সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী রহ.

(1) حضرت مجدد الف ثانی از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: ابوسعید محمد عمر علی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র)
অনূদিত

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী রহ.

মূল ঃ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র)

প্রকাশকালঃ
জানুয়ারী, ২০১৫ ঈসায়ী
মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ; রবিউস সানী, ১৪৩৬ হিজরী

প্রকাশনায়ঃ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ 01822-806163; 01776-438110

মুদ্রণে ঃ মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN: 984-622-026-1

মূল্য ঃ ৪০০.০০ (চারশত) টাকা মাত্র।

Hazrat Muzaddid Alfe SaniRh. Written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi (R) in Urdu and translated by Moulana Abu Sayeed Muhammad Omr Ali (R) into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka-1100. BANGLADESH.
Price Tk: 400/- US $ 12
Cell Phone: 01822-806163; 01776-438110

উৎসর্গ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা চরম আত্মত্যাগের সম্মুখীন হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এ পথের সকল প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে যাঁরা মুকাবিলা করেছেন,

অত্যাচারী জালিমের খড়গ-কৃপাণ ও বদ্ধ কারাপ্রাচীর যাঁদের বিশ্বাসের ভিত্কে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি,

বিলাসী ও আয়েশী জীবন যাপনের শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ জীবন যাপন করে মানুষের সামনে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন,

পর্ণ কুটিরে বাস করে এবং অনাড়ম্বর পরিবেশে থেকেও যাঁরা রাজা-বাদশাহ্‌র ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সামনে নিজেদের শির সমুন্নত রেখেছেন, দুঃখী ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হতাশ অন্তরে আশা-ভারসার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন,

তাদেরকে কাছে টেনেছেন,

আপন করেছেন,

রূহানিয়াতের প্রোজ্জ্বল আলোকধারায় যাঁরা পাপক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সব জানা-অজানা মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রূহের উদ্দেশে............

—অনুবাদক

অনুবাদকের আরয

আল্‌হামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আল্‌হামদুলিল্লাহ্। পরম করুণাময় ও করুণা নিধানের অপার মেহেরবানীতে অবশেষে 'তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত'-এর ৪র্থ খণ্ডের বাংলা তরজমা "সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস" নামে প্রকাশিত হল। এজন্য আমি সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শত সহস্র কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করছি, পেশ করছি তাঁরাই মহান দরবারে বিনীত সিজ্‌দা। অযূত সালাত ও সালাম প্রিয় নবী সাইয়েদুল মুরসালীন খাতিমুন-নাবিয়্যীন, শাফী'উল মুযনিবীন, রাহ্‌মাতুল্লিল-'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সালামের প্রতি যাহার ওসীলায় আমরা হেদায়েত রূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছি, গৌরবান্বিত হয়েছি। সেই সাথে উম্মাহাতু'ল-মু'মিনীন, আহলে বায়ত, সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন ও তাবা তাবি'ঈন, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিছীন, ফুকাহায়ে ইজাম ও আওলিয়ায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সালাম পেশ করছি যাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও সাধনায় ইসলাম অবিকৃতরূপে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

"তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমত" নামটি "সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস" পাঠকের কাছে নতুন নয়। ইতোমধ্যে এ সিরিজের তিনটি খণ্ড পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। বর্তমান খণ্ডটি সিরিজের ৪র্থ পুস্তক যা এখন পাঠকের হাতে। বর্তমান খণ্ডে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্নিপুরুষ হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ "মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী" নামে পরিচিত মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদ ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ ফারূকী সরহিন্দী (র)-র সংগ্রাম ও সাধনাবহুল অমর জীবনেতিহাস স্থান পেয়েছে। এ সিরিজের সর্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চম খণ্ডটি উপমহাদেশের আরেক কীর্তিমান পুরুষ মর্দে মু'মিন হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র)-র জীবনী ও তাঁর খান্দানের কর্মবহুল ইতিহাস স্থান পেয়েছে। আল্লাহ্‌র রহমত এবং পাঠক মহলের দো'আ পেলে আল্লাহ চাহে তো সিরিজের এই সর্বশেষ খণ্ডটিও সত্বর পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হব।

সিরিজের তিনটি খণ্ড হাতে পাবার পর পাঠক চতুর্থ খণ্ডটি হাতে পাবার জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং আমাদের ওপর তাকীদের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু নানা কারণেই আমার পক্ষে সেই তাকীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন সম্ভব হয়নি। এজন্য আমি আমার সম্মানিত পাঠকমহলের কাছে বিনীত ক্ষমাপ্রার্থী। সবচে' বেশী তাকীদ ছিল এই সিরিজের সর্বাধিক গুণগ্রাহী অধমের পীর ভাই মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদীর। তিনি যেভাবে এজন্য প্রয়োজনীয় তাকীদ দিয়েছেন এবং সর্বশেষ যে ভাষায় আমাকে এর জন্য চাপ দিয়েছেন তা আলোচ্য সিরিজের মূল গ্রন্থকার আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি 'আলায়হির প্রতি তাঁর অপরিমেয় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, সেই সাথে বর্তমান খণ্ডের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আল্‌ফে-ছানী

ও মুজাদ্দিদবর্গের তেজোদ্দীপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন তিনি এ সব গ্রন্থে। মুসলিম জাহানে তাঁর এই সিরিজটি সর্বজনস্বীকৃত ও প্রশংসিত। বিশ্বের কয়েকটি ভাষায় এগুলোর তরজমা হয়েছে। বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'ইসলামী রেঁনেসার অগ্রপথিক' নামে উক্ত সিরিজের তিনটি খণ্ডের অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় ও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু সুদীর্ঘ এক যুগ যাবত প্রকাশিত এ সব খণ্ডের আর কোন সংস্করণ মুদ্রিত না হওয়ায় আগ্রহী পাঠকের ঐকান্তিক অনুরোধে আল্লামা নদভী লিখিত পুস্তকাদির তরজমা ও প্রকাশের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান "মজলিস নাশরিয়াত-ই- ইসলাম"-এর সংগে আমরা যোগাযোগ করি। "মজলিস নাশরিয়াত-ই- ইসলাম" কর্তৃপক্ষ আমাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে শর্তসাপেক্ষে এ সিরিজগুলো প্রকাশের অনুমতি দেন। ইতিমধ্যে এ সিরিজের তিনটি খণ্ড পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। চতুর্থ খণ্ডে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্নিপুরুষ হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ 'মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী' নামে পরিচিত মর্দে মু'মিন ও মুজাহিদ ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ ফারূকী (র) -এর সংগ্রাম ও সাধনাবহুল অমর ইতিহাস স্থান পেয়েছে। সিরিজের পঞ্চম খণ্ডটি উপমহাদেশের আরেক কীর্তিমান পুরুষ মর্দে মু'মিন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর জীবনী ও খান্দানের কর্মবহুল ইতিহাস স্থান পেয়েছে। অতি সত্ত্বর পঞ্চম খণ্ডটিও পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারব ইন্‌শাআল্লাহ্।

এক্ষণে যেই আগ্রহী পাঠকের স্বার্থে আমরা এই দুরুহ কাজে হাত দিয়েছি তাদের প্রয়োজন পূরণে এ প্রয়াস সফল হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ প্রয়াস নাযাতের ওসীলা বানান এবং এ প্রয়াস কবুল করুন এটাই আমাদের মুনাজাত।

—প্রকাশক

প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবন-দর্শন। অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সুন্দর ও নিখুঁৎ সমাধান রয়েছে ইসলামে। জীবন প্রবাহের স্রোতধারায় ইসলামের অনুশাসনমালা এক কালজয়ী আদর্শরূপে স্বীকৃত। অভ্যুদয়ের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু মনীষী ও আল্লাহ্ওয়ালা এর প্রচার ও সংরক্ষণে দিয়েছেন সীমাহীন কুরবানী। আমরা তাঁদের জীবনের কতটুকুই বা জানি?

আমরা সমাজের মূল স্রোতধারার সংস্কারক শক্তির কথা বেমালুম ভুলে যাই। যে সব মানব হিতৈষীবর্গ তাঁদের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজের হিত সাধন করে গেছেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে দান করেছেন এক সুষ্ঠু অবকাঠামো, মানবতার উত্তরণ ঘটিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ করেছেন মানব সমাজকে– তাঁরা রয়েছেন ইতিহাসের পাতায় অনুল্লেখ্য। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো ভরে আছে রাজ-রাজড়াদের কাহিনীতে।

আজ মানুষ সচেতন হয়েছে অনেকটা। রাজ-দণ্ডমুণ্ডের অধিকারীরা আজ দিশেহারা। জ্ঞানরাজ্যে বিচরণকারীদের সংস্পর্শে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। যুগধর্ম ও পরিবেশের এই জরুরী মুহূর্তে সংস্কারক ব্যক্তিত্বসমূহকে স্থায়ী আসনে সমাসীন করার জন্য যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে কলমী জিহাদের বিস্তীর্ণ ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও লেখক আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

লাখনৌ-এর 'জামা'আতে দা'ওয়াত-ই-ইসলাহ ও তাবলীগ' যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে সপ্তাহব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল ১৩৭২ হিজরীর মুহাররম মাসে। এর আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম ছিল, "সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাস এবং উক্ত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।" জনাব আল্লামা নদভী উক্ত বিষয়ের ওপর নিবন্ধ পেশ করে এক নতুন ধারায় লেখনী পরিচালনার প্রেরণা লাভ করেন। এরপর আল্লাহ্র রহমত ও প্রাণান্তকর সাধনাকে সম্বল করে 'তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমত' নামে সিরিজ পুস্তক প্রণয়নে হাত দেন এবং হযরত ওমর ইবনে 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে তিনি এর সিলসিলা আরম্ভ করেন। এ পর্যায়ে তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম জাহানের স্বনামধন্য 'আলিম, মর্দে মু'মিন

শায়খ আহমদ সরহিন্দী (র)-র প্রতি গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণের প্রমাণ বহন করে। অধম এজন্য তাঁর কাছে অন্তহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং এই নেককাজের জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে যদি অধমের কিছু মাত্র আজর ও ছওয়াব প্রাপ্য হয়ে থাকে তবে তাঁকেও আমি এতে শরীক করতে চাই।

বর্তমান খণ্ডটি সর্বপ্রথম অনুবাদকের হাতে আসে আমার মুহতারাম শায়খ ও রূহানী মুরব্বী 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র প্রথম বাংলাদেশ সফরকালে। ১৯৮৪ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে তিনি এটি আমাকে ও মাওলানা মুহীউদ্দীন খান সাহেবকে হাদিয়া করেন। গ্রন্থের ইনার পৃষ্ঠায় হযরতের স্বহস্ত লিখিত স্বাক্ষর আজও বর্তমান। এরপর হযরত (র)-এর অনেকগুলো বই অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং সেগুলো পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বর্তমান খণ্ডের তরজমার কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম অনেক আগেই এবং একটা উল্লেখযোগ্য অংশের তরজমা করেছিলাম আমার শায়খ-এর মুবারক খেদমত ও সুহবতে থেকে পবিত্র মাহে রমযানে দাইরায়ে শাহ্ 'আলামুল্লাহ্য়। তারপরও এর বিলম্বের পেছনে দায়ী অন্য কতকগুলো কারণের সঙ্গে গ্রন্থের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের তরজমায় পারিভাষিক ও বিষয়বস্তুর জটিলতা। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব এই জটিলতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছি। এরপর ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২২০ পৃষ্ঠার "মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানীর অবদান" শীর্ষক সাবহেডিং থেকে ২২৮ নং পৃষ্ঠার ১ম প্যারা পর্যন্ত তরজমার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হই। এজন্য আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (র)-এর কনিষ্ঠতম খলীফাবেফাকুল মাদারিসের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের (দা.বা.) দ্বারস্থ হই। তিনি এই জটিল সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে যেভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তার তুলনা নেই। আল্লাহ্ পাক তাঁর নেক হায়াত বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর মুবারক সোহবত থেকে আমাদেরকে ফায়দা হাসিলের তৌফিক দিন। প্রিয়ভাজন মাওলানা আবদুর রায্যাক নদভীর প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল যিনি মূল লেখকের ভূমিকা অংশটুকু তরজমা করে আমাকে অনুগ্রহ করেছেন।

পরিশেষে পাঠক সমীপে বিনীত নিবেদন, বইটি ১ম সংস্করণ থেকে অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বেশ কিছু ফারসী উদ্ধৃতির তরজমা এতে দেওয়া সম্ভব হয় নি। আল্লাহ্ যদি তৌফীক দেন তবে দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলোর প্রতি নজর দেওয়া হবে। বইটি মুহাম্মদ ব্রাদার্সের যিম্মাদার বন্ধুবর অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রউফ সাহেবের বদান্যতায় প্রকাশিত হচ্ছে। এর প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের জন্য দো'আ করছি। এতদসঙ্গে দোআ করছি, আল্লাহ্ পাক বই-এর মূল গ্রন্থকার আল্লামা নদভী (র) কে জান্নাতুল ফেরদাওসে স্থান দিন এবং অধমকে তাঁর স্নেহ ছায়ায় কবূল করুন। আমীন।

—অনুবাদক

লেখকের কথা

আনুমানিক ১৯৩৫-৩৬ এর কথা। আমার মুহ্তারাম মুরব্বী ও শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ডাক্তার হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আবদুল আলী (সাবেক নাজেম, নদওয়াতুল ওলামা) মরহুম আমাকে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানীর মকতূবাত (পত্রাবলী) অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেন। আমার বয়স তখন ২২/২৩ এর বেশী হবে না। সবেমাত্র নদওয়াতুল ওলামায় অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছি। মারেফত ও হাকীকত সম্পর্কিত বিষয়াবলীর অধ্যয়ন সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক পথের পরিভাষা সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ, মন-মস্তিষ্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সাহিত্য (বিশেষভাবে আরবী সাহিত্য) ও ইতিহাসের রাজত্ব। মিসর ও বৈরুতের উন্নত প্রেস ঝকঝকে ছাপা গ্রন্থাবলী পাঠে ছিলাম অভ্যস্ত। আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই- (যাঁর স্নেহের আঁচলে আমি লালিত এবং তরবিয়তের কোলে বড় হয়েছিলাম) আমার এ অবস্থা সম্পর্কে খুব ওয়াকিফহাল ছিলেন। তারপরও আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

"যে ঘরের তুমি প্রদীপ, তার রুচি ও স্বভাব তোমার জানা"। কারণ কম পক্ষে তিন বছর থেকে হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানী ও শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (র.)-এর খান্দানের সাথে আমাদের খান্দানের চিন্তা-চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার ধারা চলে আসছে। আমাদের ঘরে ওয়ালিদ মুহ্তারামের সংরক্ষিত গ্রন্থ ভাণ্ডারে দিল্লীর আহমদী প্রেসে ছাপা মকতূবাতের নোসখা বিদ্যমান ছিল যা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল। ভাই সাহেবের নির্দেশে তা'লীমের লক্ষ্যে উক্ত মকতূবাত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি। এর মাঝে একবার আমি হিম্মত হারিয়ে ফেলি এবং কিতাব রেখে দেই। পত্রাবলীতে সমস্যা বেশি হয় যা তিনি তাঁর শায়খ হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর নামে লেখেন। এবং তিনি তাঁর অন্তরে যেসব চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটে সে সবের বিবরণ পেশ করেন। কিন্তু ভাই সাহেবের পক্ষ থেকে বার বার তাকীদ ও নির্দেশ আসতে থাকে যে, আমি যেন যে কোন মূল্যে মকতূবাত (পত্রাবলী), শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর ইযালাতুল খিফা, সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র.)-এর সীরাতে মুস্তাকীম এবং শাহ ইসমাঈল শহীদের মানসাবে নবুওয়াত অধ্যয়ন করে ফেলি।

অবশেষে সাহসে কোমর বেঁধে এ সাত-সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। অভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ নাড়া দিতে লাগলো যে, অত্যন্ত স্নেহশীল ভাইয়ের নির্দেশ পালন করতে পারছি না এবং এক বরকতপূর্ণ গ্রন্থের অধ্যয়ন করা

থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি, যুগ যুগ ধরে উলামা-মাশায়েখ যাকে রক্ষা-কবচ বানিয়ে রেখেছেন! এরপর আল্লাহ্ পাকের করুণা ও তাওফীক সঙ্গী হলো। গ্রন্থ অধ্যয়নে যতই অগ্রসর হতে লাগলাম ততই ভাল লাগতে লাগলো, নিজের সাধ্যানুপাতে গ্রন্থ হৃদয় স্পর্শ করতে লাগলো, ধীরে ধীরে এ গ্রন্থের আঁচলে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। ফলে এর অধ্যয়নে এত বেশী স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করতে লাগলাম যা কোন নামি-দামী সাহিত্য কর্মে মেলা দুষ্কর। যুগটি আমার জীবনের জন্য নাযুক ও টার্নিং পয়েন্ট ছিল। কঠিন মানসিক সংঘাত ও বড় ধরনের পরীক্ষা চলছে। এমন জটিল মুহূর্তে এ মকতূবাত পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শনের ভূমিকা রাখে। খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছিলাম যে, আমার অন্তর প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ বরং নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। যতটুকু মনে পড়ে, এমন প্রশান্তি ইতিপূর্বে আর কখনও অনুভব করিনি। এ (অধ্যয়ন) সফর সৌভাগ্যক্রমে নিতান্ত আনুগত্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় যেখানে (বড় ভাই-এর) নির্দেশ পালন ও আত্মমর্যাদাবোধের জযবা ক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু তা অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে সমাপ্ত হয়।

এর কিছুদিন পর এ লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার মকতূবাত অধ্যয়ন আরম্ভ করি যে, এতে বিক্ষিপ্ত ও বার বার আলোচিত বিষয়গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শিরনামের অধীনে একত্রিত করা যায় কিনা। এ জন্য কিতাবের বিষয়বস্তুর একটি ইনডেক্স তৈরি করে কাজ আরম্ভ করি। উদাহরণস্বরূপ নির্ভেজাল তাওহীদের ও শিরকের কথা কোথায় কোথায় আলোচিত হয়েছে। মকতূবাতের নম্বরের উদ্ধৃতিসহ পৃষ্ঠাসমূহ এক স্থানে নোট করে নিই। নবুওয়াত রিসালাত-এর আলোচনা কোথায় কোথায় এসেছে, সুন্নত ও বিদআত সম্পর্কে কোন মকতূবাতে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এ আলোচনা কত স্থানে হয়েছে যে, বিদ'আতে হাসানার কোন অস্তিত্ব কোথাও নেই, ওয়াহদাতুল ওজূদ ও ওয়াহদাতুশ শুহূদ সম্পর্কে কোন কোন মকতূবাতে আলোচনা করা হয়েছে, নিরেট বুদ্ধিবৃত্তিক ও নির্ভেজাল কাশ্‌ফ সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা কোথায় হয়েছে। যা হোক এক সপ্তাহ মেহনতের পর এ সূচী ও তালিকা প্রস্তুতের পর্ব শেষ প্রান্তে এসে যায় এবং এ তালিকা মকতূবাতের ভেতরই রেখে দেই যে, এর সাহায্যে মকতূবাতের ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো পৃথক পৃথক শিরনামের অধীনে একত্র করা সম্ভব হবে। কিন্তু কে যেন এ মকতূবাত পাঠ করার জন্য নিয়ে আর ফেরত আনেনি। মকতূবাতের নোসখার (যার বিকল্প পাওয়া তো সম্ভব ছিল বিধায় এত আফসোস হয়নি, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের পর যে সূচীটি তৈরি করা হয়েছিল তার (যার বিকল্প পাওয়া সম্ভব ছিল না) জন্য খুব আফসোস হয়। যা হোক আল্লাহ্ পাকের সিদ্ধান্তই বলবত হয়।

বছর কয়েক পর আনুমানিক ৪৫-৪৬ এর কথা হবে, মকতূবাতকে বিষয় ভিত্তিক সংকলন ও বিন্যাস করার পরিকল্পনা মনে আসে। লক্ষ্য মকতূবাতকে

নববিন্যাসে পরিচয়সহ উপস্থাপন করা যদ্দারা নতুন প্রজন্ম ও আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার শিক্ষিত যুবকরা উপকৃত হতে পারে এবং তাদের মধ্যে মকতূবাত পাঠে আগ্রহ জন্মে এবং এর মাধ্যমে মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-এর সংস্কার কর্মের বিশাল অবদান ও তাঁর প্রকৃত মর্যাদা ফুঁটে ওঠে। তাই এই গুরুত্বের ভিত্তিতে কাজ শুরু করা যে, প্রথমে নির্বাচিত মকতূবাতসমূহের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার অবতারণা করা যাতে সংক্ষেপে এ সবের কেন্দ্রীয় চিন্তা ও মূল কথা এসে যায় যা একই শিরনামের অধীনে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সমগ্র মকতূবাতে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। অতঃপর অর্থের ধারা অনুযায়ী মকতূবাতের নির্বাচিত অংশসমূহ পেশ করা, একদিকে ফারসী (মূল) মকতূবাত, অপর দিকে তার উর্দূ তরজমা। অতঃপর টিকার মাধ্যমে কঠিন শব্দ বিশ্লেষণ এবং মকতূবাতে বর্ণিত হাদীসসমূহের রেফারেন্স ও উৎস গ্রন্থের উল্লেখ করা। এরপর মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য মান্যবর উলামা ও বিজ্ঞ-ইসলামী স্কলারদের সমর্থনমূলক বক্তব্য পেশ করা। মোটকথা, সবকিছু মিলে এ কাজের পরিধি ছিল বিরাট বিস্তীর্ণ। আর এ কাজে এত অধিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন ছিল যে, আমার মত একজন অল্প বয়স্ক যুবকের পক্ষে তাবলীগ, অধ্যাপনা ও লেখনীর তিন গলিতেই বিচরণ যার আঞ্জাম দেয়া ছিল একটি দুরূহ কাজ। ফল এই দাঁড়াল, তাওহীদ-রিসালাত ও নবুওয়াতের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছার পর বিভিন্নমুখী কাজের ঝামেলা এত বেড়ে যায় যে, আর এ কাজটি করার অবকাশ দেয়নি। কিন্তু যতটুকু কাজ হয়েছিল, তাও ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও উপকারী। বন্ধুবর মাওলানা মনযুর নু'মানী তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা "আল-ফুরকানে ৬৬-৬৭ হিঃ মুতাবিক ৪৭-৪৮ ইংরেজীতে চার কিস্তিতে তা প্রকাশ করেন। এই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ার কয়েক বছর পর যখন তারীখে দাওয়াত ও আযীমত (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) সিরিজের কাজ আরম্ভ করি তখন মকতূবাতের নতুন বিন্যাস ও খেদমতের পরিবর্তে অন্তরে মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর স্বতন্ত্র জীবনী লেখার আগ্রহ জন্মে। তারীখে দাওয়াত ও আযীমতের তৃতীয় খণ্ড অষ্টম শতাব্দীর ভারতবর্ষের দুই মহান আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক ও ওলীকুল শিরমণি হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.) ও মাখদূমুল মুলক হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রহ.) জীবনী ও পরিচিত সম্বলিত ছিল, আত্মপ্রকাশ করে। এরপর মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (রহ.)-এর জীবনী লেখা জরুরী হয়ে যায় যদ্দারা উক্ত সিরিজের চতুর্থ খণ্ড শোভামণ্ডিত হবে। বিভিন্ন কারণে মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর ইনকিলাবী যুগ এবং সমস্যা ও সংকট পরিপূর্ণ মুহূর্তের অবস্থা সম্মুখে আসা প্রয়োজন এবং বর্তমান সময়ে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর কর্মপন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং জনসম্মুখে তা তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ, আজকাল যে কোন

দীনী কাজের সূচনা ক্ষণেই রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ক্ষমতাকে নিজের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে নেওয়া হয়, যা অন্য যুগে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই আমাদের সবার জানা দরকার যে, মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর সেই কর্মপন্থা কী ছিল যদ্দ্বারা সহায়-সম্বলহীন এক ফকীর এক নিভৃত খানকায় বসে দেশ ও সালতানাত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার গতিধারা বদলিয়ে দিতে সক্ষম হন। সর্বপ্রথম আমার সম্মানিত বড় ভাই সাহেবের মজলিসী আলোচনায় এ বাস্তবতা উপলব্ধি হয়। অতঃপর হযরত মানাজির আহসান গিলানী (রহ.)-এর এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ-পাঠে এ বিষয়ে অবহিত হই যা তিনি মাসিক আল-ফুরকানের মুজাদ্দিদ সংখ্যার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। আমি নিজেও বহুবার আমার আরবী বক্তৃতায় এই বাস্তবতা সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় আলোকপাত করি। এতে করে মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর কর্মপন্থা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস ও তৃপ্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কিন্তু যখন পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র জীবনী রচনার চিন্তা করলাম, তখন দু'টি বিষয় এ পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালো, প্রথম বিষয়টি হলো, মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর জীবনী লিখতে গেলে ওয়াহদাতুল ওহূদ ও ওয়াহদাতুশ শুহূদ এর দর্শন ও মতবাদের আলোচনা-পর্যালোচনা ও এর ব্যাখ্যা এবং এর ওপর দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনা ও সমালোচনা। অতঃপর দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দান এবং এই মতবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা ছাড়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু যখন এর বিশালতার কথা অন্তরে আসে তখন হিম্মতহারা হয়ে পড়ি একথা ভেবে যে, এ বিষয়ে এত বিশালকায় লাইব্রেরী প্রস্তুত হয়ে গেছে যার সার-সংক্ষেপ ও নির্বাচিত অংশ পেশ করাও ছিল জটিল ও দুরূহ কাজ।

দ্বিতীয়ত, সেই সব সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনা ও ভূমিকা, পরিভাষা সমূহে বুঝা ছাড়া এ বিষয়ে কলম ধরা ছিল অসম্ভব। সবকথার পর এই বিষয়টি ছিল আমলী তথা ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক রুচি ও নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত– লেখক যে পথে চলেনি। সেই সাথে বিরাট সংখ্যক পাঠক শুধু এ বিষয়ে অজ্ঞই নয় যার সাথে সম্পর্ক রাখতেও অপ্রস্তুত। ফলে বুঝতে পারছিলাম না যে, এ সাগর কীভাবে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে? আর যদি জীবনীগ্রন্থে, এই বিষয়ে আলোকপাত না করা হয় (অনেকের ধারণা মতে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর আসল ময়দান ও তাঁর রেঁনেসা কর্মের রহস্য এখানেই নিহিত) তাহলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচনা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? দ্বিতীয় যে বিষয়টি লেখকের কলমের গতি রোধ করে ফেলে এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলো এই যে, এ বিষয়ে অর্থাৎ মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-এর ওপর এত বেশী লেখা-লেখি হয়েছে যে, লেখকের জন্য এত নতুন কিছু সংযোজন করা ও নতুন গ্রন্থ রচনা করার বৈধতার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা ছিল দুঃসাধ্য। অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে এই সব সমস্যার সমাধান ।

এইভাবে চিন্তা করা হলো যে, مالايدرك كله يترك كله "অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্জন সম্ভব না হলেও আংশিক অর্জন পরিত্যাগ ঠিক নয়" এ নীতির ভিত্তিতে বিষয়টি শায়খ আকবরের বিদ্যাঙ্গনের কোন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ও নির্ভরশীল ব্যাখ্যাতা এবং স্বয়ং মকতূবাতের সাহায্যে পাঠকের সামনে এমনভাবে পেশ করা যায়, যদ্দ্বারা এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তারা ধারণা পেতে ও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন। কিন্তু যাঁদের সাহস ও আগ্রহ আছে তাঁরা বরাতগ্রন্থ ও মৌলিক উৎসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে পারেন অথবা এ বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ নাবিকদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন যারা এই বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও রুচির অধিকারী। আর এদের সংখ্যা খুবই কম।

আর দ্বিতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লামা ইকবাল (র.)-এর কবিতা আমাকে পথ প্রদর্শন করে এবং লেখকের সীমাবদ্ধ লেখালেখির অভিজ্ঞতাও তার সমর্থন করে ও সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করে ।

گان مبرکه بپایاں رسیدکارمغان ۔ هزارباده ناطورده دررگ تاکراست ۔

অর্থাৎ হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) সম্পর্কে হাজার কাজ হবার পরও আজও অনেক কিছুই অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে এবং অনেক কিছুই লেখা সম্ভব।

এরপর ভাষা-রীতি, প্রশ্ন ও অবস্থাদি, মান ও মূল্যায়ন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বুঝানোর ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় রচিত গ্রন্থের অবস্থা এমন হয় যে, মনে হয় যেন অন্য কোন ভাষায় এটি লেখা হয়েছে এবং এখন এর অনুবাদ প্রয়োজন। এরপর ভূমিকা ও ঘটনাবলী থেকে ফলাফল বের করা এবং কারণ ও ফলাফলের মাঝে সম্পর্ক তৈরি করা। বর্তমান যুগের অবস্থার ওপর উপযোগী করার পদ্ধতিও সব লেখকের ভিন্ন হয়ে থাকে। লেখকের অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, যদি এ কাজ নিষ্ঠা ও মেহনতের সাথে করা হয় তাহলে গ্রন্থটি শুধু উপকারীই হবে না বরং হিজরী চৌদ্দ শতকের শেষ প্রান্তে এবং পনের শতকের জন্য (যা গ্রন্থ প্রকাশের অব্যহতি পরেই আরম্ভ হতে যাচ্ছে) একটি মূল্যায়নযোগ্য ও সঞ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন পয়গাম হবে এবং আল্লাহ পাকের একজন নিষ্ঠাবান ও প্রিয় বান্দার এমন কর্মপ্রচেষ্টার রোয়েদাদ তৈরি হয়ে যাবে যে কর্ম তিনি অত্যন্ত নিরবে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে আঞ্জাম দেন, অথচ তার প্রভাব এক সহস্রাব্দ অতিক্রম করে দ্বিতীয় সহস্রাব্দে (আলফেছানী) বিস্তার লাভ করেছিল। আমাদের এ যুগের জন্যও (যার যমীন ও আসমান বাহ্যত বদলে গেছে) রয়েছে যার উপদেশ ও নসীহত।

অধম লেখকের কলব ও কলম উভয় আল্লাহ পাকের দরবারে সিজদাবনত এবং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় সিক্ত যে, আঠারো বছরের সুদীর্ঘ বিরতির পর আবার তারীখে

দাওয়াত ও আযীমতের চতুর্থ খণ্ড লেখার তাওফীকপ্রাপ্ত হচ্ছি। এ বিরতি এত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল যে, লেখক আশংকা বোধ করছিল যে, না জানি মৃত্যুর পয়গাম এসে যায় এবং এ গুরুত্বপূর্ণ সিলসিলা (সিরিজ লেখকের গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল্লাহ্ যাকে বিশেষ জনপ্রিয়তা দান করেছেন) অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চতুর্থ খণ্ড যেহেতু এমন এক মহান সংস্কারকের জীবনী সম্বলিত যার দীনী সংস্কার-কর্ম একদিকে এমন খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা দাওয়াত ও সংস্কারের ইতিহাসের কারো ভাগ্যে লিখিত হয়নি যে, মুজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) তাঁর নামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গিয়েছে। অনেক শিক্ষিত লোকও তাঁর নামের চেয়ে তারা লকবের (উপনাম) সাথে পরিচিত বেশি। অপর দিকে তাঁর সংস্কার কর্ম-প্রচেষ্টা এমন সফলতা অর্জন করেছে এবং যার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এমন অনন্য ফলাফল প্রকাশিত হয় যে, রেঁনেসা ও সংস্কার প্রচেষ্টা এবং ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে উদাহরণ মেলা ভার। ফলে নিজের অন্তরেই এ সিরিজ শেষ করার এক অদম্য আকর্ষণ ছিল এবং এআথে সিরিজের ভক্ত পাঠকদের বছরের পর বছরের দাবি ও পীড়া-পীড়িও ছিল যে, যে কোন মূল্যে এই কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা হোক, বরং অনেক দূরদর্শী ও রুচিশীল ঘনিষ্ঠ জন ও বুযুর্গের এ দাবীও ছিল যে, বর্তমান সমস্ত লেখা ও অন্যান্য কাজ স্থগিত রেখে যেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ সিরিজের কাজটি আগে শেষ করে ফেলি।

কিন্তু এ কাজটি যত সহজ মনে করা হচ্ছিল তত সহজ ছিল না। কারণ আধুনিক যুগের দাবী, আধুনিক, মন-মস্তিষ্ক ও গবেষণার আধুনিক মানদণ্ড অনুযায়ী এতটুকু যথেষ্ট ছিল না যে, মুজাদ্দিদের ওপর লিখিত জীবনী গ্রন্থ ও ইতিহাসের বিদ্যমান উপকরণ ও উপাত্ত একটু মামুলী নির্বাচন ও পরিমার্জন সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করলেই কাজ হয়ে যাবে। মুজাদ্দিদ সাহেব যে যুগে ও পরিবেশে স্বীয় রেঁনেসা কর্ম আঞ্জাম দিয়ে ছিলেন তার ওপর তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, চিন্তাগত ও রাজনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক, আকিদাগত ও কালাম শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পেশ করা জরুরী। সে সময় কোন আন্দোলন কর্মতৎপর ছিল, হিন্দুস্থান ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে কোন ধরনের মানসিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল, ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিদ্রোহের কি কি প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল, কি ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি চলছিল ইসলামের ইতিহাসে এক সহস্রাব্দীর পূর্ণ হবার কাছাকাছি এ মুহূর্তটাতে, উৎসাহদীপ্ত ভাগ্য পরীক্ষাকামীদের অন্তরে কি কি ধরনের আশা-আকাংখার প্রদীপ প্রজ্জলিত করে দিয়েছিলো এবং সন্দেহবাদী অস্থির অন্তরে কি কি সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। এক দিকে দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান, অন্যদিকে প্লেটোনিক ও বাতেনী মতবাদ নবুওয়াত ও রিসালাতের মহত্ত্ব ও মর্যাদাকে খাটো

করার এবং রিয়াযতও, মুজাহাদা ও আত্মহননকে মারেফতে ইলাহী ও আল্লাহ্ প্রাপ্তি, মুক্তি ও দর্জা বুলন্দীর জন্য যথেষ্ট মনে করার মতো কেমন ফেতনা সৃষ্টি করা- হয়েছিল, ওয়াহ্দাতুল ওজূদের মত চরমপন্থী আকীদা কিভাবে স্বাধীন ও বাধাঁ বন্ধনহীন বরং ধর্মদ্রোহিতা ও আল্লাহ্দ্রোহিতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল?

সুন্নত ও শরীয়তের গুরুত্ব শুধু স্বল্প সংখ্যক প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও হাদীসের ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিদআত খোলাখুলি ভাবে এবং কোন কোন সময় 'বিদআতে হাসানা'র নামে ও লেবাসে গোটা সমাজ এবং মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনকে "গ্রাস করে ফেলেছিল। কেউ এ বিদআতে হাসানার বিরুদ্ধে আওয়াজ বুলন্দ করতে সাহস পাচ্ছিল না। সবচে' বড় বিষয় এই ছিল যে, মুসলিম বিশ্বের সবচে' ২য় বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং এখানে বসবাসরত বিস্তৃত মুসলিম সমাজের গতি কতকগুলো নিজস্ব রুচি ও প্রবণতা, ব্যক্তি স্বার্থ, বাইরের প্রভাব ও মনগড়া রাজনৈতিক স্বার্থ-সুবিধার ফলে দীনে হিজাযীর সাথে সম্পৃক্ততা, নবুওতে মুহাম্মাদীর আনুগত্য, ইসলামী তাহযীবের প্রতিনিধিত্ব করা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতীয় দর্শন ও হিন্দুস্তানী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ধর্মের দিকে ফেরানো হচ্ছিল। এ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে সফল করার জন্য সে যুগের কিছু প্রখর মেধাবী ও যোগ্যতর ব্যক্তি শামিল ছিল এবং "নুতন যুগ নুতন আইন, নুতন সহস্রাব্দ ও নতুন নেতৃত্বের" স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছিল।

এ অবস্থা কিভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে, এর জন্য কি কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, এতে কি পরিমাণ সফলতা অর্জিত হয়েছে, অতঃপর এক নিভৃত কোণে বসে কিভাবে তিনি মানুষকে আকষর্ণ করেন ও মানুষ গঠন ও আধ্যাতিক সংশোধন ও প্রশিক্ষণের এমন কাজ আঞ্জাম দেন যার ফলে এমন সব কর্মবীর তৈরি হয় যারা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বসে, এরপর আফগানিস্তান তুর্কিস্তান, অতঃপর শাম, ইরাক, তুর্কী ও হেজায অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ্র হুকুমাত কায়েমের জোর আন্দোলন, আল্লাহ্র বাণী (কালিমাতুল্লাহ) বুলন্দ করার প্রচেষ্টা, মুর্দা সুন্নাত যিন্দাহ, শরীয়তের সাহায্য এবং বিদআত প্রতিহত করার আজিমুশ্বান কাজ সম্পাদন করেন, ওয়াহদাতুল ওজুদ-এর চরমপন্থী প্রবক্তা ও বল্গাহীন সুফীদের প্রভাব মুক্ত করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি আল্লাহ্ অন্বেষণ, শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের সিংগা ফুকে দেন। কমসে কম তিন শতাব্দী পর্যন্ত এক বিশাল কাজ এমন সাহস, হিম্মত ও প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে ও নিবেদিত হয়ে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যান যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্বে তিনি দৃষ্টিগোচর হতে থাকেন এবং এ সুদীর্ঘ শতাব্দী তাঁরই রূহানী ও ইলমী নেতৃত্বের শতাব্দী বলার যোগ্য হয়। তাঁর বিশ্ব জোড়া প্রভাব দেখে বাস্তবদর্শী মানুষ এ কথা বলতে বাধ্য হন ঃ

"পৃথিবীকে আবার উজ্জীবিত করে তুললেন একজন মরদে খোদা।"

এ ধারাবাহিকতায় আরও দু'টি বিষয় লক্ষ্য করার মত ছিল। একটি ছিল এই যে, মুজাদ্দিদ (র.)-এর যুগের বাদশাহ আকবরের যুগের অবস্থা বর্ণনা করতে শুধু মুল্লা আব্দুল কাদের বদায়ূনীর মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ এবং সকল ঐতিহাসিক বরাত গ্রন্থের উপর সীমাবদ্ধ না থাকা যা বিশেষ দীনী আবেগ অথবা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ বহন করে এবং আকবরী যুগের অন্ধকার থেকে অন্ধকার চিত্র পেশ করতে অভ্যস্ত, বরং সে ক্ষেত্রে ঐসব নিরপেক্ষ লেখক অথবা আকবরের রাজসভার ঐসব কলমধারীর লেখা ও বর্ণনা থেকে উপাত্ত-সংগ্রহ করা হয়েছে যারা শুধু যে আকবর বিরোধী ছিলেন না তাই নয় বরং তারা তাঁর প্রবক্তা এবং তাঁর চিন্তা ও দর্শনের প্রবক্তা, তাঁর সাম্রাজ্যের আইন ও আল্লাহ্প্রদত্ত প্রতিভার স্বীকৃতিদাতা প্রচারক ছিল। সেই সাথে সেই ধারাবাহিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ও বিচক্ষণতাপূর্ণ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যা জাহাঙ্গীরের যুগ থেকে শুরু হয়ে আলমগীরের যুগে এসে পূর্ণতা লাভ করে। এ ব্যাপারেও মুজাদ্দিদিয়া খান্দানের লেখকদের বিবরণ ও তার প্রতি অতি সুধারণা পোষণকারী ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্যের পরিবর্তে নিরপেক্ষ হিন্দুস্তানী ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলী থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এ সবের আলোকে এ দাবীর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

এ ছাড়া এরও প্রয়োজন ছিল চতুর্দশ শতাব্দী ধরে হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরে মুজাদ্দিদ (র) এক তাঁর যুগ সম্পর্কে উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় যে সব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে যাতে অনেক প্রসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত অনেক বিষয়কে চ্যালেঞ্জও করা হয়েছে, অনেক নতুন নতুন প্রশ্ন উথাপন করা হয়েছে, বাস্তবতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মনগড়া এক ভিন্ন চিত্র পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে (যা সেই সমুজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত চিত্র থেকে ভিন্ন যা আজ পর্যন্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে) এ গ্রন্থে এ সব বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। যদিও সেসব দাবীর উল্লেখ না করেও এমনভাবে তা খণ্ডন করা দরকার যদ্বারা মুজাদ্দিদ (র.)-এর এ নতুন জীবনীগ্রন্থে তাঁর অবদানের পর্যালোচনায় অজান্তেই ঐসব গ্রন্থের উত্তর ও তাদের দাবী ও অভিযোগসমূহের খণ্ডন হয়ে যায়।

নিজের কঠিন ব্যস্ততা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সফর ও স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা এবং সহযোগিতাকারীর অভাব সত্ত্বেও চেষ্টা করা হয়েছে যে, তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত-এর এ খণ্ডে যা হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-এর খেদমত ও অবদান সম্পর্কে রচিত, এতে যেন কিছু নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটে আজও পর্যন্ত যার ওপর কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি এবং এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী ফলাফল, তেমন একক কর্ম ও চিন্তার আহ্বানসহ এ খণ্ডটি আত্মপ্রকাশ

করুক যদ্দ্বারা আমরা এ যুগের দাবীসমূহ পূর্ণ করতে পারি এবং সমাগত ১৫ দশ শতাব্দীকে স্বাগত জানাতে (বিভিন্ন মুসলিম জনপদ যার স্বাগতম জানিয়েছে) সহযোগিতা নিতে পারি। সবশেষে এর স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাও জরুরী যে, মুজাদ্দিদ খান্দানের শাখাসমূহের এবং মুজাদ্দদী সিলসিলার বড় বড় মাশায়েখ সম্পর্কে সম্মানীয় হযরত মাওলানা আবুল হাসান যায়দ ফারূকী মুজাদ্দিদী সাহেব (প্রিয় পুত্র হযরত শাহ আবুল খায়ের মুজাদ্দেদী)-এর কাছ থেকে এমন সব মূল্যবান তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে যা বাহ্যত অন্য কোন মাধ্যমে সংগ্রহ করা দুষ্কর ছিল। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর খালিক আহমাদ নিজামী কৃতজ্ঞতার হকদার যিনি অত্যন্ত উদার চিত্তে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ভাণ্ডার থেকে কিছু প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপি ও উপকারী তথ্য প্রদান করে এ থেকে উপকৃত হবার সুযোগ দানে ধন্য করেন। গ্রন্থকার ড. নাজির আহমাদ (আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি)- এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

২৬ জুমাদাল-ঊলা ১৪০০ হি. — দাইরায়ে শাহ আলামুল্লাহ

আবুল হাসান আলী নদভী — রায়বেরেলী

১৩ এপ্রিল ১৯৮০ খ্রি.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)
হিজরী দশম শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব

দশম শতাব্দীর ঐতিহাসিক অধ্যয়নের গুরুত্ব # ১
রাজনৈতিক অবস্থা # ২
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা # ৬
জ্ঞান রাজ্যের অবস্থা # ১৪
মানসিক অস্থিরতা এবং আকীদার ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত চিন্তা # ১৯
অস্থিরতা ও বিক্ষিপ্তচিত্ততার কারণ # ৩১
দশম শতাব্দীর সবচে' বড় ফেতনা
দ্বিতীয় সহস্রাব্দ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা # ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
আকবরের শাসনামল এবং তাঁর পরস্পর বিরোধী শাসনকাল

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় ও মযহাবী জীবন # ৪৩
বিভিন্ন ধর্মের মাঝে তুলনা ও গবেষণা, বিতর্ক সভা এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া # ৫০
আকবরের মেযাজ পরিবর্তন, দরবারের আলিম-উলামা ও সাম্রাজ্যের পদস্থ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব # ৫৫
দরবারী আলিম-উলামা # ৫৬
সাম্রাজ্যের অমাত্য-এবং দরবারের উপদেষ্টাবর্গ # ৬১
মোল্লা মুবারক ও তাঁর দুই পুত্র ফৈযী ও আবুল ফযল # ৬২
রাজপূত রাণীদের প্রভাব # ৭০
ইজতিহাদ ও ইমামতনামা # ৭১
এক নজরে রাজকীয় ঘোষণা # ৭২
মাখদুমুল মুলক এবং সদরুস সুদূর-এর পতন # ৭৪
আল্‌ফে ছানীর প্রস্তুতি এবং দীনে ইলাহীর প্রচলন # ৭৪
সম্রাট আকবরের ধর্মীয় ও মেযাজগত বিকৃতি এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি # ৭৬
অগ্নি পূজা # ৭৭
সূর্য পূজা # ৭৭

গঙ্গাজল # ৭৭
চিত্রাংকন # ৭৮
ইবাদতের ওয়াক্ত # ৭৮
সিজদা-ই-তা'জীমী বা সম্মানসূচক সিজদা # ৭৮
বায়'আত ও ইরশাদ # ৭৮
সাক্ষাতের আদব # ৭৯
হিজরী সন ও তারিখের প্রতি ঘৃণা # ৭৯
অনৈসলামী পালা-পর্বণ ও আনন্দ উৎসব # ৭৯
যাকাত আদায় না করতে রাষ্ট্রীয় ফরমান # ৮০
হিন্দুরা একত্ববাদী # ৮১
শূকর # ৮১
মদ্য পান # ৮১
হিন্দু প্রথা # ৮২
ইলাহী সনের প্রচলন # ৮২
দীন ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন # ৮২
ইসরা ও মি'রাজ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ # ৮৩
মকাম-ই নবুওতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন # ৮৩
নববী নামের অহংবোধ ও কষ্ট অনুভব # ৮৩
নামাযের রুকনসমূহের অবমাননা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ # ৮৪
ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গীন ও বিপজ্জনক মোড় # ৮৪

তৃতীয় অধ্যায়
হযরত মুজাদ্দিদ আলফ-ই ছানী (র.)
জীবন কাহিনী ঃ জন্ম থেকে খিলাফত প্রাপ্তি পর্যন্ত

খান্দান # ৮৭
হযরত মাখদূম শায়খ আবদুল আহাদ # ৯২
জন্ম ও অন্যান্য অবস্থা
জন্ম ও শিক্ষা # ৯৬
সুলূক-এ প্রশিক্ষণ ও পরিপূর্ণতা লাভ এবং হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র হাতে বায়'আত গ্রহণ # ৯৮
হযরত শায়খ আবদুল বাকী নকশবন্দী দেহলভী (খাজা বাকী বিল্লাহ) # ১০১
বায়'আত ও পূর্ণতা প্রাপ্তি # ১০৫
হযরত মুজাদ্দিদ-এর উচ্চতর মরতবা সম্পর্কে হযরত খাজা (র)-র মৌখিক সাক্ষ্য # ১০৮

চতুর্থ অধ্যায়
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, অবস্থা, হেদায়েত, তা'লীম ও তরবিয়তী তৎপরতা এবং ওফাত

সরহিন্দে অবস্থান # ১০৯
লাহোর সফর # ১১০
দাওয়াত ও তাবলীগ, হেদায়েত ও তরবিয়তের বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা এবং তৎপ্রতি ধাবমান ব্যাপক জনস্রোত # ১১১
সমকালীন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি # ১১৩
গোয়ালিয়রে দুর্গে বন্দী হবার কারণ সমূহ # ১১৬
গোয়ালিয়র দুর্গে নজরবন্দী # ১১৮
গোয়ালিয়র কারাভ্যন্তরে সুন্নতে-ই য়ূসুফ (আ) পালন # ১১৯
বন্দী জীবনের নে'আমত ও স্বাদ # ১২০
শাহী সৈন্য ও রাজকীয় সাহচর্যে অবস্থান এবং এর প্রভাব ও বরকত # ১২২
জাহাঙ্গীরের উপর মুজাদ্দিদের প্রভাব # ১২৫
আচার-অভ্যাস ও দৈনন্দিন কর্মসূচী # ১২৯
হুলিয়া মুবারক (চেহারা ও আকৃতি বর্ণনা) # ১৩৫
সন্তান-সন্ততি # ১৩৫

পঞ্চম অধ্যায়
হযরত মুজাদ্দিদ-এর সংস্কার ও পুর্নজাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু

হযরত মুজাদ্দিদ-এর আসল সংস্কার ও পুর্নজাগরণমূলক কর্মকাণ্ড বা অবদান কি ছিল? # ১৩৯
নবূওতে মুহাম্মদীর চিরন্তনতা ও প্রয়োজনীয়তার ওপর আস্থা পুর্নবহাল # ১৪২
আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা # ১৪৫
কিছু মৌলিক প্রশ্নমালা ও তার জওয়াব # ১৪৭
অবিমিশ্র যুক্তিবুদ্ধি ও নির্ভেজাল কাশ্ফ (তন্ময়তাপূর্ণ প্রেরণা)-এর সমালোচনা # ১৪৭
বুদ্ধিবৃত্তির সীমাবদ্ধতা এবং সার্বভৌম স্রষ্টার জ্ঞান # ১৫৩
আল্লাহ্র পরিচয়ের ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের নির্বুদ্ধিতা # ১৫৪
জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি দীনী হাকীকত অনুধাবনের বেলায় যথেষ্ট নয় # ১৬০
নবূওতের রীতি-পদ্ধতি চিন্তা-ভাবনার রীতি-পদ্ধতির উর্ধ্বে # ১৬১
বুদ্ধি নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র হওয়া সম্ভব নয় এবং তা ঐশী সত্য অনুধাবনের জন্য (চাই কি তার নব্য- প্লেটোবাদী ও আত্মশুদ্ধির সহায়তা লাভ ঘটুক) উপকারী নয় # ১৬২
নব্য প্লেটোবাদী ও (মরমীবাদী) আত্মার পরিশুদ্ধি # ১৬৫
শায়খু'ল-ইশরাক (Master of illumination) শিহাবুদ্দীন সুহ্রাওয়ার্দী (মাকতূল) # ১৬৭

কাশ্‌ফে ভেজাল # ১৭০
দার্শনিক এবং আম্বিয়া-ই কিরাম (আ.)-এর শিক্ষার মধ্যে সংঘাত ও বৈপরিত্য # ১৭১
নবূওত ব্যতিরেকে প্রকৃত আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয় # ১৭৪
নবী প্রেরণের আবশ্যকতা # ১৭৪
ঐশী জ্ঞান ও নবূওত # ১৭৫
আম্বিয়া-ই কিরামের মারফতেই আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ ঘটে # ১৭৬
ঈমানের সঠিক স্তর বিন্যাস (সহীহ্‌ তরতীব) # ১৭৬
আম্বিয়া-ই কিরামের রিসালত অমান্য কারিগণ যুক্তিবাদী # ১৭৭
আম্বিয়া-ই কিরামের শিক্ষাপালকে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির অধীনে আনয়ন নবূওত অস্বীকৃতির নামান্তর # ১৭৮
যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী এবং যুক্তিবুদ্ধির ঊর্ধ্বের মধ্যে পার্থক্য # ১৭৮
আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পন্থা কেবল নবীদের মাধ্যমেই জানা যায় # ১৭৮
পঞ্চেন্দ্রিয়ের তুলনায় যেমন বোধ-বুদ্ধি, তেমনি বুদ্ধি-বোধের তুলনায় নবূওতের মর্যাদা শ্রেষ্ঠতর # ১৭৯
নবূওতের মকাম # ১৭৯
আম্বিয়া-ই কিরাম আ. আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং সর্বোত্তম সম্পদ তাঁদেরকেই দেওয়া হয়েছে # ১৮২
চিত্ত সম্প্রসারণের কারণে সৃষ্টি জগতের প্রতি আম্বিয়া-ই কিরামের মনোযোগ
আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের প্রতিবন্ধক হয় না # ১৮২
নবীদের অভ্যন্তরীণ দিক আল্লাহমুখী এবং বাহ্যিক সৃষ্টিমুখী # ১৮৩
'ওলী-আওলিয়ার শুরু, নবী-রসূলদের শেষ" এই উক্তি প্রত্যাখ্যান # ১৮৩
নবূওতের অনুসরণে কুর্‌ব বিল-ফারাইদ অর্জিত হয় # ১৮৪
বিলায়াতের কামালিয়াত নবূওতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় কোন গুরুত্ব বহন করে না # ১৮৪
আলিম-উলামার জ্ঞান-গবেষণার বিশুদ্ধতা ও অগ্রাধিকারের কারণ # ১৮৫
আম্বিয়া-ই কিরামের মর্যাদা নবূওতের কারণে # ১৮৬
ঈমান বি'ল-গায়ব (অদৃশ্যে বিশ্বাস) আম্বিয়া-ই কিরাম, সাহাবা, উলামা এবং সাধারণ মু'মিনদের অংশ # ১৮৭
আম্বিয়া-ই কিরামের পূর্ণ প্রত্যাবর্তন পরম মার্গে উপনীত হবার আলামত # ১৮৭
শরীয়তের সাহায্য-সমর্থন, 'আকীদার সংস্কার-সংশোধন এবং শির্ক ও
জাহিলী রসম-রেওয়াজ প্রত্যাখ্যান (তাসাওউফ কী) # ১৮৮
সুন্নাহ্‌র প্রচলন এবং বিদ'আতে হাসানার প্রত্যাখ্যান # ২০০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ অথবা ওয়াহ্‌দাতু'শ-শুহূদ

শায়খ আকবর মুহ্‌য়ি-উদ্দীন ইবন 'আরাবী ও ওয়াহদাতুল-ওজূদ #২০৮
শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া এবং ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ আকীদার বিরোধিতা ও সমালোচনা # ২১১

ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ আকীদার চরমপন্থী প্রচারক এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া # ২১৩
ভারতবর্ষে ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ আকীদা # ২১৬
শায়খ আলাউদ্দৌলা সিমনানীর ওয়াহতাদু'ল-ওজূদ মতবাদের বিরোধিতা # ২১৭
ওয়াশহ্দাতুশ-শুহূদ # ২১৮
একজন নতুন সংস্কারকের প্রয়োজন # ২১৯
মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানীর (র)-র অবদান # ২২০
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ # ২২১
ওয়াহদাতুশ-শুহূদ বা তৌহীদে শুহূদী (দৃষ্টি একক সত্তায় সীমিত থাকা) # ২২৫
শায়খ-এ আকবর (ইবনুল আরাবী) সম্পর্কে ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ মত # ২২৭
তৌহীদে ওজূদীর বিরোধিতা করার আবশ্যকতা # ২২৮
মুজাদ্দিদ সাহেবের অনন্য বৈশিষ্ট্য # ২৩১
হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ মুজাদ্দিদ সাহেবের পথ ধরে # ২৩২

সপ্তম অধ্যায়

সম্রাট আকবর থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্যন্ত

সাম্রাজ্যের প্রশাসনকে সঠিকপথে আনার লক্ষ্যে হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানী (র)-এর নীরব সাধনা ও কর্মপ্রয়াস এবং আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনামলের সাহসী ও স্পষ্টভাষী উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গবৃন্দ # ২৩৩
সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণ এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের সাম্রাজ্যের সংস্কার কর্মের সূচনা # ২৩৭
সঠিক কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি # ২৩৮
সাম্রাজ্যের আমীর-উমারার নামে প্রেরণামূলক ও দাওয়াতী পত্র # ২৪৩
অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না # ২৫১
সাম্রাজ্যের ভক্ত-অনুরক্ত অমাত্যবর্গ এবং তাদের সাথে পত্র যোগাযোগ # ২৫৪
সংস্কার চেষ্টায় হযরত মুজাদ্দিদ-এর ব্যক্তিগত প্রভাব ও অবদান # ২৫৪
জাহাঙ্গীরের প্রভাব স্বীকারকরণ # ২৫৫
সম্রাট শাহজাহানের শাসনামল # ২৫৭
শাহযাদা দারা শুকোহ # ২৫৯
মুহ্য়িউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ # ২৬০
হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরোধীতা ও তাঁর প্রতি পথভ্রষ্টতার অভিযোগ এবং এ অভিযোগের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দ # ২৬৯

অষ্টম অধ্যায়
হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দু'জন বড় খলীফা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিতদের মাধ্যমে তাঁর তাজদীদি কর্মের বিস্তৃতি ও পূর্ণতা সাধন

মশহূর খলীফাবৃন্দ # ২৮৩

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম # ২৮৪

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নূরী # ২৮৫

মুজাদ্দিদিয়া মা'সূমিয়্যা সিলসিলা এবং এর মহান বুযুর্গবৃন্দ # ২৮৭

হযরত খাওয়াজা সায়ফুদ্দীন সরহিন্দী # ২৮৭

হযরত খাজা মুহাম্মদ যুবায়র থেকে মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী পর্যন্ত # ২৮৯

মির্যা মাজহার জানাঁ এবং হযরত শাহ্ গুলাম আলী # ২৯১

মাওলানা খালিদ রূমী (কুর্দী) # ২৯৪

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ ও তাঁর খলীফাবৃন্দ # ২৯৭

হযরত শাহ্ আবদুল গণী # ২৯৯

আহ্সানিয়া সিলসিলা ও তাঁর শ্রেষ্ঠ মাশায়েখবৃন্দ # ৩০১

হযরত সাইয়েদ শাহ্ আলামুল্লাহ্ ও তাঁর খান্দান # ৩০২

শায়খ সুলতান বালিয়াবী # ৩০৩

হযরত হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী এবং ওয়ালীউল্লাহ্ সিলসিলা # ৩০৪

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর জামা'আত # ৩০৫

হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানী (র)-র রচনাবলী # ৩০৮

প্রথম অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)

হিজরী দশম শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব

দশম শতাব্দীর ঐতিহাসিক অধ্যয়নের গুরুত্ব

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র জন্ম হয় হি. ৯৭১ সালের শাওয়াল মাসে আর তিনি ইনতিকাল করেন হি. ১০৩৪ সালের সফর মাসে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর যুগ হি. দশম শতাব্দীর শেষ ২৯ বছর এবং একাদশ শতাব্দীর প্রায় ৩৩ বছর জুড়ে বিস্তৃত। সে হিসাবে তাঁর যুগের ঐতিহাসিক এবং তাঁর জীবনী লেখককে মূলত এই ৬৩ বছরের মুদ্দতকেই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে যা হিজরী বর্ষপঞ্জীর এই দুই শতাব্দীর শেষ এবং প্রথম এক-তৃতীয়াংশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কিন্তু মূলত কারো জন্মের দ্বারা, তা তিনি যত বড় মহা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বই হোন না কেন-হঠাৎ করেই এমন কোন নতুন যুগের সূচনা হয়ে যায় না যিনি আচানক কোন অদৃশ্য লোক থেকে এই দৃশ্যমান জগতে এসে হাযির হন এবং এর উপর ঐ সব ঘটনা ও দুর্ঘটনা, সেই সব ঐতিহাসিক কার্যকারণ, সেই সব রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত পটভূমি এবং সেই সব সাম্রাজ্য ও শক্তির প্রভাব না থাকে যা তাঁর জন্মের আগে থেকেই কার্যকর এবং পরিবেশ ও সমাজ জীবনের উপর প্রভাবশীল হচ্ছিল। এ জন্য আমাদেরকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সীরাত তথা জীবন-চরিত ও জীবন-কাহিনীর বিন্যাস এবং তাঁর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের আলোচনা, তাঁর যুগের মেযাজ উপলব্ধি এবং তাঁর কর্ম তথা মিশনের বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও সহজসাধ্যতার সঠিক পরিমাপ ও পারস্পরিক তুলনা করবার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক তথা চারিত্রিক দিক থেকে ঐতিহাসিক পর্যালোচনার প্রয়োজন পড়বে যদ্দ্বারা তাঁকে চেতনা ও জ্ঞান উন্মেষের সাথেই সম্মুখীন হতে হয় এবং যার ভেতরে তাঁকে সেই বিপ্লবাত্মক ও গৌরবোজ্জ্বল পুনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড আনজাম দিতে

হয় যদ্দরুন তাঁকে অনায়াসে ও নির্দ্বিধায় "মুজাদ্দিদ-এ আলফে ছানী" (হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক) বলা হয়।

এই পর্যালোচনায় আমাদেরকে এই ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতাকেও সামনে রাখতে হবে যে, একটি যুগ এবং সেই যুগের বিশ্ব ও মানব সমাজ একটি প্রবহমান নদীর ন্যায় যার প্রতিটি ঢেউ ও প্রতিটি তরঙ্গ আরেকটি ঢেউ ও তরঙ্গের সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এজন্য দুনিয়ার কোন দেশ-তা সেই দেশ ও সেই রাষ্ট্র অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে যতই বিচ্ছিন্নই হোক না কেন এবং যত পরস্পর সম্পর্কহীন জীবন যাপনই করুক না কেন, পার্শ্ববর্তী দুনিয়ার সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, বিপ্লব, পরস্পর যুধ্যমান শক্তিসমূহ এবং শক্তিশালী আন্দোলন থেকে একেবারে সম্পর্কহীন ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া শূন্য থাকতে পারে না, বিশেষত যখন এসব ঘটনা ও বিপ্লব তার সমপ্রকৃতি, সমমতাবলম্বী ও সমবিশ্বাসী প্রতিবেশী দেশসমূহে সংঘটিত হচ্ছে। এরই ভিত্তিতে এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় কেবল ভারতবর্ষের চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক হবে না। আমাদেরকে হিজরী দশম শতাব্দীর গোটা মুসলিম বিশ্ব এবং বিশেষ করে চারপাশের মুসলিম দেশগুলোর উপরও দৃষ্টি ক্ষেপণ করতে হবে যে সব দেশের সাথে যদিও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু ধর্মীয়, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত সম্পর্ক ছিল এবং সেখানে যে শীতার্ত ও উষ্ণ হাওয়া প্রবাহিত হত তার মৃদু হিল্লোল বহু দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

রাজনৈতিক অবস্থা

হিজরী দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে (সম্ভবত ৫৮৯ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর ইনতিকালের পর) বহুকাল পর মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় অংশ (মধ্যপ্রাচ্য) রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও সংহতি লাভ করেছিল এবং পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশসমূহ এমন একটি পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল, যে পতাকা ঊর্ধ্বে উত্তোলনকারী নিজেকে ইসলামের মদদগার, পবিত্র মক্কা ও মদীনা ভূমির খাদেম এবং মুসলমানদের রক্ষক হিসেবে অভিহিত করতেন এবং যিনি (চাই কি নিজ রাজনৈতিক মুসলিহাতের কারণেই হোক) খিলাফতেরও পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন, যিনি শেষ আব্বাসী খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহ তাতারীদের হাতে শাহাদাত লাভের পর (হিজরী ৬৫৬) থেকে মিসরে "খ্রিস্টানদের পোপের" ন্যায় ধর্মগুরুতে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিলেন, উছমানী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াদোয সুলতান সলীম (১ম) (হিজরী ৯১৮-৯২৬) ৯২২ হিজরীতে সিরিয়া এবং ৯২৩

হিজরীতে মিসর জয় করেন যা আড়াইশ' বছর থেকে মামলুক সুলতানদের অধীন শাসিত হয়ে আসছিল। সলীমের হামলার সময় এর শাসনকর্তা ছিলেন কানসুওয়া ঘুরী। ঐ ৯২৩ হিজরীতেই সুলতান সলীম খিলাফত, অতঃপর পবিত্র মক্কা ও মদীনা ভূমির অভিভাবকত্ব ও খেদমতের ঘোষণা প্রদান করেন। অতঃপর জযীরাতুল আরব, ক্রমান্বয়ে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম ও আরব দেশসমূহ (মরক্কো বাদে) সুলতান সলীমের, অতঃপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত মহান সুলায়মান কানুনী (৯২৬-৯৭৪ হিজরী) (যাঁকে পাশ্চাত্যের লেখকগণ Sulaiman, the Magnificent নামে স্মরণ করে থাকেন)-র শাসনাধীনে এসে যায়। মহান সুলায়মানের শাসনামল (যাঁর মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর জন্ম হয়) ছিল উছমানী সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। একদিকে য়ুরোপ, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে তাঁর বিজয় ও সৌভাগ্য পতাকা পতপত শব্দে উড়ছিল, অপরদিকে ইরানে তাঁর ফৌজ বিজয়দৃপ্ত পদচারণা অব্যাহত রেখে চলেছিল। মিসর ও সিরিয়ার সাথে ইরাক-ই-আরবও তাঁর বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসক। সুলতান মুরাদ (৩য়)-এর যুগে সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জ, তিউনিস প্রদেশ, ইরান সাম্রাজ্যের কয়েকটি উর্বর ও শস্যশ্যামল প্রদেশ এবং ইয়ামান উছমানী হুকুমতের অন্তর্গত ছিল। তাঁরই শাসনামলে ৯৮৪ হিজরীতে মক্কার হারাম শরীফ-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। মুজাদ্দিদ সাহেবের বুঝবার ও উপলব্ধি হবার মত তখন বয়স হয়েছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবশ্যই জেনে থাকবেন। ঐ যুগের মুসলমান (চাই তিনি ভারতবর্ষের বাসিন্দাই হন) উছমানী তুর্কীদের (যাঁরা গোঁড়া প্রকৃতির হানাফী সুন্নী মুসলমান ছিলেন) এসব বিজয় ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে অবশ্যই আনন্দবোধ করে থাকবেন।

এই শতাব্দীর সূচনায় (হিজরী ৯০৫) ইরান ও খুরাসানে সাফাবী খান্দানের আবির্ভাব ঘটে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ ইসমাঈল সাফাবী (৯০৫-৯৩০ হিজরী)। এই বংশ ক্রমান্বয়ে গোটা এলাকায় নিজেদের সুদৃঢ় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এই সাম্রাজ্য ছিল উছমানিয়া সাম্রাজ্যের সমপর্যায়ের তথা সমকক্ষ যারা উছমানিয়া সাম্রাজ্যের মুকাবিলায় শী'আ ইছনা আশারী জাফরী ফিক্‌হকে ইরানের সরকারী মযহার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি গোটা ইরানে এই মযহাবের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব হাতে নেন এবং এতে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। এভাবে এই হুকুমত তাঁর নিজ সীমারেখার উপর মযহাবী ইখতিলাফের ভিত্তিতে

একটি মানবীয় প্রাচীর খাড়া করত উছমানীদের [যাঁদের সম মযহাবভুক্ত (সুন্নী হানাফী) মুসলমান কনস্টান্টিনোপল থেকে নিয়ে লাহোর ও দিল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল] বিস্তৃত সাম্রাজ্যে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। এই বংশের হুকুমত বাগদাদ থেকে হেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই বংশের সর্বাধিক মর্যাদাবান শাসক শাহ আব্বাস (৯৯৫-১০৩৭) হিজরী, ইতিহাসে যিনি মহান শাহ আব্বাস নামে খ্যাত এবং যাঁকে তাঁর নির্মাণ কর্মের কারণে এই বংশের শাহজাহান বলা যেতে পারে) ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের সমসাময়িক। সাফাবী হুকুমত শাহ আব্বাস (১ম)-এর যুগে সাফল্য ও গৌরবের স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। তিনি তুর্কীদের সাথে সাফল্য ও গৌরবের সাথে লড়াই করে নাজাফ ও কারবালা ছিনিয়ে নেন। তিনি ছিলেন ভারতের সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। শাহ আব্বাস-এর পরেই এই বংশের অধঃপতন শুরু হয়ে যায়।

মুসলিম বিশ্বের অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্য ভূখণ্ড তুর্কিস্তান যা শতশত বছর যাবত ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয় শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল, যাকে প্রাচীন সাহিত্যে 'মাওয়ারাউন-নাহর' নামে স্মরণ করা হয় এবং যে ভূখণ্ডটি হানাফী ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনে (ইরাকের পরে) সর্বাধিক অংশগ্রহণ করেছে। এর কতিপয় জীবন্ত ও চিরন্তন গ্রন্থ, যা ভারতীয় উপমহাদেশে অদ্যাবধি পাঠ্য তালিকাভুক্ত, উক্ত ভূখণ্ডেই প্রণীত হয়।[১] অধিকন্তু নকশবন্দিয়া তরীকা (যে তরীকার সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ এবং তাঁর মাশায়েখগণের সম্পর্ক রয়েছে) সেখানেই জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছে এবং সেখান থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। এই উর্বর এবং স্বর্ণ-প্রসবিনী দেশ হিজরী দশম শতাব্দীর সূচনাতে (হিজরী ৯০৫) থেকেই উযবেকদের শায়বানী বংশের শাসনকর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায় এবং ৯১৬ হিজরী একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি ছাড়া যে বছর বাবর সাফাবীদের সাহায্যে মা-ওয়ারাউন-নাহর-এর উপর হামলা করেছিলেন এবং তৎকালীন রাজধানী সমরকন্দ দখল করেছিলেন-খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (রুশ বিপ্লব পর্যন্ত) তাদেরই শাসনাধীনে থাকে। দশম শতাব্দীতে শায়বানী বংশের দু'জন শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (হিজরী ৯১৮-৯৪৬) এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে ইস্কান্দর (৯৬৪-১০০৬ হিজরী)-এর রাজধানী ছিল বুখারা। তাদের বদৌলতে বুখারা পুনর্বার চিন্তা-চেতনা ও রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

---

১. যেমন শরহে বিকায়া, হিদায়া ইত্যাদি।

আফগানিস্তান ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী দেশ যা এর পশ্চিমে অবস্থিত। এই দেশটি ১০ম শতাব্দীর তুর্কিস্তানের উযবেক, ইরানের সাফাবী এবং মাঝে মধ্যে স্থানীয় উৎসাহদীপ্ত লোকদের চারণক্ষেত্র হিসেবে থাকে। কাবুল ও কান্দাহার কখনো মুগল, কখনো ইরানীরা অধিকার করে বসত এবং হেরাত ইরান সীমান্তে অবস্থিত হবার কারণে অধিকাংশ সময় সাফাবী সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন থাকে। ৯২৮ হিজরীতে সম্রাট বাবর কান্দাহার জয় করেন। অতঃপর তিনি যখন ভারতবর্ষে তৈমুরী সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পত্তন করেন তখন তিনি একেই স্থায়ী আবাসে পরিণত করেন যেখান থেকে তিনি কাবুল, বাদাখশান ও কান্দাহার অবধি রাজত্ব করতেন। সে সময় আফগানিস্তান হিন্দুস্তান এবং ইরান এই দুই সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীনে একটি সুশৃঙখল ও শান্তিপূর্ণ যুগে প্রবেশ করে। সে এই দুই সাম্রাজ্যের ভেতর এমনভাবে বণ্টিত হয়ে গিয়েছিল যে, হেরাত এবং সীস্তান প্রদেশ ইরানের অধিকারে থাকে (যদিও এর উপর মাঝে-মধ্যে উযবেকদের হামলা চলত)। কাবুল ছিল মুগল সাম্রাজ্যের অংশ এবং কান্দাহারের উপর কখনো মুগল, আবার কখনো-বা ইরানীরা কবজা জমিয়ে বসত। কোহিস্তানের উত্তরে সম্রাট বাবরের চাচাতো ভাই সুলায়মান মিরযা (বাবর যাকে বাদাখশানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন) একটি অর্ধ-স্বাধীন শাহী খান্দানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের অবশিষ্ট অংশ শায়বানী খান্দানের অধীনে। ৯৬৫ হিজরীতে ইরান সম্রাট তাহমাস্প কান্দাহার দখল করেন এবং হিজরী ১০০৩ পর্যন্ত এই শহর ইরানীদের দখলে থাকে। হিজরী ১০০৩ সনে শাহযাদা মুজাফফর হুসায়ন একে সম্রাট আকবরের নিকট সমর্পণ করেন। তখন থেকে আফগানিস্তান মুগল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এই ধারাবাহিকতা দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর ১১৫১ হিজরীতে নাদির শাহ আফশারের হাতে বাবুর বংশের দুশো চল্লিশ বছরের হুকুমত আফগানিস্তান থেকে বিদায় নেয়।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে লোদী বংশের রাজত্ব চলছিল। এই বংশের শেষ সুলতান ইবরাহীম লোদী ৯৩২ হিজরীতে মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর গূরগানী (৮৮৮-৯৩৯ হিজরী)-র হাতে নিহত হন এবং মুগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় যা ভারতবর্ষের মুসলিম সালতানাতগুলোর ভেতর সর্বাধিক বিস্তৃত, সুশৃঙখল, সুদৃঢ় এবং দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ছিল। লোদী বংশ তাদের পাঠান বংশ ও ঐতিহ্যের কারণেই ইসলামে নিবেদিত এবং হানাফী মযহাবের পাবন্দ ছিলেন যারা নিত্য-নতুনপ্রিয়তা (تجدد پسندی) ও ধর্মহীন

(সেক্যুলার) রাজনীতির সম্পর্কে অপরিচিত ছিলেন। এই বংশের সবচে' দীনদার ও মা'আরিফ নওয়ায এবং উলামায়ে কিরাম-এর কদরদান ও অভিভাবক সুলতান ছিলেন সিকান্দার লোদী (মৃ. ৯২৩ হিজরী)। এই শতাব্দীর পাঁচটি সৌভাগ্যশীল বছর (৯৪৬ হিজরী-৯৫২ হিজরী) শেরশাহ সূরীর শাসনাধীনে অতিক্রান্ত হয় যাঁর চেয়ে অধিকতর সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক যোগ্যতাসম্পন্ন, জনহিতকর কর্মে সামর্থ্যের অধিকারী মুসলিম নৃপতি এবং জ্ঞানবান ও দীনদার শাসক এর পূর্বে ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসে আর কেউ আসেনি। শেরশাহর ইনতিকালের পর আকবরের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কপালে রাজনৈতিক ও শাসন বিভাগীয় সংহতি, সরকারের স্থিতি এবং দেশবাসীর ভাগ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জোটেনি। শেরশাহ সূরীর উত্তরাধিকারী সলীম শাহ তাঁর প্রতিভাবান পিতার যোগ্যতার ধারে কাছেরও ছিলেন না। সম্রাট বাবরের উত্তরাধিকারী নাসীরুদ্দীন হুমায়ুন (৯৩৭ হিজরী-৯৬৩ হিজরী) ভারতবর্ষে নিশ্চিন্ত তৃপ্তির সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন নি। শের শাহের বিজয়দৃপ্ত আক্রমণ এবং ভাইদের বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে বিব্রত ও হতচকিত থাকেন তিনি এবং যতদিন অবধি ইরানের বাদশাহ তাহমাস্প সাফাবীর সাহায্য না নিয়েছেন তিনি স্বস্তি পান নি। ৯৬৩ হিজরীতে আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন এবং পূর্ণ অর্ধশতাব্দী যাবত দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

মুজাদ্দিদ সাহেবের যমানাতেই, যখন তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বছর, নুরুদ্দীন জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁরই শাসনামলে মুজাদ্দিদ সাহেব ইনতিকাল করেন। রাজধানীর এই কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য ছাড়াও গুজরাট, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহমদ নগরে আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল যা স্বায়ত্বশাসিত পন্থায় পরিচালিত হচ্ছিল। শেষের তিনটি রাজ্য ছিল শী'আ মযহাবভুক্ত।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা

সে সময় গোটা মুসলিম বিশ্বের মন-মস্তিষ্কের উপর ধর্মের বাঁধন ছিল মযবুত। সাধারণভাবে গণ-মানুষ (তাদের জ্ঞানগত, নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা সত্ত্বেও) গভীর বিশ্বাসী মুসলমান, ধর্মপ্রাণ, মর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং ইসলামপ্রিয় ছিল। তাদের ভেতর বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদাবোধ এবং ইসলামী প্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা পাওয়া যেত। যদিও অনেক সময় বেদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কাজে তারা জড়িয়ে পড়ত, তবুও সাধারণভাবে তারা কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার প্রতি বিরূপ ও ঘৃণার মনোভাব পোষণ করত।

ধর্মের প্রতি তাদের এই সাধারণ আগ্রহ ও মেযাজের কারণে মুসলিম রাজা-বাদশাহগণকেও (যাঁরা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বিরোধী শক্তিরও পরওয়া করতেন না এবং যাঁদের সামরিক শক্তি য়ুরোপকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল) ইসলামী প্রথা-পদ্ধতির প্রতি সম্মান এবং ধর্মের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার কথা প্রকাশ করতে ও ঘোষণা দিতে হত এবং জনসাধারণের অন্তর-রাজ্যে তাঁদের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মান ও ভালবাসার চিত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না যতক্ষণ না তাঁরা তাঁদের এই ধর্মীয় দিকটা উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতেন। সুলতান সলীম (১ম)-এর সাম্রাজ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থিতি আসেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজেকে 'খলীফাতুল মুসলিমীন' এবং 'খাদিমুল-হারামায়ন আশ-শারীফায়ন' এই সম্মানজনক উপাধিটি গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর দামিশক অবস্থানকালীন পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা খোলাখুলি প্রকাশ করেছেন। ৯২৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সুলতান সলীম দামিশক থেকে হাজীদের একটি কাফেলা পাঠান। কাফেলার সাথে এই প্রথমবার তুর্কী সুলতানের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে কা'বা শরীফের গিলাফ পাঠানো হয়। তখন থেকে তুর্কী সুলতানগণ 'খাদিমুল-হারামায়ন' উপাধিটি ব্যবহার করতে থাকেন যার কারণে তাঁরা মুসলিম বিশ্বে বিরাট মর্যাদা লাভ করেন। সুলতান সুলায়মান-এর জীবনে বিনয় ও নম্রতা এবং সুগভীর ধর্মীয় আবেগ ও প্রেরণার কতিপয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি স্বহস্তে কুরআন মজীদ-এর আটটি কপি তৈরি করেন যা আজও সুলায়মানিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। তাঁর রচিত দীওয়ান-এর গযল ও কবিতাসমষ্টি থেকে তাঁকে একজন গভীর আকীদাসম্পন্ন মুসলমান হিসাবেই প্রতীয়মান হয়। তিনি মুফতী আবুস-সউদ (তফসীর-ই আবুস-সউদ প্রণেতা, ৯৫২ হিজরীতে মৃত্যু)-এর ফতওয়ার উপর ভিত্তি করে কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং মক্কা মুকাররামায় ছোট ছোট খাল খনন করান। সুলতান মুরাদ ৯৮৪ হিজরীতে কা'বা ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন যা অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এসবগুলোই হিজরী দশম শতাব্দীর উছমানীয় সুলতানদের উল্লেখযোগ্য অবদান।

ইরানের শী'আ সাম্রাজ্যেও সাধারণের মন-মস্তিষ্ক ধর্মীয় ও দীনী রুচির প্রতি প্রসন্নচিত্ত ছিল এবং সাফাবী সুলতানগণ তাদেরকে এর খোরাক সরবরাহ করতেন এবং ইসলাম ও আহলে বায়েত-এর প্রতি নিজেদের নিবিড় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে এর দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক স্থিতি ও সংহতি এবং জনগণের ভেতর লোকপ্রিয়তা অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। ইরানের শ্রেষ্ঠতম নৃপতি শাহ আব্বাস ১ম কেবল যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ইস্ফাহান থেকে মাশহাদ পর্যন্ত

আটশ' মাইল পদব্রজে সফর করেছিলেন এবং নাজাফ-এ উপস্থিত হয়ে হযরত আলী মুর্তাযা (রা)-এর পবিত্র রওযা ঝাড়ু দিয়েছিলেন। শাহ আব্বাসের প্রতি ইরানীদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও নানা জল্পনা-কল্পনা এসব কারণেই সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং জনগণের ভেতরে নানারূপ কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়েছিল।

তুর্কিস্তান এবং আফগানিস্তানের লোকদের বিশ্বাসের গভীরতা, দীন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সুন্নী বিশ্বাসে একনিষ্ঠতা এবং হানাফী মযহাবের প্রতি কঠোর আনুগত্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তাদের শাসক ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গ, সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা, অমাত্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (স্ব-স্ব শ্রেণী ও মানদণ্ড মাফিক) অনেকটা তাদেরই সমগোত্রীয় ও একই রঙে রঞ্জিত ছিলেন।

ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পত্তন হয়েছিল তুর্কী ও আফগান বংশের বিভিন্ন খান্দান ও শাসকদের হাতে। এজন্যই শুরু থেকেই এখানেও ধর্মের প্রভাব ছিল গভীর এবং এর প্রকৃতি ছিল সহজ সারল্যে ভরপুর যা ছিল তুর্কী ও আফগান মন-মানস ও রুচির বৈশিষ্ট্য। শুরু থেকেই এখানে তরীকায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এবং হানাফী মযহাবের (কতিপয় উপকূলীয় ভূখণ্ড এবং দক্ষিণ ভারতের মালাবার এলাকা বাদে) প্রতি আনুগত্য চলে আসছে এবং শুরু থেকেই সেটাই রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আদালতের আইন হিসেবে অনুসৃত হচ্ছে। এখানে "ফাতাওয়া-ই তাতারখানী" এবং "ফাতাওয়া-ই কাযী খান"-এর ন্যায় হানাফী ফিকহ (jurisprudence, ন্যায়-শাস্ত্র)-এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রণীত হয়।[১]

ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসের কয়েকজন বাদশাহ তাঁদের সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি সমর্থন, কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা সম্পর্কে অসন্তোষ ও বিরূপ মনোভাব, বেদ'আত ও গর্হিত কর্মের বিরোধিতা ও তা দূরীকরণ এবং ধর্মীয় মর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ তুগলক ও ফীরূয তুগলক এবং দশম শতব্দীতে সুলতান সিকান্দার লোদীর নামোল্লেখই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। "তাবাকাত-ই আকবরী", "তারীখ-ই ফিরিশতা" এবং "তারীখ-ই দাউদী"-এর গ্রন্থকারের বর্ণনা মুতাবিক সুলতান সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে ধর্মের প্রতি আনুগত্য এমনভাবে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল জীবনের একটি নতুন পন্থা জন্ম লাভ করেছে। তিনি নিজের চাইতেও ইসলামকে বেশী ভালবাসতেন। তাঁদের ভাষায় ঃ সুলতান তাঁর

১. ফাতাওয়া-ই আলমগীরি সংকলনের বহু পূর্বেই সংকলিত হয়ে মুসলিম বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে এবং ফাতাওয়া-ই হিন্দিয়া নামে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকে খ্যাত হয়।

জীবনের প্রথম থেকেই ধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত ছিলেন। ইলম চর্চায় বাদশাহ ছিলেন প্রবল আগ্রহী। তাঁর আমলে হিন্দুদের ফারসী পাঠের সূচনা হয়। কায়স্থরা বাদশাহর পরামর্শ গ্রহণ করে। সুলতান তাঁর রাজ্যে সালার মাসউদের ছড়ি প্রেরণ একেবারে স্থগিত রাখেন যা প্রতি বছর যেত। কতক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তা'যিয়া বের করা এবং (বসন্তের দেবী) শীতলা পূজাও তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।[১] মুশতাকী লিখেছেন যে, قبور بلا میت را نهر ساخته 'সে যুগে গজিয়ে উঠা বহু কবরের জায়গায় খাল খনন করত তিনি সে সবের নাম-নিশানাও মুছে ফেলেন'।[২]

সুলতান সলীম শাহ সূরী মসজিদে সালাতে স্বয়ং ইমামতি করতেন। নেশাকর পানীয় থেকে নিজেকে তিনি কঠোর সংযমে বেঁধে রাখেন।

এ যুগটা ছিল তাসাওউফের এবং বিভিন্ন তরীকা ও সিলসিলার চরম উন্নতির যুগ। মুসলিম বিশ্বের কোন দেশ ও এলাকাই এমন ছিল না যেখানে কোন না কোন সিলসিলা খুঁজে পাওয়া না যেত। প্রতিটি ঘরে ছিল এর চর্চা। এই সিলসিলায় তুর্কিস্তানের দু'টি প্রসিদ্ধ শহর এবং শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র বুখারা ও সমরকন্দ, আফগানিস্তানে হেরাত ও বাদাখশান, মিসরে আলেকজান্দ্রিয়া ও তানতা, ইয়ামানে তা'আয্য ও সান'আ এবং হাদরামাওত-এ তারীম, শাহর ও সীওন উলামা, সুফিয়া ও মাশাইখ-ই-কিরামের বিরাট কেন্দ্র ছিল। হাদরামাওতে বা'আলভী ঈদরৌস খান্দান বড়ই জনপ্রিয় ও কামালিয়াতের অধিকারী খান্দান ছিল। এ যুগেই ঐ সব দিকে শায়খ আবূ বকর 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকরকে খুবই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী শায়খ ও কুতুব-ই-দওরান মনে করা হত। তারীম আলী (রা.) বংশীয় সৈয়দদের আবাস ছিল। সে যুগের মশহুর ওলীয়ে কিরামের ভেতর ছিলেন শায়খ সা'দ ইবন 'আলী আস-সুওয়ায়নী বান্দ হাজ্জ আস-সাঈদ। শায়খ মুহয়ি উদ্দীন আবদুল কাদির ঈদরৌসী (হিজরী ৯৭৮-১০৩) তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ النور السافر فی رجال القرن العاشر[৩] তাঁর জীবনী আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন যা গ্রন্থের ৪৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ৪৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

হিজরী দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যদিও কাদিরিয়া ও চিশতিয়া সিলসিলার দু'টি শাখা (নিজামিয়া ও সাবিরিয়া) বিস্তার লাভ করেছিল এবং এ দু'টি শাখায় হাল ও কামালিয়াতের অধিকারী কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু মূলত এই শতাব্দী ছিল সিলসিলা-ই ইশকিয়া শাত্তারিয়ার শতাব্দী, যে তরীকা

১. তারীখ-ই-হিন্দুস্তান, মওলভী যাকাউল্লাহ দেহলভী কৃত, ২য় খণ্ড, ৩৭৪ পৃ:

২. ওয়াকি'আত-ই-মুশতাকী;

৩. গ্রন্থটি হিজরী ১০১২ সালে আহমদাবাদে প্রণীত হয়।

(আধুনিক ব্যাখ্যা মুতাবিক) ভারতবর্ষের বিলায়েতের অধিকারী চিশতিয়া সিলসিলা থেকে এ দেশের রূহানী দায়িত্বভার নেয় এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে নেয়।[১]

শাত্তারিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ 'আবদুল্লাহ্ শাত্তার খুরাসানী সম্ভবত নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মাণ্ডো নামক স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। ৮৩২ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয় এবং মাণ্ডোতে দুর্গাভ্যন্তরে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি আমীরসুলভ শান-শওকতের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর তীব্র আধ্যাত্মিক আকর্ষণীয় শক্তি ছিল। বহু লোক তাঁর থেকে উপকৃত হয় এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁর তরীকা তথা সিলসিলা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরীকার দু'টি শাখা। একটি শাখা শায়খ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রীর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর এবং শায়খ আবদুল্লাহ শাত্তারীর মাঝে তিন পুরুষের ব্যবধান রয়েছে। অপর শাখার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আলী ইবনে কাওয়াম জৌনপুরী (শায়খ আলী 'আশেকান-ই-সরাইমীরি)। তাঁর এবং শায়খ 'আবদুল্লাহ্ শাত্তারীর মাঝে দু'পুরুষের ব্যবধান রয়েছে। এই সিলসিলাই সম্ভবত প্রথমবারের মত যোগ-সাধনাকে তাসাওউফের সাথে মিলায় এবং তার সুলুক (আধ্যাত্মিক সাধনার পথ)-এর কতক তরীকা ও যিকর-আযকার, কতক আসন ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের পন্থা এখতিয়ার করেন এবং স্বীয় মুরীদদেরকে এর তা'লীম দেন। অধিকন্তু তিনি ইলম সিমিয়া[২]-কেও এর মধ্যে শামিল করেন। এসব আসনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তাঁর যিকিরসমূহের বিস্তৃত বিবরণ বাহাউদ্দীন ইবন ইবরাহীম আল-আনসারী আল-কাদেরী রচিত রিসালা-ই শাত্তারিয়ায় বর্তমান। শায়খ মুহাম্মদ শাত্তারী রচিত গ্রন্থ كليد مخازن -এ গ্রন্থকারের একটি বর্ধিত বিষয় রয়েছে যদদ্বারা ওয়াহদাতুল ওজূদ, পূজামণ্ডপ ও মসজিদ এবং শায়খ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাম্যের এবং এসব বস্তুর ভেতর আল্লাহ্র তাজাল্লীর বরং

---

১. এই শতাব্দীতে মাদারিয়া তরীকাও, যাঁর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ বদীউদ্দীন মাদার মকনপুরী (মৃ. ৮৪৪ হিজরী)-ভারতবর্ষে পাওয়া যেত। এই সিলসিলার পরিধি ও পরিচয় চিহ্ন ওয়াহদাতুল ওজূদের চিন্তাধারা ও বিষয়সমূহের খোলামেলা প্রকাশ ও ঘোষণা, তাজরীদ-ই-জাহিরী (এতটা পর্যন্ত যে, কেবল লজ্জাস্থান আবৃত রাখাই যথেষ্ট) এবং কেবল তাওয়াক্কুল। কালক্রমে এই সিলসিলার অবনতি ও পতন ঘটে এবং বাধা-বন্ধনহীনতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি 'মাদারী' শব্দটি বাজীকরের বিকল্প হিসেবে অভিহিত হয়। দশম শতাব্দীতে এই সিলসিলা বিশিষ্ট মহলে তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে বসেছিল। 'নুযহাতুল-খাওয়াতির-এর চতুর্থ খণ্ডে (যে গ্রন্থে প্রতিটি সিলসিলার শায়খগণের জীবনী সংকলিত হয়েছে) অনুসন্ধান চালিয়ে দু'জন ব্যক্তিত্বর সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁরা মাদারিয়া তরীকায় বায়'আত প্রাপ্ত ছিলেন।

২. হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, নদওয়াতুল উলামা গ্রন্থাগার, তাসাওউফ শাস্ত্র শিরো. ৪৭-৪৯ পৃ.

প্রকাশের পরিষ্কার প্রকাশ ঘটে যে, এসব কিছুই সেই একক সত্তারই বিভিন্ন রঙ ও বিকশিত দৃশ্য। শেষোক্তজনের কবিতা ঃ

عشقی شد و در مشرب شطار بر آمد * خود غوث جهاں شد

ইশ্‌ক সৃষ্টি হল ও শাত্তারী মতবাদ গ্রহণ করল এবং পৃথিবীর গওছ হিসেবে বরিত হল।

'রিসালা-ই ইশকিয়া' নামক পুস্তিকায় কাফিরীকে "জালাল-এ ইশ্‌ক" এবং মুসলমানিত্বকে "জামাল-এ ইশ্‌ক" বলা হয়েছে এবং তাতে এই কবিতাটি পাওয়া যায় ঃ

کفر و ایمان قرین یك دگراند * هر که را کفر نیست ایمان نیست

কুফর ও ঈমান একে অন্যের সাথী ও সম্পূরক; যার মধ্যে কুফর নেই, ঈমান নেই।

এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

العلم حجاب اکبر گشت؛ مراد ازیں علم عبودیت که حجاب اکبر است ، ایں حجاب اکبر اگر از میان مرتفع شود کفر به اسلام واسلام به کفر آمیزد ، وعبادت خدائی وبندگی برخیزد ـ

ইল্‌ম হল বড় বাঁধা; ইলম-এর উদ্দেশ্য দাসত্ব ও গোলামী যা কিনা সবচে' বড় বাঁধা। বড় বাঁধা উঠে গেলে ইসলাম কুফরের সাথে এবং কুফর ইসলামের সাথে মিশে যাবে আর সেই সাথে ইবাদত-বন্দেগীও উঠে যাবে।

এই সিলসিলার সবচে' খ্যাতনামা ও প্রভাবশালী শাত্তারী শায়খ ছিলেন মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রী (মৃ. ৯৭০ হিজরী)। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং লোকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং তাঁর শান-শওকত আমীর-উমারা ও মন্ত্রীদের দরবারকেও ম্লান করে দিত। তাঁর জায়গীর থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ছিল নয় লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা (কতিপয় বর্ণনায় এক কোটির মত বলা হয়েছে)। তাঁর হাতীশালে চল্লিশটি হাতী ছিল এবং বিরাট এক দল চাকর-বাকর সর্বদা তাঁর সেবায় নিরত থাকত। আগ্রার বাজার পরিদর্শনে বের হলে লোকের ভীড় বেড়ে যেত। সকলকে মাথা ঝুকিয়ে সালাম করতেন, এমনকি জীনের উপর তাঁর সোজা হয়ে বসাও কঠিন হয়ে যেত। মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর বর্ণনা মুতাবিক শায়খ মুহাম্মদ গওছ সম্রাট আকবরকে কৌশলে তাঁর মুরীদ বানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাট সত্বরই নিজেকে এর থেকে মুক্ত করে নেন। তাঁর এই

আমীরানা, বরং বলা চলে, শাহী ঠাঁট-বাট সত্ত্বেও সারা দেশে তাঁর দারিদ্র্যের কথাই লোকমুখে প্রচারিত ছিল। কাউকে সালামকালে তিনি প্রায় রুকুর ন্যায় ঝুঁকে পড়তেন-চাই মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম। উলামায়ে কিরামের এতে আপত্তি ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে "জাওয়াহির-এ খামসা", "মিরাজিয়া"[১], "কানযুল-ওয়াহদাহ" এবং "বাহরুল-হায়াত"।[২] ভারতবর্ষের উপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে এবং চিশতিয়া শাত্তারিয়া তরীকা সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[৩] মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর ইনতিকালের এক বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।

এই সিলসিলায় শায়খ আলী ইবনে কাওয়াম জৌনপুরী, যিনি আলী আশেকান সরাইমীরি নামে পরিচিত ও খ্যাত (মৃ. ৯৫৫ হিজরী), শায়খ লশকর মুহাম্মদ বুরহানপুরী (মৃ. ৯৯৩ হিজরী), আল্লাহ বখশ গড় মুক্তেশ্বরী (মৃ. ১০০২ হিজরী) অত্যন্ত জলীলুল কদর মাশায়েখ ছিলেন। বিরাট ও বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁদের থেকে উপকৃত হয়। আলী আশেকান সরাইমীরি সম্পর্কে কতক জীবনী লেখক লিখেছেন যে, তাঁর থেকে এত কারামত প্রকাশিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.)-র পর অপর কারো থেকে তত প্রকাশিত হয়নি।[৪] শায়খ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রীর স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা শায়খ যিয়াউল্লাহ আকবরাবাদী (মৃ. ১০০৫ হিজরী) আল্লামা ওয়াজীহুদ্দীনের শাগরিদ ছিলেন। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আকবরাবাদে (যা সম্রাট আকবরের রাজধানী ছিল) ছিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সম্রাট আকবরের দরবারে তাঁকে কয়েকবার ডেকে পাঠানো হয়। মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনী লিখেছেন যে, আমি তাঁকে সুন্নত মুতাবিক সালাম করলাম। এতে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন ও নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং ইসলামের এই পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন ও মানবশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি বিদ্রূপ করেন। বদায়ূনী তাঁর উত্তম চিত্র অংকন করেন নি এবং তাঁর ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনেক কাহিনী লিখেছেন।[৫]

১. তাঁর মিরাজ হয়েছিল বলে তিনি দাবী করেন। ফলে গুজরাটের উলামায়ে কিরামের ভেতর গোলযোগ ঘটে। কিন্তু মালিকুল-উলামা শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন (যিনি সে যুগে অধিকাংশ 'আলিমের উস্তাদ ছিলেন)-এর ইলমী ব্যাখ্যায় এর নিরসন হয়।

২. গ্রন্থটি অমৃতকুণ্ডের অনুবাদ। শেখ মুহাম্মদ ইকরাম তদীয় "রূদ-ই কাওছার" গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেন ঃ এতে হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের আচার ও ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা তিনি ফারসীতে ভাষান্তর করেছেন। তাঁর প্রাথমিক রচনা "জওয়াহির-ই খামসায়" এর ছিটে-ফোটা ঝলক দেখান। এ থেকে শাত্তারিয়া তরীকার এই ارتباط। এর উপর আলোকপাত হয় যা এর হিন্দু যোগসাধনার সাথে ছিল। (৩৪-৩৬ পৃ.।

৩. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

৪. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. 'আরিফ আলী প্রণীত "আল-'আশিকিয়া" অথবা নু. খা. ৫-খ.

৫. বিস্তারিত জানতে দেখুন মোল্লা আবদুল কাদির বিরচিত "মুনতাখাবুত্তাওয়ারীখ" অথবা নু. খা. ৫ খ.

এসব বুযুর্গ-মনীষী ছাড়াও শাহ আবদুল্লাহ সুন্দেলভী (৯২৪-১০১০ হি.) এবং শায়খ ঈসা ইবনে কাসিম সুন্দী যিনি হযরত শায়খ লশকর মুহাম্মদ 'আরিফ বিল্লাহর খলীফা ছিলেন (যিনি হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের সমসাময়িক ও নিকট বয়সী ছিলেন), ছিলেন ইশকিয়া শাত্তারিয়ার খ্যাতনামা মাশায়েখগণের অন্তর্গত।[১]

ইশকিয়া শাত্তারিয়া সিলসিলার এসব নামকরা মাশায়েখ ছাড়া ভারতবর্ষে অপরাপর জলীলুল কদর মাশায়েখও বর্তমান ছিলেন যাঁদের অন্যান্য সিলসিলার সাথেও সম্পর্ক ছিল। এঁদের ভেতর একজন ছিলেন শায়খ চায়ীন লাদাহ সুহনবী[২] (মৃ. ৯৯৮ হি.)। তিনি 'ফুসূস' ও 'নকদু'ন-নুসূস' গ্রন্থের দরস প্রদান করতেন। সম্রাট আকবর ছিলেন তাঁর ভক্ত। একদিন তাঁকে সালাতে মা'কূস আদায় করতে দেখে তিনি চলে যান।[৩] দ্বিতীয় জন ছিলেন শাহ আবদুর রাযযাক ঝিনঝানাবী (৮৮৬-৯৪৯হি.) কাদেরী চিশতী। তিনি ছিলেন এমন একজন আলিম যিনি গ্রন্থকার ও মুদাররিস হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় যুগে ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ এবং শায়খ আকবর[৪]-এর মতবাদের সবচে বড় নিশানবরদার ছিলেন। এ বিষয়ের উপর তাঁর লিখিত কয়েকটি পুস্তিকা রয়েছে। শায়খ আবদুল আযীয শকরবার (৮৫৮-৯৭৫হি.) ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের একজন সমর্থক এবং 'সাহিব-এ হাল' বুযুর্গ ছিলেন। তিনিও 'ফুসূসু'ল-হিকাম' এবং এর বিভিন্ন শরাহ পুস্তকের দরস প্রদান করতেন। এই বুযুর্গ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ(র.)-র মাতৃকুলের উর্ধ্বতন পুরুষও ছিলেন।

এই শতাব্দীতে হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গূহী (মৃ.৯৪৪হি.) আধ্যাত্মিক খ্যাতির শীর্ষদেশে উপনীত হন এবং তাঁর দ্বারা চিশতিয়া সাবিরিয়া সিলসিলা নবতর শক্তি ও সজীবতা লাভ করে। তিনি ওয়াহদাতু'ল-ওজূদের গুপ্ত রহস্যসমূহ খোলামেলাভাবে প্রকাশ্যে বলতেন এবং এর দাঈ ছিলেন। জৌনপুরে শায়খ কুতবুদ্দীন বীনাদল(৭৭৬-৯২৫হি.) কলন্দরিয়া তরীকায় এবং আম্বালা জেলার ক্যাথলে শায়খ কামাল উদ্দীন (মৃ. ৯৭১ হি.) কাদিরিয়া সিলসিলা ও হালকার মধ্যমণি এবং নেতৃস্থানীয় পুরুষ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে এই দু'টি তরীকা নবজীবন লাভ করে। শায়খ কামাল ক্যাথলী সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব (র.) তাঁর বুযুর্গ পিতা শায়খ আবদুল আহাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যখন

---

১. দ্র. নু. খা. ৫ম খণ্ড।

২.সুহনা পূর্ব পাঞ্জাবের গড়গানওয়াহ জেলার একটি পল্লী। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ প্রসিদ্ধ।

৩. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড;

৪. মুহয়িউদ্দীন ইবনে আরাবী।

কাশফ-এর দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন দেখা যায় যে, এই মহান সিলসিলায় (কাদিরিয়া সিলসিলায়) পীরানে পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর পর তাঁর চেয়ে বুলন্দ মরতবার অধিকারী কামালিয়াতসম্পন্ন শায়খ অপর কেউ দৃষ্টিগোচর হন না।[১] অযোধ্যায় শায়খ নিজামুদ্দীন আমবীঠবী, বন্দেগী মিঞা নামে খ্যাত ও পরিচিত, (৯০০-৯৭৯ হি.) চিশতিয়া সিলসিলার একজন উঁচুদরের শায়খ, শরীয়তের সমর্থক এবং সুন্নতের অনুসারী বুযুর্গ ছিলেন। 'ইহয়াউল-উলুম', 'আওয়ারিফ' এবং রিসালা-ই মাক্কিয়ার উপর ছিল তাঁর আমল। একবার জনৈক লোকের হাতে 'ফুসূস' দেখে তিনি তা কেড়ে নেন এবং অন্য একটি কিতাব অধ্যয়নের জন্য তাঁকে দেন। তাঁর সিলসিলায় যদিও সামা'-র ব্যাপক প্রচলন ছিল, কিন্তু তিনি নিজে এর থেকে মুক্ত ছিলেন।[২]

এই ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং এঁরাই ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও শ্রেণী-মত নির্বিশেষে তরীকার শায়খ ও সিলসিলার বুযুর্গ যাঁরা হিজরী দশম শতাব্দীতে বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের আধ্যাত্মিক ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কায়েম করে রেখেছিলেন এবং ভারতবর্ষের গভীর ধর্মীয় মন-মানস পোষণকারী আল্লাহপ্রার্থী এবং দরিদ্র প্রেমিক সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের সঙ্গে কোন-না-কোনভবে সম্পর্কিত এবং তাঁদের ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। এ বিষয়টি এত বিস্তৃতভাবে এজন্য বলা হল যাতে মুজাদ্দিদ সাহেবের যুগের পরিবেশ, রুচি-প্রকৃতি, প্রবণতা এবং সেযুগে দীনের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণের কাজের সমস্যা ও সম্ভাবনা দুটোরই পরিমাপ করা যায়।

জ্ঞান রাজ্যের অবস্থা

হিজরী দশম শতাব্দী জ্ঞান রাজ্যের আবিষ্কার- উদ্ভাবনী, ইজতিহাদী চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টি, বিবিধ জ্ঞানের নবতর সংকলন এবং এসবের ভেতর উল্লেখযোগ্য ব্যাপ্তির শতাব্দী ছিল না। এইসব বৈশিষ্ট্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যে শতাব্দীতে শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (মৃ.৭২৮ হি.), শায়খুল ইসলাম তকীয়ুদ্দীন ইবন দাকীকু'ল-'ঈদ (মৃ.৭০২ হি.), আল্লামা আলাউদ্দীন আল-রাযী (মৃ. ৭১৪ হি.), আল্লামা জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী (মৃ.৭৪২ হি.) এবং আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহবী (মৃ.৭৪৮ হি.) ও আল্লামা আবু হায়্যান নাহবী (মৃ.৭৪৫ হি)-র মত সর্বজনশ্রদ্ধেয়

১. যুবদাতুল-মকামাত, ১০৮ পৃ.।

২. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড;

উলামা' জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা হাদীস, উসূল, ইলমে কালাম,রিজাল শাস্ত্র এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে উন্নত মানের মূল্যবান রচনা রেখে যান। হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ফতহুল বারী প্রণেতা আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃ.৮২৫ হি.)-র যুগও অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, যাঁর বুখারীর তুলনাহীন ব্যাখ্যা গ্রন্থ (ফতহুল বারী) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لا هجرة بعد الفتح (মক্কা বিজয়ের পর যেমন হিজরতের সুযোগ নেই তেমনি ফতহুল বারীর পরও বুখারীর কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিষ্প্রয়োজন)।

দশম শতাব্দীর অধিকাংশই সংকলন, বিন্যাস, সরলীকরণ ও সংক্ষিপ্তকরণের শতাব্দী ছিল। এরপরও এর প্রথম ভাগে আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী (মৃ.৯০২ হি.) এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.)-র মত ধর্মীয় জ্ঞানে সমুদ্রতুল্য ইসলামের অন্যতম লেখক-শ্রেষ্ঠ গুযরে গেছেন। আল্লামা সাখাবী সম্পর্কে কোন কোন আলিমের উক্তিঃ ইমাম শামসুদ্দীন-এর পর ইলমে হাদীস, রিজালশাস্ত্র ও ইতিহাসে তাঁর পর্যায়ের আর কোন ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়নি। তারপর থেকেই হাদীসশাস্ত্রের অধঃপতন যুগ শুরু হয়। উসূল এবং মুসতালিহাতুল হাদীস-এ তাঁর কিতাব "ফতহু'ল-মুগীছ বিশারহি আলফিয়াতিল-হাদীছ" এবং রিজাল আলোচনায় الضوء اللامع لأهل القرن التاسع। আপন বিষয়-বস্তুর উপর তুলনাহীন সৃষ্টি মনে করা হয়ে থাকে। আল্লামা সুয়ূতী সকল রকমের প্রশংসা ও পরিচিতির ঊর্ধ্বে। তাঁকে ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম লেখক হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ স্বীয় বিষয়বস্তুর উপর বিশ্বকোষের মর্যাদা রাখে। তৎকৃত তফসীরে জালালায়ন-এর প্রথম অর্ধাংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পঠিত হয়ে আসছে এবং আজ পর্যন্ত তাঁর নামকে চির অমর করে রেখেছে।

এই শতাব্দীতে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকে হাদীস ও রিজালশাস্ত্র, ইরানে যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শন, তুর্কিস্তান ও ভারতবর্ষে ফিকহ শাস্ত্রের (হানাফী) জোর ছিল এবং একেই মর্যাদার মাপকাঠি ও একেই কামালিয়াতের সর্ব্বোচ্চ দর্জা মনে করা হত। মিসরে সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কাসতাল্লানী (মৃ.৯২৩ হি.), শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (মৃ.৯২৫ হি.) তুরস্কে তফসীর প্রণেতা আল্লামা আবুস সুঊদ (মৃ.৯৫২ হি.), হেজাযে আস-সাওয়াইকুল-মুহরিকাসহ আরও বহু গ্রন্থের লেখক আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী (মৃ.৯৭৪ হি.), কানযু'ল-উম্মাল-এর লেখক আল্লামা আলী মুত্তাকী

(মৃ.৯৭৫ হি) জ্ঞানমার্গের এক একজন উজ্জল জ্যোতিষ্কস্বরূপ ছিলেন এবং তৎকালীন বিশ্বের এক বিরাট অংশকে রত্নসম তাঁদের অমূল্য জ্ঞানরাজি বিতরণ পূর্বক উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলেন। মশহূর মুহাক্কিক ও মুনসিফ (কাযী, বিচারক) হানাফী আলিম ও গ্রন্থকার মোল্লা আলী কারী আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করলেও মক্কা মু'আজ্জমাকে বসবাসের জন্য নির্বাচিত করে এক বিরাট জগতকে স্বীয় ইল্ম দ্বারা ধন্য ও উপকৃত করেন। ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর ইনতিকাল হলেও তাঁর জ্ঞানগত ও কিতাবী (লেখনী) খেদমতের কাল হিজরী দশম শতাব্দীই ছিল। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আল্লামা কুতবুদ্দীন নহরওয়ালী[১] মক্কী ('আল-আ'লাম ফী আখবারি বায়তিল্লাহি'ল-হারাম' নামক গ্রন্থের প্রণেতা) ৯৯০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। এই মনীষীর জন্মও হয়েছিল ভারতবর্ষের মাটিতেই এবং তুরস্ক ও হেজাযের সুলতান ও আমীর-উমারা যাঁর যোগ্যতার যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি দেন।

ইরান ভূখণ্ড আল্লামা জালালুদ্দীন দাওওয়ানী (মৃ. ৯১৮ হি.), মোল্লা ইমাদ ইবন মাহমূদ তারিমী (মৃ. ৯৪১ হি.) এবং আল্লামা গিয়াছুদ্দীন মনসূর (মৃ. ৯৪৮ হি.)-এর জন্য স্বভাবতই গর্ব করতে পারে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন যাঁর প্রবল তরঙ্গ ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই যুগের শেষ পাদের বড় বড় উলামায়ে কিরামের ভেতর ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ ইবন আশ-শায়খ আবি'ল-হাসান সিদ্দিকী আশ-শাফিঈ আশ'আরী মিসরী যাঁকে "আল-উস্তাযুল আজম" এবং "কুতুবুল-'আরিফীন" উপাধিতে স্মরণ করা হয়ে থাকে। তিনি বিস্ময়কর ও অত্যদ্ভুত সব বিষয় ও টিকা-টিপ্পনী বর্ণনার ক্ষেত্রে তুলনাহীন ছিলেন এবং আয়াতে পাকের সম্পর্ক নির্ধারণে এবং কুরআন পাকের তফসীর, হাদীস ও ফিকহ-এর ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি ছিল না। মিসরের বিখ্যাত জামি আযহার-এ তিনি দরস প্রদান করতেন। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা চতুর্দিক থেকে পতঙ্গের মতই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এরই সাথে তিনি বিরাট বাতেনী জ্ঞানের অধিকারী, তরীকতের পীর ও সাহিত্যিক ছিলেন।[২] ১৯৯৩ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। ঠিক তেমনি প্রখ্যাত ভারতীয় মুহাদ্দিস রহমতুল্লাহ ইবন 'আবদুল্লাহ সিন্ধী হানাফী (মৃ. ৯৯৪ হি.) হেজাযে বসে হাদীসে নববী (সা)-র

১. নহরওয়ালা নহলওযাড়ার আরবী রূপান্ত পট্টন (গুজরাট)-এর পুরনো নাম। ৪১৬ হিজরীতে সুলতান মাহমূদ গযনবী একে জয় করেন।
২. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন 'আন্-নূরুস সাফির' ৪১৪ পৃ.

ব্যাপক প্রসার ঘটান এবং হাদীসশাস্ত্রে স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বীকৃতি আদায় করেন। মালিকুল উলামা আল্লামা ওয়াজীহুদ্দীন ইবন নসরুল্লাহ্ গুজরাটী যিনি অর্ধ শতাব্দী ধরে ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের নানা শাখায় দরস প্রদান করেন। তাঁর ছাত্ররা এক শতাব্দীর অধিককাল পঠন-পাঠনের সিলসিলায় তৎপর থাকে। এই শতকের শেষ অর্ধেক তিনি আলোকোজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করে রাখেন এবং এই শতকের একেবারে শেষ দিকে ইনতিকাল করেন (৯৯৮ হি.)। সে সময় য়ামন ছিল হাদীস বর্ণনা ও সনদের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এবং য়ামানী মুহাদ্দিস তাহির ইবন হুসায়ন ইবন 'আবদির রহমান আল-আহ্দাল দরস প্রদানের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। উল্লিখিত ৯৯৮ হিজরীতেই তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন।[১]

এই আমলেই ভারতবর্ষে ইরানের মনীষীবর্গের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল যাঁরা 'আল্লামা জালালুদ্দীন দাওওয়ানী, মোল্লা ইমাদ ইব্ন মাহমূদ তারিমী এবং মীর গিয়াছুদ্দীন মনসূরের ফয়েযপ্রাপ্ত ছিলেন। সম্রাট হুমায়ূন-এর শাসনামলে মওলানা যয়নুদ্দীন মাহমূদ কামানগীর বাহদাঈ (মওলানা জামী ও মওলানা আবদুল গফূর লারীর ছাত্র) ভারতে আসেন। সম্রাট তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেন। সম্রাট আকবরের যমানায় হাকীম আবুল ফাতাহ গীলানী, হাকীম হুমায়ূন (হাকীম হুমাম) এবং নূরুদ্দীন কারারী নামের বিজ্ঞ তিন ভ্রাতা গীলান থেকে আগমন করেন এবং রাজদরবারে প্রভাব সৃষ্টি করেন। কিছুকাল পর মোল্লা মুহাম্মদ য়াযদী বিলায়েত (ইরান) থেকে আগমন করেন। আমীর ফতহুল্লাহ্ শীরাযীও বিজাপুর অবস্থানের পর সম্রাট আকবরের দরবারে যোগ দেন এবং দরবারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি ছিলেন মীর গিয়াছুদ্দীন মনসূরের শাগরিদ। ৯৯৩ হিজরীতে তিনি সভাপতি (صدر) পদে বরিত হন। ভারতবর্ষে ইরানী আলিমদের রচনাবলী তাঁরাই নিয়ে আসেন। তাঁরা এখানকার নিসাব (পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচী) এবং পাঠ দানের তরীকা বা পন্থার উপর এত গভীর প্রভাব ফেলেন যা শেষাবধি দরস-ই নিজামী নামে পরিবর্তিত উন্নত সংস্করণে রূপ নেয় এবং যা ভারবর্ষের 'ইলমী ও দরসী (শিক্ষিত ও জ্ঞানী) মহলে আজও প্রভাব জাঁকিয়ে আছে।[২]

এ যুগেই বিশেষত দক্ষিণ ভারতে, নীশাপুর, আগ্রাবাদ, জুর্জান, মাযেনদারান ও গীলানের বহু বিজ্ঞ মনীষী ও সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায় দরবারে যাঁদের

১. তার জীবন কাহিনী ও কামালিয়াত সম্পর্কে জানতে আল্লামা ইবন আলী শওকানীর গ্রন্থ البدر الطالع পড়ুন।

২. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী কৃত الثقافة الاسلامية فى الهند।

প্রভাব ছিল।[১]

আফগানিস্তান তার সৈনিকবৃত্তি ও তলোয়ারবাজির সাথে সাথে 'ইল্ম ও দরস (জ্ঞান ও পঠন)-এর সম্পদ থেকেও বঞ্চিত ছিলনা। কাযী মুহাম্মদ আসলাম হারাবী ১০৬১ হিজরীতে, ভারতবর্ষের মাটিতেই যাঁর ইনতিকাল হয়েছিল, হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আফগানিস্তানেই মওলানা মুহাম্মদ ফাযেল বাদাখ-শানীর নিকট ইল্ম হাসিল করেন। মওলানা মুহাম্মদ সাদিক হালওয়াইও সে সময় আফগানিস্তানের অন্যতম প্রখ্যাত 'আলিম ছিলেন। হেরাত ইরান সীমান্তে অবস্থিত হবার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র (মারকায) ছিল এবং এর সন্তানদের ভেতর কাযী মুহাম্মদ আসলাম হারাবী এবং তাঁরই নামকরা ও কৃতবিদ্য সন্তান মওলানা মুহাম্মদ যাহিদ (যিনি ভারতের শিক্ষকমহলে অত্যন্ত পরিচিত ও মশহূর ব্যক্তিত্ব) দর্শন শাস্ত্রে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। অনেককাল পর্যন্ত শেষোক্ত জনের তিনটি টীকাগ্রন্থ, যা زواهد ثلاثة নামে মশহূর—আলিম-'উলামা ও শিক্ষকমহলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ও মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে আছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের ও উপকৃত হবার এই সম্পর্ক কেবল ইরানী মনীষী এবং বিলায়েতের উস্তাদদের সঙ্গেই অব্যাহত ছিল না, মিসর, হেজায এবং য়ামনের মুহাদ্দিছদের সাথেও কায়েম ছিল। শায়খ রাজেহ ইবন দাঊদ গুজরাটি (মৃ.৯০৪ হি.) আল্লামা সাখাবী থেকে হাদীস পাঠ করে ছিলেন। আল্লামা সাখাবী তাঁকে শায়খ মুহয়িউদ্দীন ইবন আরাবী সম্পর্কে শায়খ আল-'আলা আল-বুখারীর অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি কি তা বলেছিলেন যাতে তিনি ভারতীয় মাশায়েখ ও উলামায়ে কিরামকে তা অবহিত করেন এবং শায়খ-ই আকবর সম্পর্কে তারা যে সুধারণা পোষণ করেন তার নিরসন হতে পারে।[২] আল্লামা সাখাবী الضوء اللامع নামক গ্রন্থে তাঁর এই ভারতীয় শাগরিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর জ্ঞানবত্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বীয় যুগের হাদীস শাস্ত্রের ইমাম 'কানুয'ল-'উম্মাল'-এর লেখক শায়খ 'আলী ইবন হুসসামুদ্দীন আল-মুত্তাকী যাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে,'সুয়ূতীর দান সমগ্র দুনিয়ার উপর এবং আলী মুত্তাকীর দান রয়েছে স্বয়ং সূয়তীর উপর—আল্লামা আবুল হাসান আশ-শাফিঈ আল-বিকরী, মক্কার হারাম শরীফের মুদার্রিস এবং আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার মক্কী, মুফতী ও মুহাদ্দিছ-ই মক্কার ছাত্র ছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয় পরিমাপ করতে পেরেছেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশ সমুদ্র ও গগনচুম্বী পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন নু.খা. ৪র্থ খণ্ড;

২. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

(বেলুচিস্তানের বোলান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিরিপথই যার বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম) জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বহির্বিশ্বের সাথে একেবারে সম্পর্কচ্যুত ছিল না। শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ধারা অব্যাহত ছিল যদিও এধারায় শিক্ষা প্রদানের চেয়ে গ্রহণ এবং রফতানীর চেয়ে আমদানী কার্যক্রম বেশী ছিল এবং এমনটি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কেননা ভারতবর্ষে দীন ও ইল্‌ম দুটোই তুর্কিস্তান ও ইরানের পথ ধরেই পৌছেছিল।

মানসিক অস্থিরতা এবং আকীদার ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত চিন্তা

কিন্তু দশম শতাব্দীর রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জ্ঞানগত পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি সেই মানসিক অস্থিরতা এবং আকীদাগত বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল অবস্থার কথা আলোচনা না করি যা সেই যুগে ভারতবর্ষে এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে কোথাও কোথাও পাওয়া যেত যাতে করে উক্ত শতাব্দীর সঠিক অবস্থা আমাদের সামনে এসে যায় এবং এই ভুল বোঝাবুঝিও না থাকে যে, জীবন-নদী যা হাযারো মাইলের দূরত্বে প্রবাহিত হচ্ছিল পরিপূর্ণ শান্ত ছিল যার ভেতর দীনের তা'লীম ও তার প্রচার এবং আখলাক ও রূহানিয়াত (চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা)-এর প্রশিক্ষণ ও উন্নতির নৌকা পরিপূর্ণ ও নিরুদ্বেগ প্রশান্তির সাথে চালনা করা যেতে পারে এবং কোন প্রকার তরঙ্গাঘাতে কিংবা ঘূর্ণাবর্তে এর নিমজ্জিত হবার আশংকা ছিল না। যদি এমনটি হত তাহলে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও নবজাগরণের পরিবর্তে তা'লীম ও তরবিয়ত 'তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' এবং নশর ও ইশাআত তথা প্রচার-প্রসার- এই শিরোনামই এর জন্য অধিকতর উপযোগী ছিল। ভারতবর্ষ ইসলামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (পবিত্র হেজায ভূমি, মিসর, সিরিয়া ও ইরাক) থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হবার কারণে, তুর্কিস্তান ও ইরান হতে ইসলাম এখানে পৌঁছুবার দরুন, তদুপরি আরবী ভাষার প্রচলন না হওয়াতে, বিশেষত ইলমে হাদীস (যদ্দ্বারা দীনের সহীহ রূহ, সুন্নত ও বিদ'আতের পার্থক্য, আমর বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি এবং বিশুদ্ধ ধর্মীয় খতিয়ান নেওনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়)-এর প্রচার না হওয়া , হজ্জ ও ইল্‌ম হাসিলের জন্য বাইরের দেশগুলোতে সফরের কষ্ট-ক্লেশ, ইসলাম অনুসারীদের বিপুল সংখ্যক অমুসলিম জনগোষ্ঠী কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকা (যারা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসে কট্টর গোড়া, অমুসলিম রসম-রেওয়াজ তথা প্রথা-পদ্ধতির কঠোর অনুসারী এবং সীমাতিরিক্ত কল্পনাপুজারী) ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে বিশৃংখল ও অরাজকতাপ্রিয় দাওয়াত, বিভ্রান্ত

ফের্কা এবং ভাগ্যান্বেষী ধর্মীয় নেতাদের সহজ শিকারে পরিণত করে। এই পর্যায়ের একটি রূপ ছিল শী'আ মতবাদের সেই কট্টর ও আক্রমণাত্মক অবয়ব যা ইরানীদের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতের কতক স্থানে ও কাশ্মীরে জন্ম নেয়। হিজরী দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগে আহমদ নগর সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা বুরহান নিজাম শাহ্ শায়খ তাহির ইবনে রাদী ইসমাঈল কাযভীনির প্রভাবে (যিনি ইরান থেকে শাহ্ ইসমাঈল সাফাবীর ভয়ে আহমদ নগর পালিয়ে এসেছিলেন) শী'আ মতবাদ কবুল করেন এবং এতে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছাড়েন। এমনকি তিনি মসজিদ, খানকাহ, হাটবাজার ও সড়কগুলোতে প্রকাশ্যভাবে খলীফাত্রয় (আবূ বকর, ওমর ও উসমান রা)-এর উপর অভিশাপ বর্ষণের নির্দেশ দেন। এই দায়িত্ব সম্পাদনকারীদের বিরাট অংকের বেতন-ভাতা বরাদ্দ করা হয়। আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের বহু লোককে হত্যা ও বন্দী করা হয়।[১] অপর দিকে মীর শামসুদ্দীন ইরাকীর চেষ্টায় কাশ্মীরে শী'আ মতবাদ বিস্তার লাভ করে। তিনি শী'আ মতবাদ প্রচারে অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করেন। কথিত আছে যে, তার চেষ্টায় চৌত্রিশ হাজার হিন্দু শী'আ মতবাদ গ্রহণ করে। এও কথিত আছে যে, তিনি একটি নতুন ধর্মের পত্তন করেন যার নাম ছিল নূর বখশী। ফিকহ্ শাস্ত্রে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন যার মসলা-মাসায়েল না আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের মসলা-মাসায়েলের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল, না ইমামিয়া ফের্কার সাথেই সংগতিপূর্ণ ছিল। এও কথিত আছে যে, কাশ্মীরে একটি নতুন ফের্কার উদ্ভব ঘটে যার 'আকীদা ছিল যে, সায়্যিদ মুহাম্মদ নূর বখ্শ প্রতিশ্রুত মাহদী।[২]

৯৫০ হিজরীতে পারস্য সাম্রাজ্যের সমর্থন ও সামরিক সাহায্য লাভের জন্য সম্রাট হুমায়ূন পারস্য সম্রাটের দ্বারস্থ হন। এ সময় শাহ তাহমাস্প ছিলেন পারস্য সম্রাট। পারস্য সম্রাট হুমায়ূনকে শী'আ মতবাদ কবুলের অনুরোধ জানান। হুমায়ূন সম্রাটকে একটি কাগজের উপর শী'আ মতবাদের আকীদাসমূহ লিখে দিতে বলেন। অতঃপর তিনি লিখিত আকীদাসমূহ পাঠ করেন। সম্রাটের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের যদিও কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ইরানে অবস্থান, শাহানশাহ-ই ইরানের বদান্যতামূলক মেযবানী ও মুসাফির প্রীতি এবং তাঁর উদার সামরিক সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে কৃতজ্ঞতার দিনর্শনস্বরূপ তাঁর হৃদয় কন্দরে শী'আ ইছনা 'আশারী মযহাবের জন্য

---

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. মুহাম্মদ কাসিম বিজাপুরী লিখিত "তারীখে ফিরিশতা" (গ্রন্থকার ইছনা আশারিয়া ফের্কাভুক্ত ছিলেন)।

২. প্রাগুক্ত;

একটি সুকোমল আশ্রয় অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকবে যা তাঁর গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী তৈমূরী বংশধরদের হৃদয়ে (যাঁরা গোঁড়া বিশ্বাসী সুন্নী হানাফী ছিলেন এবং তাঁদের কেউ কেউ নকশবন্দিয়া তরীকার বুযুর্গদের মুরীদ হিসাবেও সম্পর্কিত ছিলেন) পাওয়া যেত না। হুমায়ূনের সাহায্যের জন্য ইরান থেকে কিযিলবাশ আমীরগণ এসেছিলেন। হুমায়ূন স্বয়ং নেক দিল, মার্জিত ও সভ্য মানুষ ছিলেন। সর্বদাই তিনি বা-ওযূ থাকতেন। পাক-পবিত্র অবস্থা ব্যতিরেকে তিনি আল্লাহ রসূলের নাম নিতেন না। লাইব্রেরীর সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে যেখানে আযান শ্রবণের সম্মানার্থে বসে পড়েছিলেন, পা পিছলে পড়ে যান। অতঃপর এই আঘাতেই তিনি ১৫ই রবীউ'ল-আওয়াল ৯৬৩ হি.-তে ইনতিকাল করেন।

তাঁর বিশিষ্ট আমীর-উমারা ও সাম্রাজ্যের সদস্যবর্গের ভেতর বৈরাম খান খানান ছিলেন অতি উত্তম ও বহু সদগুণবিশিষ্ট আমীর ও সর্দার। কোমল হৃদয়, জুমু'আ ও জামা'আতের পাবন্দ, উলামা ও বুযুর্গানের দীনের কদরদান ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ছিলেন তাফযীলী (تفضیلی)। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ঃ

شهے که بگذرداز نه سپهر افسر او * اگر غلام علی نیست خاك برسر او

যে সম্রাটের আধিপত্য ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল অতিক্রম করে, সেও যদি আলী (রা)-এর গোলাম হয়, তবে তার মাথায় ধুলি নিক্ষিপ্ত হোক।

মীর শরীফ আমেলী বিজ্ঞান ও দর্শনে অত্যন্ত বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের আমলে ভারতবর্ষে আসেন। আকবর তাঁকে অত্যন্ত সমাদর করেন। ৯৯৩ হি.-তে প্রথমে কাবুল, অতঃপর ৯৯ হিজরীতে বাঙলার সভাপতি (صدر) পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে আজমীর ও মোহানে জায়গীর প্রদান করেন। "মাআছিরুল-উমারা"-র লেখক খাফী খানের বর্ণনা মুতাবিক তিনি ধর্মদ্রোহিতামূলক ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন। তাসাওউফকে দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে মিশ্রিত করেন এবং সম্রাট ও সৃষ্টির একই অস্তিত্ব এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন।

ভারতবর্ষে দু'টি আন্দোলন ছিল খুবই বিশৃঙখলপ্রিয় এবং ইসলামী জীবনাদর্শের পক্ষে বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক। এর ভেতর একটি ছিল যিকরী আকীদা ও ফের্কা। এর বুনিয়াদ ছিল এই আকীদার উপর যে, হিজরী ১ম সহস্রাব্দে নবুওতে মুহাম্মদীর সমাপ্তি এবং ২য় সহস্রাব্দ থেকে একটি নতুন নবুওত ও হেদায়াতের সূচনা ঘটবে। এই আন্দোলন বেলুচিস্তানে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়। কিন্তু তারা যাকে পয়গম্বর হিসেবে মান্য করত তার ভাষায় ৯৭৭ হিজরীতে আটক নামক স্থানে তার আবির্ভাব ঘটে। এই ফের্কার কিতাব "যিকরী কৌন

হ্যায়?" (যিকরী কারা?)-এর গ্রন্থকার যিকরিয়া ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা মুহাম্মদ-এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন ঃ

> "তিনি সোমবার ৯৭৭ হিজরী ভোরবেলা কুতব শহর থেকে যমীনের দিকে মানবীয় আকৃতিতে ফকীরী লেবাসে আটকের পাহাড়ী এলাকায় একটি উঁচু পাহাড়ের উপর কদম মুবারক স্থাপন করত আবির্ভূত হন।"[১]

যিকরীগণ মোল্লা মুহাম্মদকে শেষ নবী, সর্বোত্তম রসূল এবং প্রথম ও শেষ নূর হিসাবে মানে। 'মূসানামা' নামক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে ঃ

حق تعالی گفت اے موسی بعد از مہدی پیغمبر دیگر نیا فریدم نور اولین و آخرین همیں است که پیدا خواهم کرد -

> "আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, হে মূসা! মাহদীর পর আর দ্বিতীয় কাউকে পয়গম্বর করি নাই; মাহদী হল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের নূর যাকে আমি সৃষ্টি করব।" (১১৮ পৃ.)

এই ফের্কার পুস্তকাদি যেমন 'মি'রাজনামা' (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি), ছানা-ই-মাহদী (মুদ্রিত), সফরনামা-ই মাহদী, যিকর-ই ইলাহী প্রভৃতিতে এমন সব সুস্পষ্ট বাক্য (ইবারত) স্থান পেয়েছে যদ্দ্বারা মোল্লা মুহাম্মদের পাপমুক্তি ও পবিত্রতা এবং তার সম্পর্কে এমন সব বাড়াবাড়িপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশ পায় যদ্দ্বারা সমস্ত আম্বিয়া-ই কিরামের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং নবী করীম (সা)-এর উপর তার ফযীলত ও মর্যাদা, দুঃসাহস, অপবাদ আরোপ ও সৃষ্টি এবং মনগড়া ও আজগুবী ধরণের নানা রকম প্রতারণার আশ্চর্য সব নমুনা জাহির হয়। তারা নিজেদের একটি স্থায়ী কালেমাও তৈরী করেছিল যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

لا اله الا الله نور پاك محمد مهدی رسول الله

অর্থ ঃ "আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কোন ইলাহ নেই, নূর পাক মুহাম্মদ মাহদী আল্লাহ্‌র রসূল।" যারা সালাত আদায় করত তাদেরকে তারা কাফির বলত এবং তাদেরকে নিয়ে হাসি-মস্করা করত।[২] তদ্রূপ সওম (রোযা), হজ্জ, যাকাতকেও তারা ইনকার (অস্বীকার,প্রত্যাখ্যান) করত। বায়তুল্লাহর হজ্জের পরিবর্তে কোহে মুরাদ-এর হজ্জকে তারা জরুরী বিবেচনা করত।[৩] 'তারীখ খওয়ানীন-ই বালুচ'

১. "যিকরী কৌন হ্যাঁয়"? পৃ. ১৩
২. ইতিকাদনামা, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।
৩. যিকরী লেখকেদের লিখিত গ্রন্থ 'যিকরে তাওহীদ', 'মায় যিকরী হুঁ' 'তাফসীর যিকরুল্লাহ' ও মাযকূরাতুস সদর দ্র.। আরও দ্র. বালুচিস্তান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার; এতে পরিষ্কার বিবৃত হয়েছে যে, তাদের ও আহলে সুন্নাহ্‌র আকীদার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ১১৬পৃ.

নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, বালূচিস্তানের কিছু এলাকায় যিকরীর ন্যায় ইসলাম বিরোধী মযহাব চালু ছিল এবং যিকরীরা মুসলমানদেরকে নামাযী বলে এদেরকে হত্যার যোগ্য মনে করত। মীর নাসীর খান আ'জম একদিকে শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রচলন ঘটান এবং অপর দিকে যিকরীদের ইসলাম দুশমনী ও শির্ক প্রতিপালনের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত জিহাদের ক্রমিক ধারা অব্যাহত রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্তাক্ত ও চূড়ান্ত যুদ্ধের পর এই বিদ'আতকে পরিপূর্ণরূপে ও জড়ে মূলে উৎখাত করা হয়েছে।[১]

ভারতবর্ষে অপর সংশয়যুক্ত ফেরকা ছিল রৌশনাইয়া ফের্কা। পাঠানদের পতনোন্মুখ শক্তিকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দান এবং মুগলদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে প্রতিহত করবার জন্য এই ফের্কা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২] তারা এই যুগের লেখকদের বর্ণনাসমূহকে ভাবনাযোগ্য ও গবেষণার মুখাপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কতটা সক্রিয় ছিল এবং ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতা ছিল কতটা? এই ফেরকার অনুরাগী ভক্ত ও সমর্থক এবং এর বিরোধীদের বর্ণনা ও বিবৃতি এতটা পরস্পরবিরোধী যে, একজন এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতাকে "পীর-ই রওশন" বা আলোর পীর নামে স্মরণ করে, অপরজন "পীর-ই তারীক" বা অন্ধকারের পীর বলে। এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন বায়েযীদ আনসারী যিনি পীর-ই রৌশাঁ (বা রৌশন) নামে কথিত। তার পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ। ৯৩১ হিজরীতে জলন্ধরে (বাবর কর্তৃক মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্বে) জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রাথমিক দিনগুলো পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অভিভাবকদের অমনোযোগিতার মাঝে অতিবাহিত হয় এবং এজন্য তার শিক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। কোন এক সফর কালে (কোন কোন বর্ণনানুসারে) সুলায়মান ইসমাঈলীর সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটে। বলা হয়ে থাকে যে, তার যোগী-সন্যাসীদেরও সাহচর্য

---

১. তারীখে বালুচ ঃ এই বিষয়ে দ্র. 'রিসালা আল-হক' (আকুড়া খটক)-এর ১০৭৯ সালের সংখ্যার একটি নিবন্ধ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যা দারুল উলূম তিরবত, বালুচিস্তানের সদর মুদাররিস মওলানা আবদুল হক কর্তৃক লিখিত। আরও দেখুন ১৯৮০ সালের "আল-হক" পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যার ذکری مذھب کا تفصیلی جائزہ শীর্ষক নিবন্ধ।

২. এই যুগে তাসাওউফের প্রভাব ও অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা দৃষ্টে কোন কোন দূরদর্শী ও উৎসাহী লোকের এই ধারণা অমূলক নয় যে, একে পাঠানদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদেরকে একটি মযহাবী আন্দোলনের পতাকাতলে একত্র পূর্বক মুগল হুকুমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত করা এবং এর দ্বারা আফগানদের অপসৃয়মান ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে কাজে লাগানো হয়।

লাভ ঘটেছিল। তার জীবনীকারদের বর্ণনা মুতাবিক তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন এবং অদৃশ্য লোক থেকে আওয়াজ শুনতে পান। তিনি যিকর-ই খফীতে মগ্ন হন এবং কিছুকাল পর ইসমে আ'জম জপতে গিয়ে ইসতিগরাকী হালতে উপনীত হন। যখন তিনি একচল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেন তখন অদৃশ্য স্থান থেকে জনৈক আহবানকারী তাকে ডেকে বলে, এখন তাকে শরঈ পাক- পবিত্রতা বর্জন করতে হবে এবং মুসলমানদের নামাযের পরিবর্তে তাকে আম্বিয়া-ই কিরামের নামায পড়তে হবে।[১] এরপর তিনি সকলকে মুশরিক ও মুনাফিক ভাবতে থাকেন এবং চিল্লাকাশী শুরু করেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে তাবলীগের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। ইমাম মাহদী হবার দাবী এবং ইলহামে রব্বানীর অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে।[২] তার মুরীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কতিপয় লোককে তিনি তার খলীফা নিযুক্ত করেন যাতে তারা তবলীগের কাজের আরও বেশী বিস্তার ঘটায়।

কিন্তু তার রচনা সিরাতুত-তওহীদ নামক গ্রন্থে তার যে তা'লীম বা শিক্ষামালা এসেছে তাতে একে তাসাউওফের প্রতি আসক্তির অতিরিক্ত তা'লীম ও বাড়াবাড়িপূর্ণ আত্মপরিচিতির ফল বলে মনে হয় যা কোন কামিল শায়খ এবং কুরআন ও সুন্নাহর গভীরতর ইল্‌ম ব্যতিরেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে নিজে রিয়াযত ও মুজাহাদাকারীদের ভেতর জন্ম নেয়। এ গ্রন্থে তাদের কতক উসূল (মূলনীতি) ও আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো সম্ভবত তার যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিধান যা সে যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত যখন তিনি মুগল ও তার বিরোধী আফগান গোত্রগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষরত ছিলেন।

বায়েযীদ আনসারী পেশাওয়ার সন্নিহিত এলাকায় কতিপয় আফগান গোত্রকে নিজের ভক্ত মুরীদ বানিয়ে নেন। মেহমান্দযাই গোত্রেও তিনি তার মতবাদ প্রচারের কাজ শুরু করেন। সিন্ধী ও বেলুচীদের ভেতরও তার প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। পীর ও উলামায়ে কিরামের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তার বিস্ময়কর সাফল্য লাভ ঘটে। শায়খ বায়েযীদ তার দাঈ ও প্রচারক দল প্রতিবেশী দেশগুলোর

১. কিন্তু স্বয়ং শায়খ বায়েযীদ তার কিতাব মকসুদুল মু'মিনীন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, শরীয়ত হল গাছের বাকলের ন্যায় এবং বাকল ব্যতিরেকে গাছের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় (পৃ. ৪৪৪, হস্তলিখিত পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ব. লাইব্রেরী)।

২. শায়খ বায়েযীদ স্বয়ং এ কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তিনি মাহদী। কাবুলের কাযী খান ও তার ভেতর যে বিতর্ক হয়েছিল উক্ত বিতর্কের বিবরণীতে এটি স্থান পেয়েছে (পাঞ্জাব বি. বি. রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে)।

শাসনকর্তা, আমীর-উমারা ও আলিমগণের নিকট পাঠান। তাদের ভেতর একজন সম্রাট আকবরের দরবারেও আসে। তার জীবনের শেষ আড়াই বছর মুগলদের সঙ্গে যুদ্ধে অতিবাহিত হয় এবং ৯৮০ হিজরীতে কালাপানি নামক স্থানে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন ও হশত নগরে সমাহিত হন। তার লিখিত গ্রন্থের ভেতর তিনটি গ্রন্থ খায়রুল-বয়ান, মকসূদুল-মু'মিনীন ও সিরাতুত-তাওহীদ বর্তমান। এতে তৎকর্তৃক সৃষ্ট ফের্কার মূলনীতি ও আকীদা-বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এর ভেতর 'খায়রুল-বয়ান' এবং 'মকসুদুল-মু'মিনীন' তার অনুসারীদের নিকট প্রায় পবিত্র গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। তার সবচেয়ে বড় বিরোধী ছিলেন আখুন্দ দরবীযাহ যিনি সায়্যিদ 'আলী তিরমিযী (পীর বাবা নামে পরিচিত ও বিখ্যাত, ৯৯১ হিজরীতে মৃত্যু)-র মুরীদ ছিলেন। তিনি তার প্রত্যাখ্যানে 'মাখযানুল-ইসলাম' নামে একটি কিতাব লিখেন। হালনামা পীরই দস্তগীর (ফারসী) নামে শায়খ বায়েযীদের একটি আত্মজীবনী রয়েছে। এটি আলী মুহাম্মদ মুখলিস পরিবর্ধনসহ বিন্যস্ত করেন।

ভেতর ও বাইরের যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে, অধিকন্তু আলিম-উলামার প্রবল বিরোধিতার দরুন এবং এ জন্যও যে, তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল বিধায় এই ফের্কার লোকেরা হ্রাস পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত একেবারেই নাম-নিশানাহীন হয়ে যায়।[১]

'দাস্তান তুর্কতাযান-ই হিন্দ' গ্রন্থের লেখক মির্যা নসরুল্লাহ খান ফিদাঈ দৌলত ইয়ার জঙ্গ এই ফের্কার পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"রৌশনাঈ একটি ফের্কার নাম, বায়েযীদ নামক একজন ভারতীয় এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সে আফগান (পাঠান)-দের ভেতর গিয়ে পয়গম্বরীর দাবী করে ও নিজেকে রৌশনাঈ পয়গম্বর হিসাবে পরিচয় দেয় এবং তাদেরকে স্বীয় অনুসারী বানায়। সে আসমানী সহীফাসমূহকে বর্জন করে এবং আল্লাহ্র ইবাদত পরিত্যাগ করে। তার কথাবার্তা থেকে জানা যায় যে, সে ওয়াহদাতুল-ওজুদ মতবাদের সমর্থক ছিল।[২] তার 'আকীদা ছিল যে, সেই ওয়াজিবুল-ওজুদ ছাড়া আর কারুর অস্তিত্ব নেই। পয়গম্বর-ই 'আরাবী (সা.)-র প্রশংসা করত। লোকদের সে সুসংবাদ শোনাত যে, সেদিন খুবই নিকটবর্তী যেদিন গোটা পৃথিবী তার পায়ের তলে এসে যাবে।"

---

১. উর্দু দাইরায়ে মা'আরিফ-ই ইসলামিয়ার নিবন্ধকার অধ্যাপক ডঃ মাওলানা মুহাম্মদ শফী মরহুমের নিবন্ধ, ৪র্থ খণ্ড দ্র.।

২. ঐ যুগে এতে কোন নতুনত্ব ছিল না। সূফীদের অধিকাংশই (কমপক্ষে ভারতবর্ষে) এই আকীদায় চরমপন্থী ছিল। (গ্রন্থকার)

হালনামা নোশ্‌ত-ই বায়েযীদ থেকে জানা যায় যে, তার উপর ইলহাম হত এবং জিবরাঈল নাযিল হত তার কাছে। আল্লাহ্ তাকে নবুওত দ্বারা ধন্য করেন। সে স্বয়ং নিজেকে নবী মনে করত। নামায পড়ত, কিন্তু কিবলা নির্ধারণ জরুরী মনে করত না। فاينما تولوا فثم وجه الله (অনন্তর তুমি যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহ্ বর্তমান) আয়াত দ্বারা এর পক্ষে দলীল পেশ করত। পানি দিয়ে গোসলের প্রয়োজন বোধ করত না। তার বিরোধীদেরকে হত্যা করা জায়েয মনে করত।[১] গ্রন্থকার এই পর্যায়ে তার এমন কিছু কিছু উক্তির বর্ণনা দিয়েছেন যা 'আরিফ ও সূফীসুলভ এবং যা সমালোচনা করবার মত নয়। কিন্তু এর সাথে ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণাও এতে রয়েছে।

"তার কাছে আত্মপরিচিতি ও খোদা পরিচিতি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যদি হিন্দুকে সে আত্মপরিচিত দেখতে পেত তাহলে তাকে মুসলমানের উপর অগ্রাধিকার দিত। মুসলমানদের থেকে জিযয়া নিত। উৎপাদিত খাদ্যশস্যের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) বায়তুল মালে জমা করাত এবং অভাবী লোকদের ভেতর বণ্টন করত। তার সকল সন্তান-সন্ততি অন্যায়-অনাচার থেকে মুক্ত এবং জুলুম-নির্যাতন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত। আরবী, ফারসী, হিন্দী ও পশতু ভাষায় তার কতকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তার খায়রুল-বয়ান নামক গ্রন্থটি ৪টি ভাষায় লেখা যা 'আল্লাহ তা'আলা' তাকে সরাসরি সম্বোধন করেছেন এবং তার বিশ্বাস মতে এটি আসমানী কিতাবের মর্যাদায় সমাসীন।"[২]

সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পীর বায়েযীদ আফগান (পাঠান)-দের এক বিরাট শক্তি সংগ্রহ করেছিলেন এবং কোহে সুলায়মানকে ঘাটি বানিয়ে খায়বার গিরিপথ দখল করে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উপর হামলা করা শুরু করেছিলেন। এই ফেতনা দমনের জন্য সম্রাট আকবর সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি তাদের উৎখাত করতে পারেননি। বায়েযীদের ইনতিকালের পর তৎপুত্র ও স্থলাভিষিক্ত মুগল সাম্রাজ্যের জন্য একটি হুমকি হিসাবে থেকেই যায়। রাজা মানসিংহ, বীরবল ও যয়েন খান তার বিরুদ্ধে সফলতা লাভে সক্ষম হননি। বীরবল এক সংঘর্ষে তো মারাই যান। ৯৯৫ হিজরীতে মানসিংহের একটি আক্রমণও রৌশনাঈদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়। অবশেষে সম্রাট শাহজাহানের আমলে (হিজরী ১০৫৮) এই ফেতনা নির্মূল হয়।[৩]

১. দা. মা. ই. ৪র্থ খণ্ড ,৩০৪-৫ পৃ.।

২. হালনামায়ে বায়েযীদ দর দাবিস্তানে মাযাহিব থেকে উদ্ধৃত, মোল্লা হাসান খান কৃত, ৩০৯ পৃ.।

৩. দাস্তান-ই তুর্কতাযান-ই হিন্দ থেকে সংক্ষেপিত। দুঃখের বিষয় যে, অনুবাদ ও জীবনী গ্রন্থে তার সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় না।

মাহদীবাদ ঃ এই আমলের সবচে' কাঁপন সৃষ্টিকারী আন্দোলন ছিল মাহদীবাদ যার প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ মুহাম্মদ (ইবনে য়ূসুফ) জৌনপুরী (জন্ম ৮৪৭ হি.)-র মৃত্যু যদিও ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে (হি. ৯১০) হয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব ১০ম শতাব্দীর শেষ অবধি বাকী ছিল। নিরপেক্ষ ইতিহাস অধ্যয়নের আ-লোকে একথা বলা যেতে পারে যে, দু'তিন শতাব্দীর ভেতর কোন ধর্মীয় দাওয়াত ও আন্দোলন এই উপমহাদেশে (আফগানিস্তানসহ) এত ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে এবং এত গভীর ও শক্তিশালী পর্যায়ে মুসলিম সমাজের উপর প্রভাবশালী হয়নি যতটা হয়েছিল এই দাওয়াত ও আন্দোলন। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ও লেখকগণ পক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু লিখেছেন সে সবের অধ্যয়ন থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুচ্ছি ঃ

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ জৌনপুরী ছিলেন অভ্যন্তরীণ ও সৃষ্টিগতভাবে সে সমস্ত উন্নত, সমর্থ ও শক্তিশালী মনমানসের অধিকারী লোকের অন্যতম যাঁরা বহুকাল পর জন্ম নিয়ে থাকেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসী বীর পুরুষ, স্বীয় পরিবেশ ও যুগের অবস্থা সম্পর্কে অতৃপ্ত, আমরু বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনিল-মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায় ও গর্হিত কর্মের ক্ষেত্রে কঠিন তিরস্কার ও কঠোর ভর্ৎসনায় অত্যুৎসাহী ছিলেন এবং এ জন্যই সে সময়ই তাকে 'আসাদুল-উলামা' (আলিমদের মধ্যে ব্যাঘ্রসদৃশ) উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তরীকত তথা অধ্যাত্ম জ্ঞানের তা'লীম শায়খ দানিয়াল-এর কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদা করেন। পাহাড়-পর্বত ও বিভিন্ন উপত্যকায় বহুদিন নিভৃত জীবন যাপন করেন যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (বিশেষত যখন কামিল শায়খ-এর তত্ত্বাবধান ও পথ-নির্দেশনা লাভ ঘটে না) এমন সব ঘটনা ও ইশারা-ইঙ্গিত ঘটে যদ্দরুন পদস্খলনের আশংকা ও কতক সময় ভ্রান্ত প্রতীতি জন্মে এবং এমন লোক যিনি তাহকীক-এর মকাম ও দৃঢ়তার স্তরে না পৌঁছেছেন তিনি শব্দসমষ্টিকে ভ্রান্ত স্থানে প্রয়োগ এবং অদৃশ্য ইঙ্গিতকে ভুল অর্থে মনে করতে পারেন। অনন্তর এ সময়েই কোন এক সফরে তিনি ইমাম মাহদী হবার দাবী করেন। এরপরও কয়েকবার নানা জায়গায় নিজেকে 'মাহদী মাও'উদ' বা প্রতিশ্রুত মাহদী হবার ঘোষণা দেন এবং তার উপর ঈমান আনার দাওয়াত জানান।

২. তিনি অতিরিক্ত রিয়াযত, বাতেনী শক্তি এবং আমর বি'ল-মা'রূফ-এর আবোগোদ্দীপ্ত প্রেরণার কারণে সর্বোচ্চ দর্জার প্রভাবের অধিকারী (صاحب تاثير)

ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহচর্য, তাঁর কথাবার্তা ও বর্ণনা-বিবৃতি শ্রোতা ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপর যাদুর ন্যায় ক্রিয়া করত এবং সুলতান ও আমীর-উমারা থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট জন সকলের উপর বেখুদী (আত্মবিলোপ) ও আত্মবিস্মৃতির তরঙ্গ বয়ে যেত এবং তার জন্য বিরাট থেকে বিরাটতর পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিদায় জ্ঞাপন, দেশ-দুনিয়া পরিত্যাগ করত তার সহগামী হওয়া এবং নিজেকে তার হাতে সোপর্দ করে দেওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যেত। রাজধানী মাণ্ডোতে গিয়াছ উদ্দীন খিলজীর সাথে এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছিল এবং গুজরাটের জানপানীরে মাহমূদ শাহ গুজরাটির উপর এই প্রতিক্রিয়াই হয়। আহমদ নগর, আহমদাবাদ, বেদর ও গুলবার্গাতে এই দৃশ্যই দেখতে পাওয়া গিয়েছে। দলে দলে লোক তার হাতে বায়'আত হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষ তার কাফেলায় শরীক হয়েছিল। সিন্ধু এলাকাতেও টালমাটাল দৃশ্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এবং মানুষ থামানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। কান্দাহারেও তার বক্তৃতা কিয়ামত দৃশ্যের সৃষ্টি করে এবং কান্দাহারের শাসনকর্তা মির্যা শাহ বেগ তার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

৩. তার জীবন ছিল নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা ও সংসার বিরাগ, যুহদ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে আর সব কিছুর সংশ্রব বর্জনের জীবন এবং ঘরে-বাইরে ও সফরে তার দায়েরা বা বৃত্তে সেই যুহদ ও আত্মোৎসর্গ এবং সেই যিকর ও ইবাদতের দৃশ্যেই ভরপুর দেখতে পাওয়া যেত। খাবারসহ সকল কিছুই সমান সমান, কারুর কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি পক্ষপাত ব্যতিরেকেই বণ্টন করা হত। এ ক্ষেত্রে তার কিংবা পরিবারবর্গের বেলায়ও কোনরূপ রেআয়েত করা হত না। এই দৃশ্যে যে কোন নবাগত প্রভাবিত না হয়ে পারত না।

৪. এই দাওয়াত এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থপর, ত্যাগী, সাহসী, নির্ভীক ও আত্মভোলা দাঈ জন্ম দিয়েছিল যারা كلمة حق عند سلطان جائر অত্যাচারী শাসকের সামনে হক-কথা বলার অপরিহার্য দায়িত্ব অত্যন্ত শক্তি ও সাহসের সাথে পালন করে। আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে তারা কঠোর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এবং এ পথে হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দেয়। মানুষ তাদের অবস্থা জেনে ও পড়ে খুবই প্রভাবিত হয় এবং সায়্যিদ মুহাম্মদ জৌনপুরীর প্রশিক্ষণ ও সাহচর্যের প্রভাব স্বীকার না করে থাকতে পারে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শায়খ 'আলা ইবনে হাসান আল-বিয়ানভী (শায়খ 'আলাঈ, মৃ. ৯৫৭ হি.)-র জীবন-বৃত্তান্ত দেখা যেতে পারে যিনি সুলতান সলীম শাহ ইবন শের শাহ্ সূরীর দরবারে দাওয়াত ও উপদেশ প্রদানের অপরিহার্য দায়িত্ব আনজাম দেন এবং শাহী আদব ও কুর্নিশের পরিবর্তে ইসলামী তরীকায় সালাম প্রদানকেই যথেষ্ট মনে করেন। দ্বিতীয়বার সফরের শ্রান্তি-ক্লান্তি ও প্লেগরোগে আক্রান্ত অবস্থায় কোড়ার আঘাত খান। এতেও তাঁর মৃত্যু না হওয়ায় হাতীর পায়ের সাথে বাঁধা হয় এবং সেনাবাহিনীর মাঝে তাঁকে ঘোরানো হয়।[১]

৫. তার দাওয়াতের রুকন ছিল পাঁচটি : (১) দুনিয়া বর্জন, (২) সৃষ্টিকুলের সংস্রব বর্জন ও নির্জনতা অবলম্বন, (৩) দেশ থেকে হিজরত, (৪) সিদ্দীকগণের সাহচর্য, (৫) সার্বক্ষণিক যিকর (হিফজে আনফাসের তরীকায়)। তারা মুশাহাদায়ে ইলাহী তথা স্রষ্টাকে দর্শন (চাই মনশ্চক্ষু মারফত অথবা হৃদয় দিয়ে, জাগ্রতাবস্থায় অথবা স্বপ্নযোগে) জরুরী ও ঈমানের শর্ত হিসাবে অভিহিত করে।

৬. মত্ত অবস্থায় অথবা অর্থ ও মর্ম যথার্থভাবে উপলব্ধি না করতে পারায় তার থেকে নিজের সম্পর্কে কয়েকবার ও সুস্পষ্টভাবে এমন সব উক্তি ও দাবী প্রকাশ পেয়েছে[২] যার ভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মুশকিল এবং যেগুলো তার অনুসারীদেরকে (প্রথম দিকে তাদের নিয়ত যতই সহীহ্ এবং তাদের ধর্মীয় আবেগ ও প্রেরণা যতই কদরযোগ্য হোক না কেন) সহজেই একটি বিরোধী জমহূর ও আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আত বিরোধী ফের্কায় রূপ দেয় যারা ঐসব উক্তির আশ্রয় নিয়েছে এবং সেসবের উপর নিজেদের 'আকীদার বুনিয়াদ রেখেছে। পরবর্তীকালে আগত ও চরমপন্থী ভক্ত-অনুরক্তগণ (যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে) এতে আরও বৃদ্ধি ঘটায় এবং তার পবিত্রতা বর্ণনায় ও সম্মান-শ্রদ্ধায় এতখানি বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেয় যে, তাকে আম্বিয়ায়ে কিরামের সমপর্যায়ে এনে দাঁড় করায় এবং কতকের থেকে শ্রেয় ও উত্তম বানিয়ে দেয়। কোন কোন

১. বিস্তারিত দ্র. তরজমা শায়খ 'আলা ইবনে হাসান আল-বিয়ানভী, নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড, অথবা মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, আবদুল কাদির বদায়ূনী কৃত। মওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভঙ্গিমায় শায়খ আলাঈর শাহাদতের মর্মস্পর্শী কাহিনী বিস্তারিতভাবে প্রভাবমণ্ডিত পন্থায় বর্ণনা করেছেন (তাযকিরা, ৫৩-৬১ পৃ.)।

২. এ ধরনের উক্তি চরমপন্থী অনেক সূফী ও কঠোর রিয়াযতকারী তাপসদের থেকে বর্ণিত আছে।

চরমপন্থী তো তাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমপর্যায়ে পৌঁছে দেয় (যদিও তাদের মতেও সায়্যিদ মুহাম্মদ জৌনপুরী তাঁর অনুসারী এবং দীনে মুহাম্মদীর অনুগত ছিলেন)। কেউ কেউ তো এতদূর পর্যন্ত ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ি দেখায় যে, "যদি কুরআন ও সুন্নাহ তার কোন উক্তি ও কর্মের পরিপন্থী ও বিরোধী হয় তবে কুরআন -সুন্নাহর উপর আস্থা রাখা হবে না।" ঠিক এমনি করে তারা এও বাড়াবাড়ি করে যে, 'যে মুসলমান ঐশী নূর স্বচক্ষে অথবা অন্তর দিয়ে শয়নে-স্বপনে অথবা জাগরণে মুশাহাদা (পর্যবেক্ষণ) না করে সে মু'মিন নয়।' সাধারণ এবং এই ফের্কার মাঝে এই ব্যবধান কালের প্রবাহে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে চলে। এমন কি মাহদাবী নামে স্বতন্ত্র ফের্কা পরিচয়ে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামাআত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায় যে জন্য এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং যা সম্ভবত এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার চোখের সামনে ছিল।

দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই জামা'আতের প্রভাব হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তানের উপর কায়েম থাকে এবং দাক্ষিণাত্যে এর অনুসারীদের কয়েকটি সাম্রাজ্য কায়েম হয়। দশম শতাব্দীর শেষে মাহদাবীদের শক্তি ও সংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটে তা এথেকে পরিমাপ করা যাবে যে, ইসমাঈল নিজাম শাহ ইবনে বুরহান নিজাম শাহ ২য়-এর শাসন আমলে (হি. ৯৯৬-৯৮) সাদ্দাহর অন্যতম মনসবদার জামাল খান মাহদাবী আহমদ নগরে শাহী অভিযানগুলোর বাগডোর স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইসমাঈল নিজাম শাহকেও (যিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন)স্বধর্মে নিয়ে আসেন। অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুস্তানের চতুর্দিক থেকে ভবঘুরে মাহদাবী জমা হয়ে যায়। জামাল খানের চারপাশে দশ হাজারের কাছাকাছি মাহদাবী একত্র হয় এবং তারা বুরহান নিজাম শাহর অনুপস্থিতিতে আহমদ নগর সাম্রাজ্যের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। ৯৯৮ হিজরীতে আহমদ নগরে ফিরে এলে তিনি মাহদাবী ধর্ম, যার প্রচলন ঘটে গিয়েছিল, খারিজ করে দেন এবং পূর্বের মতই ইছনা 'আশারী মযহাবের প্রচলন ঘটে ।[১]

দশম শতাব্দীর শেষে মাহদাবী মতবাদের আন্দোলনে সুস্পষ্ট দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এই দাওয়াত ও সায়্যিদ মুহাম্মদ জৌনপুরীর দাবী এবং তার অধিকাংশ চরমপন্থী ভক্ত-অনুরক্তদের জোর-যবরদস্তির ফলে এই আকীদার মধ্যে একটি নড়বড়ে অবস্থা এবং মুসলিম সমাজ জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা

১. মওলবী যাকাউল্লাহ দেহলভী কৃত-তারীখে হিন্দুস্তান, ৪র্থ খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত।

দেখা দিচ্ছিল। এর দরুন ঐ যুগের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম, যাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর উপর গভীর দৃষ্টি ও দীনী 'ইল্‌ম তথা ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ দখল রাখতেন, তাঁরা অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা একে এক বড় রকমের গোমরাহী ও ফেতনার পূর্ব লক্ষণ মনে করতেন। অনন্তর সে যুগের হাদীস ও সুন্নাহর সবচে' বড় আলিম 'মাজমা'উ বিহারি'ল-আনওয়ার'-এর গ্রন্থকার আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পাটনী (৯১৩-৯৮৬ হি.) এর প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন পর্যন্ত এই বিদ'আত (যার আছর সমগ্র গুজরাটে এসে গিয়েছিল) নির্মূল না হবে ততদিন তিনি পাগড়ী পরিধান করবেন না। সম্রাট আকবর ৯৮০ হিজরীতে গুজরাট বিজয়ের পর আল্লামা মুহাম্মদ তাহিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বহস্তে তাঁর মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন এবং বলেন ঃ দীনের সাহায্য ও সমর্থন এবং এই নতুন ফের্কার উৎসাদন (যার গুরুভার দায়িত্ব আপনি আপন কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন) আমার যিম্মায় রইল। তিনি মির্যা 'আযীযুদ্দীনকে (যিনি তাঁর দুধ ভাই ছিলেন) গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং এই কাজে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর শাসনামলে তাদের শক্তি হ্রাস পায়। কিন্তু মির্যা 'আযীয এই দায়িত্ব থেকে অপসারিত হলে তদস্থলে আবদুর রহীম খানখানান গুজরাটের শাসনকর্তা হন। এ সময় মাহদাবীরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং ময়দানে অবতরণ করে। 'আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পুনরায় পাগড়ী নামিয়ে ফেলেন এবং রাজধানী (দিল্লী) যাবার সংকল্প নেন। তাঁর পেছনে পেছনে মাহদাবীদের একটি দলও রওয়ানা হয় এবং উজ্জয়িনী পৌঁছুতে পৌঁছুতে তাঁকে শহীদ করে দেয়।[১]

অস্থিরতা ও বিক্ষিপ্তচিত্ততার কারণ

ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শন অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, এই ধরনের মানসিক অস্থিরতা ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণাত্মক আন্দোলন ও বিক্ষিপ্ত ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হবার জোরদার কারণগুলো সাধারণত নিম্নরূপ হয়ে থাকে ঃ

১. সমাজের কথায় ও কাজে, বিশ্বাসে ও জীবন যাপনে সামঞ্জস্যহীনতা আর পারস্পরিক বৈপরিত্য যা অস্থির ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন প্রকৃতিতে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তা একটা পর্যায়ে বিদ্রোহাত্মক আহবান ও আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারা স্বয়ং যদি কোন আন্দোলন সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়ে যায়। সাধারণত এসব আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি চরমপন্থা গ্রহণ করে বসে এবং স্বয়ং এই বিকৃত ও দূর্বল সমাজের তুলনায় ধর্মীয়

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

দিক দিয়ে অধিক ভ্রষ্ট, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক এবং সমাজের জন্য অশান্ত ও অরাজকতাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মনে হয়, দশম শতাব্দীতে বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্য, পদ ও পদমর্যাদার প্রতি লোভ এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার আগ্রহই এই বৈপরিত্যের জন্ম দিয়েছিল এবং দুনিয়াদার ও দুনিয়াপূজারীদের একটি বিরাট দল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যারা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ও নীতিমালাকে এক পাশে ঠেলে রেখে পদমর্যাদা লাভ কিংবা মজা ও ফূর্তি লুটবার জন্য সব ধরনের অনিয়ম ও উচ্ছৃংখল পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করেছিল। এই শ্রেণী সাধারণত এমন সব যুগে জন্ম নেয় যখন বিশাল বিস্তৃত ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতার যুগ ফিরে আসে। মনে হয় সূরী শাসনামলের শেষ যুগ এবং মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর উপমহাদেশীয় সমাজের এই অবস্থাই লক্ষ্যণীয় আকারে প্রকাশ পেয়েছিল এবং বহুবিধ ইসলাম ও শরা-শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম, রসম-রেওয়াজ ও আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।[১] উমায়্যা ও আব্বাসী সাম্রাজ্যেও এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য বিকাশ লাভ ঘটেছিল এবং একেই হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ পাদের সবচে' বড় মুজাদ্দিদ ও দাঈ হযরত হাসান বসরী (মৃ. ১১০ হি.) মুনাফিক অভিধায় স্মরণ করেছেন।

২. সুলতান ও শাসনকর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের জোর-জুলুম, স্বেচ্ছাচারিতা, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন, শরঈ বিধি-বিধানের প্রতি উপেক্ষা ও প্রকাশ্য প্রবৃত্তি পূজা যা ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত লোকদেরকে বিপ্লবী আন্দোলন ও বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

৩. রসম পূজা ও জাহির-পরস্তী যখন তার চরম মার্গে গিয়ে পৌঁছে সমাজ তখন নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক অধঃপতন এবং শিক্ষিত মহল মারাত্মক জড়তা ও স্থবিরতার শিকার হয়ে যায়।[২] এবং শিক্ষা ব্যবস্থা যখন নিষ্প্রাণ, বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং মানস প্রকৃতিকে সান্তনা দানের যোগ্যতা থেকে

১. ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সুলতান সলীম শাহ অথবা ইসলাম শাহর শাসনামলে প্রতি বিলায়েত বা সরকারী আবাসে জুম'আর দিন সমস্ত আমীর-উমারা ও সরকারী কর্মকর্তা জমায়েত হত এবং একটি উঁচু শামিয়ানার তলে কুরসীর উপর সুলতান সলীম শাহর জুতা রেখে তার সামনে কুর্নিশ করত এবং শাহী আইন সংকলন পাঠ করা হত (তারীখে হিন্দুস্তান, সায়্যিদ হাশেমী ফরিদাবাদী কৃত, ৩য় খণ্ড ১ পৃ.)।

২. অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী এই যুগের চিত্র অংকন করতে ও রোগের মূল সঠিকভাবে নিরুপণ করতে গিয়ে যথার্থই লিখেছেন, "মুসলমানদের সাধারণ সামাজিক ও

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মাহরূম হয়ে যায় তখন মানুষ এমন সব আন্দোলনের ভেতর তার মানসিক সান্তনার উপকরণ খুঁজে পায় (তা সে ভ্রান্ত ও সঠিক যে পন্থায়ই হোক) এবং এই সীমিত বৃত্তের বাইরে পা ফেলে। কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা থেকে গাফিলতি এবং হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতাও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী কারণ যার ফলে দীনের সহীহ্ মেযাজ পয়দা হয় এবং যদ্দ্বারা এর সঠিক পরিমাপ করা যায় যে, উম্মাহর উপলব্ধি ও আমলের মধ্যে আসল দীন রসূল আকরাম (সা.)-এর আদর্শ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবিঈদের তরীকা থেকে কতটা দূরে সরে গেছে এবং কতটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

৪. এমন কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অভাব যিনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়ে সাধারণ মান থেকে উন্নত, শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হবেন, যিনি মানসিক অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্য দূর করবেন, সমাজের মরা দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারবেন এবং ইসলামের চিরন্তনতা ও শরীয়তে মুহাম্মদীর সত্যতা, উন্নতি ও বিকাশের বিস্তৃত সম্ভাবনার উপর নতুন আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারেন।

১০ম শতাব্দীর ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে (অনুবাদ ও জীবনী গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার রোয়েদাদের সাহায্যে) জানা যায় যে, কমপক্ষে ভারতবর্ষে এই অস্থিরতা ও চিন্তার বিক্ষিপ্ততার এই স্বাভাবিক কারণসমূহ বিগত শতাব্দীগুলোর মুকাবিলায় বেড়ে গিয়েছিল এবং এরই ফলে মানসিক অস্থিরতা ও গোলযোগপূর্ণ আন্দোলন এই শতাব্দীতে খুব বেশী দৃষ্টিগোচর হয়।

দশম শতাব্দীর সবচে' বড় ফেতনা

দ্বিতীয় সহস্রাব্দ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

হিজরী দশম শতাব্দী এই দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এর সমাপ্তিতে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) নৈতিক অবস্থা দ্রুততার সাথে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। আফসানা-ই-শাহান এবং তারীখে দাউদী গ্রন্থে যে সব কিসসা-কাহিনীকে বিস্ময়করভাবে পেশ করা হয়েছে তা নৈতিক অধঃপতন ও বিশ্বাসের অশুভ অবস্থার দর্পণ। দরিদ্রদের বিলাস জীবন, ছাত্রদের খারাপ চাল-চলন ও উচ্ছৃংখলতা, তা'বীয ও মাদুলীতে অযথা বিশ্বাস, জিন-পরী ও দেবদেবীর কাহিনী, সুলায়মান (আ)-এর প্রদীপের কাহিনী কোন সুদৃঢ় সমাজ অথবা সুসংবদ্ধ নৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে এভাবে ব্যাপক হতে পারত না। বস্তুত মাহদাবী আন্দোলন এই মানসিক অবনতি ও ধর্মীয় স্থবিরতা দূর করার একটি প্রয়াস ছিল" (সালাতীনে দিল্লীকে মযহাবী রুজহানাত, ৫৫১)।

ইসলামী বর্ষপঞ্জী এক হাজার বছর পূর্ণ এবং দ্বিতীয় হাজার বছর (দ্বিতীয় সহস্রাব্দ)-এর সূচনা হয়। সাধারণ অবস্থায় এই পরিবর্তন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিবীর দীর্ঘ বয়স এবং মানব জীবনের বিশাল বিস্তৃত পঞ্জিকা যেভাবে প্রতিটি শতাব্দীতে একবার পাতা উল্টায় তেমনি এক হাজার বছরের উপরও ১১শ শতাব্দীর নতুন পাতা উল্টাতে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন মনের ভেতর ভীষণ রকমের বিক্ষিপ্ত ভাবনা, ধর্ম বিশ্বাসে বিরাট দোদুল্যমানতা, দীনের সহীহ তা'লীম এবং কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান সম্পর্কে কেবল অজ্ঞতা ও অলসতাই নয় বরং ভীতি ও ঘৃণা হয়, গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মানব বুদ্ধির শেষ ধাপ বলে অভিহিত করা হয় এবং এরই নাম "হিকমত", "জ্ঞান ও প্রজ্ঞা" এবং মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও পরিপূর্ণতার সুবিশাল বিস্তৃত দিগন্তে الأفق المبين[1] হিসাবে অভিহিত করা হয়, কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি এবং পিপড়াকে হাতী (কিংবা সুচকে ফাল) হিসাবে দাঁড় করানো হয়, শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্য তালিকাকে শিক্ষাঙ্গনের কামালিয়াত মনে করা হয়, 'ইলমে নবূওত তথা নবূওতের জ্ঞান, আসমানী গ্রন্থ, ওয়াহী অবতরণ এবং কুরআনের 'নস'সমূহকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা হয় এবং এর উপর ঈমান আনাকে মূর্খতা, অন্ধ অনুকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে শত্রুতার সমার্থক মনে করা হয়, অতঃপর সেই সাথে তৎকালীন হুকূমত ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতি (যা ভুল ও শুদ্ধভাবে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত এবং একে নিজেদের ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষক ভাবত) অসন্তোষ, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। এর পর সোনায় সোহাগার মত যখন এমন সব উৎসাহী ও ভাগ্যান্বেষী মানুষ সৃষ্টি হয়ে গেল যারা মেধা ও তৎকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসজ্জিত, যারা নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা ও পথ-প্রদর্শক এবং সম্মান ও শক্তির অধিকারী হবার সোনালী স্বপ্ন দেখছিল এবং তাদের দিল ও দিমাগে এ আশা-আকাঙ্খাও নিত্য-নতুন রূপ নিচ্ছিল যে, মাস ও বছরের বিবর্তন থেকে সেও ফায়দা লুটবে যে ফায়দা বিগত দিনের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ (তাদের কথা মত) লুটেছে এবং তাদের দাওয়াত ও আন্দোলন থেকে দেশ ও জাতির ইতিহাসে এক নতুন বর্ষপঞ্জীর সূচনা হয়েছে আর তাদের ধারণায় এর সর্বাধিক সফল ও পূর্ণাঙ্গ রূপ ছিল সেই আমলের সূচনা যা রসূল আকরাম (সা.)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের বিকাশ থেকে আরবে শুরু হয় এবং সমগ্র বিশ্বকে আপন ছায়াতলে ঢেকে নেয়। তাদের নিকট এই দীনের ইতিহাস এবং দুনিয়ার বর্ষপঞ্জীতে প্রথম সহস্রাব্দের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সুবর্ণ

---

১. মুল্লা বাকির দামাদের الأفق المبين নামক গ্রন্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সুযোগ ছিল যা খুব সত্বর ও বারবার ফিরে আসে না। যদি এই দুর্লভ সুযোগ খুইয়ে ফেলা হয় তবে পুনরায় এক হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। এজন্য এই সুযোগ কোনভাবেই হারানো ঠিক হবে না, অন্যথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী আফসোস করতে হবে।

১০ম শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে এর সবচে' অস্থির, তীক্ষ্ণ, সৃজনী ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী ভূখণ্ড ইরানে (যাকে অনেকগুলো সাদৃশ্যের দরুন প্রাচ্যের গ্রীস বলা সঙ্গত হবে) এই ধারণার ছায়া দৃষ্টিগোচর হয়। ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশের পর এছিল পয়লা সুযোগ যে, এক হাজার বছর পূর্ণ হচ্ছিল এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শুরু হতে চলেছিল। প্রতিটি শতাব্দীর মাথায় মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হাদীস থেকেই প্রমাণিত এবং ইতিহাস থেকেও এর প্রমাণ মেলে। এজন্যই কতক ধীশক্তির অধিকারী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে মুজাদ্দিদের চেয়েও বেশী করে নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের নতুন যুগের একজন বিজেতার আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল এবং এর ভিতর অনেক অত্যুৎসাহী লোক নিজেদের নাম এই পদের প্রার্থী তালিকায় লিখাবার প্রয়াসও শুরু করে দিয়েছিল। আফসোস যে, এই যুগের কোন মানসিক ও চৈন্তিক ইতিহাস প্রণীত হয়নি যার ভেতর এই যুগের মন-মস্তিস্ক, আবেগ-অনুপ্রেরণা, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিচ্ছায়া দৃষ্টিগোচর হবে। পুর্বের ও বিগত যুগগুলোর মত সব ইতিহাসই রাজা-বাদশাহদের দরবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় (অর্থাৎ ইতিহাসে জনগণ তথা দেশের সাধারণ মানুষ স্থান পায়নি। ইতিহাস লেখা হয়েছে অধিকাংশ রাজা-বাদশাহদের শানদার দরবার ও তাদের পরিচালিত অভিযান ও যুদ্ধ-বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই—অনুবাদক)এবং এর ভেতর অধিকাংশই সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, সম্রাটদের আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমক, সাম্রাজ্যের পদস্থ কর্মকর্তাদের নিযুক্তি ও অপসারণ, আমীর- উমারার আরাম -আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের কাহিনী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের চমকপ্রদ ও লোমহর্ষক বর্ণনাই মিলে। যদি দশম শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের কোন সুচিন্তিত ইতিহাস পাওয়া যেত তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পেতাম যে, দ্বিতীয় সহস্রাব্দের নৈকট্য কত মানুষের অন্তর-মানসে ভ্রান্ত আশার উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বেলেছিল এবং তা নতুনতর নেতৃত্বের মসনদ এবং একটি নতুন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আখড়া বানাবার জন্য ঢাক-ঢোল জোগাতে শুরু করে দিয়েছিল।

সাফাবী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পর যিনি শী'ঈ মতবাদকে হুকুমতের শক্তি ও

সৌভাগ্যের সাহায্যে সমগ্র ইরানের অনুসৃত ধর্মে পরিণত করে দিয়েছিলেন এবং যদিও এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার সর্বোচ্চ পূর্বপুরুষ যার নিকট থেকে রাজ্য শাসনের উত্তরাধিকার পাওয়া গেছে সেই শায়খ সফিয়্যুদ্দীন স্বীয় রুচি ও মতাদর্শের দিক দিয়ে সূফী ছিলেন-কিন্তু যেহেতু শী'ঈ মতবাদ তাসাওউফের প্রতি বৈরিতা পোষণ করে-তাঁর শাসনামলে সেই ইরান যে ইরান একদিন ইমাম গাযালী তূসী, শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার নীশাপূরী, মওলানা জালালুদ্দীন রুমী[১] এবং মওলানা আবদুর রহমান জামীর ন্যায় 'আরিফ ও তত্ত্বজ্ঞানীর জন্ম দিয়েছিল, যেই ইরান থেকে বাগদাদ, দিল্লী ও আজমীর পীরানে পীর সায়্যিদুনা হযরত আবদুল কাদের জীলানী, শায়খুশ-শুয়ুখ শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী, খাওয়াজা-ই বুযুর্গ শায়খ মু'ঈনুদ্দীন চিশতী এবং শহীদ-ই 'ইশক খাওয়াজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কা'কী আওশী (রা)-র মত বুযুর্গ সাধক লাভ করেছিল সেই ইরান থেকে তাসাওউফের প্রদীপ একেবারেই নির্বাপিত হয়ে যায়। অপর দিকে কুরআন ও সুন্নাহর সেই 'ইলম বা জ্ঞান ও হাদীস শাস্ত্র ইরান ছিল একদিন যার বড় কেন্দ্র, যেই ইরান ইসলামের ইতিহাসকে দান করেছিল মুসলিম ইবনু'ল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নীশাপুরী, আবু 'ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী,ইবনে মাজা কাযবীনী এবং হাফিজ আবূ 'আবদুর রহমান নাসাঈর মত হাদীসের ইমাম ও সিহাহ সিত্তাহ্‌র গ্রন্থকার, সংকলক সেই ইরান এখন কুরআন-সুন্নাহ ও 'ইলমে হাদীস সম্পর্কে একেবারেই অপরিচিত ও সম্পর্কহীন হয়ে গিয়েছিল। এখন তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত পুঁজি, তার বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্যের ক্ষেত্র গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার দর্শন ও যুক্তি শাস্ত্র। এই বিপ্লব যা আরবের নবী (সা)-র সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং তাঁর সুন্নাহ ও হাদীসসমূহ থেকে এই মনুষ্য-প্রসবিনী মুসলিম দেশটির আত্মীয়তার সম্পর্কটি প্রথমেই কেটে দিয়েছিল। দেশের প্রতিভাবান, ধীশক্তি ও সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণীর সম্পর্ক নবুওতে মুহাম্মদী, খতমে নবুওতের আকীদা এবং দীন ইসলামের স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতার আকীদা থেকে যদিও বিচ্ছিন্ন করেনি, তবুও এ সম্পর্ককে দুর্বল করে দিয়েছিল অবশ্যই। যদি আহলে বায়ত (শী'আ মতবদের ভিত্তিতে)-এর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিসবত না থাকত তাহলে দেশটির পক্ষে পুনরায় অগ্নিপূজা, ইসলাম পূর্বযুগের সভ্যতা এবং ফেরদৌসীর শাহনামার রুস্তম ও ইস্ফান্দিয়ার-এর যুগের দিকে ফিরে যাবার সমূহ আশংকা ছিল।

এমতাবস্থায় নবম ও দশম শতাব্দীর ইরানে উচ্ছৃংখল আন্দোলন এবং ইসলা-

১. তিনি খুরাসানে অবস্থিত বলখের অধিবাসী ছিলেন, বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত।

মের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক চক্রান্ত সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, ছিল না কল্পনার বাইরে যার সবচে' প্রগতিশীল উদাহরণ নবম শতাব্দীর শেষ এবং দশম শতাব্দীর প্রথম দিককার নুকতাবী আন্দোলন যে আন্দোলন ইরানের এই অস্থির চিত্তের সর্বোত্তম প্রকাশ যা কখনো মাযদাকের অবয়বে, কখনো মানীরূপে, আবার কখনো-বা হাসান ইবন সাব্বাহ্‌র পোশাকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ছিল নির্ভেজাল ধর্মদ্রোহী আন্দোলন। ইস্কান্দার মুনশীর ভাষায় ঃ

"এই ফের্কা দার্শনিকদের মযহাব মুতাবিক বিশ্ব-জাহানকে "কাদীম" (অনাদি, চিরন্তন) মেনে থাকে। মানবদেহের পুনরুজ্জীবন লাভ এবং হাশর-নশর সম্পর্কে এরা কোনরূপ বিশ্বাস পোষণ করে না। আমলের ভাল-মন্দের শাস্তি ও পুরস্কারকে দুনিয়ার শাস্তি বা আরাম ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আকারে একেই বেহেশত ও দোযখ মনে করে থাকে" (তারীখ আলম আরায়ে আব্বাসী, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃ.)।

শাহ্‌নওয়ায খান তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

"ইল্‌ম নুকতা-ই ইলহাদ[১] ও যানদাকী[২]-ই ইবাহাত (অর্থাৎ সব কিছুই জায়েয) এবং ওয়াসী'উল-মাশরাবী (সবই বিশুদ্ধ ও সহীহ্)-র নাম। প্রাচীন কালের দার্শনিকদের মত তারাও পৃথিবীর অনাদি ও চিরন্তন হওয়া সমর্থন করে এবং হাশর-নশর ও কিয়ামত অস্বীকার করে। আমলের ভাল-মন্দের পুরস্কার ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে এই দুনিয়ারই প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশ এবং অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টকে মনে করে থাকে।"[২]

তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, জড় জগত ও প্রাণীকূল উন্নতি করতে করতে অর্থাৎ ক্রমোন্নতির মাধ্যমে মনুষ্য পর্যায়ে উপনীত হয়।[৩] উদ্ভিদ উদগমের মধ্যে আল্লাহ্‌র কুদরতের কোন ভূমিকাই নেই, এ কেবল নক্ষত্ররাজি ও বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণের ফল[৪]। কুরআন পাককে নবী করীম (সা.) কর্তৃক প্রণীত বলে তারা মনে করে। শরীয়তের মসলা-মাসাইলকে জ্ঞানীজনদের উদ্ভাবিত বলে বিশ্বাস করে। এই ফের্কার অনুসারীরা নামায, হজ্জ

১-২. পুস্তকের শেষাংশে পরিশিষ্ট দেখুন।—অনুবাদক।

২ মাআছিরুল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৬১৯ পৃ.।

৩. দাবিস্তানে মাযাহিব, পৃ. ৩০০।

৪. মাবলাগুর-রিজাল, পৃ. ২৫ক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান, মওলানা আযাদ সংগ্রহ, মওলানা আযাদ লাইব্রেরী, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়।

ও কুরবানীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।[১] রমযান মাসের নাম রেখেছে "মাহে গুরুসঙ্গী ও তিশনাগী"। পাক-পবিত্রতা অর্জন ও গোসলের মসলা-মাসাইল নিয়েও তারা হাসি-মস্করা করে[২] এবং চিরন্তন হারাম-এর হুরমতকেও তারা সমর্থন করে না। তারা কুরআন-হাদীস তথা ওয়াহী-নির্ভর জ্ঞান স্বীকার করে না এবং তারা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের জোর সমর্থক।[৩]

এই ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় মাহমূদ পীসখাওয়ানীকে।[৪] হিজরী দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও ইরানের হাজার হাজার লোককে এই ফের্কা প্রভাবিত করে এবং ইরানে এর অনুসারীদের সংখ্যা হাজার হাজারে গিয়ে পৌঁছে।

নুকতাবীদের আকীদা ছিল এই যে, সৃষ্টির আদি থেকে মাহমূদ পীসখাওয়ানী পর্যন্ত আট হাজার বছরের মুদ্দত হয়। এই গোটা সময়কাল ছিল আরবদের নেতৃত্বের সময়। কেননা এই মুদ্দতে তথা সময়পর্বে পয়গম্বর কেবল আরবেই জন্মেছে।

মাহমূদ পীসখাওয়ানীর আবির্ভাব থেকে আরবদের নেতৃত্ব খতম হয়ে গেছে।[৫] অতএব আগামী আট হাজার বছর পর্যন্ত পয়গম্বর অনারবদের মধ্যেই

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত ঃ এই নিবন্ধে অধ্যাপক মুহাম্মদ আসলামের "দীন-ই ইলাহী আওর উস্‌কা পাস মানজার" নামক গ্রন্থ, অধিকন্তু আলীগড় মুসলিম য়ূনিভার্সিটির ড. নাযীর আহমদের "তারীখী ও আদবী মুতালি" নামক গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য দ্র. নুকতাবীয়া য়া পীসখাওয়ানীয়া" ড. সাদিক কায়া।

৪. মাহমুদ পীসখাওয়ানী অথবা পেসখানী গিলানী আস্ত্রাবাদ নামক স্থানে হিজরী ৮০০ সনে এই নতুন ধর্মের ঘোষণা দেন। ৮৩২ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। এই ফের্কার বুনিয়াদ স্থাপিত হয় হিজরী নবম শতাব্দীর একেবারে প্রথম ভাগে। ক্রমান্বয়ে তা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এমনকি দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইরান ও ভারতবর্ষে এই ফের্কার অনুসারীদের সংখ্যা হাজার হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই ফের্কাকে মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী), তানাসুখিয়া ও যিন্দীক নামে ইরানী ঐতিহাসিক ও মুসলিম লেখকগণ স্মরণ করেছেন এবং যেহেতু মাহমূদের প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি মাটি থেকেই হয়েছে এবং মাটিকে নুকতা বলে অথবা এ জন্য যে, সে কুরআনের মতলব (অর্থ, মর্ম) কে স্বীয় ধারণাকে ব্যক্ত করার মধ্যে হরফ ও নুকতার সংখ্যা থেকে সাহায্য নিয়েছে সেজন্য এই ফের্কাকে নুকতাবী অথবা আহলে নুকতা বলা হয়।

৫. মাহমুদ কিংবা তার কোন অনুসারীর কবিতা ঃ

رسید نوبت رندان عاقبت محمود

گذشت انکه که عرب طعنه بر عجم میزد

জন্ম নেবেন।[১]

নুকতাবীদের ধর্ম বিশ্বাস, যার কিছুটা বর্ণনা এখানে দেওয়া হল, বুনিয়াদী ও বিপ্লবাত্মক গুরুত্বের অধিকারী (এবং আমাদের এই আলোচনা ও মুজাদ্দিদ সাহেবের তাজদীদী তথা পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে)। তাদের বিশ্বাস মতে, "ইসলাম ধর্ম মনসুখ হয়ে গেছে। এজন্য মাহমুদের আনীত দীন কবুল করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।" ইসলাম ধর্মের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন নতুন দীন আবশ্যক।[২] দশম শতাব্দীর এই আকীদার আবির্ভাব ও ঘোষণা পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে, তারা এই সহস্রাব্দ আকীদার সমর্থক এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে তাদের মিশন জোরেশোরে শুরু করতে যাচ্ছিল। শাহ 'আব্বাস সাফাবী ইরানে নুকতাবী ধর্ম অনুসরণের অভিযোগে হাজার হাজার নুকতাবীকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেন। এ ব্যাপারে শাহ তাঁর পূর্ববর্তী শাহদের তুলনায় অধিকতর কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাদশাহ্‌র দৃষ্টিতে এদের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক আর কোন দল ছিল না। অনন্তর ১০০৩ হিজরীতে তিনি তাদের বিরাট সংখ্যককে পাইকারী হত্যা করেন। এই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে বহু নুকতাবী জীবন বাঁচিয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। এদের মধ্যে মওলানা হায়াতী কাশীও ছিলেন যিনি দু'বছর বন্দী থাকার পর শীরায আসেন এবং ৯৮৬ হিজরীতে কিছু দিন দেশে কাটিয়ে শেষাবধি ভারতবর্ষে চলে আসেন। ৯৯৩ হিজরীতে তিনি আহমদ নগরে বর্তমান ছিলেন। শরীফ আমেলী নামক একজন আলিম এই ফেরকার নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি তার সময়কার কঠোরতার দরুন অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষে চলে এসেছিলেন। সম্রাট আকবর তার সঙ্গে পীরের মত ব্যবহার করতেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা যে, মীর শরীফ আমেলীই মাহমুদ পীসখাওয়ানীর লেখা থেকে প্রমাণ পেশ করে সম্রাট আকবরকে নতুন ধর্ম প্রবর্তনে উৎসাহিত করেন। তিনি মাহমুদের ভবিষ্যদ্বাণী বিবৃত করেন যে, ৯৯০ হিজরীতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যে বাতিল ধর্ম মিটিয়ে দীনে হক কায়েম করবে।

ঐতিহাসিক বদায়ূনী ও খাজা কিলাঁ[৩] উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে, শরীফ আমেলী ইরান থেকে পালিয়ে এসে শায়খ হুসায়ন খাওয়ারিযমীর পৌত্র মাওলানা মুহাম্মদ যাহিদের খানকাহে আশ্রয় নেন এবং সূফীদের মত থাকতে লাগেন।

---

১. দাবিস্তানে-মাযাহিব, ৩০১ পৃ,।

২. ঐ পৃ. ৩০০।

৩. مبلغ الرجال-এর গ্রন্থকার খাজা বাকী বিল্লাহর পুত্র খাজা উবায়দুল্লাহ।

যেহেতু তার স্বভাবের সঙ্গে দরবেশীর কোন সম্বন্ধ ছিল না বিধায় তিনি গালগল্প, নির্লজ্জ আচরণ ও বেহায়াপনাকে অবলম্বন বানান। মওলানা যাহিদ যখন তার আকীদা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখনই তাকে খানকাহ থেকে বের করে দেন এবং শরীফ আমেলী দাক্ষিণাত্যে গমন করেন।

দাক্ষিণাত্যে তখন শী'আদেরই রাজত্ব চলছিল। লোকে শরীফ আমেলীকে শী'আ আলিম ভেবে লুফে নেয়। কিন্তু তারা যখন তার আকীদা সম্পর্কে জানতে পারল তখন তারা ক্ষেপে গেল। বদায়ূনীর ভাষায় ঃ

"দাক্ষিণাত্যের শাসক তার অস্তিত্বই শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেন যে, তাকে গাধার পিঠে বসিয়ে জনসমক্ষে তার মুখোশ তুলে ধরা হবে।"[১]

সম্রাট আকবর তাকে এক হাজারী মনসব প্রদান করে তার নৈকট্য-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন[২] এবং বাংলায় তাকে দীন-ই ইলাহীর দাঈ নিযুক্ত করেন। সে ছিল সম্রাট আকবরের চারজন একান্ত বন্ধুদের অন্যতম। দীনে ইলাহীর মুরীদ-মু'তাকিদ (ভক্ত-অনুরক্ত)-দের সামনে সে আকবরের প্রতিনিধিত্বও করত।[৩] মা'আছিরুল-উমারা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি তাসাওউফ ও ইলমে মারিফাত হাসিল করেছেন এবং এগুলোকে কুফরী ও খোদাদ্রোহিতার সাথে ঘুলিয়ে ফেলেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুকেই আল্লাহ বলে দাবি করেছেন।

আবুল ফযল আল্লামী সম্পর্কে কতক সমসাময়িক ঐতিহাসিকের বর্ণনা যে, তিনি নুকতাবী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। শাহ 'আব্বাস সাফাবী নসরাবাদ কাশানে বিশিষ্ট নুকতাবী দা'ঈ ও যিম্মাদার মীর সায়্যিদ আহমদ কাশীকে যখন হত্যা করেন তখন তার কাগজের স্তূপের ভেতর যে সব নুকতাবীর চিঠিপত্র পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে আবুল ফযলের একটি চিঠিও ছিল। সমকালীন ঐতিহাসিক ইস্কান্দার মুনশী তদীয় "তারীখ 'আলম আরাঈ 'আব্বাসী" গ্রন্থে বলেন ঃ

"ভারতবর্ষ থেকে গমনাগমনকারীদের থেকে জানতে পারলাম যে, শায়খ মুবারকের পুত্র ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আবুল ফযল আকবরের দরবারে সম্রাটের নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন এবং সেও এই ধর্মের একজন অনুসারী। সে

১. মুনতাখাবুত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃ.।
২. مبلغ الرجال ৩২ পৃ.।
৩. মুনতাখাব, ২য় খণ্ড, ২৪৫-২৪৮ পৃ.।

সম্রাট আকবরকে উদারচিত্ত বানিয়ে শরীয়তের রাস্তা থেকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। মীর আহমদ কাশীকে লিখিত তাঁর পত্র থেকে যা মীর কাশীর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল, প্রমাণিত হয় যে, সে নুকতাবী ছিল।"[১]

খাজা কিলাঁ তদীয় مبلغ الرجال গ্রন্থে মাহমুদ পীসখাওয়ানীর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

شيخ ابو الفضل ناگوری بساط آں آئین خسارت قریں را در مملکت هندوستان گسترد

শায়খ আবুল ফযল নাগোরী সেই ক্ষতিকর আইনকে ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এই সব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের পর অনুমিত হয় যে, নুকতাবী ফের্কা অথবা আন্দোলনের দা'ঈ ও পতাকাবাহিগণ ভারতবর্ষে এসে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের জন্য নতুন যুগ, নতুন ধর্ম ও নতুন আইন-এর জন্য কিভাবে এক সিংহাসন ও মসনদ তৈরী করে রেখেছিল যার উপর সমাসীন হবার জন্য একজন এখতিয়ারসম্পন্ন ও শক্তিশালী উপযোগী ব্যক্তিত্বের দরকার ছিল আর এজন্য তাদের দৃষ্টিতে আকবরের চেয়ে সর্বাধিক যোগ্য আর কেউ ছিল না।[২]

---

১. تاریخی و ادبی مطالع নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২৬৯ পৃ. — ایك طائرانه نظر فرقه نقطوی پر নামক নিবন্ধ থেকে গৃহীত, ডঃ নাযীর আহমদের

২. مبلغ الرجال ৩১-৩২ ও ৩৩ দ্র.।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকবরের শাসনামল এবং তাঁর পরস্পর বিরোধী শাসনকাল

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় ও মযহাবী জীবন

ভারতবর্ষের সমস্ত ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, সম্রাটের সিংহাসন লাভ এবং প্রাথমিক শাসনামল কেবল একজন গোঁড়া বিশ্বাসী মুসলমান হিসাবেই শুরু হয়নি, বরং নির্মল আকীদা, ধর্মের প্রতি অতি মাত্রায় আকর্ষণ ও আগ্রহের মাঝ দিয়েই সূচনা ঘটেছিল। একথা প্রমাণের জন্য আকবরের শাহী দরবারের বিখ্যাত লেখক ও আলিম এবং আকবরের শাসনামলের ইতিহাস লেখক মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনী (মৃ.১০০৪ হি.)-র ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ' থেকে বাছাই করে আকবরের শাসনামলের এই যুগের কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং সম্রাটের অবস্থাদি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যখন তিনি পূর্বসুরীদের মতই একজন সাদা-সিধা ও সৎ আকীদাসম্পন্ন মুসলমান ছিলেন এবং দীনী তা'লীম তথা ধর্মীয় শিক্ষা, বরং বলা চলে আদৌ কোন লেখাপড়ার সুযোগ না ঘটায়, পরিবেশের প্রভাব এবং আপন যুগের প্রথা মাফিক (যার ভেতর পীর-বুযুর্গ ও তাঁদের মাযার সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি, সীমাতিরিক্ত সু-ধারণা ও বিশ্বাস এবং বিদ'আতের ব্যাপক প্রচলন ছিল) বুযুর্গদের মাযারে লম্বা-চওড়া সফর করতেন, বদ'আকীদা এবং সর্বসাধারণ যে আকীদা পোষণ করত তার বিরোধী আকীদা পোষণের অভিযোগে কঠোর সাজা দিতেন,আল্লাহর ওলীদের মাযারে নযর-নিয়ায প্রদান করতেন,স্বয়ং গভীর আত্মনিমগ্নতার সাথে যিকর-এ মশগুল থাকতেন, 'আলিম ও সালিহ্ বান্দাদের সাহচর্যে সময় অতিবাহিত করতেন এবং সামা'র মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন।

আকবরের দীনদারী এবং ধর্মের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহের সাক্ষ্য মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনীর বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কেননা এ ব্যাপারে সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত এবং এথেকে বরং

আকবরের প্রশংসাই বেরিয়ে আসে। আর এ ব্যাপারে মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনীর ইতিহাস ও রচনার মধ্যে কোন রকম বিরোধিতামূলক আবেগের কাজ করা কিংবা শত্রুতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আকবরের জীবনের অপরাংশ (দীন-ই ইলাহীর আদর্শ প্রচার, সমস্ত ধর্মই মূলত এক—এই আকীদা-বিশ্বাস, ইসলাম থেকে দূরত্বে অবস্থান ও ভীতি, অপরাপর ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত আনুকূল্য পোষণ ও উদারতা প্রদর্শন এবং ইসলাম সম্পর্কে বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনীর বিবরণ উদ্ধৃত করতে (যার সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং এসবের ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার ব্যাপারে এর শেষ বছরগুলোতে কতিপয় মহলের পক্ষ থেকে বিরাট সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছে)[১] সতর্কতা অবলম্বন করব এবং কেবল এককভাবে তাঁর বর্ণিত বিবরণের উপরই নির্ভর করব না,বরং এগুলো আকবরের সাম্রাজ্যের নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, দরবারের ইতিহাস লেখক এবং সেই যুগের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিবরণ ও সাক্ষ্য এর সমর্থনে পেশ করব। মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ-এর নিম্নোক্ত বিবরণসমূহ দেখুন ঃ

---

১. আকবরের শাসনামলের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর বর্ণিত বিবরণ ও সাক্ষ্যকে তাঁর ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব এবং আকবরের সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও বিরোধিতা হিসেবে চিত্রিত করে তাঁর 'মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ' নামক গ্রন্থটিকে ক্ষতযুক্ত ও অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করবার জন্য বিগত বছরগুলো থেকে যে অভিযান শুরু হয়েছে তার কোন সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এই অভিযোগের ভিত্তিও কেবল আবেগনির্ভর এবং সম্রাট আকবরের মর্যাদা রক্ষা ও তাকে সব ধরনের অভিযোগ থেকে মুক্ত করার প্রেরণা (যা বিশেষ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, যুগ ও পরিবেশের ফল এবং একটি উদ্দেশ্যের অধীনে ইতিহাস চর্চার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া), কুধারণা পোষণ ও Negative দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। কেউ যদি খোলা মন নিয়ে মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ অধ্যয়ন করেন তবে তিনি লেখকের নিষ্ঠা ও সততা, হৃদয়ের সবটুকু দরদ ও বেদনা এবং নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলার সৎ সাহসের স্বীকার না করে পারবেন না। যিনি ব্যাপকভাবে ইতিহাস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন তার মধ্যেই ইতিহাস ও রূপকথার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, গ্রন্থকার ও তাঁর গ্রন্থের মান অনুধাবনের যোগ্যতা পয়দা হয়ে যায় এবং তিনি স্বয়ং পোদ্দারের মত আসল ও নকলের পার্থক্য বুঝতে পারেন।

   এলিট 'মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ' পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেন যে, ঘটনার বিবরণ দানকারী হিসাবে এমন খুব কম লেখকই আছেন যিনি বদায়ূনীর মত নিজের আবেগের প্রকাশ ঘটাতে চান, বিশেষত যিনি শাহী কর্ণের পক্ষে বিস্বাদ ও অমনোরম এবং যিনি স্বীয় ভ্রান্তি ও পদস্খলন এত খোলাখুলি ও বেপরোয়াভাবে বলতে পারেন (এলিট, ৫ম খণ্ড,৪৮০ পৃ.)।

"শাহযাদা সলীমের জন্মলাভে শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট পায়ে হেঁটে আজমীর সফর করেন, প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীতে ছাউনি ফেলেন এবং দিল্লীর আওলিয়ায়ে কেরামের মাযারসমূহ যিয়ারত করেন।"[১]

"আজুদহন গিয়ে হযরত শায়খুল মাশায়েখ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকরের মাযার যিয়ারত করেন এবং মীর্যা মুকীম ইসফাহানীকে মীর ইয়াকূব কাশমীরীর সাথে রাফিযী [হযরত আলী (রা)-র বিরোধী] হবার অভিযোগে শাস্তি দেন।"[২]

"শা'বান-এর প্রথম দিকে সম্রাট আজমীর সফর করেন। সাত ক্রোশ দুর থেকে খালি পায়ে হেটে মাযারে উপস্থিত হন। নাকাড়া বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠান, আল্লাহওয়ালা, 'উলামা ও সালিহ্ বান্দাদের সাহচর্যে অবস্থান করেন এবং 'সামা'র মহফিল সরগরম থাকে।"[৩]

"ইবাদতখানায় "ইয়া হূ" এবং "ইয়া হাদী"র যিকরে মগ্ন থাকতেন" (৯৮০ হিজরীতে ইবাদতখানার তিন ইমারত নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ)।[৪]

"ইবাদতখানায় প্রতি জুমু'আর রাত্রে সৈয়দ ও মাশায়েখ,'আলিম-'উলামা ও আমীর-উমারা ডেকে পাঠানো হত। সম্রাট স্বয়ং একটি মজলিসে যোগ দিতেন এবং মসলা-মাসাইলের আলোচনা করতেন।"

"এযুগেই কাযী জালাল এবং অপরাপর 'আলিমদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন কুরআন পাকের তফসীর বয়ান করেন।"[৫]

"৯৮৬ হিজরীর ঘটনা বর্ণনায় ফতেহপুর সিক্রীতে ইবাদতখানায় উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখে ইজামের সাহচর্যে জুমু'আর রাত্রে শবে বেদারী (রাত্রি জাগরণপূর্বক ইবাদত-বন্দেগী)-র আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।"

"যখন খান যামান সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন তার মুকাবিলায় বহির্গত হবার পূর্বে সম্রাট দু'আ লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লীর সমস্ত আও-লিয়ায়ে কিরামের মাযারে হাযিরা দেন।"[৬]

"মাহাম আঁকা কর্তৃক নির্মিত মাদরাসা খায়রু'ল-মানাযিলের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করবার সময় ফূলাদ নামক জনৈক ব্যক্তি (শরফুদ্দীন হুসায়ন-এর ইঙ্গিতে) সম্রাটকে হত্যার উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করে। সম্রাট সামান্য আহত হন

১. মু. তা. ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃ.।
২. ঐ, ১২৪ পৃ.।
৩. ঐ, ১৮৫ পৃ.।
৪. ঐ, ২০০ পৃ.।
৫. ঐ, (২য় খণ্ড) ২১১ পৃ.।
৬. ঐ, ২৫২ পৃ.।

এবং কয়েকদিনের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই অতর্কিত হামলায় বেঁচে যাওয়াকে তিনি 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সতর্ক সংকেত এবং দিল্লীর হযরত পীরান পীরদের কারামত হিসাবে গণ্য করেন।"[১]

"একবার আজমীর যাবার পথে সেযুগের মশহুর বুযুর্গ শায়খ নিজাম নারনূলীর, যাঁর যুহ্দ ও তাকওয়ার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, খেদমতে হাযির হন।"[২]

"৯৮০ হিজরীতে আজমীরে সায়্যিদ হুসায়ন খাঙ্গ সওয়ারের মাযারে এবং কয়েক বছর পর হাঁসীতে হযরত কুত্ব জামালের মাযারে অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে হাযির হয়ে ফাতিহা পাঠ করেন।"[৩]

"শায়খ সলীম চিশতীর সঙ্গে সম্রাটের গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তাঁর রওযা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্মাণ করান এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাবশত সম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী (জাহাঙ্গীর)-এর নাম রাখেন সলীম। কথিত আছে যে, শায়খ সলীম চিশতীর দু'আর বরকতে শাহ্যাদা সলীমের জন্ম হয়। সম্রাট শাহ্যাদা সলীমের জন্মের পূর্বে রাণী যোধা বাঈকে শায়খ সলীম চিশতীর মহলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে রাণী তাঁর তাওয়াজ্জুহ ও দু'আ সার্বক্ষণিকভাবে লাভ করতে পারেন।"[৪]

"ঠিক তেমনি শাহ্যাদা মুরাদের জন্মও শায়খ-এর ঘরেই হয়েছিল।"[৫]

"শাহ্যাদা সলীম মকতবে যাবার উপযুক্ত হতেই তাঁর" বিসমিল্লাহ্ খানি" অনুষ্ঠানের জন্য সেযুগের মশহূর মুহাদ্দিছ মওলানা মীর কালাঁ হারাবীকে ডেকে আনা হয় এবং তিনি সম্রাট ও তাঁর সভাসদবর্গের উপস্থিতিতে শাহ্যাদাকে বিসমিল্লাহ্ খানি করান।"[৬]

"লেখাপড়া শেখার উপযুক্ত হতেই শাহ্যাদাকে শায়খ আবদুন নবীর ঘরে গিয়ে তাঁর নিকট হাদীসের তা'লীম হাসিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। শাহ্যাদা মওলানা জামীর 'চল্লিশ হাদীস' (চিহিল হাদীস) তাঁর নিকট পড়েন।"[৭]

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ২৬২ পৃ.।
২. ঐ. ২৫২ পৃ.।
৩. ঐ. ২৩২ পৃ.।
৪. ঐ. ১০৮ পৃ.।
৫. ঐ, ১২৩ পৃ.।
৬. ঐ. ১৭০ পৃ.।
৭. ঐ. ৩০৪ পৃ.।

সম্রাট আকবর শায়খ আবদুন নবী (হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গূহীর দৌহিত্র এবং আকবরের শাসনামলের সদর জাহান)-র প্রতি এতটাই ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে, তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর দরসে যোগদান করতেন। দু'-একবার তাঁর জুতাও সোজা করেছেন।"[১]

"সম্রাট তাঁর জন্য শাহী কারখানায় বিশেষভাবে দোশালা তৈরী করিয়েছিলেন এবং মোল্লা আবদুল কাদির-এর হাতে তাঁর খেদমতে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনার জন্যই এটা শাহী কারখানায় তৈরী হয়েছে।"[২]

"ঐ আমলের মশহূর শাত্তারী শায়খ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়ারীর ভরণ-পোষণের জন্য এক কোটি মুদ্রা মূল্যের বার্ষিক রাজস্বের জায়গীর নির্দিষ্ট করেন। তাঁর ইনতিকালের পর তৎপুত্র শায়খ যিয়াউল্লাহ্র সঙ্গেও তিনি একইরূপ বিনয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখেন।"[৩]

"বুযুর্গদের সঙ্গে এ ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কে রক্ষা করে চলার এই ঐতিহ্য আকবর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর তৈমূরীয় পূর্বপুরুষ খাজা নাসিরুদ্দীন উবায়দুল্লাহ আহরার-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বাবর (প্রথম মুগল সম্রাট)-এর পিতামহ সুলতান আবু সাঈদ পায়ে হেটে তাঁর খেদমতে গমন করতেন এবং তাঁর পরামর্শ ব্যতিরেকে তিনি কোন কাজই করতেন না। বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্যারও খাজা সাহেবের সঙ্গে ভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। স্বয়ং বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে অত্যন্ত সসম্মানে তাঁর আলোচনা করেছেন। আকবরের বংশের নারী ও বেগমদের বৈবাহিক সম্পর্ক নক্শবান্দিয়া খান্দানের সঙ্গে হয়। হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের বংশের একজন বুযুর্গ খাজা ইয়াহইয়া ভারতবর্ষে আগমন করলে সম্রাট আকবর তাঁকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন, তাঁর ব্যয় নির্বাহের জন্য জায়গীর প্রদান করেন, তাঁকে হজ্জ প্রতিনিধি দলের আমীর নিযুক্ত করে মক্কা মুকার্রামায় পাঠান। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে স্থায়ীভাবে আগ্রায় বসবাসের ব্যবস্থা করেন।"[৪]

"আকবর সপ্তার সাত দিনের জন্যই সাত জন ইমাম নিযুক্ত করে রেখেছিলেন যাঁরা পালাক্রমে নির্ধারিত দিনে নামাযের ইমামতি করতেন। বুধবার দিনের ইমামতির দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর উপর।"[৫]

১. মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ. ২৩৭ পৃ.
২. ঐ. ২০২ পৃ.
৩. ঐ, ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃ.।
৪. ঐ. ২৫১ পৃ.।
৫. ঐ, ২০৪ পৃ.।

"প্রতি বছর এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে সরকারী খরচে হজ্জে পাঠাতেন। আমীরু'ল-হাজ্জের হাতে মক্কার শরীফের জন্য তোহফা এবং হারাম এলাকার অধিবাসীদের জন্য নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী পাঠাতেন।"[১] "হজ্জ কাফেলা রওয়ানা হবার দিন হাজীদের মত ইহরাম বেঁধে মাথার চুল কিছুটা ছেটে কেটে তকবীর বলতে বলতে খালি মাথায় ও নগ্নপদে বহুদূর অবধি তাদেরকে বিদায় জানাতে গমন করতেন। এই দৃশ্যে এক শোরগোল সৃষ্টি হত এবং লোকের চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠত।"[২]

শাহ আবূ তুরাব যখন হেজায থেকে ভারতবর্ষে কদম রসূল [রসূল (সা)-এর পবিত্র পদ-চিহ্ন] নিয়ে আসলেন এবং আগ্রার কাছাকাছি পৌঁছুলেন তখন সম্রাট তাঁর অমাত্যবর্গ ও একদল আলিম-'উলামা সমভিব্যাহারে শহর থেকে চার ক্রোশ বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।[৩]

পরিশেষে আমরা তাঁর দীনদারীর সাক্ষ্য মুগল শাসনামলের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মীর আবদুর রাযযাক খাফী খান, যিনি সামসামুদ্দৌলা শাহনওয়ায খান নামে পরিচিত (১১১১-১১৭১ হি.),-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাআছিরু'ল-উমারা'য় লিখিত নিম্নোক্ত বিবরণের উপর সমাপ্ত করছি। তিনি লিখছেন ঃ

اکبر بادشاہ بہ ترغیب شیخ در اجراء احکام شرعی و امر معروف و نہی منکر فراواں جہد می فرمود وخود اذان می گفت وامامت می کرد حتی بقصد ثواب بمسجد جاروب می زد -

"সম্রাট আকবর শরীয়তের বিধি-বিধান, সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে খুবই চেষ্টা চালাতেন। স্বয়ং আযান দিতেন এবং ইমামতি করতেন। এমনকি ছওয়াবের নিয়তে মসজিদ ঝাড়ুও দিতেন।"[৪]

আকবরের মেযাজে পরিবর্তন এবং তাঁর শাসনামলের দ্বিতীয় যুগ[১]

সম্রাট আকবরের দীনদারী ও ধর্মপ্রীতির যে উদাহরণ উপরে দেওয়া হল পাঠক এর থেকে পরিমাপ করতে পারবেন যে, তা ছিল এমন এক ধরনের ভাসাভাসা ধরনের ধর্মবোধ যার বুনিয়াদ দীনের সহীহ্ সমঝ বা যথার্থ উপলব্ধি,

১. মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ.২৫১ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ২৩৯।

৩. মাআছিরু'ল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৫৬১ পৃ.।

৪. বলা হয় যে, জাহাঙ্গীর তাঁর জীবনীতে সম্রাট আকবরের ইনতিকালের যে বিবরণ রেখে

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে অবহিতি এবং সরাসরি ইল্‌ম ও অধ্যয়নের উপর ছিল না। বিজ্ঞ আলিমদের তা'লীম এবং সহীহ্ দীনী সুহবত ও তরবিয়ত তথা সঠিক ধর্মীয় সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হবার পরিবর্তে যুগের রুচি, সিপাহীসুলভ মেযাজ এবং মধ্য এশিয়ার ধর্ম সম্পর্কে অনবহিত আমীর-উমারা ও ক্ষমতাধিকারীদের অনুসরণ ও অনুকরণ এবং তা সুধারণা নয় বরং দুর্বল 'আকীদা-বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ছিল। আর এই দীনদারীর প্রধান অঙ্গসমূহ ছিল মাযারে হাযিরা দেওয়া, ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেটে মাযারে যাওয়া, সেখানকার গদ্দীনশীন-এর সঙ্গে (যারা অধিকাংশই হত 'ইল্‌ম বর্জিত মূর্খ, পূর্বপুরুষের গুণাবলী ও কামালিয়াত থেকে সহস্র যোজন দূর এবং বিশুদ্ধ রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতা শূন্য) স্বীয় বিনয়-নম্রতা ও আত্মোৎসর্গের প্রকাশ, খানকাহ্‌র ঝাড়-মোছ, যিক্‌র ও সামা মাহফিলে যোগদান, দরবারী ও সরকারী 'আলিম-উলামা' ও শায়খদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আকবরের জীবনী থেকে পূর্বেই আমরা জেনে গেছি যে, তিনি একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন।[২] তায়মুরী বংশের মেযাজের ভেতর সাধারণভাবে সীমাতিরিক্ততা, চরম পন্থাপ্রিয়তা ও মাত্রাতিরিক্ত সুধারণা অনুপ্রবিষ্ট ছিল। হুমায়ূন সম্পর্কে ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, পরিশ্রমের ক্ষেত্রে, যুদ্ধের ময়দানে, কষ্টসহিষ্ণুতায় ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলায় তাঁকে মনে হত তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ নন, বরং ইস্পাতে গঠিত। তিনি মানুষ নন, জিন্ন। কিন্তু তিনি যখন আরাম কিংবা বিশ্রামে যেতেন অমনি

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) গেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সেসময় তাঁর নিকট সূরা ইয়াসীন ও দু'আ পড়া হচ্ছিল। এ ব্যাপারে আমরা কোন আলোচনা করতে চাইনা, আল্লাহ তার সঙ্গে কি আচরণ করেছেন এবং তিনি কোন্ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আমরা তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী যা তিনি নতুন ধর্ম ও আইন জারী করতে গিয়ে করেছিলেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর তা কি কুফল বয়ে এনেছিল।

১. আকবরের চার বছর চারমাস চার দিন বয়সে প্রথা মাফিক মকতবে পাঠাবার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং মোল্লাযাদা 'ইসামুদ্দীন ইবরাহীম তাঁর গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি টের পান আকবরের লেখাপড়ার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। একে শিক্ষকের ব্যর্থতা ও অমনোযোগিতা হিসাবে ধরা হয় এবং শিক্ষক হিসেবে মোল্লাযাদার পরিবর্তে মওলানা বায়েযীদ নিযুক্ত হন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। শেষে সম্রাট মওলানা বদায়ূনীকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু এতেও শাহযাদার মন-মানসিকতা লেখাপড়ার প্রতি আকৃষ্ট হল না। রাজনৈতিক অবস্থা এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রতিদিনের স্থান পরিবর্তনে পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে। আকবরের লেখাপড়া শেখার প্রয়াস নিষ্ফল হয় এবং তিনি নিরক্ষরই থেকে যান। সংক্ষিপ্ত-তাওয়ারীখ আহদে আকবরী।

সব ভুলে যেতেন। তখন বোঝাই যেত না তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের একজন অকুতোভয় সিপাহী। তদীয় পৌত্র জাহাঙ্গীরের মধ্যেও এই বৈপরিত্য ও ভারসাম্যহীনতা দৃষ্টিগোচর হবে।

অতঃপর একথা বিস্মৃত হওয়াও ঠিক হবে না যে, যেই প্রতিকূল ও অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর দিয়ে তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল, পিতৃব্যদের যেই মনুষ্যত্বহীনতা, হৃদয়হীনতা ও ভীরুতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং যে তিক্ত বরং বিষাক্ত ঢোক তিনি তাঁর পিতার পরাজয় ও ইরান সফরকালে গিলে ছিলেন, অতঃপর বৈরাম খানের সাথে যা কিছু ঘটেছিল এ সবই তাঁর তবিয়তে মানবীয় প্রকৃতির দিক থেকে বদগুমানী, বড় থেকে বড় এবং ভাল থেকে ভাল লোকের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় এবং মেযাজে এক ধরনের তিরিক্ষি (تلون) ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

বিভিন্ন ধর্মের মাঝে তুলনা ও গবেষণা, বিতর্ক সভা এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

এই অবস্থার সংস্কার ও সংশোধন, এ সব দুর্বলতার উপর তাঁর জয়লাভ করা এবং তাঁকে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা বরং বহু মুসলিম সুলতানের মতই (যাদের মধ্যে কতক তাঁর বংশেই জন্ম হয়েছে) দীনের সমর্থক ও মদদগার বানিয়ে রাখবার জন্য উপযোগী সূরত এই হতে পারত যে, সম্রাট আকবর এই বাস্তব সত্য স্বীকারপূর্বক যে, তিনি অক্ষরজ্ঞানহীন অশিক্ষিত, (আর এটা এমনই এক দুর্বলতা যে, সম্রাট বাবর থেকে বাহাদুর শাহ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের আর কোন সম্রাটকেই এমনটি পাওয়া যায় না) সাম্রাজ্য জয়ের অভিযান এবং রাজ্যের বিস্তৃতির দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতেন যার অসাধারণ যোগ্যতা ও খোদাপ্রদত্ত প্রতিভা তাঁর ভেতর ছিল এবং ধর্মীয় বিষয়াদিতে তিনি হস্তক্ষেপ না করতেন; বরং একজন সহজ সরল ও সাদাসিধে মুসলমান ও সৈনিকের মতই ধর্মীয় ব্যাপারগুলোকে 'আলিম-'উলামা' এবং সাম্রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী অমাত্যবর্গের হাতে সোপর্দ করতেন, বাবর ও হুমায়ূন (শিক্ষিত এবং সাহিত্যিক রুচি থাকা সত্ত্বেও) যেমনটি করেছিলেন, বিশেষত নাযুক 'আকীদাগত ও কালামশাস্ত্রীয় মসলাগুলো, নানা ধর্মের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অদৃশ্য তথা গায়বী লোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে গবেষণা ও বিশ্লেষণের ময়দানে টেনে না আনতেন যেখানে সামান্যতম ভুল কিংবা অসতর্কতায় মানুষ কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার সীমায় প্রবেশ

করে এবং দীন ও ঈমানের পুঁজি খুঁইয়ে বসে, যার ক, খ জ্ঞান তথা প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কেও আকবর স্রেফ অজ্ঞ ছিলেন, যা রাজনৈতিক স্বার্থ এবং এমন একজন সম্রাটের স্বার্থেরও পরিপন্থি ছিল, যিনি চারশ' বছরের মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এই রূপ নাযুক আকীদাগত ও কালাম শাস্ত্রীয় মসলার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা এবং এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহারের মত ভুল খলীফা মামুনুর রশীদ (১৭০ হি.-২১৮) -এর মত একজন বিজ্ঞ 'আলিম ও ক্ষণজন্মা খলীফার পক্ষেও আনুকুল্য বয়ে আনে নি এবং তিনি এ থেকে কোন সুফলও লাভ করতে পারেন নি।[১]

কিন্তু আকবর পেয়েছিলেন অস্থির প্রকৃতি এবং সন্দেহপ্রবণ মস্তিষ্ক। এ দিকে অনুপম সৌভাগ্য এবং অব্যাহত সাফল্য ও বিজয় তাঁকে তাঁর নিজের সম্পর্কে কতকটা আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রতারণার শিকারে পরিণত করে দিয়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, তিনি যেভাবে রাজনৈতিক সমস্যা ও জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন এবং রাষ্ট্রীয় সংকটের সমাধান করে থাকেন ঠিক সেভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের কণ্টকপূর্ণ উপত্যকাও অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করতে পারেন।

অপরদিকে দরবারের কতিপয় ধূর্ত অমাত্য কিছুটা নিজেদের মেধাগত শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার জন্য এবং কিছুটা সম্রাটের খেলোয়াড়োচিত স্বভাব ও মজলিসের রৌনক বৃদ্ধির নিমিত্ত মোরগ,মেষ,ষাড় ও হাতীর লড়াই (যা প্রাচ্যের সুলতান ও আমীর-উমারার প্রাচীন ক্রীড়া-কৌতুক ছিল)-এর পরিবর্তে বিভিন্ন ধর্ম ও ফের্কার আলিমদের দঙ্গল কায়েম করেন এবং নাম দেন ধর্মীয় গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা। এ এক নিরেট ও বাস্তব সত্য যে, (আর ধর্ম ও চিন্তার ইতিহাসে এর শতবার অভিজ্ঞতা হয়েছে) যে, যদি এসব বিতর্ক অনুষ্ঠান, আলিম-উলামা ও বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তাদের কথার তুবড়ী ও কচকচানীর শ্রোতা যদি গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের অধিকারী না হন,এর চেয়ে বড় কথা এই যে, আল্লাহ্র তওফীক যদি তার সহগামী না হয় তাহলে তার পক্ষে সন্দেহ ও সংশয়, অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের বিজন উপত্যকায় পথ হারানো কিংবা ধর্মদ্রোহিতা ও কুফরীর গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

সম্রাট আকবর সম্পর্কে পুত্র জাহাঙ্গীরের সাক্ষ্যের চেয়ে আর কারো সাক্ষ্য অধিকতর বিশ্বস্ত হতে পারে না। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ১ম খণ্ড, খাল্‌ক-ই কুরআন-এর ফেতনা।

"ওয়ালেদ মাজেদ প্রতিটি ধর্ম ও মযহাবের জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতেন, বিশেষত ভারতীয় মনীষী ও পণ্ডিতদের সঙ্গে। তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এসব বৈঠকের আধিক্যের দরুন 'আলিম-ফাযিলদের সাথে কথাবার্তায় কেউ তাঁর নিরক্ষরতা ও লেখাপড়া না জানা সম্পর্কে জানতে পারত না। গদ্য ও পদ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ এত ভাল বুঝতেন যার চেয়ে বেশী সম্ভব নয়।"[১]

ইসলাম,হিন্দু ধর্ম এবং ভারতবর্ষের অপরাপর ধর্ম ও ফের্কাগুলোর প্রতিনিধি ও প্রবক্তাদের উপরই এ ব্যাপার সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং এর জের ফিরিঙ্গীদের পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। স্বয়ং আবুল ফযল লিখছেন যে, দরবারের পক্ষ থেকে তওরীত, ইনজীল ও যবুরের তরজমা এবং এ সবের সারমর্ম সম্রাট অবধি পৌছুবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এজন্য দরবারের একজন অমাত্য সায়্যিদ মুজাফফরকে নিযুক্ত করা হয়। কতিপয় খ্রিষ্টান শাসককে পত্র প্রেরণ করা হয়ঃ

"আমরা অবসর সময়ে সকল ধর্মের জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে মিলিত হই এবং তাদের পবিত্র বাণী ও উন্নত চিন্তাধারা থেকে উপকৃত হই। ভাষার অপরিচিতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সেজন্য এমন কাউকে পাঠিয়ে আমাদেরকে আনন্দ দান করবেন যিনি ঐ সমস্ত উচ্চ ভাব ও মর্ম উন্নত ভাষার মাধ্যমে মনে গেঁথে দিতে পারেন। সম্রাট শুনতে পেয়েছেন যে, আসমানী গ্রন্থ তওরীত, যবুর, ইনজীল-এর তরজমা আরবী-ফার্সী ভাষায় হয়েছে। তরজমাকৃত ঐ সব গ্রন্থ যদি এ দেশে থাকে তবে সর্বসাধারণের উপকারার্থে সেগুলো পাঠিয়ে দেবেন। ভালবাসা ও প্রীতিবন্ধনের নবায়ন এবং ঐক্যের বুনিয়াদ মজবুতকরণের ধারণায় জনাব সায়্যিদ মুজাফফরকে (যিনি আমাদের অবদানধন্য) ঐ সব তরজমার কয়েকটি নুসখা (কপি)-র জন্য পাঠানো হল। তিনি আপনাদের সাথে খোলাখুলি কথা বলবেন। আপনি তার উপর আস্থা রাখবেন এবং বরাবর চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।"[২]

তরজমা ছাড়াও স্বয়ং খ্রিস্টান পাদরীরা দরবারে এসে হাযির হয় এবং তারা তাদের ধর্ম সম্রাটের সামনে পেশ করে ত্রিত্ববাদ ও খ্রিস্টধর্ম দলীল-প্রমাণ সহযোগে প্রমাণিত করতে চেষ্টা চালায়। মোল্লা বদায়ূনী লিখেন ঃ

"দরবারে ফিরিঙ্গী মুলুকের সাধু পণ্ডিতদেরও একটি দল ছিল। এদেরকে পাদরী বলা হয়। তাদের বড় মুজতাহিদের নাম পাপা (পোপ)। তারা ইনজীল

১. তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, ১৫ পৃ.।
২. ইনশা-ই আবুল ফযল, ৩৯ পৃ.।

পেশ করে এবং ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ পেশ করত খ্রিস্টবাদকে সত্য ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করে।"[১]

বিতর্ক সভার পুরনো অভিজ্ঞতা এই যে, কোন ধর্মের সত্যতা ও তার শ্রেষ্ঠত্বের সপক্ষে ফয়সালা করার জন্য সর্বদা দলীল-প্রমাণের শক্তি এবং জ্ঞানগত প্রমাণই যথেষ্ট ও চূড়ান্ত হয় না। এর অনেকটাই নির্ভর করে সেই ধর্মের প্রবক্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দের সুতীক্ষ্ণ বাগ্মিতা ও বাকশক্তির উপর। এমনও দেখা যায় যে, একটি কমযোর ধর্মের প্রতিনিধি অধিক বাক-সক্ষম বা বাকপটু, মিষ্টভাষী, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত এবং সুযোগ-সন্ধানী হয়েছে। ফলে তারা শ্রোতাদেরকে প্রভাবিত ও ভক্তে পরিণত করে ফেলেছে। অপর পক্ষে একটি সত্য সঠিক ধর্মের মুখপাত্র (কোন কারণবশত) এ সব বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত এবং ঐসব বাক-অস্ত্রশূন্য হয়েছে আর এসব ক্রটির কারণে প্রতিযোগিতায় সে হেরে গেছে। এতে খুবই সন্দেহ রয়েছে যে, সম্রাট আকবরের দরবারে ইসলামের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করার মত যে সব আলিম ছিলেন তাদেরকে ঐসব বিজ্ঞ ও চতুর ফিরিঙ্গীদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত, তওরীত, ইনজীল ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে যাদের পড়াশোনা এবং এবং সেসবের দুর্বলতা সম্পর্কে জানাশোনা এবং ইসলামকে যুক্তির সাহায্যে ও কার্যকরভাবে পেশ করার যোগ্যতা এমত পরিমাণের ছিল না যদ্দারা তারা এসবকে ঐ সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন এবং ইসলামের মুখপাত্রের হক আদায় করতে পারেন। এ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, সম্রাটের মনে ঐসব বিদেশী খ্রিস্টান পণ্ডিতদের যৌক্তিক ও কার্যকর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং মুসলিম আলিমগণ (যারা এ ময়দানের মর্দে মুজাহিদ ছিলেন না) তাঁর দৃষ্টি পথ থেকে নিম্নে পতিত হন।

এর ফল যা হবার তাই হল। মোল্লা আবদুল কাদির লিখেছেন ঃ

"বিদআতী ও কল্পনাবিলাসী প্রবৃত্তি পূজকরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও অমূলক সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ঘাত থেকে বেরিয়ে আসল এবং বাতিলকে হকের সুরতে এবং ভুল-ভ্রান্তিকে সহীহ-শুদ্ধ আবরণে পেশ করতে লাগল। সত্যপিয়াসী প্রতিভাবান সম্রাটকে, যিনি নিজে একেবারেই অক্ষর-জ্ঞানহীন ছিলেন, কাফিরদের অন্তরঙ্গতা আরও সন্দেহের আবর্তে নিক্ষিপ্ত করল এবং তাঁর বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। ফলে আসল উদ্দেশ্য হল পণ্ড, সম্রাটের উপর থেকে শরীয়তের

---

১. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃ.।

বাঁধন গেল টুটে। অবস্থা এতদূর গিয়ে গড়াল যে, পাঁচ-ছ' বছর পর ইসলামের কোন প্রভাবই আর তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট রইল না এবং ব্যাপারটা গেল একদম পাল্টে।"[১]

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"ধর্মের রুকনসমূহের প্রতিটি রুকন এবং ইসলামী আকাইদের প্রতিটি আকীদা সম্পর্কে, চাই এর সম্পর্ক উসূল তথা মূলনীতির সাথেই হোক কিংবা এর কোন শাখা-প্রশাখার সাথেই হোক—যেমন নবুওত ও কালাম শাস্ত্রীয় মসলা, দীদারে ইলাহী তথা আল্লাহ্‌র দর্শন, মানুষের মুকাল্লাফ (মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী এই মত) হওয়া, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকরণ, হাশর-নশর প্রভৃতি সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সাথে নানা ধরনের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা হতে লাগল।"[২]

এর উপর আরও যা ঘটল তা এই যে, তফসীর ও ইতিহাসের মত নাযুক বিষয় যেখানে আল্লাহ-ভীতিশূন্য ও ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী লোকদের মস্তিষ্কজাত বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টির বিরাট সুযোগ রয়ে গেছে, এই নিরক্ষর সম্রাটের দরবারে হাল্কা ও নিঃশংক পরিবেশে পড়া হতে লাগল।

মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনী অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"এই দিনগুলোতেই কাযী জালাল এবং অপরাপর আলিমদের প্রতি হুকুম হয় যে, তারা কুরআন শরীফের তফসীর বয়ান করবেন। স্বয়ং উলামায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে বেশ দ্বন্দ্ব ছিল। রাজা মনঝুলার ভাঁড় দীপচান্দ বলত যে, যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট গাভী সম্মানিত বিবেচিত না হত তাহলে কুরআনের প্রথম সূরায় তা উল্লিখিত হত না। যখন থেকে ইতিহাস গ্রন্থ পঠিত হতে লাগল তখন থেকে সাহাবা-ই কিরাম (রা) সম্পর্কে লোকের ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস শিথিল হতে লাগল। সম্মুখে গিয়ে নামায, রোযা এবং তামাম ইসলামী শিক্ষামালাকে 'অন্ধ অনুকরণ' নাম দেওয়া হতে লাগল অর্থাৎ এগুলোকে অযৌক্তিক বলা হতে লাগল। দীনের ভিত্তি ওয়াহী ইলাহীর পরিবর্তে যুক্তির উপর রাখা হতে লাগল। ফিরিঙ্গীদের আনা-গোনাও চলতে থাকল। অনন্তর তাদের কোন কোন ধর্ম-বিশ্বাসও গ্রহণ করা হল।"[৩]

---

১. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২৫৫ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ৩০৭ পৃ.।
৩. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২১২ পৃ.।

আকবরের মেযাজ পরিবর্তনে দরবারের আলিম-উলামা ও সাম্রাজ্যের পদস্থ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

সম্রাট আকবরকে ইসলামের সোজা-সরল রাস্তা (সিরাতে মুস্তাকীম)-এর উপর কায়েম রাখা এবং তাঁর মেযাজকে ভারসাম্যহীনতা ও ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে শাহী দরবারের আলিম-উলামা এবং সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গ বিরাট মৌলিক ও উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারতেন। কিন্তু এর জন্য একদিকে এমন সব 'আলিম-উলামার প্রয়োজন ছিল যাঁরা দীনের হিকমত ও সমঝ-এর ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ছিলেন, যাঁদের দৃষ্টি আংশিকের তুলনায় সামগ্রিকতার প্রতি অধিকতর নিবদ্ধ, উপায়-উপকরণের তুলনায় লক্ষ্যের প্রতি অধিকতর নিবেদিত এবং বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার তুলনায় মিলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে অধিকতর আগ্রহী, যাঁরা উন্নত চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত ও স্বার্থলেশহীন, যাঁরা পদমর্যাদা ও দুনিয়াপ্রীতি থেকে যথাসম্ভব দূরে অবস্থান করবেন এবং যাঁদের একটা পরিমাণে আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়ায়ে নফ্স, আত্মিক পবিত্রতা) লাভ ঘটেছে, যাঁরা এই বিশাল উর্বর শ্যামল মুসলিম সাম্রাজ্যের গুরুত্ব ও মাধুর্য বেশ ভাল রকম উপলব্ধি করতে পারেন যা এই অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি (যাদের ভেতর অদ্যাবধি নিজেদের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা হারাবার অনুভূতি বিদ্যমান এবং যাদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন সাম্রাজ্যই কায়েম থাকতে পারে না) দ্বারা বেষ্টিত এবং অনুভব করতে পারেন এও যে, তাদেরকে যেই তায়মুরী সাম্রাজ্যের খেদমত ও নেতৃত্বের সোনালী ও ঐতিহাসিক সুযোগ মিলেছে তা এই মুহূর্তে তুর্কী উছমানী সাম্রাজ্যের পর বিস্তৃতি, উপকরণের আধিক্য, জনশক্তি এবং ধর্মীয় প্রেরণার কর্তৃত্ব, মোটের উপর সকল দিক দিয়েই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্য বিধায় এর হেফাযত করা, ইসলামের সঙ্গে এর সম্পর্ক কায়েম রাখা, এর শাসককে এসব নাযুক অবস্থায় এই 'লৌহ-সীসা' ও ঐ 'আগুন-তূলা' একত্রে রাখতে সাহায্য করা সময়ের সবচে' বড় ইবাদত এবং দেশ ও ধর্মের সবচে' বড় খেদমত।

অপরদিকে সাম্রাজ্যের এমন সব অমাত্য ও দরবারী উপদেষ্টা মেলাও প্রয়োজন ছিল যারা এই দীন (ইসলাম)-এর উপর [যেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সম্রাট বাবর রানা সঙঘের (৯৩৩ হি.) মুকাবিলায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে শরীয়ত নিষিদ্ধ সকল বস্তু থেকে তওবাহ করে এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবার প্রতিজ্ঞায় নতুনভাবে আবদ্ধ হয়ে রেখেছিলেন][1] নিজেরাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং সম্রাটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ

বিশ্বাসী হওয়াকে পসন্দ করেন, যারা সর্বপ্রকার মানসিক বিপর্যয় ও বিশৃংখলা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এবং ঐসব ধ্বংসাত্মক ও ধর্মদ্রোহী আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থান করেন যা দশম শতাব্দীতে ইরান ও ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং যা ছিল সাম্রাজ্য ও সমাজ দেহের সম্পর্ক দুর্বলকারী, বিশ্বাসগত ও নৈতিক নৈরাজ্য বিস্তারকারী, যাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের শাসন-শৃঙখলা ও আইন প্রণয়নের যোগ্যতার সঙ্গে নৈতিক ও চারিত্রিক সমুন্নতি, ধর্মীয় সংহতি ও দৃঢ়তা এবং মযহাবী পাবন্দীও পাওয়া যায়।

যদি এ দু'টো উপাদান সম্রাট আকবর এবং তাঁর সাম্রাজ্য পেয়ে যেত তাহলে এতে সন্দেহের কোনই কারণ নেই যে, এই সাম্রাজ্য প্রাচ্যে ইসলামের সাহায্য-সমর্থন এবং দীনের খেদমতে সেই কর্ম সম্পাদন করত যা পাশ্চাত্যে তুরস্কের উছমানী সাম্রাজ্য করেছে। ইকবালের ভাষায় ঃ

نہ تھے ترکاں عثمانی سے کم ترکان تیموری

উছমানী তুর্কীদের চেয়ে তুর্কী তৈমুরীগণ কোন দিক দিয়েই অযোগ্য ছিল না।

কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আকবর (তাঁর সৌভাগ্য রবি ও খোশনসীবীর সাথে) এই দু'টো দলের মধ্যে থেকে যাদেরকে পেলেন তারা সংখ্যায় এতই কম যারা এই মানদণ্ডে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন না, বরং দুঃখজনক বিষয় এই যে, তারা এই পর্যায়ে খেদমতের পরিবর্তে বদ-খেদমতী, আকবরকে দীনের কাছে টেনে আনার পরিবর্তে আরও দূরে ঠেলে দেওয়া, দীন-ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিরূপ মনোভাবের উদ্রেক করা এবং ইসলাম বিরোধী দাওয়াত ও আন্দোলন থেকে দূরে রাখা কিংবা সে সবের উৎখাত ও উৎসাদনে উৎসাহিত করার পরিবর্তে তাঁকে ঐসব দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকাবাহী বরং সেসবের খয়ের-খা বানাবার খেদমতে আত্মনিয়োগকারী ছিল।

দরবারী আলিম-'উলামা'

সম্রাট আকবরকে যে দু'টো বস্তু গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার প্রথমটি হল দরবারী আলিম-উলামা। আমরা প্রথমে তাদের নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আকবর প্রথমে তাঁদের ভীষণ ভক্ত ছিলেন, তাঁদের উপর তিনি সর্বাধিক নির্ভর করেন এবং যাঁরা দরবারে সম্রাটের সবচে'বেশী নৈকট্য লাভ করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন—ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠতম আলিম ও বিশেষজ্ঞ

১. বিস্তারিত 'তারীখে ফিরিশতা'য় দেখুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক-এর মতে সকল প্রকার অরাজকতা ও বিপর্যয়ের পেছনে তিনটি ক্রিয়াশীল উপাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها

"দীনের বিকৃতি ও ক্ষতিসাধন ক্ষমতাসীন রাজা-বাদশাহ, উলামায়ে সু' (আত্মবিক্রীত স্বার্থসর্বস্ব দুনিয়াপূজারী আলিম-'উলামা) এবং স্বার্থ শিকারী ভণ্ড সূফীরা ছাড়া আর কে করেছে?"

আমরা এক্ষেত্রেও মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করছি যিনি স্বয়ং রাজদরবারের একজন সদস্য ছিলেন এবং তাঁর এসব বিবরণের মধ্যেও যা তিনি এক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে স্বীয় দল ও সাথীদের সম্পর্কে স্বয়ং দিয়েছেন, এতে তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা শত্রুতা ছিল বলে মনে হয় না। দরবারী আলিমদের ছবি এঁকেছেন তিনি এভাবে ঃ

"প্রতি জুমু'আর রাত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, পীর-মাশায়েখ, উলামায়ে কিরাম এবং আমীর-উমারাকে তিনি ইবাদতখানায় ডেকে পাঠাতেন। দরবারে কে সামনে বসবেন আর কে পিছনে বসবেন এ নিয়ে উলামা ও মাশায়েখদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেতে শুরু করে। প্রত্যেকেই একে অপরের সামনে এবং বিশিষ্ট আসনে উপবেশন করতে চাইত। বাদশাহ এ সমস্যার সমাধান করে নির্দেশ দেন যে, আমীর-উমারা পূর্ব দিকে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পশ্চিম দিকে, উলামায়ে কিরাম দক্ষিণ দিকে এবং মাশায়েখগণ উত্তর দিকে বসবেন। বাদশাহ নিজে এক একটি হাল্কায় আসতেন এবং মসলা-মাসাইল তাহকীক করতেন।"[১]

মোল্লা সাহেব লিখছেন, "এক রাত্রে আলিম-উলামা' বিরাট জোরে জোরে কথা বলতে ও তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন। এ থেকে সম্রাটের মনে বিরক্তির সৃষ্টি হয় এবং একে তিনি বেতমিযী ও দুনিয়াদারী হিসাবে ধরে নেন।"[২]

"পারস্পরিক কথা কাটাকাটি অবশেষে একে অপরের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। মতপার্থক্য এতদূর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় যে, একে অপরকে তাঁরা কাফির ও পথভ্রষ্ট বলতে থাকেন। ক্রোধে সবাই ফুসছিলেন এবং ঝগড়া অবশেষে চীৎকারে গিয়ে দাঁড়ায়। সভ্যতা ও ভব্যতার সকল মাত্রা তাঁরা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।"

---

১. মুন্তাখাবু'ত -তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড,২০২ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ২০৩ পৃ.।

সম্রাট আকবর এতে সাংঘাতিক ত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে মোল্লা আবদুল কাদিরকে নির্দেশ দেন যে, অতঃপর যেই আলিম এই মজলিসে কোনরূপ বদতমীযী প্রদর্শন করবেন তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেবেন।

উচ্চ ধর্মীয় পদমর্যাদাধিকারীদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন মোল্লা আবদুল্লাহ সুলতানপূরী,[১] যাঁর পদমর্যাদা ও উপাধি ছিল মখদূমু'ল-মুল্ক, যিনি কেবল এই ভয়ে যাতে হজ্জ করতে না হয়, হজ্জের ফরযিয়ত তথা বাধ্যবাধকতা আর অবশিষ্ট নেই বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। যাকাতের ক্ষেত্রেও তিনি শরঈ কৌশল ও চালবাজীর আশ্রয় নিতেন এবং এভাবে শরীয়তের বাধ্য-বাধকতা থেকে বেঁচে যেতেন।[২] সম্রাট আকবরের শাসনামলে এবং তাঁর সৌভাগ্য রবি মধ্যাহ্ন গগনে থাকাকালে তিনি এত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন যে, স্বর্ণভর্তি কয়েকটি সিন্দুক তাঁর পৈতৃক কবরস্থান থেকে উদ্ধার করা হয় যেগুলো মুর্দার বাহানায় তিনি সেখানে দাফন (প্রোথিত) করেছিলেন।[৩]

মখদূমুল-মুল্ক-এর পর পরবর্তী মর্যাদা ছিল সদরু'স- সুদূর মওলানা আবদুন-নবীর[৪] যিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম, বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রের উপর তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ মনে করা হত। কিন্তু মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ-এর কতক বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, তাঁর পাণ্ডিত্য তেমন উচ্চ মানের ছিল না এবং আরবী ভাষার কতক শব্দের সংশোধন ও বিশ্লেষণ সম্পর্কেও তাঁর তেমন জ্ঞান ছিল না।[৫] সম্রাট আকবর তাঁকে সদরু'স-

১. পূর্ব পাঞ্জাবে জলনধরের নিকট সুলতানপুর অবস্থিত। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন নুযহাতুল খাওয়াতির,৪র্থ খণ্ড।

২. অর্থাৎ বছর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই সেই বিত্ত যার উপর যাকাত ফরয—স্বীয় স্ত্রী কিংবা অপর কোন আত্মীয়কে দিয়ে দিতেন। সে নেবার পর আবার পূর্বোক্ত মালিককে ফিরিয়ে দিত। এভাবে ঐ বছরের যাকাত দেওয়া থেকে বেঁচে যেতেন। পরবর্তী বছরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতেন।

৩. এক বর্ণনামতে তার কবর থেকে তিন কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের ইট পাওয়া গিয়েছিল।

৪. শায়খ আবদুন নবী শায়খ আহমদ গঙ্গূহীর পুত্র এবং হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দূস গঙ্গূহী (রা)-এর পৌত্র। হেজাযের উলামা-ই কিরাম থেকে হাদীসের তা'লীম পাবার কারণে পারিবারিক মত ও পথ ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ ও সামা সম্পর্কে তাঁর মতান্তর ঘটে। পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না।(দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড)।

৫. হেজাযের আলিম-উলামা বিশেষ করে আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার হায়তামী মক্কীর মত উস্তাদের নিকট ইলমে হাদীস শিক্ষালাভ এবং লেখক হবার কারণে একথা কিছুতেই সঙ্গত মনে হয় না যে, তিনি মা'মুলী আরবী শব্দও ভুল পড়তেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সুদূর পদে নিযুক্ত করেন। ফলে তিনি এমন শান-শওকত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন যে, সাম্রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অমাত্যও তাঁর সামনে নিস্প্রভ হয়ে যান। সম্রাট কয়েকবার স্বহস্তে তাঁর জুতা পরিয়ে দেন। বড় বড় উলামায়ে কিরাম তাঁর দর্শন লাভের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। সমগ্র ভারতবর্ষর উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ এবং সাজ্জাদানশীনদের জায়গীর প্রদান,উপহার-উপঢৌকন ও ভাতা মঞ্জুর তাঁর এখতিয়ারাধীন ছিল। এক্ষেত্রে তিনি যে উদার মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন বিগত শাসনামলগুলোতেও এর নজীর মেলা ভার।

কিন্তু মোল্লা আবদুল কাদিরের বর্ণনা মুতাবিক (যিনি তাঁর সমসাময়িক দোস্ত এবং দরবার সঙ্গী ছিলেন) মনে হয় যে, উলামায়ে কেরামের উন্নত পবিত্র-আখলাক, স্বীয় খান্দানের সর্বোত্তম ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য বরং সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্য এবং কখন, কোন সময় কি করা দরকার সে জ্ঞানটুকুও তাঁর ছিল না। সম্ভবত তাঁর এই উচ্চ পদ তাঁর ভেতর এই পরিবর্তন সৃষ্টি করে থাকবে। এর নৈতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্রাট এবং তাঁর দরবারের অমাত্য ও সভাসদবর্গের উপর শুভ হত না। মোল্লা আবদুল কাদির তাঁকে তাঁর পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অপব্যবহার এবং এর অবৈধ সুযোগ নেওয়া ও এর থেকে অন্যায় ফায়দা উঠানোর জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "তিনি গোটা ভারতবর্ষের ধর্মীয় জায়গীরদারদের দৌড়ান শুরু করেন। লোকে শায়খ-এর উকীল, ফাররাশ, দ্বাররক্ষী, সহিস—এমনকি মেথরদেরকে পর্যন্ত ঘুষ দিতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। কেননা ঘুষ প্রদান ব্যতিরেকে কোন কার্যোদ্ধার হত না।"[১]

আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং ধর্মীয় বিষয়ে খতিয়ান গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি হিক-মত ও স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি দৃকপাত করতেন না। ফলে কখনো কখনো সম্রাটও এর আওতায় পড়ে যেতেন। মাআছিরু'ল-উমারা নামক গ্রন্থের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "সম্রাট আকবরের এক রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে আমীর-উমারা, উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখগণ সম্রাটকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছিলেন। সম্রাটের গায়ে যাফরানী রঙের পোশাক ছিল। শায়খ এই পোশাকের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন এবং অন্য পোশাক পরিধানের তাকীদ দেন। কিন্তু এই তাকীদ এতটা উত্তেজনার সাথে দিয়েছিলেন যে, তার লাঠির অগ্রভাগ সম্রাটের

১. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২০৫ পৃ.।

শাহী পোশাকে গিয়ে লাগে। সম্রাট সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন, কিন্তু একে তিনি তাঁর জন্য অপমানজনক মনে করেন এবং শাহী হারেমে গিয়ে স্বীয় মাতার নিকট অভিযোগ করেন। মাতা ছিলেন এক বুযুর্গ পরিবারের মেয়ে। তিনি সম্রাটকে বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর এই সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর প্রশংসা-গাঁথা হিসাবে কীর্তিত হবে যে, তাঁর একজন আলিম প্রজা সম্রাটকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল এবং সম্রাট শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নিশ্চুপ ছিলেন।"[১]

এছাড়া মুসীবত আরও ছিল। তন্মধ্যে এও একটি যে, মখদূমু'ল-মুল্ক এবং শায়খ আবদুন-নবী একে অপরের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়েন। মখদূমু'ল-মুল্ক শায়খ আবদুন-নবীকে ইলযাম (অপবাদ দেওয়া,দোষারোপ করা) দিতেন এবং অপরপক্ষে শায়খ আবদুন-নবী মখদূমু'ল-মুল্ককে মূর্খ ও কাফির বলতেন। অতঃপর একে কেন্দ্র করে উভয়ের সমর্থকবৃন্দ পরস্পরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেত। মখদুমু'ল-মুল্ক এবং সদর শায়খ আবদুন-নবীর অবস্থা থেকে (যদি তা সেরকমই হয় যে রকমটি ইতিহাসে-বর্ণিত হয়েছে) পরিমাপ করা যায় যে, এদু'জন মনীষী জ্ঞান, ধর্মীয় প্রজ্ঞা, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা এবং আত্মিক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধি কোন দিক দিয়েই এই সঙ্গীন যুগ (আকবরের শাসনামল) এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পরিবেশে (আকবরের দরবারে) দীনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব ও রসূল(সা)-গণের যথার্থ নিয়াবতের (স্থলাভিষিক্তের) জন্য উপযোগী ছিলেন না। এর জন্য যদি উমায়্যা খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদি'ল-মালিকের উপদেষ্টা ও মন্ত্রী রাজা 'ইব্ন হায়াত এবং আব্বাসী খলীফা হারূনুর রশীদ-এর ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ও কাযীউ'ল-কুযাত কাযী আবূ য়ূসুফ-এর পর্যায়ের 'আলিম, মুত্তাকী ও কুশলী না হলেও নিদেনপক্ষে আবদুল 'আযীয আসিফ খান এবং কাযী শায়খু'ল-ইসলাম[২]-এর মত সাহিব-এ কামাল, উন্নত মেধার অধিকারী, নিবিষ্ট-চিত্ত সাধক ও মুত্তাকী সাম্রাজ্যের উপদেষ্টা হতেন। আকবরের দরবারে (সামনে বলা হবে) ইরান ও ভারতবর্ষের যেসব মেধাসম্পন্ন, প্রতিভাবান, পাণ্ডিত্যের অধিকারী, যুক্তিবাদী আলিম-উলামা' ও সাহিত্যিক সমবেত হয়েছিল তাদের মুকাবিলা করার জন্য এদের উভয়ের চেয়েও অনেক বেশী যোগ্যতর দীন ও শরীয়তের প্রতিনিধি এবং সাম্রাজ্যের মযহাবী তথা ধর্মীয় মুহাফিজ ও উপদেষ্টার প্রয়োজন ছিল।

---

১. মাআছিরু'ল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৫৬১ পৃ।

২. এঁদের উভয়ের সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানীকৃত 'ইয়াদে আয়্যাম' (তারীখে গুজরাট)।

আকবর যিনি (মোল্লা আবদুল কাদিরের বর্ণনানুসারে) ঐ সমস্ত আলিম-উলামাকে, যাঁরা তাঁর শাসনামলের সৌন্দর্য হিসাবে বিরাজ করতেন, গাযালী ও রাযীর থেকেও উত্তম মনে করতেন, যখন তাদের এই ধরনের দেখতে পেলেন তখন পূর্ববর্তী যুগের আলিমদেরকেও এদের সাথে তুলনা করে গোড়া থেকেই 'আলিমদের বিরোধী হয়ে যান।

সাম্রাজ্যের অমাত্য এবং দরবারের উপদেষ্টাবর্গ

সাম্রাজ্যের অমাত্যদের সম্পর্কে আকবরের দুর্ভাগ্য দরবারের আলিমদের চেয়ে কম ছিল না। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ হবার কারণে তাঁর উপর প্রতিটি বাকচাতুর্যের অধিকারী প্রতিভাবান ও সৃজনশীলদের যাদু ক্রিয়া করত,বিশেষ করে তিনি যদি তখনকার বিলেত (ইরান) থেকে আগমন করতেন যাকে ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের লোকেরা গ্রীসের মর্যাদা দিত। ঠিক সেই সময় যখন আকবরের কদম ধর্মের ময়দানে পতনোন্মুখপ্রায় কাঁপছিল, ইরান থেকে হাকীম আবুল ফাতাহ গীলানী, হাকীম হুমায়ূন (হাকীম হুমাম) এবং নুরুদ্দীন কারারী নামক তিন সহোদর ভ্রাতা আগমন করেন এবং দরবারে উচ্চাসন লাভ করেন। কিছুকাল পর মোল্লা য়াযদী ইরান থেকে আসেন এবং সাহাবা-ই কিরাম সম্পর্কে লাগামহীনভাবে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেন। হাকীম আবুল ফাতাহ এক-পা অগ্রসর হলেন এবং দীনের হাকীকতসমূহ (নবুওত, ওয়াহী ও মু'জিযাসমূহ) প্রভৃতিকে খোলাখুলি অস্বীকার করেন।[১] এই সময় শরীফ আমেলীরও ইরান থেকে আগমন ঘটে (যার কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে) যিনি ছিলেন মাহমূদ পীসখাওয়ানীর পদাংক অনুসারী এবং ধর্মদ্রোহী আকীদা পোষণকারী। এই সব ইরানী সুধী ও মনীষী ছাড়াও নড়বড়ে আকীদা ও মানসিক অস্থিরতার এই যুগেই কাল্পীর অধিবাসী প্রখর উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী, বিজ্ঞজনদের মাহফিলের সৌন্দর্য বর্ধনকারী হাস্যরসিক হিন্দু ব্রহ্মদাস দরবারে প্রবেশ করেন এবং খুব সত্বর সম্রাটের মেযাজে অনুপ্রবেশ ও সভাসদের আসন লাভ করেন এবং খাস মোসাহেব হিসেবে অভ্যর্থিত হয়ে বীরবল নামে ধন্য ও গর্বিত হবার সুযোগ পান।[২] তিনি হাওয়ার গতি আঁচ করতে পেরে ধর্মীয় ব্যাপারে এবং নাযুক ইসলামী 'আকীদা ও মসলা-মাসাইলের বিষয়ে অকুণ্ঠ ও বিদ্রূপাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেহেতু তখন এরই কদর ছিল বিধায় চতুর্দিক থেকে তিনি

---

১. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২১১ পৃ.।

২. রাজা বীরবলের চরিত্র জানতে দেখুন দরবারে আকবরী, হুসায়ন আযাদকৃত ৩৩৬-৮৩।

বাহবা পেতে থাকেন। ধর্মের ব্যাপারে সম্রাটের মেযাজকে অযৌক্তিকভাবে অবিবেচক বানাতে তারও বিরাট ভূমিকা ছিল।[১]

মোল্লা মুবারক ও তাঁর দুই পুত্র ফৈযী ও আবু'ল-ফযল

অতঃপর অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বোঝার উপর শাকের আটি হিসেবে দরবারে মোল্লা মুবারক নাগোরীর আনাগোনা শুরু হয়[২] এবং তাঁর দুই পুত্র ফৈযী ও আবু'ল-ফযল সম্রাটের মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেন এবং শাহী দরবারে এমন গৌরবময় আসন লাভ করেন যা ইতিপূর্বে অপর কারোর ভাগ্যে জোটেনি। মোল্লা মুবারক এবং আবুল ফযল ও ফৈযী এই তিনজনের অবস্থা নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, এঁরা কেবল ভারতবর্ষেই নন বরং স্বীয় যুগের অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উচ্চতর জ্ঞানগত যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও সাহিত্যে অসাধারণ দখল এবং ফার্সী রচনা ও কাব্যে সুনিপুণ পণ্ডিত ছিলেন। মোটের উপর সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থা, পঠন ও গবেষণা পদ্ধতি এবং প্রচলিত ও জনপ্রিয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয়-শাস্ত্রের দিক দিয়ে তাঁরা অত্যন্ত জ্ঞানী ও মেধাবী ছিলেন। যদি এই পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান, মেধার তীক্ষ্ণতা, প্রকৃতির ভারসাম্যতা এবং ভাষা ও লেখনীর সাযুজ্যের সঙ্গে এই পিতা-পুত্রদের ভেতর দীনী ইস্তিকামাত তথা ধর্মীয় অটলতা, ধর্মে গভীরতা ও দৃঢ়তা, আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল প্রয়াসী ইখলাস এবং আল্লাহর জন্যই সব কিছু করার মানসিকতাও থাকত তাহলে তারা সে যুগে এমন খেদমত আঞ্জাম দিতে পারতেন এবং একে কালের ফেতনা ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারতেন যার নজীর মেলা হত ভার। কিন্তু তাঁদের অবস্থা এবং স্বয়ং আবুল ফযল ও ফৈযীর রচনাসমূহ থেকে যে সব মৌলিক সত্য বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) মোল্লা মুবারক (যিনি ছিলেন এই ত্রিরত্নের সূচনাবিন্দু)-এর স্বভাব ও প্রকৃতিতে অস্থিরতা এবং মানসিকতায় প্রকৃতিগতভাবে গোলমাল ও বিশৃঙখলা ছিল। মযহাব চতুষ্টয় (হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী) এবং এ সবের এখতিলাফসমূহ সম্পর্কে অবহিত হবার পর তাঁর ভেতর জমা ও সমন্বয় সাধন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিবর্তে সবগুলোকেই অস্বীকার ও সে সবের প্রতি অসন্তোষের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং তিনি এই গোটা ফিকহী সম্পদ ও শ্রদ্ধাভাজন

---

১. বিস্তারিত দ্র. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ১৬১ পৃ.

২. আবুল ফযল তদীয় আকবরনামায় মোল্লা মুবারকের প্রথম দরবারে প্রবেশকে দ্বাদশ বর্ষের ঘটনায় বিবৃত করেছেন।

পূর্বসূরীদের শ্রমসাধ্য প্রয়াস সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। এদিকে শীরাযের বিখ্যাত পণ্ডিত দার্শনিক আবুল ফযল গাযারূনীর চক্রে শরীক হবার ফলে তাঁর উপর দর্শনশাস্ত্র প্রভাব জাঁকিয়ে বসে। তাসাওউফের ইমাম ও মাশায়েখে কিরাম থেকে ইলমে তরীকত ও মা'রিফতের ফয়েয হাসিল করা এবং শয়তানী চক্রান্ত ও নফসের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে অবহিত না হয়ে সরাসরি এতদসম্পর্কীয় কিতাবাদি অধ্যয়ন মারফত তাসাওউফ ও প্রাচ্য-দর্শন সম্পর্কে অবহিত হতে গিয়ে তিনি মারাত্মক ভ্রমে পতিত হন এবং এ সবের গলি-খুপচি অতিক্রম করার পর তাঁর ভেতর এক অস্থিরচিত্ততা ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাঁর ভেতর প্রতিটি রঙে রঞ্জিত হবার এবং "বাতাস বুঝে নাও বাও"-এর সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র সাহেবযাদা খাজা কিলাঁ, শায়খ মুবারকের কন্যার ঘরে যাঁর প্রশিক্ষণ লাভ ঘটেছিল[১], তাঁর সম্পর্কে লিখেন ঃ

در هر عصر هم مشرب و مذهب شعار وقت خود می ساخت که ملوك وامراے عصر بداں مذهب رغبت داشتند۔

"প্রতিটি যুগের প্রচলিত ধর্ম ও মতাদর্শ তিনি আত্মস্থ করতেন, সেই অনুযায়ী চলতেন যে মত অনুযায়ী চলতে রাজ্যের আমীর-উমারা পসন্দ করে।"[২]

স্যার ওয়েলেসলী হেগ বলেন ঃ শায়খ মুবারক বিভিন্ন সময় সুন্নী, শী'আ, সূফী, মাহদাবী ছাড়াও না জানি আরও কি কি ছিলেন।[৩]

(২) স্বভাব ও প্রকৃতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন উদ্যমী ও মর্যাদালোভী। এজন্য জ্ঞান ও পাঠ্য জগতের সীমিত গণ্ডীর ভেতর বন্দী থাকা তাঁর অস্থির প্রকৃতির উপযোগী ছিল না। তাঁর রাজসরকারে ও শাহী দরবারে আপন জ্ঞান ও মেধার প্রভাব সৃষ্টির আগ্রহ দেখা দিল এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি সম্রাট আকবরের ছায়াতলে (যে ছায়াকে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি মনে করা হত) আসলেন এবং কেবল একাই নন আপন দুই পুত্রকেও এর আওতায় নিয়ে এলেন।

(৩) মনে হয়, সে যুগের আলিম-উলামা (বিশেষ করে মখদুমুল-মুল্ক এবং শায়খ আবদুন নবী, যাঁরা শাহী দরবারে সীমাহীন প্রভাব জাঁকিয়ে বসে ছিলেন) তাঁকে সেই মর্যাদা দেয়নি, স্বীয় মেধা ও মর্যাদার ভিত্তিতে যার তিনি যোগ্য

১. খাজা কিলাঁ খাজা হুসসামুদ্দীনের ঘরে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। খাজা হুসসামুদ্দীনের স্ত্রী ছিলেন মোল্লা মুবারকের দ্বিতীয় কন্যা। তারীখে হিন্দুস্তান, ৫ম খণ্ড, ৯৪৭ পৃ.।

২. مبلغ الرجال ৩৩ পৃ.;

৩. Cambridge History of India, ৪র্থ খণ্ড, ১৮ পৃ.।

ছিলেন। অধিকন্তু তাঁর কিছু কিছু 'আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও অস্থিরমতি মেযাজের দরুন ধর্মীয় মহলে তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হন কিংবা তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়। এতে তাঁর অন্তর-মানস গভীরভাবে আহত হয়। মওলভী মুহাম্মদ হুসায়ন আযাদের সাহিত্যমণ্ডিত ভাষায় ঃ

"শায়খ মুবারক ঐসব লোকের নিপীড়নমূলক তীর এত খান যে, তাঁর দিল্ চালুনীর মত ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। শায়খ (আবুল ফযল)ও শায়খের পিতা মোল্লা মুবারক মখদূম ও সদর প্রমুখের হাতে বছরের পর বছর যে আঘাত খেয়েছিলেন জীবনেও তার ক্ষতিপূরণ হবার ছিল না।"[১] অন্যত্র ঃ "মখদূমের হাতে শায়খ মুবারকের উপর যেসব বিপদ-মুসীবত নেমে এসেছিল তাঁর ছেলেরা তা ভোলেনি। এ সবের প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় তাঁরা আকবরের কান ভারী করতে শুরু করল, সেই সাথে আকবরের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটা শুরু হল।"[২]

মওলভী মুহাম্মদ হুসায়ন আযাদ নিজেও মুক্তবুদ্ধি ও উদার চিন্তার হওয়া সত্ত্বেও লিখেছেন ঃ

"ফৈযী ও আবুল ফযলের ব্যাপার তাঁদের পিতার মতই দ্বিধাগ্রস্ত থাকে।"

আলিম-উলামার এই বিরোধিতা এবং কালের এই অবিচার এই গোটা পরিবারকেই হীনমন্যতাবোধের শিকারে পরিণত করে যা বিভিন্ন রূপে এবং অধিকাংশ সময় "শ্রেষ্ঠত্ববোধের" আকারে প্রকাশিত হয় এবং তাঁরা এটা প্রমাণ করে দেন যে, তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা এবং তাঁদের মেধা ও প্রতিভার সামনে কারুর প্রদীপ জ্বলতে পারে না। ইসলাম এবং গোটা ধর্মীয় ব্যবস্থা এই প্রয়াসের শিকারে পরিণত হয়। এমনকি যখন সকল প্রদীপ এই দুই ভ্রাতার জ্ঞানবত্তা ও মেধার প্রদীপের সামনে নির্বাপিত বা নির্বাপিত-প্রায় হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সাম্রাজ্যে তাঁদেরই বুলি আওড়ানো হচ্ছিল, কিন্তু এরই সাথে ইসলামের কুসুম কানন যখন তাঁদের চোখের সামনে জ্বলছিল তখন (মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর বর্ণনানুসারে) আবুল ফযলের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তিদ্বয় ঃ

آتش بدودست خویش در خرمن خویش *
چو خودزده ام چه نالم از دشمن خویش

---

১. দরবারে আকবরী, ৪৯-৫০ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত ৩৮৯ পৃ.।

کس دشمن من نیست نم دشمن خویش *

اے وائے من دوست من و دشمن خویش

আগুন ছিল আর ছিল আমার হাত আমারই খড়-কুটায়। আমি নিজেই যখন এতে আগুন দিয়েছি তখন 'দুশমনের প্রতি আর কি অভিযোগ করব। কেউ আমার দুশমন নয়, আমি নিজেই আমার দুশমন। আফসোস! আমি নিজেই আমার দোস্ত, আমি নিজেই আমার দুশমন।

মোল্লা মুবারকের দুই উপযুক্ত পুত্র ছিল যাঁদের একজনের নাম ছিল আবুল ফয়েয ফৈযী (জন্ম ৯৫৪ হি.) এবং অন্যজন আবুল ফযল আল্লামী (জন্ম ৯৫৮ হি.)।

ফৈযী সাহিত্য ক্ষেত্রে ছিলেন উচ্চতর প্রতিভার অধিকারী এবং তাঁর ফারসী কাব্যেও এ ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতার প্রশ্নে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন না। আল্লামা শিবলী নু'মানী তদীয় "শি'রুল-'আজম" নামক গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন যে, "ফার্সী কাব্য সাহিত্যে ছ'শ বছরের বিস্তৃত মুদ্দতে হিন্দুস্তান মাত্র দু'জন লোকই জন্ম দিয়েছে যাঁদেরকে ফার্সী ভাষাভাষী লোকদেরকেও অনন্যপ্রায়চিত্তে মেনে নিতে হয়েছে আর সে দু'জন হলেন খসরূ (আমীর খসরূ) এবং ফৈযী।"

"ফৈযী খাজা হুসায়ন মারবীর ছাত্র ছিলেন এবং তিনি প্রতিটি বিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করেন। ৯৭৪ হি.-তে (আকবরের দ্বাদশতম সিংহাসন আরোহণ বর্ষে) তিনি দরবারে পৌঁছেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহ লাভে ধন্য হন। সম্রাটের নৈকট্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তদসত্ত্বেও তিনি দরবারের কোন খেদমতে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন নি। তিনি ছিলেন চিকিৎসক, ছিলেন কবি ও লেখক এবং এই সব পেশায় তিনি নিয়োজিত থাকতেন। শাহযাদাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত ছিল। অনন্তর সিংহাসন আরোহণের দ্বাদশবর্ষে শাহযাদা দানিয়ালের শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের ভার তাঁর উপর অর্পিত হয় এবং অতি অল্প দিনেই তিনি তাকে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (مراتب) শিখিয়ে দেন। এই বছরই সম্রাট আকবর ইজতিহাদ ও ইমামতের দাবীতে মসজিদে গিয়ে খুতবা পাঠ করেন। খুতবা লিখেছিলেন ফৈযী। সম্রাট শায়খ 'আবদুন-নবীর শক্তি খর্ব করতে প্রেসিডেন্সী কয়েক অংশে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। অনন্তর ৯৯০ হি.-তে আগ্রা, কালিঞ্জর ও কালপীর প্রেসিডেন্সী ফৈযীকে প্রদান করা হয়। ৯৯৩ হি.তে য়ূসুফযাঈ পাঠানদের বিরুদ্ধে সম্রাট আকবর যখন অভিযান প্রেরণ করেন তখন ফৈযীও এই অভিযানে গমনে আদিষ্ট হন। ৯৯৬ হি.তে যে বছর ছিল

সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের ৩৩তম বর্ষ, ফৈযী 'কবি সম্রাট' (ملك الشعراء) উপাধি প্রাপ্ত হন। ৩৬তম বর্ষে (মুতাবিক ৯৯৯ হি.) ফৈযীকে খান্দেশ রাজ্যে দৌত্য কর্মে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই দায়িত্ব আনজাম দেন। ১০০৪ হি.তে সফর মাসে (সিংহাসন আরোহণের ৪০তম বর্ষে) তিনি ইন্‌তিকাল করেন।"[১]

সাহিত্যিক রচনাসমূহ, সংস্কৃতের অনুবাদ, কাব্য ও দীওয়ান ছাড়াও তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত রচনা কুরআন মজীদের নুকতাবিহীন 'সওয়াতি'উল-ইলহাম'[২] নামক তাফসীর গ্রন্থ। দু'বছরের মুদ্দতে (১০০২ হি.) এটি সমাপ্ত হয়। এর বিনিময়ে সম্রাট ফৈযীকে দশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করেন।[৩] ফৈযী তাঁর এই রচনা কর্মের জন্য রীতিমত গর্ব অনুভব করতেন এবং এ থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ শক্তিমত্তার পরিমাপ করা যায়। ধর্মীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও বদায়ূনী নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর সুবিপুল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন ঃ

---

১. شعر العجم ৩য় খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত (পৃ. ২৮-৭২)

২. ফৈযী এই তাফসীর লিখতে গিয়ে এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন যে, এতে তিনি কোন নুকতাযুক্ত হরফ ব্যবহার করবেন না। ফলে তা সেই যুগে এবং তৎপরবর্তী যুগে সর্বত্র তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্বীয় যোগ্যতার প্রমাণ এবং এই অভিযোগের জবাবে তিনি লিখেছেন যে, ধর্মীয় তথা দীনী ইল্‌মে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু এই কর্ম সম্পাদন থেকে আরবী ভাষায় তাঁর অসীম শক্তিমত্তার যতই প্রকাশ ঘটুক না কেন এতে কোন জ্ঞানগত ও বাস্তব উপকারিতা নেই। এ ঠিক তেমনি যেমন কোন কোন লিপিকুশলী চাউলের উপর قل هو الله লিখে স্বীয় সূক্ষ্ম লিপিকুশলতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। এইরূপ লৌকিকতার দরুন লেখায় কোন লাবণ্য এবং বাক্যে কোনরূপ স্বাদ, সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য নেই।
সম্ভবত এর চেয়ে বেশী উপকারী ও উল্লেখযোগ্য ইলমী তথা জ্ঞানগত কৃতিত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে তাই যা সেই যুগেরই একজন সিরীয় আলিম যাঁর নাম মুহাম্মদ বদরুদ্দীনমা'রূফ বি-ইবনিল গুয্যা আদ-দামিশকী (মৃ. ৯৮৪ হি.) আনজাম দেন। তিনি এক লাখ আশি হাজার কবিতা—শ্লোকে কুরআন মজীদের তাফসীর সম্পন্ন করেন। এরই একটি সংক্ষিপ্ত-সারও কাব্যাকারে তৈরী করেন এবং উছমানী খলীফা সুলায়মান আজমের খেদমতে পেশ করেন। সুলতান উলামায়ে কিরামকে দেখতে দেন যে, এর ভেতর উম্মাহর সাধারণ আকীদা বিরোধী কোন কিছু আছে কিনা কিংবা কোনরূপ বিকৃতি আছে কিনা। উলামায়ে কিরাম এর সত্যতার স্বীকৃতি দেন এবং প্রশংসা করেন। সুলতান এতে লেখককে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেন (الكواكب السائرة بنجم الدين الغزى)। অধিকন্তু নায়লুল আওতারের লেখক আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী আল-য়ামানী-এর البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع (মৃ. ১২৫০ হি.) দ্বিতীয় ভাগ, অনু. মুহা. ইবন মুহা. আল-গুয্যা ২৫২ পৃ. দেখুন।

১. মাআছিরুল্ উমারা, ২য় খণ্ড, ৫৮৭ পৃ.।

در فنون جزئیه از شعر و معمه و عروض وقافیه و تاریخ و لغت و طب وانشاء عدیل در روزگار نداشت

ফুনূন-ই জুযইয়্যা অর্থাৎ কবিতা ও হেয়ালী (রূপক), ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি, ইতিহাস ও অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও লেখালিখিতে তিনি তাঁর যুগের অদ্বিতীয় প্রতিভা ছিলেন।

বই-পুস্তক ও কিতাবাদির প্রতি প্রবল আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন। দুর্লভ কিতাবাদির একটি বিরাট সংগ্রহশালা তিনি গড়ে তোলেন যেথায় ৪০০৬ খানা পুস্তক ছিল। এ সবের অধিকাংশই ছিল স্বয়ং গ্রন্থকারের লিখিত কিংবা সেযুগের লিখিত।

মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনী এবং সেই যুগের সে সমস্ত লোক যাঁদের হৃদয় কন্দরে ইসলামের প্রতি ভক্তি-প্রযুক্ত ভালবাসা ও সম্মানবোধ ছিল, যাঁরা সম্রাট আকবরের শাসনামলের এইরূপ অবস্থাদৃষ্টে অত্যন্ত বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট ছিলেন—এ বিষয়ে একমত যে, ফৈযীও তাঁর পিতার মতই আকীদার ক্ষেত্রে নড়বড়ে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন এবং সম্রাট আকবরকে ধর্মহীন ও ধর্মদ্রোহী (ملحد) বানাবার ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মোল্লা 'আবদুল কাদির বদায়ূনী স্বীয় "মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ" নামক গ্রন্থে ফৈযীর যেই চিত্র অংকন করেছেন তার ভেতর থেকে অতিশয়োক্তি ও শব্দের কচকচানীর অংশটুকু বাদ দিলেও তাঁর (ফৈযীর) মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাধারার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মওলানা শিবলী شعر العجم নামক গ্রন্থে ফৈযীর অনুকূলে জোর ওকালতি করেছেন। এরপরও তিনি লিখছেন :

"তিনি উদার, স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, গোঁড়া ও পক্ষপাতদুষ্ট মৌলভীরা ধর্মের যে অবস্থা তৈরী করে রেখেছে তা ইসলামের প্রকৃত চিত্র নয়। শী'আ-সুন্নীর বিবাদকে তিনি প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন মনে করতেন। এই ঘরোয়া দ্বন্দ্বকে তিনি বিদ্রূপ করতেন। এরপর মোল্লা বদায়ূনী তাঁর লেখা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করেছেন যার ভেতর ঠাট্টা-মস্করার উপাদান রয়েছে।[১] বদায়ূনী লিখছেন যে, ফৈযী ও আবুল ফযল জ্ঞান চর্চার মাহফিল কায়েম করান যে মাহফিলে দরবারীরা প্রকাশ্যে দেখতে পেত যে, ঐসব পক্ষপাতদুষ্ট লোকগুলোর নিকট অভিশাপ বর্ষণ ও কুফরী ফতওয়া প্রদান ব্যতিরেকে আর কোন হাতিয়ার নেই।"

---

১. شعر العجم ৩য় খণ্ড, ৪৯-৫০ পৃ.।

মনে হয় ফৈযীর জীবনকালেই তাঁর এই ধর্মদ্রোহিতামূলক ধ্যান-ধারণার শোহরত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে তাঁর মৃত্যুর যে তারিখ বের করেছেন তা থেকে এটাই প্রকাশ পায়। তাঁর মৃত্যুর বর্ণনাও বেশ শিক্ষণীয়।[১]

আবুল ফযলও তাঁর অপার মেধা, সৃষ্টিশীলতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রমী প্রতিভা। যেমন তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ফৈযী কাব্য ক্ষেত্রে পূর্ণ শক্তি-সামর্থের অধিকারী ছিলেন, তেমনি লেখনী ও রচনাশক্তিতেও তাঁর তুলনা ছিলেন তিনি নিজেই। 'আকবরনামা'র তৃতীয় খণ্ডের ৮৩-৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন যে, অল্প বয়সেই তাঁর ভেতর আত্মঅহংকার, আত্মপ্রদর্শনী ও তাকলীদের বিরুদ্ধে পাগলামী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।"[২]

৯৮১ হিজরীতে তিনি আগ্রায় শাহী দরবারে প্রবেশ করেন এবং আয়াতুল কুরসীর তাফসীর সম্রাটকে পেশ করেন। অতঃপর ৯৮২ হিজরীতে সূরা আল-ফাতাহর তাফসীরের হাদিয়া পেশ করেন। এ সবের মাধ্যমে সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ও নৈকট্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এমনকি তিনি মন্ত্রীত্বের ন্যায় মহা গৌরবমণ্ডিত পদ ও সর্বময় ওকালত লাভ করেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ অবদান তদরচিত "আঈন-ই আকবরী" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থটি। আঈন-ই আকবরী গ্রন্থকে তায়মূরী আমলের রাষ্ট্রীয়, সামরিক, শিল্প, কৃষি, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, জ্ঞানগত ও ধর্মীয় অবস্থা ও ঘটনাবলীর দর্পণ মনে করতে হবে। তাঁর অপর উল্লেখযোগ্য কীর্তি "আকবরনামা"[৩] যা ভারতবর্ষের তায়মূরী সুলতানদের জীবনকাহিনী সম্বলিত। এ ছাড়া ইনশা-ই আবুল ফযল বা আবুল ফযল পত্র ও রচনা-সমগ্র নামে তাঁর চিঠিপত্রের সংকলন ও অপরাপর রচনাসমূহ রয়েছে। ১০১১ হিজরীতে জাহাঙ্গীরের ইঙ্গিতে বীর সিংহ দেব তাঁকে হত্যা করে। সম্রাট আকবর এতে খুব মর্মাহত হন এবং তাঁর মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জন করেন।

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫ ও ৪০৬, ফৈযীর ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা মওলভী মুহাম্মদ হুসায়ন আযাদকৃত দরবারে আকবরী, ৪৭১ পৃ. দ্র.।

২. বাযমে তায়মূরিয়্যাঃ, ১৬৩ পৃ.।

৩. "আকবরনামা" সম্পর্কে প্রখ্যাত ফরাসী মনীষী Carra de Vaux লিখেছেন ঃ এটি এমন এক জ্ঞান-ভাণ্ডার যা নিয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতি গর্ব করার অধিকার রাখে। যে সব মানুষের মেধা এই বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় পেশ করেছে তাদের সরকার ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিজেদের যুগের অগ্রবর্তী মনে হয়। Corra de vaux, LESPEN-SEURS DEL ISLAM-Paris 1921.

ডঃ মুহাম্মদ বাকির উর্দূ দাইরাঃ মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যাঃ-তে "আবুল ফযল" নামক নিবন্ধে বলেন ঃ

"আবুল ফযল সম্রাট আকবরের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে বেশ ভালরকম প্রভাব জাঁকিয়ে বসেছিলেন। অনন্তর সম্রাট আকবর যখন ৯৮২ হিজরীতে (১৫৭৫ খৃ.) ফতেহপুর সিক্রীতে বিভিন্ন ধর্মের আলিম-উলামা, জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের আলোচনা শোনার জন্য ইবাদতখানা কায়েম করেন তখন আবুল ফযল উক্ত আলোচনা মাহফিলে শরীক হতেন এবং সর্বদা আকবরের 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন করতেন। এমনকি তিনি আকবরকে বুঝিয়েছিলেন যে, ধর্ম সম্পর্কে সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক আলিম-উলামার তুলনায় অনেক বেশি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। ১৫৭৯ খৃ.-এ শাহী দরবার থেকে একটি পত্র জারী করা হয় যে, মযহাবী আলিমদের মতভেদ ও মতানৈক্যসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে সম্রাটই হবেন চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। ইবাদতখানায় অনুষ্ঠিত আলোচনা মাহফিলই আকবরের মনে একটি নতুন ধর্ম উদ্ভাবনের ধারণা জন্ম দেয় এবং ১৫৯২ খৃ.-এ "দীন-ই ইলাহীর" বুনিয়াদ রাখে। অন্যদের ন্যায় আবুল ফযলও এ নতুন ধর্ম কুবল করেন।"[১]

মাআছিরু'ল-উমারা নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, 'জান্নাত-ই মাকানী' অর্থাৎ সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং লিখছেন যে, "শায়খ আবুল ফযল আমার পিতার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ছিল অনুপম বাকপটুত্ব আর কুরআন ছিল তাঁরই কালাম। এ জন্য যখন তিনি (আবুল ফযল) দাক্ষিণাত্য থেকে আসছিলেন তখন আমি বীর সিংহ দেবকে তাঁকে হত্যা করতে বলি। এরপর আমার পিতা এই 'আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিরত হন।"[২]

কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাক্ষ্য স্বয়ং আবুল ফযলের একটি বাক্য থেকে পাওয়া যাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর জ্ঞান ও মেধার সাহায্যে সম্রাটের মনোবাঞ্ছাকে জ্ঞানগত পোশাকে সুশোভিত করা, তাকে শাস্ত্রীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত করা এবং সম্রাট আকবরকে সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা থেকে যমানার ইমাম এবং হাদিয়ে দাওরান-এর উচ্চতর পদে পৌঁছুতে যে কীর্তি

---

১. উর্দূ দাইরাঃ মা'আরিফে ইসলামিয়্যাঃ, ১খ. ৮৮৯-৯০ পৃ.।

২. সায়্যিদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান লিখেছেন যে, তুযুক-ই জাহাঙ্গীরীর নওল কিশোর সংস্করণে সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই বর্ণনা নেই। কিন্তু মেজর ডেভিড ব্রাইস কৃত এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে উক্ত বর্ণনা সমর্থিত হয় (৫৩-৫৪ পৃ.)।-বাযমে তায়মূরিয়্যাঃ. ১১৬ পৃ.।

আনজাম দিয়েছিলেন এ জন্য তাঁর বিবেক পরিতৃপ্ত ছিল না। তিনি কখনো কখনো আপন জীবন ও সজাগ-সচেতনতার পরিচয় দিতেন। খান-খানানকে লিখিত এক পত্রে তিনি এ সম্পর্কে লিখছেন ঃ

"এই বেদনাদায়ক কাহিনীর একটি মা'মূলী দুঃখজনক দিক হল এই যে, লেখক (আবুল ফযল) অর্থহীন ব্যস্ততার জাহান্নামে ফেসে গিয়ে আল্লাহ্‌র গোলামীর মর্যাদা থেকে ছিটকে যেয়ে প্রকৃতির গোলামে পরিণত হয়েছে এবং এর (ধ্বংসের) এতটা কাছাকাছি পৌঁছে গেছে যে, তাকে খোদার বান্দার পরিবর্তে টাকা-পয়সার গোলাম বলা হচ্ছে।....... সে এই লেখনীর ভেতর তার এই শোক প্রকাশ করছে এবং উপলব্ধি করছে যে, দুনিয়ার বুকে অতিক্রান্ত ঐ তেতাল্লিশ বছরের বোকামীপ্রসূত দৌড়ঝাপ থেকে বিশেষত সেই বারো বছরের টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে যা কোন পরিক্রমা ও যুগ-প্রবাহের সাহচর্যে কেটেছে, আমার ভেতর না সহ্য শক্তি আছে, না আছে এড়িয়ে চলার ও পরহেয করার শক্তি। আমি একে লিখিত আকারে এনে প্রকাশ্যে তা স্বীকার করছি।"

صبرے نہ کہ از عشق بہ پرهیزم من - بختے نہ کہ بادوست در امیزم من
دستے نہ کہ باقضا آویزم من - پائے نہ کہ از میانہ بگریزم من [১]

আমি যে প্রেম থেকে এড়িয়ে চলব সে ধৈর্য আমার নেই; এ ভাগ্যও নেই যে, আমি বন্ধুর সাথে মিলিত হব।
আমি যে ভাগ্যের ফয়সালার সাথে হাত মেলাব সে হাত আমার নেই, আর মাঝখান থেকে যে পালিয়ে যাব সে পাও আমার নেই।

রাজপূত রাণীদের প্রভাব

সম্রাট আকবরের জন্য এক বিরাট পরীক্ষার ব্যাপার এবং ইসলাম থেকে তাঁর মন-মেযাজ বিযুক্ত হবার একটি শক্তিশালী কারণ ছিল এই যে, সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার নিমিত্তে তিনি রাজপূত রাজন্যবর্গের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তাদেরকে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তাদের পূর্ণ আস্থা লাভের জন্য এবং তাদেরকে এক দেহে লীন করবার জন্য এমন সব কাজ করেন যা তার পূর্ববর্তী সুলতানগণ তখন অবধি করেন নি। যেমন গরু যবাহ্‌র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, সূর্যের দিকে মুখ করে বসে ঝরোকা দর্শন, দাড়ি মুণ্ডন, ভদ্রা করানো, কপালে তিলক লাগানো, হিন্দু রাণীদের সাথে মিলে সর্বপ্রকার হিন্দুয়ানী প্রথা ও

১. আবুল ফযলের রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় দফতর, ১০২ পৃ. (লাখনৌ) ৮৮৩ খৃ।

আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি। আকবরের এক স্ত্রী ছিল রাজা বিহারী মলের কন্যা এবং রাজা ভগবান দাসের বোন। দ্বিতীয় স্ত্রী যোধপুরের রাণী ও জাহাঙ্গীরের মা যোধাবাই। কোন কোন ইতিহাসে এভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের গবেষণাপ্রসুত সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি জাহাঙ্গীরের স্ত্রী এবং শাহজাহানের মাতা ছিলেন। এই সব হিন্দু রাণী এবং তাদের মাধ্যমে ও আত্মীয়তার কারণে তাদের ভাই ও আত্মীয়-বান্ধবদের সম্রাটের উপর বেশ প্রভাব ছিল আর এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। আকবরের দীন ও ধর্মের প্রাসাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ধস নামে তা এই সম্পর্কেরই পরিণতি ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মথুরার কাযী আবদুর রহীম একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম জমা করেন। কিন্তু কাছের এক ব্রাহ্মণ রাতারাতি সে সব সাজ-সরঞ্জাম উঠিয়ে নিয়ে মন্দির নির্মাণে লাগিয়ে দেয়। মুসলমানরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে ইসলাম এবং ইসলামের নবী সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শানে গোস্তাখী করতে থাকে। কাযী আবদুর রহীম সদরুস-সুদূর শায়খ আবদুন-নবীর আদালতে বিষয়টি পেশ করেন। শায়খ আবদুন-নবী তার নামে তলবী নোটিশ জারী করেন। তদন্তে দেখা গেল যে, ঘটনাটি আসলে সত্য। এতে সদরুস-সুদূর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ রাণী যোধাবাঈ-এর পুরোহিত ছিল। রাণী সম্রাটের উপর চাপ প্রয়োগ করছিল যেন তিনি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে তাকে প্রাণে রক্ষা করেন। সম্রাট আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ এবং সেই সাথে সদরুস-সুদূরকে অসন্তুষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। সদরুস-সুদূর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। কিন্তু এতে করে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হবার পরিবর্তে আরও জটিল আকার ধারণ করে। বদায়ূনীর ভাষায় ঃ

"ভারতের ঐ সব রাজন্যবর্গের দুহিতারা এই বলে সম্রাটের কানভারী করে যে, তিনি (সম্রাট) মোল্লাদেরকে এমনভাবেই মাথায় তুলেছেন যে, তারা সম্রাটের ইচ্ছারও কোন পরওয়া করেন না। দরবারে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হানাফী মযহাবে রসূল (সা)-এর গালি প্রদানকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। এইজন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ সেই মযহাবেরও বিপরীত যে মযহাবের আইন এই দেশে চলে।"

ইজতিহাদ ও ইমামতনামা

এটাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ যখন মোল্লা মুবারক সম্রাটের সহায়তা করেন এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক রাজকীয় ঘোষণা তৈরী করেন যা সম্রাট আকবর

এবং তাঁর সাম্রাজ্যের গতিধারা পাল্টে দেবার ক্ষেত্রে ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে প্রমাণিত হয় যাকে মানসিক ও সাংস্কৃতিক ধর্মদ্রোহিতার গোটা প্রাসাদের সদর দরজা বলা যেতে পারে।[১] এই রাজকীয় ঘোষণায় পরিষ্কার বলা হয় যে,

"খোদার নিকট ন্যায়বিচারক বাদশাহ্‌র মর্তবা মুজতাহিদের মর্তবার চেয়ে বেশি এবং হযরত সুলতানে কাহ্‌ফুল-আনাম, আমীরুল-মু'মিনীন, গোটা বিশ্বের উপর আল্লাহ্‌র ছায়া আবুল-ফাত্‌হ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর বাদশাহ গাযী, যিনি সর্বাধিক ন্যায়বিচারক, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, এরই ভিত্তিতে এমন সব দীনি মসলা তথা ধর্মীয় সমস্যায় যে সবের মধ্যে মুজতাহিদগণ পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করেন, যদি তারা নিজেদের প্রোজ্জল মেধা (ثاقب) এবং যথার্থ অভিমতের আলোকে মানুষের আসানীকে সামনে রেখে কোন একটি দিককে অগ্রাধিকার প্রদান করত তাকেই নির্দিষ্ট করে দেন এবং এর ফয়সালা করেন তবে এমতাবস্থায় সম্রাটের এই ফয়সালা অকাট্য ও সর্বসম্মত হিসাবে অভিহিত হবে এবং প্রজাবর্গ ও সর্বসাধারণের উপর এর অনুসরণ চূড়ান্ত ও অপরিহার্য বিবেচিত হবে।"

এই রাজকীয় ঘোষণা ৯৮৭ হিজরীর রজব মাসে তৈরী করা হয় এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে কার্যকর ও বলবত করা হয়। সম্রাটের ইঙ্গিতে তামাম উলামা এই ঘোষণায় দস্তখত করেন। ঘোষণার আলোকে সম্রাট ইমাম মুজতাহিদ, যার আনুগত্য বাধ্যতামূলক ও আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে অভিহিত হন এবং এটাই সেই সফরের সূচনা-বিন্দু যা শুধু ইসলাম থেকেই মুখ ফিরায়নি বরং এর থেকে শত্রুতা ও মতভেদে গিয়ে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

এক নজরে রাজকীয় ঘোষণা

সমসাময়িক সুলতান ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের প্রতি শর্তহীন সাহায্য-সমর্থন, তাদের পদস্খলন ও নিয়ম-নীতিহীনতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তাদের নিবর্তনমূলক বিধি-বিধানসমূহ (এবং কোন কোন সময় ইসলামকে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও তাকে বদনামকারী), ভুল পদক্ষেপ ও পরিকল্পনাসমূহের জন্য তাত্ত্বিক প্রমাণপঞ্জী এবং ফিকহী ও কালামশাস্ত্রীয় সনদ সরবরাহ করার নজীর দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ইতিহাস মুক্ত নয়। সমসাময়িক 'আলিম-উলামা দ্বারা

---

১. এই ঘোষণার সম্পূর্ণ মূল অংশ মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২৭১-৭২ পৃ.; তাবাকাত-ই কুবরা, ৩৪৩-৪৪ পৃ. দেখা যেতে পারে। নুযহাতুল খাওয়াতির-এ এর পুরো আরবী তরজমা রয়েছে।

বারবার পদস্খলন ও ভুল সংঘটিত হয়েছে এবং তারা (কোন ইখতিয়ারী বা ইচ্ছাকৃত মুসলিহাত কিংবা কোন অনিবার্য প্রয়োজনের কারণে) স্বীয় পদমর্যাদা ও অবস্থানের পরিপন্থী কাজ করেছেন। কিন্তু এ রকম সমসাময়িক সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা বরং দীন ও শরীয়তের পরিপন্থী পরিকল্পনা গ্রহণের ধারাবাহিকতায় এই ঘোষণার[১] যা শায়খ মুবারক সম্রাট আকবরের জন্য তৈরী করেছিলেন, খুব কমই তুলনা মিলবে। এতে (অর্থাৎ এই ঘোষণায়) এমন একজন যুবক সম্রাটকে মুজতাহিদ থেকেও উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং মুজতাহিদদের ইখতিলাফী মসলার ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার ও নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয়, তাকে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ মেনে নেওয়া হয় যিনি ছিলেন একেবারেই নিরক্ষর, যার স্বভাবে প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণহীনতা ও সীমাতিরিক্ত স্বাধীনতা রয়েছে, ইসলামের 'আলিম-উলামা' এবং দীন ও শরীয়তের ব্যাখ্যাতাদের উপর থেকে যার আস্থা ও বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল এবং স্বীয় দরবার ও আপন গৃহের হিন্দুয়ানী পরিবেশ দ্বারা যিনি গভীরভাবে প্রভাবিত এবং দ্রুততার সঙ্গে হিন্দু ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণের দিকে ধাবিত, যিনি সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও পূর্ণ ক্ষমতার মালিক, এর ফায়দা কেবল প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা কিংবা খেয়াল-খুশীর অধিকারী অথবা ঐ সমস্ত দরবারী আলিম-উলামা পর্যন্ত পৌছুত যারা সম্রাটের নামে এবং তৎপ্রদত্ত বিধি-বিধান ও ফরমানাদির আড়ালে স্বাধীনতা ও উচ্ছৃংখলতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইত, ইসলামী শারী'আকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করতে চাইত কিংবা নিজেদের পুরনো শত্রু বা প্রতিপক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের খাব দেখত। শায়খ মুবারকের মত তীক্ষ্ণধী ও সতর্ক মানুষের পক্ষে এই পদক্ষেপের ফলাফল ও পরিণতি চোখ এড়িয়ে যাবার মত নয়। এ জন্য এর ব্যাখ্যা দেওয়া বড় কঠিন যে, এই ঘোষণার পেছনে কি পরিকল্পনা কাজ করছিল? একজন দূরদর্শী ঐতিহাসিক যাঁর এ ধরনের পদক্ষেপের ফলাফল ও পরিণতির উপর দৃষ্টি রয়েছে আজ মোল্লা মুবারকের আত্মাকে সম্বোধন করে বলতে পারে ঃ

فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة - وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

"যদি তোমার এই কর্মপন্থার স্বাভাবিক ফল তুমি না জেনে থাকো তবে তা এক দুঃখজনক ব্যাপার। আর যদি তুমি জেনেশুনে এ কাজ করে থাক তাহলে তা আরও বেশী বিস্ময়কর ও দুঃখজনক।"

১. এই ঘোষণা প্রকাশের সময় আকবরের বয়স ছিল ৩৮ বছর।

মাখদূমুল-মুল্‌ক এবং সদরু'স-সুদূর-এর পতন

এই ঘোষণা প্রকাশ, মোল্লা মুবারকের তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁর উপযুক্ত দুই পুত্র ফৈযী ও আবুল ফযলের দরবারে আসা-যাওয়ার পর মখদূমু'ল-মুল্‌ক মোল্লা আবদুল্লাহ্ সুলতানপূরী এবং সদরু'স-সুদূর মওলানা 'আবদুন্নবী গঙ্গূহীর পতন শুরু হয়ে যায়। মখদূমু'ল-মুল্‌ক এবং শায়খ আবদুন্নবী দরবারের এই নতুন রঙ দৃষ্টে নিজেদেরকে গৃহকোণে গুটিয়ে নেন। এরপর একদিন তাদেরকে জোর করে দরবারে আনা হয় এবং জুতার সারিতে বসতে দেওয়া হয়।[১] মখদূমু'ল-মুল্‌ক হিজায গমনের হুকুম পান। ৯৮৭ হিজরীতে তিনি হিজায গমন করেন। সেখানকার উলামায়ে কিরাম তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং উস্তাযু'ল-'উলামা শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী তাঁকে অত্যন্ত সসম্মানে গ্রহণ করেন। মক্কা মু'আজ্জমায় প্রায় তিন বছর কাল অবস্থান করত তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু গুজরাট পৌঁছুতেই তাঁকে বিষপ্রয়োগ করা হয় এবং ৯৯০ হিজরীতে তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন। সম্রাটের ইঙ্গিতেই যে তাঁর বিষপ্রয়োগ ঘটেছিল এর বহু প্রমাণ রয়েছে। খাফী খান তদীয় মা'আছিরু'ল-উমারা গ্রন্থে এর স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।[২]

শায়খ আবদুন্নবীও হিজায গমনের অভিলাষী ছিলেন। কিছুকাল সেখানে তিনি অবস্থানও করেন। কিন্তু মনে হয় তিনি তাঁর পূর্ব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা বিস্মৃত হতে পারেন নি। তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং সম্রাটের ক্ষমা ভিক্ষা চান। মোল্লা আবদুল কাদিরের বর্ণনা যে, সম্রাট রাজা টোডর মলকে তার সঙ্গে বুঝা-পড়া করে নিতে বলেন। রাজা তাঁকে বন্দী করেন ও নির্যাতন- নিপীড়নের শিকারে পরিণত করেন। এই অবস্থায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু মা'আছিরু'ল-উমারার বর্ণনা মতে সম্রাট তাঁর ব্যাপারটা আবুল ফযলকে সোপর্দ করেন। আবুল ফযল তাঁকে গলা টিপে হত্যা করেন।[৩]

আলফেছানীর প্রস্তুতি এবং দীনে ইলাহীর প্রচলন

সম্রাটকে স্বাধীন মুজতাহিদ (মুজতাহিদ মুতলাক) ও সত্যপথী অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বানিয়ে দেবার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল এই যে, ইসলামের আবির্ভাব ও প্রকাশের পর এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনা

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩য় খণ্ড, ৭৯-৮৩ পৃ.।
২. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।
৩.প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড।

হচ্ছে। এই নতুন হাজার বছর থেকে পৃথিবীর এক নতুন বয়স শুরু হচ্ছে। এর জন্য একটি নতুন দীন (ধর্ম), এক নতুন আইন, একজন নতুন শরীয়ত (আইন) রচয়িতা এবং একজন নতুন শাসক চাই আর এর জন্য আকবরের মত রাজমুকুট ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক, ন্যায়বিচারক ইমাম (নেতা) ও বুদ্ধিমান অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী আর কেউ নেই। মোল্লা আবদুল কাদিরের ভাষায় ঃ

"সম্রাটের মস্তিষ্কে যেহেতু একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামের পয়গম্বরের আবির্ভাবের মুদ্দতের হাজার বছর পূর্তি হয়ে গেছে যা এই দীনের স্বাভাবিক বয়স, অতএব তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন চাহিদা ও দাবী প্রকাশে এখন আর কোন প্রতিবন্ধকতা রইল না।"[১]

এই ফয়সালার পর সেই সমস্ত পরিবর্তন শুরু করে দেওয়া হয় যার ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে এই ধারণা ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হয়ে যায়। অনন্তর মুদ্রার উপর (যা প্রত্যেকের হাতে গিয়ে পৌছে এবং যার চেয়ে বড় কোন ইশতিহার হয়না) 'আল্‌ফ'-এর তারিখ মুদ্রণ করা হয়।[২] বিশ্ব ইতিহাসে একটি পার্থক্য নিরুপণকারী বিভাজন রেখা কায়েম করার জন্য এবং একে দু'টি মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বন্টন করার জন্য "তারীখে আলফী" নামে একটি নতুন তারীখ তথা দিনপঞ্জী সংকলন ও সম্পাদনের কাজ আলিমদের একটি বোর্ডের উপর সোপর্দ হয়। এতে হিজরী বর্ষের পরিবর্তে তিরোধানের কথা উল্লেখ করা হয়। লোকের মন-মস্তিষ্কে একথা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে,

"সেই যুগ-নায়কের সময় এসে গেছে যিনি হিন্দু-মুসলমানের বাহাত্তর ফের্কার মতভেদ মেটাবেন আর তা সম্রাটের পবিত্র সত্তার গুণ।"[৩]

এথেকেই আকবর শাহীর দীন-ই ইলাহীর সূচনা ঘটে যার ভেতর ছিল তওহীদের পরিবর্তে (সূর্য উপাসনার আঙ্গিকে) প্রকাশ্য শির্ক,নক্ষত্র পূজা, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান বিশ্বাসের পরিবর্তে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস। আকবর (তৎকর্তৃক প্রবর্তিত দীনে ইলাহীতে) দস্তুর মত বায়'আত গ্রহণ করতেন। এই ধর্মে দাখিল হবার জন্য দাখিল হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি থেকে যে কালেমা পড়ানো হত তাতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সঙ্গে 'আকবার খালীফাতুল্লাহ' (আকবর আল্লাহ্‌র খলীফা) ও শামিল করা হত। কলেমার সাথে একটি ইকরারনামা থাকত যেখানে বলা হত ঃ

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩০১ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত, ২৭৯ পৃ.।

"আমি আমার একান্ত অভিলাষ, উৎসাহ ও আন্তরিক আগ্রহে অপ্রাকৃত ও অন্ধ আনুগত্যমূলক ধর্ম ইসলাম থেকে যে ধর্ম সম্পর্কে বাপ-দাদা থেকে শুনেছি ও দেখেছি, সেই ধর্ম থেকে নিজেকে বিমুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করছি এবং আকবরশাহী দীনে ইলাহীতে দাখিল হচ্ছি এবং এই দীনের ইখলাসের চারটি ধাপ অর্থাৎ তরক-ই মাল (ধন-সম্পদ বিসর্জন), তরক-ই জান (আত্মবিসর্জন), তরক-ই নামূস ও 'ইযযত (মান-সম্মান বিসর্জন) এবং তরক-ই দীন (দীন বিসর্জন) কে কবুল করছি।"[১]

এই দীনে (দীনে-ই ইলাহীতে) সূদ, জুয়া, শুকর মাংস বৈধ ছিল এবং গরু যবাহ নিষিদ্ধ ও বিবাহ আইন সংশোধন করা হয়েছিল। পর্দা ও খাতনা প্রথা নিষিদ্ধ ছিল। দেহ ব্যবসাকে সুসংহত করা হয়েছিল এবং এর জন্য স্থান নির্ধারিণ করে দেওয়া হয়েছিল, এর জন্য আইন বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মৃতের দাফন ক্রিয়ার মধ্যেও সংশোধন আনা হয়েছিল। মোটকথা একটি স্থায়ী ভারতীয় আকবরী ধর্ম সংকলিত হয়েছিল যার ভেতর মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির প্রাচীন আইন মুতাবিক এই দীন ও জীবন-পদ্ধতির পাল্লা ছিল অবনমিত যে দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক বা প্রবণতা এবং প্রবৃত্তির তৃপ্তির উপকরণ ছিল এবং বহির্দেশীয় জাতীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ এর অগ্রাধিকারের অনুকূলে ছিল।[২]

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় ও মেযাজগত বিকৃতি এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি

আকবরের এই ধর্মীয় ও মেযাজী বিকৃতি ও বিপর্যয় কোন স্তরে গিয়ে পৌছেছিল তা নিরুপণে আমরা সর্বপ্রথম আকবরের বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধ-শক্তি যার কাছে বাঁধা প্রড়ছিল সেই আবুল ফযল 'আল্লামীর উদ্ধৃতি পেশ করব। এগুলো সেই সামগ্রিক পরিবর্তন ও বিকৃতির বিভিন্ন পর্যায় যা আবুল ফযলের বিবরণে ও বর্ণনায় পাওয়া যায়। সেগুলোকে একত্র করলে সেই অগ্নি-শৃঙ্খলের কিছুটা কল্পনা করা যাবে যা সেই সময় ইসলামের গলায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ২৭৩ পৃ.।

২. এই উদারতাও সকলের সঙ্গে শান্তি-সমঝোতার আন্দোলন অথবা নতুন ধর্ম ও আইনে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সমান আচার-আচরণ কায়েম থাকেনি। স্বাভাবিকভাবেই এই ধর্ম ও ফের্কার পাল্লা ঝুকে যায় যার প্রতি দরবারে প্রভাব এবং স্বভাবে ঝোঁক ছিল। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-এর লেখক ডব্লিউ এইচ মোরল্যাণ্ড এবং এ. সি. চ্যাটার্জি এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আকবর হিন্দুদের খুশী করবার জন্য গো-হত্যাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশের অমান্যকারীদেকে কঠিন শাস্তি দেন। আকবরের আইনগুলো ইসলাম ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের অনুকূলে ও সমর্থনেই বেশী হত। তাঁর এই কর্মকৌশল ফলপ্রসূ হয়।

تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

অগ্নিপূজা

"জাহাঁপনা স্বীয় আলোকোজ্জ্বল বিবেক থেকে রৌশনী (আলো)-কে অত্যন্ত প্রিয় এবং এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকে খোদাপরস্তী ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞান করতেন। এই মূর্খ নাদান একে খোদা বিস্মৃতি ও অগ্নিপূজা বলে থাকে।"১

"সূর্য অস্ত যাবার পর (খাদেম ও পরিচারক) বারটি কর্পূরের বাতি জ্বালায় আর প্রতিটি চেরাগ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বারকোষে রেখে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসে। তাদের ভেতর থেকে একজন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী খাদেম বাতিটা হাতে নিয়ে নানা রকম চিত্তহারী সুরে খোদার প্রশংসা গীতি গায় এবং শেষে সম্রাটের দীর্ঘায়ু ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দু'আ করে।"২

সূর্য পূজা

"দো-আশিয়ানা মনযিল" নামক ইমারতে ঈশ্বর বন্দনা হত এবং এখান থেকেই সূর্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সূচনা হয়েছিল। তিনি বলেন যে, রাজা-বাদশাহদের অবস্থার উপর সূর্যের এক বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। এজন্যই এর উপাসনাকে খোদার ইবাদত মনে করা হয়। কিন্তু অপরিণামদর্শী মানুষ বদগুমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জনসাধারণ কিজন্য কালিমা লিপ্ত মনের অধিকারী বিত্ত-সম্পদের মালিককে নিজেদের লাভের নিমিত্ত সম্মান করে এবং নিজেদের অন্ধত্বের কারণে এই আলোর ঝর্নাধারার সম্মান জ্ঞাপনে সংকুচিত হয় এবং ইবাদত গুযার-এর উপর ভর্ৎসনা করে? যদি স্বয়ং তার বুদ্ধিবিভ্রম না ঘটে থাকে তাহলে সূরা ওয়াশ-শাম্‌স কেন ভুলিয়ে দেওয়া হল?"৩

গঙ্গাজল

"সম্রাট ঘরে-বাইরে সব সময় গঙ্গার পানি পান করতেন। আস্থাভাজন কর্মচারীদের একটি দল নদীর ধারে মোহরাংকিত কুঁজোয় পানি ভরে আনবার জন্য আদিষ্ট। জাহাঁপনা যখন আগ্রা ও ফতেহ পূরে অবস্থান করতেন সূর কসবা থেকে পানি আনা হত। শাহী তাবু যখন লাহোরে স্থাপন কর হত হরি দ্বার-এর সর্বোত্তম

১. A Short History of India-এর উর্দূ অনুবাদ, পৃ. ২৫১
২. আঈন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, ২৮ পৃ. লাখনৌ সং. ১৮৮২।
৩. আঈন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড, ১৮৪ পৃ.।

পানিতে আবদার-খানা প্লাবিত হত। বাবুর্চিখানায় যমুনা ও চেনাবের পানি অথবা বৃষ্টির পানি খরচ হয় । কিন্তু তার ভিতর কিছুটা গঙ্গাজল মিশানো হয়।"১

চিত্রাংকন

"একদিন জাহাঁপনা নির্জনে ও নিভৃত স্থানে, যেখানে কেবল সৌভাগ্যবান মুরীদদেরই সমাবেশ ছিল, বললেন যে, একদল লোক চিত্রাংকন শাস্ত্রের দুশমন এবং এই পেশার দোষ-ক্রটি বয়ান করে। কিন্তু তাদের কথা ও যুক্তি মন কবুল করে না বরং যুক্তি-বুদ্ধির কথা এই যে, চিত্র শিল্পী অধিকাংশ মানুষের চেয়ে অধিকতর খোদাপ্রেমিক হতে পারে। এজন্য যে, এই ব্যক্তি জীবজন্তুর ছবি আঁকতে গিয়ে তার প্রতিটি অঙ্গের ছবি আঁকে এবং ছবি সম্পূর্ণ করার পর যখন দেখে যে, এই বাহ্যিক যাদুকরিতা সত্ত্বেও সে এতে আত্মা বা প্রাণের সঞ্চার করতে অক্ষম তখন সে সেই মহা ও পরম স্রষ্টার 'কুদরতে কামেলা' পরিমাপ করতে পারে এবং পরম স্রষ্টার সামনে সিজদাবনত হয়।"২

ইবাদতের ওয়াক্ত

"ভোর মুবারক দিনের সূচনা এবং আলোক বিচ্ছুরণের শুরু, দুপুর যখন সূর্যের জ্বলন্ত আলোক-রশ্মি তামাম জাহানকে প্লাবিত করে এবং মানুষের ভেতর বিবিধ বর্ণের আনন্দের আমেজ সৃষ্টি করে এবং সন্ধ্যা যখন আলোর উৎস (সূর্য) মানুষের চোখের আড়ালে হারিয়ে যায় (অস্ত যায়)।"৩

সিজদা-ই তা'জীমী বা সম্মানসূচক সিজদা

"ভক্ত- দাসেরা সম্মানসূচক সিজদা করে এবং একে স্বর্গীয় তথা ঐশ্বরিক সিজদা গণ্য করে।"৪

বায়'আত ও ইরশাদ

"সত্যান্বেষী হাতে পাগড়ী নিয়ে পবিত্র পায়ের উপর মাথা রাখত এবং মুখে এভাবে বলত যে, জাগ্রত ভাগ্যের সাহায্য ও দয়ায় এবং সৌভাগ্য রবির পথ-প্রদর্শনায় ও দিক-নির্দেশনায় (যা বিবিধ প্রকার ক্ষতির কারণ ছিল) আমি আমার দিলের তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ) সম্রাটের আনুগত্যের প্রতি ঝুকিয়ে দিচ্ছি।"৫

---

১. আঈন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃ.
২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৭৮ পৃ.।
৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃ.।
৪. ঐ, ১ম খণ্ড,১০৭।
৫. ঐ, ১১০।

সাক্ষাতের আদব

"পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় একজন বলত, 'আল্লাহু আকবার' এবং অন্যজন এর প্রত্যুত্তরে বলত, 'জাল্লা জালালুহু' (স্মর্তব্য যে, সম্রাটের মূল নাম ছিল আকবর এবং কুনিয়াত ছিল জালালুদ্দীন। সালামের পরিবর্তে উপরিউক্ত বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে সম্রাটের বন্দনা গাওয়াই ছিল মূখ্য উদ্দেশ্য। অনুবাদক)।"[১]

হিজরী সন ও তারিখের প্রতি ঘৃণা

"দীর্ঘ কাল যাবত সম্রাটের অভিলাষ ছিল ভারতবর্ষে নতুন বর্ষ ও মাস জারী করে (এক্ষেত্রে বিরাজিত) অসুবিধাগুলো দূর করবেন এবং মানুষকে আরাম দেবেন। জাহাঁপনা হিজরী সনকে এর ত্রুটির কারণে পসন্দ করতেন না। কিন্তু অপরিণামদর্শী ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অবুঝ লোকের আধিক্যের কারণে যারা সন-তারিখের প্রচলনকেও একটি ধর্মীয় বিষয় মনে করে মহানুভব সম্রাটের মনরঞ্জক প্রকৃতি তাদের মন ভাঙতে চায়নি বিধায় প্রথম দিকে আপন খেয়াল বাস্তবায়িত করতে পারেন নি।"[২]

অনৈসলামী পালা-পার্বণ ও আনন্দ উৎসব

"প্রথম রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠান (জশন جشن) জশনে নওরোযী (নওরোয, নববর্ষের উৎসব) নামে অভিহিত । সূর্য যখন বর্ষ-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করত পরবর্তী বছরে পদার্পণ করে এবং স্বীয় প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দ্বারা গোটা জগদ্বাসীকে উপকৃত করে তখন ঊনিশ দিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ আনন্দ-ফুর্তি ও আমোদ-প্রমোদের ঢেউ বয়ে চলে। এই সময় দু'দিন ঈদের পর্ব পালন করা হয় এবং বেশুমার নগদ অর্থ ও রকমারী জিনিষ দান ও উপহার-উপঢৌকন হিসেবে বণ্টন করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারীর দিন, যা য়াওমুশ-শারফ, ঈদের জন্য নির্দিষ্ট। পার্শীদের নিয়ম হল, প্রতি মাসের সেই দিনকে যা মাসের সাথে একই নামের, অত্যন্ত বরকতময় ধারণা করে এবং সেই দিন আনন্দোৎসব করে ও সীমাহীন গান-বাজনা ও খানা-পিনার আয়োজন করে। সম্রাটও এই প্রথার অনুকরণ করলেন এবং প্রতিটি সৌর মাস একটি বিশেষ উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এসব দিনের তালিকা-সূচী নিম্নরূপ ঃ

---

১. আঈন-ই আকবরী, ১১০।
২. আঈন-ই আকবরী, ১৯৬ পৃ.।

'উনিশ ফরওয়ার দীন, তৃতীয় ইরদী বেহেশ্‌ত, ষষ্ঠ খোরদাদ, এয়োদশ তীর, সপ্তম আমেরদাদ, চতুর্থ শহরপূর, ষষ্ঠদশ মহর, দশ আবান, নবম আযর; অষ্টম, পঞ্চদশ ও তেইশ দে, দ্বিতীয় বাহমান, পঞ্চম ইস্‌ফিন্দার।

"এ সমস্ত দিনে উৎসব (جشن) অনুষ্ঠিত হত এবং প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানে নানা ধরনের ও বিভিন্ন প্রকারের আলোকসজ্জাসহ সাজ-সজ্জা করা হত। উপস্থিত লোকেরা আনন্দের আতিশয্যে বেএখতিয়ার আনন্দ ধ্বনি করত।

"প্রতিটি প্রহরের সূচনায় নাকাড়া বাজান হত। আমোদ-প্রমোদকারীরা নিজেদের গান-বাদ্য ও যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে আনন্দের ফোয়ারা ছোটাত।"[১]

যাকাত আদায় না করতে রাষ্ট্রীয় ফরমান

"বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মচারীবৃন্দ এবং অধীনস্থ রাজ্যসমূহের গোমস্তাদের জানা দরকার যে, এই সৌভাগ্যের যুগে যার সূত্রপাত ঘটেছে উৎসব-বর্ষ থেকে এবং যা দ্বিতীয় করন (قرن)-এর সপ্তম বর্ষ (অর্থাৎ ৩৭ বছর, কেননা 'করন' দ্বারা এখানে তিরিশ বছর বুঝানো হয়েছে), যা সম্পদ ও সৌভাগ্যের বসন্ত এবং জালাল ও জামালের (মহত্ত ও সৌন্দর্য) প্রকাশ কাল—এই ফরমান প্রকাশিত হয় যে, সাম্রাজ্যের কর্মকৌশলের দাবী যে, হুকুমত ও সিয়াসত (সরকার ও রাজনীতি) যা স্থানীয় ও বিদেশাগত এবং কর্মচারী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের হেফাজতের নাম এবং যা রাজস্বের একটি মাধ্যম যার উপর সামরিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি, যা জান-মাল ও আকীদা-বিশ্বাস এবং বাজারের তত্ত্বাবধান করে । যদি ঐ সব বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন লোকদের নিক্তি ভুল হয়ে যায়, যা খাটি ও খাদ-এর পরীক্ষা করে তাহলে নির্ভেজাল ভেজালে এবং ভাল মন্দে পরিবর্তিত হবে। আল্লাহ্‌র প্রশংসা যে, শুরু থেকেই সম্রাটের লক্ষ্য সাধারণের কল্যাণ এবং প্রজা সাধারণের লালন-পালনের দিকে রয়েছে, যারা সম্রাটের সন্তানতুল্য এবং আল্লাহ্‌র আমানত। আল্লাহ্‌র জন্য মিনতি যে, ভারতবর্ষ এবং অধীনস্থ অন্যান্য প্রদেশসমূহ 'আদল তথা ন্যায়বিচার ও প্রাচুর্যের কেন্দ্র এবং দুনিয়ার তাবৎ মুসাফিরের অবতরণস্থল।

"অতি সম্প্রতি শাহী দরবার থেকে এই মর্মে নির্দেশনামা ঘোষিত হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য-শস্য, উদ্ভিজরাজি, ঔষধপত্র, লবন ও মেশক, নানা প্রকার সুগন্ধি, বস্ত্র ও তুলা, পশমী উপকরণ, ঘাস-বাঁশ ও অন্যান্য বস্তুসামগ্রী, যে সমস্তর উপর জীবন ও যিন্দেগী নির্ভরশীল, কেবল হাতী-ঘোড়া, উট, বকরী,

---

১. আঈন-ই আকবরী, ৬৪ পৃ.।

অস্ত্রশস্ত্র ও জরুরী সামানের (যা প্রথম থেকেই ব্যতিক্রম) যাকাত অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশগুলোতে এবং ছোট-বড় সমস্ত ট্যাক্স মাফ করা হচ্ছে।"[১]

হিন্দুরা একত্ববাদী

"আমাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, এই যে লোকের মুখে মুখে ফিরে যে, হিন্দুরা একক খোদার শরীক ঠাওরায়—একথা ঠিক নয়। যদিও বহু কথা ও দলীল-প্রমাণ আপত্তিকর, কিন্তু এই জাতি একত্ব প্রয়াসী ও এদের খোদাপরস্তীর নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে।"[২]

গোশ্ত ভক্ষণ

"তিনি (সম্রাট) বলেন যে, যদি জীবনের সমস্যা-সংকুলতা, সংকট আমার স্মৃতিপটে অংকিত না হয়ে যেত তাহলে মানুষের গোশ্ত ভক্ষণে আমি প্রতিবন্ধক হতাম এবং আমি এই দিক দিয়ে এর উপর এক সঙ্গে আমল করতে চাই না যে, এতে বহু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং মানুষ এর শোকে-দুঃখে পাগলপারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে, কসাই, জেলে এবং তাদের মত অন্যরা, যাদের পেশা জীবন নেওয়া, তাদের আবাস সাধারণের বসতিস্থল থেকে আলাদা করা হোক এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের থেকে জরিমানা আদায় করা হোক।"[৩]

শূকর

"তিনি বলেন যে, যদি শূকর হারাম হবার পেছনে তার পৌরুষ ও মর্যাদাহীনতা-ই কারণ হয় তাহলে ব্যাঘ্র কিংবা অনুরূপ অপরাপর (হিংস্র) প্রাণী হালাল হওয়া আবশ্যক।"[৪]

মদ্য পান

"এই মাসের উৎসব অনুষ্ঠানে সম্রাট মদ্যপান করতেন,মীর সদর জাহান, মুফতী মীর 'আদল ও মীর আবদুল হাইও মদপান করেন এবং সম্রাটের মুখে এই কবিতা এসে যায়।"[৪]

در دور پادشاه خطا بخش و جرم پوش
قاضی قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش

১. তাবাকাত-ই আকবরী, ৬৭-৬৮।
২. আঈন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড,২য় পৃ.।
৩. ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৮৯ পৃ.।
৪. ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৮৫ পৃ.।

অপরাধ ক্ষমাকারী ও পাপ গোপনকারী বাদশাহ্‌র যুগে কাযী ও মুফতী হল মদ্য পানকারী।

হিন্দু প্রথা

"খান আ'জম মির্যা কোকার মাতা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এতে জাহাঁপনা এতটাই শোকাভিভূত হন যে, শোকে প্রকাশ্যে মস্তক ও গোঁফ মুণ্ডন করেন। আপ্রাণ চেষ্টা চলে যাতে মরহূমার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতিত আর কেউ কেশ মুণ্ডন না করে। কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম সেবকবৃন্দ সম্রাটের অনুসরণ করে।"[১]

ইলাহী সনের প্রচলন

"৯৯২ হিজরীতে শাহানশাহী (রাজোচিত) জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির আলো, জ্ঞান ও পূর্ণতার সেই উজ্জল প্রদীপ জ্বালান যা স্বীয় বরকতময় রৌশনীর সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান করে দেয়। খোশনসীব ও সত্য প্রিয় সম্প্রদায় ব্যর্থতার উপাধান থেকে মাথা তুলল এবং বেহুদাগো ও অলস মতের লোকেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে মুখ লুকাল। কিবলায়ে আলম (অর্থাৎ সম্রাট)-এর সদিচ্ছা বাস্তব রূপ লাভ করল এবং বিজ্ঞলোকদের স্মারক মীর ফতহুল্লাহ্ শীরাযী এই কর্ম সম্পাদনের জন্য সাহসে কোমর বাঁধল। আল্লামা শীরাযী আধুনিক গুরগানী বর্ষগঞ্জিকাকে সামনে রেখে জাহাপঁনার সিংহাসন আরোহণ বর্ষকে ইলাহী সনের প্রথম বর্ষ হিসাবে অভিহিত করেন।"[২]

এই সব বুনিয়াদী সত্য তুলে ধরার পর, যদ্দ্বারা সম্রাট আকবরের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার পরিপূর্ণ অবয়ব তৈরী হয়ে যায়, এক্ষণে মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর প্রদত্ত কতক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি তথ্য দ্বারা এই অবয়বকে অধিকতর পূর্ণতা দানে কোন ক্ষতি নেই এবং দীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় তা ইসলাম ও ইসলামী শরী'আতের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণ-পুরুষ-এর সঙ্গে যে দূরত্ব ও আতংক বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছিল তার একটি চিত্রও যেন লোকের সামনে আসতে পারে।

দীন ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

"মুসলিম মিল্লাতের সমগ্র পুঁজিকে ধ্বংসশীল এবং অসৎ যুক্তি-বুদ্ধির সমষ্টি হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং এর স্রষ্টা (আল্লাহ্‌র পানাহ চাই) আরবের সেই

১. আঈন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড, ৬০৬ পৃ. (উর্দূ)।
২. আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, ৮৩০ পৃ.।

সব কতিপয় গরীব বেদুঈন অভিহিত হন যাঁদের ভেতর সকলেই ছিল হাঙ্গামাবাজ ও ডাকাত এবং ফেরদাউসীর শাহনামার দু'টো বিখ্যাত কবিতা থেকে এর সনদ গ্রহণ করা হয় যা তিনি উদ্ধৃতি হিসাবে বলেছিলেন ঃ

زشیر شتر خوردن وسوسمار * عرب را بجاے رسیدست کا

که ملك عجم را کنند آرزو * تفو باد بر چرخ گردان تفو[২]

"উটের দুধ পান করে আর গোসাপ ও বেজীর গোশ্‌ত খেয়ে আরবরা ধ্বংস হয়েছে; এখন তারা অনারব দেশগুলো জয় করার আশা পোষণ করে, বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের উপর অভিশাপ।"

ইসরা ও মি'রাজ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ

"যাই হোক, জ্ঞান-বুদ্ধি একথা কি করে মেনে নিতে পারে যে, একজন ভারী দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠেই আসমানের উপর গিয়ে হাযির হন এবং আল্লাহর সঙ্গে নানা ধরনের ৯০ হাজার কথা বলেন, কিন্তু তাঁর বিছানা তখনও পর্যন্ত উষ্ণই থাকে আর লোকে তাঁর দাবী মেনে নেয়! এ ধরনেরই আরেকটি উদাহরণ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের মত কথাকেও তারা মেনে নেয়।"

এরপর মাটি থেকে উঠানো একটি পায়ের দিকে উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে তিনি প্রশ্ন রাখেন ঃ

"যতক্ষণ পর্যন্ত না অপর পা যমীনের উপর নামিয়ে আনছি আমার পক্ষে দাঁড়ানো অসম্ভব, আমি দাঁড়াতে পারি না। আসলে এ সব কিসের গল্প?"[১]

মকাম-ই নবূওতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

"অর্থাৎ হিজরতের প্রথম পাদেই কুরায়শ কাফেলা লুণ্ঠন, চৌদ্দ জন মহিলাকে বিবাহকরণ এবং স্ত্রীদের মনোরঞ্জন ও সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত মধু ভক্ষণ নিষিদ্ধকরণ (এ সব কথার পেছনে নবূওতের উপর আপত্তি উত্থাপনই ছিল আসল উদ্দেশ্য)।"[২]

নববী নামে আতংকবোধ ও কষ্ট অনুভব

"আহমদ, মুহাম্মদ, মুস্তফা প্রভৃতি নাম বাইরের কাফিরদের খাতিরে এবং অন্দরের মহিলাদের কারণে সম্রাটের নিকট বোঝা অনুভূত হতে থাকে। শেষে

১. আঈন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, ৫৬৪ পৃ.।
২. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩০৭ পৃ.।

কিছু দিন পর একান্ত আপর জনদের নাম তিনি বদলেও দেন। যেমন ইয়ার মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ খানকে তিনি রহমত নামেই ডাকতেন এবং লেখার সময়ও তাদেরকে উল্লিখিত নামেই সম্বোধন করতেন।"১

নামাযের অনুমতি না দেওয়া

"দীওয়ানখানায় কারোর সাধ্য ছিল না যে, প্রকাশ্যে নামায আদায় করে।"২

এক স্থানে লিখেন ঃ

"নামায, রোযা ও হজ্জ তো এর আগেই হারিয়ে গিয়েছিল।"৩

ইসলামের রুকনসমূহের অবমাননা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ

"মোল্লা মুবারকের এক পুত্র ছিল আবুল-ফযলের শিষ্য। সে ইসলামের ইবাদত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করে। এসব পুস্তিকা শাহী দরবারে জনপ্রিয়তা পায় এবং এই পুস্তিকাই তার সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের কারণ হয়।"৪

ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গীন ও বিপজ্জনক মোড়

মোটকথা, সেই সময় ভারতবর্ষ যেখানে দীন-ই ফিতরত-এর পবিত্র বৃক্ষের রোপণ, লালন-পালন ও ফলে-ফুলে সুশোভিতকরণের জন্য চারশ বছর যাবত উপর্যুপরি সর্বোত্তম মানবীয় শক্তি-সামর্থ্য, মেধাগত যোগ্যতা এবং সূফী-দরবেশগণের রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা ব্যয়িত হয়েছিল একেবারে হঠাৎ করেই ধর্মীয়, মানসিক ও সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ইরতিদাদ (ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ধর্ম পরিত্যাগ, ইসলাম বর্জন)-এর রাস্তায় গিয়ে পড়ছিল যার পৃষ্ঠপোষকতা করছিল যুগের এক বিরাট বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং বিশাল এক সামরিক শক্তি যেই শক্তি ও সাম্রাজ্যের পেছনে সেই যমানার কতিপয় প্রতিভাবান ও মনীষাসম্পন্ন লোকের জ্ঞানগত ও মস্তিষ্কপ্রসূত সাহায্য-সহযোগিতাও ছিল। সেই সময় যদি অবস্থার গতি এটাই থাকত এবং এর রাস্তা রোধকারী কোন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব না থাকত কিংবা কোন বিপ্লবাত্মক ঘটনা সংঘটিত না হত তাহলে এদেশের পরিণতি হি. একাদশ শতাব্দীতে বাহ্যত তাই হত যা হিজরী নবম শতাব্দীতে মুসলিম স্পেনের (যাকে বর্তমান বিশ্ব কেবল স্পেন নামেই চিনে ও

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩১৪ পৃ., ৩খ.।
২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃ.।
৩. প্রাগুক্ত, ২৫১ পৃ.।
৪. প্রাগুক্ত, ২৫১ পৃ.।

জানে) অথবা হি, চতুর্দশ শতাব্দীতে (রুশ বিপ্লবের পর) তুর্কিস্তানের হয়েছে। কিন্তু مردے از غیب بروں آید وکارے بکند

এখন আমরা এই অধ্যায়কে সীরাত-ই নববী (স.)-র লেখক ও ইসলামের ঐতিহাসিক মওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র)-র সেই বাগ্মিতাপূর্ণ বাক্য দ্বারা শেষ করছি যা তিনি ہندوستان کے غربت کدہ میں مسافر اسلام-এর ভ্রমণ-কাহিনী শোনাতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

“এই অলস ঘুমের মাঝে চারশ' বছর অতিবাহিত হয়ে গেল আর মুসাফিরের সফর সূচনার হাজারো বছর অতিক্রান্ত হচ্ছিল। যুগটি ছিল সম্রাট আকবরের, যখন অনারব দেশের একজন যাদুকর এসে সম্রাটের কানে এই মন্ত্র ফুঁকল যে, আরব উদ্ভূত ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) সহস্র বছর বয়স পূর্তি হয়েছে। এখনই সময় একজন নিরক্ষর সম্রাটের মাধ্যমে নিরক্ষর নবী (স)-র ধর্ম মনসূখ হয়ে দীন-ই ইলাহীর আবির্ভাব ও প্রকাশ ঘটার। অগ্নি উপাসক মজূসীরা তাদের উপাসনাগার উত্তপ্ত করল, খৃস্টানরা গির্জার ঘন্টা বাজাল, ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুতুল সাজাল এবং যোগ-সাধনা ও তাসাওউফ মিলিত হয়ে কা'বা এবং পূজামণ্ডপকে একই প্রদীপ দ্বারা আলোকমণ্ডিত করতে বদ্ধপরিকর হল। এই পাঁচ মিশেলী আন্দোলনের যে আছর হল তার ছবি যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে সে যেন دبستان مذاهب অধ্যয়ন করে, দেখতে পাবে কত পৈতাধারীর হাতে তসবীহ এবং কত তসবীহধারীর গলায় পৈতা। শাহী আস্তানায় কত আমীর-উমারা সিজদাবনত, কত পাগড়ীধারী সম্রাটের দরবারে হাত জোড় করে দণ্ডায়মান তাও দেখা যাবে এবং মসজিদের মিম্বর থেকে এ আওয়াজও শোনা যাবে,

الله اکبر - تعالی شانه

“এ সবই হচ্ছিল। এমন সময় সরহিন্দ-এর দিক থেকে একজন ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল, “পথ পরিষ্কার করুন, পথিক আসছেন।” একজন ফারূকী মুজাদ্দিদ ফারূকী শানে আবির্ভূত হলেন। ইনি ছিলেন আহমদ সরহিন্দী।”[১]

১. মুকাদ্দিমা সীরাত সাইয়িদ আহমদ শহীদ, ৩০-৩১ পৃ.।

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ আলফ-ই ছানী (র)

জীবন কাহিনী ঃ জন্ম থেকে খিলাফত প্রাপ্তি পর্যন্ত

খান্দান

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব বংশগত দিক দিয়ে ফারূকী।[১] তাঁর বংশধারা[২]

---

১. হযরত মুজাদ্দিদ হযরত ফারূক-ই আজম-এর সঙ্গে বংশসূত্রে সম্পর্কিত হবার দরুণ গর্ব অনুভব করতেন এবং তার ধর্মীয় মর্যাদাবোধকে এর দাবী ও স্বভাবিক পরিণতি বলে মনে করতেন। জমহূর আহলে সুন্নত ও আকাইদে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে একজন আরিফ শায়খ আবদুল কবীর য়ামানীর একটি গবেষণার কথা শ্রবণে তাঁর কলম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নোক্ত কথাগুলো বেরিয়ে গিয়েছিল ঃ مخدوما! ایں فقیر را تاب استماع امثال ایں سخنان نیست بے اختیار رگ فاروقیم درحرکت می اید মকতূব ১০০ (দফতর আওয়াল, মুল্লা হাসান কাশ্মিরীর নামে)। অপর এক পত্রে এ কথা শুনে যে, সামানা কসবার খতীব জুমুআর খুতবায় খুলাফায়ে রাশিদীন-এর উল্লেখ ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিত্যাগ করেছেন, তিনি লিখেন ঃ

چوں استماع ایں خبر وحشت انگیز در شورش اور دو رگ فاروقیم را حرکت داد بچن کلمات اقدام نمود ۔ (পত্র নং ১৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দফতর দ্বিতীয়)।

২. বংশধারা সম্পর্কে আমরা উল্লিখিত খান্দানের নয়নমণি, পণ্ডিত ও গবেষক মওলানা শাহ আবুল হাসান যায়দ ফারূকীর গবেষণামূলক আলোচনার উপর নির্ভর করেছি যা তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের বংশ-লতিকা সম্পর্কে তদীয় মাকামাত-ই খায়র গ্রন্থে حضرات اباء و اجداد کرام শিরনামে (২৬-৩৩) পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত এই যে, আটাশ মাধ্যম ওমর-এর পরে যাঁকে আমীরুল মু'মিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব মনে করা হয়, চারটি মাধ্যম সাধারণভাবে নসবনামা সংক্রান্ত কিতাবাদি থেকে পড়ে গেছে। সে চারটি মাধ্যম হল ঃ হাফ্‌স, 'আসেম, হযরত 'আবদুল্লাহ এবং হযরত ওমর আল-ফারূক। সম্ভবত ২৭তম মাধ্যম 'আবদুল্লাহ্‌র পর ওমরের নাম দৃষ্টে গ্রন্থকারগণ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, ইনিই মশহূর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা) সাহাবীর পুত্র সাহাবী। কিন্তু যেহেতু উক্ত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমরের কোন পুত্রের নাম নাসির ছিল না, এই জন্য এই সমস্যা দেখা দেয় এবং অনুসন্ধানের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এই খান্দানের একজন বিরাট পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ বুযুর্গ শাহ মুহাম্মদ হাসান মুজাদ্দিদী (সাঈদাঁদ সিন্ধ) ও মাহমূদ আহমদ সাহেব 'আব্বাসীর অভিমতও তাই এবং আহমদ হুসায়ন খানও جو هر معصومی-তে তাই লিখেছেন।

ঊর্ধ্বতন ৩১ মাধ্যমে আমীরুল মু'মিনীন ফারূক-ই আজম হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। বংশ-লতিকা এইরূপ ঃ

হযরত শায়খ আহমদ (মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী) ইব্‌ন মখদুম আবদুল আহাদ ইব্‌ন যয়নুল-'আবিদীন ইবন 'আবদুল হায়্যি ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীবুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম রফীউদ্দীন ইবন নাসীরুদ্দীন সুলায়মান ইবন ইউসুফ ইবন ইসহাক ইবন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন শু'আয়ব ইবন আহমদ ইবন ইউসুফ ইবন শিহাবুদ্দীন 'আলী ফররুখ শাহ্ ইব্‌ন নূরুদ্দীন ইবন নাসীরুদ্দীন ইবন মাহমূদ ইবন সুলায়মান ইবন মাসঊদ ইবন 'আবদিল্লাহ্ আল-ওয়াইজ আল-আসগার ইবন 'আবদিল্লাহ্ আল-ওয়াইজ আল-আকবার ইবন আবু'ল-ফাতাহ্ ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন নাসির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইবন ওমর ইবন হাফ্‌স ইব্‌ন 'আসেম ইব্‌ন হযরত আবদিল্লাহ্ ইবন হযরত ওমর আল-ফারূক (রা)।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফ-ই ছানী (র)-এর ১৫তম ঊর্ধ্বপুরুষ শিহাবুদ্দীন 'আলী ফররুখ শাহ্ কাবুলী এই সিলসিলার খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ কামিল ও খ্যাতিমান ফারূকী বংশীয় মনীষী, সংস্কারক ও মাশায়েখ যেমন হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে-শকর প্রমুখ তাঁরই বংশধর। দুঃখের বিষয় এই যে, আফগানিস্তানের 'উলামা' ও মাশায়েখের জীবনী আলোচনায় কোন বিস্তৃত তাযকিরা ও তাবাকাত গ্রন্থ না থাকায় তাঁদের বিস্তারিত জীবন-কাহিনী পাওয়া যায় না। তাঁদের যে ছিটেফোটা জীবনী পাওয়া যায় তার উৎস সেই সব গ্রন্থ যা মুজাদ্দিদ সাহেব ও তাঁর খান্দানের বিবরণ লিখতে গিয়ে লেখা হয়েছে।[১] শিহাবুদ্দীন 'আলী ফররুখশাহ্ কাবুলী ছিলেন শায়খ নূরুদ্দীনের পুত্র এবং শায়খ নসীরুদ্দীনের পৌত্র। এজন্যই তাঁর খান্দানকেও কাবুলের সঙ্গে সম্পর্কিত করে স্মরণ করা হয়। তিনি প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন। ইস-লামের প্রচার-প্রসার ও প্রচলনে, কুফর ও শির্ক-এর রীতিনীতি ও চালচলনের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনে তিনি বিশেষ উৎসাহী ও বৈশিষ্ট্যের দাবীদার ছিলেন।[২]

পিতার ইনতিকালের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আফগান (পাঠান) ও মুগলদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ নিরসনে প্রশংসনীয় প্রয়াস চালান। পার্থিব জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের সাথে সাথে বাতেনী সম্পদেও তিনি সম্পদশালী ছিলেন। বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর ফয়েয লাভে ধন্য হয়। ওফাতের পূর্বেই ক্ষমতা সাহেবযাদা শায়খ ইউসুফকে সোর্পদ

১. যেমন যুবদাতুল মাকামাত, হাদারাতুল কুদ্‌স প্রভৃতি;

২. যুবদাতুল মাকামাত, ৮৮-৮৯ পৃ.।

করত কাবুল থেকে ষাট মাইল উত্তরে অবস্থিত তাঁরই নামে নামকৃত ফররুখ শাহ উপত্যকায় নির্জনতা অবলম্বনপূর্বক ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।

শায়খ ইউসুফ জাহিরী ইল্‌ম হাসিলের পর স্বীয় বুযুর্গ পিতা সুলতান ফররুখ শাহ্‌ থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও লাভ করেন এবং তাঁর সাম্রাজ্য পরিত্যাগের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ন্যায়বিচার, সংস্কার ও সংশোধন এবং দীনদারীতে তিনি সুনামের অধিকারী ও সর্বজন-প্রিয় ছিলেন। তাঁর ভেতরও ইশ্‌ক-ই ইলাহীর সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই ছিল যা তাঁর পূর্বপুরুষদেরকে সময় সময় মওলানা রূম (র)-এর এই কবিতার প্রতি অনুগত ও আমলকারী হবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করছিল।

ملك دنيا تن پرستاں را حلال

ما غلام ملك عشق لا يزال

দুনিয়ার রাজত্ব ভোগবাদীদের জন্য বৈধ, কিন্তু আমরা অবিনশ্বর প্রেমরাজ্যের গোলাম।

তিনিও শেষ বয়সে সাম্রাজ্য ও ক্ষমতার মসনদ থেকে অবসর নিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং তদীয় সাহেবযাদা শায়খ আহমদ সাম্রাজ্যের দায়িত্ব হাতে তুলে নেন। তিনিও পিতার ন্যায় ইল্‌ম, তাকওয়া ও শাহী পোশাকে দরবেশ সিফতের বুযুর্গ ছিলেন। ঐশী আকর্ষণ তাঁকে এতটাই অভিভুত করে ছিল যে, তিনি সাম্রাজ্যের সকল কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নেন এবং চিরতরে তাকে বিদায় আরয জানান এবং সন্তানদেরকেও এর থেকে দূরে থাকবার জন্য ওসিয়ত করেন। কিছুটা সম্পদ পরিবার-পরিজনদের জন্য রেখে অবশিষ্ট সকল সম্পদ দরিদ্রদের ভেতর বন্টন করে দেন। তিনি তাঁর বুযুর্গ পিতা ছাড়াও শায়খুশ শুয়ূখ হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (কু. সি) থেকে বাতেনী সম্পদ লাভ করেছিলেন এবং খিলাফত লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

তারপর খান্দানের মুরুব্বীগণও দীনদারী ও যুহ্‌দ-এর অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং স্ব-স্ব যুগের জনপ্রিয় ও উচ্চ মরতবাসম্পন্ন মাশায়েখ থেকে সুলূকের প্রশিক্ষণ ও বাতেনী ফয়েয হাসিল করতে থাকেন তা সে যে কোন মহান সিলসিলার সঙ্গেই সম্পর্কিত হোক।

ইমাম রফীউদ্দীন মুজাদ্দিদ সাহেবের ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পুরুষ এবং শায়খ শিহাবুদ্দীন 'আলী ফররুখ শাহ্‌র নবম অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তিনি 'যুবদাতুল মাকামাত' প্রণেতার ভাষ্য মুতাবিক জাহিরী ও বাতেনী উভয় প্রকার ইল্‌মের সমন্বয় ছিলেন। বাতেনী তরবিয়ত ও সুলূকের তালীম হযরত মাখদূম জাহাঁনিয়াঁ জাহাঁগাশ্‌ত সাইয়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী (মৃ. ৭৮৫ হি.) থেকে হাসিল

করেছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, তিনি ৮ম শতাব্দীর শেষ কিংবা ৯ম শতাব্দীর প্রথম দিককার বুযুর্গ ছিলেন। তিনি এই খান্দানের প্রথম বুযুর্গ যিনি কাবুল থেকে ভারতবর্ষে তশরীফ রাখেন এবং সরহিন্দ-এ বসবাস করতে মনস্থির করেন। এর প্রাচীন নাম ছিল সহরন্দ। এ জায়গাটা ছিল অনাবাদী ও বন্য পশুর আবাস। এর ও সামানার মাঝে যেখানে শাহী রাজস্ব যেত আর কোন বসতি ছিল না। এর ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী লোকজন বিশেষত এখান থেকে ৬/৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত সুরায়স গ্রামের অধিবাসীরা হযরত মখদূম জাহাঁনিয়াঁর খেদমতে হাযির হয়ে (সুলতান ফীরূয শাহ্ তুগলক যাঁর ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন) অনুরোধ জানান যে, রাজধানীতে গিয়ে তিনি যেন সেখানে শহর আবাদের আন্দোলন করেন। সুলতান তাঁর খাহেশ ও ফরমায়েশ তামিল করেন এবং ইমাম রফীউদ্দীনের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ও সুলতানের অন্যতম পারিষদ খাজা ফতহুল্লাহকে উক্ত দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। খাজা সাহেব দু'হাজার অশ্বারোহীসহ সেখানে তাশরীফ নেন এবং দুর্গ নির্মাণ করেন। হযরত মখদূম জাহাঁনিয়াঁ ইমাম রফীউদ্দীনকে যিনি তাঁর খলীফা ও সালাতের ইমাম ছিলেন, সুন্নাম কসবায় অবস্থান করতেন, দুর্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে ও উক্ত শহরে বসবাস করতে নির্দেশ দেন। কেননা তিনি (ইমাম রফীউদ্দীন) ছিলেন উল্লিখিত শহরের বিলায়েতের অধিকারী। তখন থেকে তাঁর খান্দান সেখানেই বসবাস করছে।[১] দুর্গের ভিত্তি এবং সরহিন্দ-এর পত্তনের সূচনা ৭৬০ হিজরীতে বলে বলা হয়।[২]

১. বিস্তারিত যুবদাতুল মাকামাত, ৮৯-৯০ দ্র.

২. প্রাচীন ইতিহাসের সম্পর্ক যতটা তাতে মনে হয় যে, এই শহর কখনো শতদ্রু জিলার সদর মকাম ছিল। বিখ্যাত চীনা প্ররিব্রাজক হিউ-এন-সাং (যিনি খৃ. সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সফর করেছিলেন) এর উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর সফরনামায় লিখেছেন যে, এর আশেপাশে সোনা পাওয়া যায়। হিন্দীতে 'সর' অর্থ শের অর্থাৎ ব্যাঘ্র এবং 'আন্দ' অর্থ জঙ্গল। এককালে এটি হিন্দু ও গাযনাবীদের জন্য সীমান্তের ভূমিকা পালন করত এবং এর সামনে থেকে ভারতবর্ষ শুরু হয়ে যেত। সম্ভবত এজন্যই এটি 'সরহিন্দ' নামে মশহূর হয়ে যায় যা 'সহরান্দ'-এর কাছাকাছি উচ্চারণ। ৫৮৭/১১৫১ সালে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী সরহিন্দ জয় করেন। ফীরূয শাহ্ তুগলকের সিংহাসন আরোহণ অবধি দিল্লীর সুলতানগণ সরহিন্দকে আদৌ গুরুত্ব দেন নি। পরিবর্তে সামানাই তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ফীরূযশাহ তুগলকের আমল থেকে সরহিন্দের প্রতি নতুনভাবে মনোযোগ প্রদান শুরু হয়। এরপর থেকে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ আমীর-উমারা সরহিন্দ ও ফীরূযপুরের নাজিম হতে থাকেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সম্রাট বাবুর কয়েকবারই সরহিন্দ আসা-যাওয়া করেন। হুমায়ূনও সরহিন্দ আগমন করেন এবং এখান থেকেই দিল্লী এসে পুনর্বার সিংহাসনের অধিকারী হন। মুগল আমলে শহরের প্রাচুর্য ও ঔজ্জ্বল্যের অবস্থা ছিল এই যে, এখানে ৩৬০ মসজিদ, সরাইখানা, কুয়া ও মকবারা পাওয়া যেত। দা.মা.ই সরহিন্দ শরীফ নিবন্ধ থেকে সংক্ষেপিত।

এভাবে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জন্মের দু'শো বছর আগে থেকেই সরহিন্দ আবাদ চলে আসছিল।[১] তাযকিরা ও অনুবাদ গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, সেখানে অভিজাত ও আলিম-উলামার খান্দান বসতি স্থাপন করেছিল এবং এই মাটি থেকে কয়েকজন কামালিয়াতসম্পন্ন বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২] মনে হয় এর উত্থান ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক হি. ১০ম শতাব্দীর প্রথম পাদেই হয়েছিল। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খান্দানের কতিপয় নির্বাচিত ব্যক্তি ছাড়া বড় কোন সরহিন্দী আলিমের নাম তাযকিরা ও অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ১০ম শতাব্দী শুরু হবার পর সরহিন্দে জ্ঞানগত ও ধর্মীয় জাগরণ এবং দরস-তাদরীস তথা পঠন-পাঠনের উষ্ণ বাজার দৃষ্টিগোচর হয় এবং কয়েকজন কামালিয়াতসম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় আলিমের নাম নজরে পড়ে যাঁরা শিক্ষকতা ও হেদায়াতের মসনদে সমাসীন ও জনকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম বিখ্যাত মুদার্রিস মওলানা ইলাহদাদ ইবন সালিহ সরহিন্দী (মৃ. ৯২৭ হি.)-র নাম পাওয়া যায়। এরপর মওলানা শের আলী কাদেরী (মৃ. ৯৮৫ হি,), মওলানা আলী শের (মৃ. ৯৮৫ হি.)[৩], মুফতী আহমদ সরহিন্দী (মৃ. ৯৮৬ হি.), আলহাজ্জ ইবরাহীম সরহিন্দী (মৃ. ৯৯৪ হি) যিনি আল্লামা শিহাবুদ্দীন ইবন হাজার হায়তামী মক্কীর ছাত্র ছিলেন, মওলানা আবদুল্লাহ নিয়ায মাহদাবী[৪] (মৃ.১০০০ হি.) এবং এমন কতিপয় মনীষীর নাম দৃষ্টিগোচর হয় যাঁদের মৃত্যু সন জানা যায়নি। যেমন সেকালের মশহূর উস্তায মখদূমুল-মুল্‌ক মুল্লা আবদুল্লাহ সুলতানপুরীর উস্তাদ মওলানা আবদুল কাদির, শায়খ 'আলী আশিকান জৌনপুরীর মুরীদ মওলানা আবদুস সামাদ হুসায়নী, মওলানা আমানুল্লাহ , মওলানা কুতবুদ্দীন ও মাওলানা মাজদুদ্দীন। শেষোক্ত জন সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উস্তাদ মওলানা ইয়া'কুব কাশ্মীরীর সাক্ষ্য এই যে, তিনি তাঁর যুগের সর্বাধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলিম ছিলেন। সম্রাট

১. হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় বাসভূমি সরহিন্দ সম্পর্কে "মকতুবাতে' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং এতে খাস নূরানিয়ত ও সাকীনার উল্লেখ করেছেন (দ্র. মকতূবাত, দফতর ২য়, মকতূব ২২)।

২. ইতিহাস ও অনুবাদ গ্রন্থে কেবল তারীখে মুবারকশাহীর লেখক ইয়াহ্‌য়া ইবন আহমদের নাম মিলে যিনি হি. ৯ম শতাব্দীর অন্যতম গ্রন্থকার। তিনি তারীখে মুবারকশাহী ৮৩৮ হিজরীর সীমানায় লিখেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরান্দী লিখতেন (দামাই)।

৩. সম্ভবত দু'জন একই ব্যক্তি হবেন। গুলযারে আবরার ও নুযহাতুল খাওয়াতিরে উভয়ের নাম চিহ্নিত বিন্যাসে এসেছে।

৪. কথিত আছে যে, তিনি শেষ বয়সে মাহদাবী আকীদা থেকে তওবাহ করেছিলেন।

বাবুরের সঙ্গে সরহিন্দে তাঁর মোলাকাত হয়। সম্রাট তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করেন। মওলানা মীর 'আলী ও মওলানা বদরুদ্দীন সরহিন্দীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

হযরত মখদূম শায়খ 'আবদুল আহাদ

খাজা মুহাম্মদ হাশিম কাশ্‌মী "যুবদাতু'ল-মাকামাত" নামক গ্রন্থে হযরত মখদূম শায়খ আবদুল আহাদ-এর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হযরত খাজা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেদমতে লাগাতার তিন বছর ছিলেন এবং তার জানাশোনার বেশির ভাগ উৎস সেই সব বাণী ও উক্তি যা তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুখে বিভিন্ন সময় শুনেছেন। এক্ষেত্রে যদি কিছু অতিরিক্ত থেকে থাকে তা পুত্রবৎ মর্যাদা থেকে অর্জিত তথ্যের। এজন্য তাঁর প্রদত্ত বিবরণকে নির্ভরযোগ্য ও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বাণী সংকলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মনে করতে হবে। এখানে এর সংক্ষিপ্ত-সার পেশ করা হচ্ছে।

হযরত শায়খ আবদুল আহাদের যৌবনারম্ভে এবং ইল্‌ম হাসিল- কালীন প্রভু পরওয়ারদিগারের অন্বেষা ও ইলমু'ল-য়াকীন লাভের প্রেরণা এমনভাবে পেয়ে বসে যে, ইল্‌ম-এ পরিপূর্ণতা লাভের অপেক্ষা না করেই সেযুগের বিখ্যাত চিশতিয়া সাবিরী সিলসিলার শায়খ হযরত আবদুল কুদ্দূস গঙ্গূহী (র)-র খেদমতে হাযির হন এবং তাঁর থেকে যিক্‌র-আযকার-এর তালকীন ও সুলূক-এর তা'লীম হাসিল করেন। যখন তিনি হযরত 'শায়খ'-এর আস্তানায় পড়ে থাকবার আগ্রহ ও সংকল্পের কথা প্রকাশ করেন তখন আলোকিত অন্তরের অধিকারী পীর তা মনজুর করেন নি। তাকে তিনি ইলমে দীন ও ইলমে শারী'আত হাসিল ও এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জনের তাকীদ দেন এবং বলেন যে, "ইল্‌ম ব্যতিরেকে যে দরবেশী লাভ ঘটে তাতে লবণ-পানি কিছুই হয়না।" মখদূম হযরত শায়খ (র)-এর বয়সের আধিক্য দৃষ্টে আরয করেন যে, আমার আশংকা হয় 'ইলমে দীন-এ পূর্ণতা অর্জনের পর যখন আমি আবার এই আস্তানায় হাযির হব তখন এই চিরন্তন সম্পদ পাই কিনা?[২] উত্তরে শায়খ (র) বলেন ঃ যদি আমাকে না পাও তাহলে আমার ছেলে রুকনুদ্দীন থেকে তা হাসিল করবে। মখদূম হুকুম তামিল করেন এবং ইল্‌ম হাসিলে মশগুল হন।

তকদীরের ব্যাপার যে, তিনি যেই আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন অবশেষে তাই সত্যে পরিণত হল। ইল্‌ম হাসিল থেকে ফারিগ হবার পূর্বেই শায়খ গঙ্গূহী (র)

১. এসব নাম নুযহাতুল খাওয়াতির-এর ৪র্থ খণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের জীবনী জানতে চাইলে দ্র. উক্ত গ্রন্থ।

৩. শায়খ-এর চির বিদায় গ্রহণের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছিল।

পরলোকে যাত্রা করেন। মখদুম প্রচলিত ইল্ম-এ পরিপূর্ণতা লাভের পর কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বুযুর্গদের থেকে উপকৃত হন। অতঃপর হযরত শায়খ রুকন উদ্দীন-এর খেদমতে হাযির হন, সুলূক-এর বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করেন এবং চিশতী ও কাদিরী সিলসিলায় খিলাফতের খিরকা এবং তালকীন ও তরবিয়তের এজাযত লাভে ধন্য হন।[১]

এ দু'জন বুযুর্গ শায়খ আবদুল কুদ্দূস গঙ্গূহী ও শায়খ রুকনুদ্দীন- এর উপর ইস্তিগরাক-এর প্রাবল্য ছিল এবং তাঁরা আল্লাহ্র প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। বিশেষত শায়খ আবদুল কুদ্দূস (র) 'ওয়াহদাতু'ল-ওজুদ'-এর প্রকাশ করতে ও ঘোষণা দিতে নিজেকে আদিষ্ট ভাবতেন এবং তিনি এর একজন অত্যুৎসাহী দাঈ ও মুবাল্লিগ ছিলেন। অধিকন্তু সুন্নাহ্র অনুসরণ ও আমলের ক্ষেত্রে 'আযীমতের উপর চলার ব্যাপারে দৃঢ়পদ ছিলেন। আত্মবিলুপ্তি ও নাফসানিয়াত শূন্যতার প্রাবল্য ছিল। অত্যন্ত নরম দিলের মানুষ ও অত্যধিক ইবাদতগুযার বুযুর্গ ছিলেন। সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন এবং অন্তিম মুহূর্তের কথা বেশি করে ভাবতেন।[২]

স্বীয় পীর যাঁদের হাতে তিনি বায়'আত হয়েছিলেন অর্থাৎ শায়খ 'আবদুল কুদ্দূস গঙ্গূহী ও শায়খ রুকনউদ্দীন (র) ছাড়া মখদূম শায়খ আবদুল আহাদের কাদিরী সিলসিলার মশহূর বুযুর্গ হযরত শাহ কামাল ক্যাথলীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। হযরত শাহ কামাল স্বীয় যুগের বিরাট কামালিয়াতের অধিকারী ও সাহিব-ই হাল বুযুর্গ ছিলেন।[৩]

শায়খ আবদুল আহাদের একথা পূর্বেই গুযরে গেছে যে, যদি অন্তচক্ষুর সাহায্যে দেখা যায় তবে দেখা যাবে যে, কাদিরিয়া সিলসিলায় এর প্রতিষ্ঠাতা পীরান পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র)-র পর অনুরূপ মর্তবার লোক খুব কমই চোখে পড়ে। তাঁর পৌত্র শাহ সিকান্দরও বড় উচ্চ মরতবার শায়খ ছিলেন। হযরত মখদূম তাঁর থেকেও উপকৃত হয়েছিলেন।

হযরত মখদূম আবদুল আহাদ ইল্ম হাসিল থেকে ফারিগ হয়ে আল্লাহওয়ালা মানুষের সন্ধানে বিভিন্ন শহর সফর করেন। সফরকালীন তিনি দৃঢ় সংকল্প হন যে, যেখানে বিদ'আতের চিহ্নমাত্র চোখে পড়বে সেখানে মুরীদ হওয়া তো দূরের কথা

১. শায়খ রুকনউদ্দীন তাঁকে যে খিলাফতনামা প্রদান করেছিলেন তা যুবদাতু'ল-মাকামাত-এ হুবহু লিপিবদ্ধ রয়েছে (দ্র.৯২-৯৬ পৃ.)। এর বড় অংশই আরবীতে।

২. কামালিয়াত, যওক ও ওয়াজ্দ-এর জন্য দ্র. হযরত শায়খ গঙ্গুহীর পুত্র শায়খ রুকনউদ্দীন রচিত 'লাতাইফে কুদ্দুসী', খাজা মুহাম্মদ হাশিম কাশমী কৃত যুবদাতুল-মাকামাত, ৯৭-১০১ পৃ. এবং নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

৩. তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলে দ্র. নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

তার সাহচর্যও এড়িয়ে চলবেন। সফরে শায়খ ইলাহদাদ-এর সাহচর্য থেকেও উপকৃত হন। রোহতাস-এ শায়খ ইলাহদাদ এবং 'তাওদীহু'ল-হাওয়াশী'র গ্রন্থকার মওলানা মুহাম্মদ ইবন ফখর-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাঁদের দরস-এ শরীক হন। তিনি বাঙ্গলায়ও তাশরীফ নেন এবং জৌনপুরেও কয়েকদিন হযরত সায়্যিদ 'আলী কাওয়াম ('আলী আশিকান)-এর খেদমতে থাকেন। এই সফর থেকে তিনি সরহিন্দ ফিরে আসেন। অতঃপর আ-মৃত্যু এখানেই অবস্থান করেন, আর কোথাও যাননি। মা'কূলাত (মানতিক, দর্শন ও ইলমে কালাম সম্পর্কিত) ও মানকূলাত (কুরআন-হাদীস ও এতদসম্পর্কিত)-এর প্রচলিত কিতাবসমূহ অত্যন্ত পাবন্দীর সাথে, গভীর অধ্যবসায় ও চিন্তশীলতার সঙ্গে পড়াতেন। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব বলতেন যে, তিনি সব ধরনের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ-এ তাঁর কোন তুলনা ছিলনা। যখন তিনি উসূলে বায়দাবীর দরস প্রদান করতেন তখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-র ফিক্হ-এর ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চতর শান, মর্যাদা ও নেতৃত্ব ফুটে উঠত। তিনি তাসাওউফের কিতাবাদিরও দ্রস দিতেন। বিশেষত 'তা'আর্রুফ' 'আওয়ারিফুল-মা'আরিফ' ও ফুসূসুল হিকাম-এর মর্মার্থ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদির গুঢ় রহস্যের সমাধান করতে তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন। বিচার-বিশ্লেষণ ও রুচির দিক দিয়ে তিনি শায়খুল আকবার-এর মতানুসারী ছিলেন। কিন্তু খোদাদত্ত উন্নত প্রতিভা, সংযম ও শরীয়তের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের দরুন মুখ দিয়ে কখনো মত্ততা ও প্রলাপমূলক কথা বের হয়নি। স্বার্থলেশহীনতা ও নির্জনতার প্রাধান্য ছিল। ছাত্রের আধিক্য সত্ত্বেও কখনো কারো থেকে খেদমত নিতেন না। ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেই বাজার থেকে নিয়ে আসতেন। সুন্নত অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। যথাসম্ভব কোন সুন্নত তাঁর থেকে ছুটতে পারত না। অভ্যস্ত বিষয়াদি, লেবাস-পোশাকেও সুন্নত অনুসরণের ইহতিমাম করতেন। 'আযীমতের উপর আমল করতেন এবং রুখসত থেকে পরহেয করতেন। যদিও চিশতিয়া ও কাদিরিয়া সিলসিলায় বায়'আত হয়েছিলেন ও খিলাফত পেয়েছিলেন এবং এসব তরীকায় উচ্চ নিসবতের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইখলাস তথা ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বুলন্দ হিম্মতির দলীল এই যে, তিনি নক্শবান্দিয়া তরীকার প্রতিও গভীর আগ্রহের কথা প্রকাশ করতেন এবং এ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসামূলক উক্তি করতেন। যেমন তিনি বলতেন যে, "আমি দু'আ করি যেন এই মহান সিলসিলা আমাদের দেশে এসে পৌছে। হে খোদা ! আমাকে এর মারকাযে পৌঁছে দিন.

যেন আমি এথেকে উপকৃত হতে পারি"। তিনি লেখকও ছিলেন। 'কুনূযু'ল হাকাইক' ও 'আসরারু'ত-তাশাহ্‌হুদ' তাঁর অন্যতম রচনা।[১]

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলেন যে, আমার ওয়ালেদ মাজেদকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে, আহলে বায়ত-ই কিরাম-এর মুহব্বত ঈমানের হেফাজত ও ঈমানী মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যখন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হল তখন আমি একথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ! আমি সেই মুহব্বতে মাতাল এবং সেই অনুগ্রহ সাগরে নিমজ্জিত।

الهی بحق بنی فاطمه   که بر قول ایماں کنی خاتمه[২]

হে আল্লাহ্! ফাতিমা (রা)-এর বংশধরদের ওসিলায় দোআ করি, ঈমানী কালেমার সাথে যেন আমার মৃত্যু হয়।

সফরকালে যখন তিনি সেকেন্দ্রা[৩] নামক স্থানে পৌঁছেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন তখন সেখানে তাঁর শরাফত ও নজাবত (অভিমত), উপদেশ ও তাকওয়া-পরহেযগারী এবং ইল্‌ম ও 'আমলের সাম্রগ্রিকতাদৃষ্টে সেখানাকার এক শরীফ খান্দান নিজেরাই বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং উক্ত খান্দানের সালিহা খাতুন নাম্নী এক নেক-সীরত (সচ্চরিত্রবতী) মহিলার সঙ্গে 'আক্‌দ সম্পন্ন করেন। মখদূমের সকল সন্তান এই মহিলারই গর্ভজাত।

হযরত মখদূম (র) কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুরশিদের ন্যায়ই সাত সন্তান দান করেছিলেন। যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁদের নাম নিম্নরূপ ঃ

শাহ্ মুহাম্মদ, শায়খ মুহাম্মদ মাসঊদ, শায়খ গুলাম মুহাম্মদ, শায়খ মওদূদ।[৪] দু'ভাইয়ের নাম ও বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি। এঁদের মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ছিলেন মধ্যমণি। অপরাপর সকল সন্তানই ছিলেন 'আলিম ও যোগ্যতার অধিকারী এবং তাঁরাও প্রচলিত 'ইল্‌ম ও সুলূক-এর তা'লীম আপন ওয়ালেদ ও সমকালীন বুযুর্গদের থেকেই লাভ করেছিলেন।

হযরত মখদূম আশি বছর বয়সে ১০০৭ হিজরীর ১৭ই রজব তারিখে এই

---

১. খাজা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী 'যুবদাতুল-মাকামাত' নামক গ্রন্থে আসরারু'ত-তাশাহহুদের কিছু বিষয় উদ্ধৃত করেছেন (১১৮-২০ পৃ.)। হযরত মুজাদ্দিদের মুখে হযরত মখদূমের কতক ফাওয়াইদ ও গবেষণার নির্যাস উদ্ধৃত করেছেন (১২০-২২ পৃ.)।

২. যুবদাতুল-মাকামাত, ১২৩ পৃ.।

৩. যুবদাতুল মাকামাত প্রণেতা একে আটাওয়াহ্‌র নিকটবর্তী বলেছেন। এথেকে মনে হয় যে,তা বর্তমান উত্তর প্রদেশে (ইউ.পি.তে) অবস্থিত ছিল।

৪. শায়খ গুলাম মুহাম্মদ ও শায়খ মওদূদের নামে মুজাদ্দিদ সাহেবের পত্রাবলী রয়েছে। দ্র. ১খ

নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।[১] কবর মুবারক সরহিন্দ শহর থেকে পশ্চিম দিকে আনুমানিক এক মাইল দুরে অবস্থিত।[২]

হযরত মখদূম (র)-এর জীবন-চরিতের বিশেষ সম্পদ হল তাঁর সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরায়ণতা, শরীয়ত ও সুন্নতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং এসবের উপর আমল করবার সযত্ন প্রয়াস, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে উন্নত মনোবল ও বুলন্দ হিম্মতি বলা যেতে পারে। এই সম্পদই হৃদয়ের গহীন কোণে [যাঁর ভাগ্যে দীনের তাজদীদ (সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন) এবং ভারতবর্ষে মিল্লাতের পুঁজি ও সম্পদের তত্ত্বাবধানের সৌভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল] সযত্নে রোপিত হয়েছিল যাঁকে ঐশী অনুগ্রহ প্রোজ্জল পূর্বক ও অনন্য সেই কামালিয়াত দান করত মধ্যাহ্ন সূর্যে পরিণত করে দিয়েছিল।

জন্ম ও অন্যান্য অবস্থা

জন্মও শিক্ষা

৯৭১ হিজরীর (১৫৬৩ খৃ.) ১৪ই শওয়াল জুমু'আর রাত্রে সরহিন্দ শহরে তাঁর জন্ম। নাম রাখা হয় শায়খ আহমদ। خاشع শব্দ থেকে তাঁর জন্ম সন নির্ণীত হয়। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে রুশ্‌দ ও সা'আদত (সাধুতা ও সৌভাগ্য)-এর আলামত পরিস্ফুট ছিল। بالائے سرش زهوش مندی می تافت ستاره بلندی

সমকালীন বুযুর্গদের বিশেষত হযরত শাহ্ কামাল ক্যাথলীর (যাঁর সঙ্গে ওয়ালেদ বুযুর্গের বাতেনী নিসবত তথা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল) তাঁর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ও স্নেহ দৃষ্টি ছিল এবং তিনি তাঁর সাথে বিশেষ ধরনের ব্যবহার করতেন।[৩] সাত বছর বয়ঃক্রমকালে যখন শায়খ কামাল ইহলোক ত্যাগ করেন তখন শায়খ-এর হুলিয়া মুবারক তাঁর স্মরণ ছিল এবং যে ঘরে ওয়ালেদ সাহেবের সাথে গিয়ে দেখা করেছিলেন তার ছবিও তাঁর স্মৃতিপটে জাগরুক ছিল।

কুরআন মজীদ হিফ্জ-এর মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং অল্প সময়েই তিনি তা সমাপ্ত করেন। অতঃপর ওয়ালেদ মাজেদের (পিতার) খেদমতে ধারাবাহিক শিক্ষা শুরু করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর খোদাদত্ত প্রতিভার

১. বিস্তারিত জানার জন্য যুবদাতুল-মাকামাত, ১২৭ পৃ.। কেউ কেউ তাঁর ইন্তিকাল ১৭ই রজব আবার কেউ কেউ ২৭ জমাদিউল আখিরা বলেছেন। ১০০৭ হিজরীর ব্যাপারে সকলেই একমত।

২. যুবদাতুল-মাকামাত, ১২২ পৃ.

৩. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. যুবদাতুল মাকামাত, ১২৭-১২৮ পৃ.।

স্ফূরণ ও বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ যথা সত্বর গ্রহণ এবং সেগুলো নিজের ভাষায় সরল পন্থায় পেশ করবার ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়। বেশির ভাগ লেখাপড়া তিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতা এবং কিছু কিছু সমকালীন কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিম থেকে হাসিল করেন। কিছুকাল পর সেযুগের বিখ্যাত ইলমী ও তা'লীমী মারকায (শিক্ষাকেন্দ্র) সিয়ালকোট গমন করেন এবং যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন, 'ইলমে কালাম ও উসূলে ফিক্হ-এ অভিজ্ঞ, যাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি, ব্যাপক অধ্যয়ন ও পাঠদান শক্তির খ্যাতি ছিল দেশ জোড়া সেই মওলানা কামাল কাশ্মীরীর[১] নিকট যাঁর শাগরিদদের মধ্যে আল্লামা 'আবদুল হাকীম সিয়ালকোটির ন্যায় নেতৃস্থানীয় আলিম ও মুদার্রিসীন জন্মগ্রহণ করেছেন, তৎকালীন নিসাবে তা'লীম (পাঠ্য সূচী)-এর কতক সর্বোচ্চ ও উন্নত পর্যায়ের কিতাব (যেমন 'আদুদী) পড়েন এবং হাদীস শাস্ত্রের তৎকালীন সম্রাট শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইব্ন হাজার হায়তামী মক্কীর[২] শাগরিদ শায়খ ইয়া'কূব সরফী কাশ্মীরীর নিকট হাদীসের কতক কিতাবাদি পাঠ করেন। শিহাবুদ্দীন আহমদের রচিত কিতাবাদির মধ্যে সহীহ বুখারীর একটি ভাষ্য রয়েছে।

শায়খ ইয়া'কূব-এর বড় বড় মুহাদ্দিছ ও গ্রন্থকারদের থেকে হাদীস ও তাফসীরের কিতাবাদি এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহের এজাযত লাভ ঘটেছিল। তিনি তাঁর যুগের মশহূর 'আলিমে রব্বানী কাযী বাহলূল বাদাখশানী থেকে যিনি 'ইলমে হাদীস ও তাফসীরে সর্বোচ্চ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং হাদীসে শায়খ 'আবদুর রহমান ইব্ন ফাহ্দ-এর সুযোগ্য ও সুপ্রিয় শাগরিদ ছিলেন, সহীহ বুখারী, মিশকাতুল মাসাবীহ্, শামাইলে তিরমিযী ও অপরাপর কিতাবাদি, ছালাছিয়াত-ই বুখারী ও মুসালসাল হাদীস-এর সনদ হাসিল করেন। অধিকন্তু মুতাকাদ্দিমীন-এর দস্তুর মাফিক তাফসীরের কিতাবাদি প্রভৃতির সনদও সেই সব

১. মওলানা কামালুদ্দীন ইব্ন মূসা ৯৭১ হিজরীতে কাশ্মীর থেকে সিয়ালকোট স্বীয় আবাস পরিবর্তন করেন এবং অর্ধশতাব্দীকাল পঠন-পাঠনে নিমগ্ন থেকে ১০১৭ হিজরীতে লাহোরে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন (নুযহাতুল খাওয়াতির)।

২. মওলানা ইয়া'কূব ইব্ন আল-হাসান আস-সারফী কাশ্মীরীর জন্ম ৯০৮ হিজরীতে কাশ্মীরে। বিদ্যার্জন ও তরীকা লাভের উদ্দেশ্যে সমরকন্দ গমন করেন যেখানে শায়খ হুসায়ন খারিযমী থেকে কুবরাবিয়া তরীকা হাসিল করেন এবং বেশ কিছুকাল তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। হেজাযে গিয়ে ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন এবং সেখান থেকে ফিক্হ, হাদীস ও তাফসীরের সর্বোত্তম কিতাবাদি সংগ্রহ করত সঙ্গে নিয়ে আসেন। ১০০৩ হিজরীর ১২ই যী-কা'দাঃ তারিখে তাঁর ইনতিকাল হয়(নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃ.)। এভাবেই স্বীয় উস্তায মওলানা ইয়া'কূব-এর মাধ্যমে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সিহাহ অধ্যয়ন এবং হাদীসের মৌলিক কিতাবাদির সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ ঘটে থাকবে।

তাফসীরের মুফাস্সির পর্যন্ত পৌছান।[১] সতের বছর বয়সে শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তিনি পার্থিব ও অপার্থিব এবং এ সবের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে শিক্ষা সমাপ্তির পর দরস ও তাদরীস তথা পঠন ও পাঠন-এর সূচনা করেন এবং আরবী ও ফারসীতে কিছু পুস্তিকাও লিখেন যাঁর ভেতরে রিসালায়ে তাহলীলিয়া, রিসালায়ে রদ্দে মযহাবে শী'আ অন্তর্গত। তিনি রাজধানী আকবরাবাদ (আগ্রা)ও গমন করেন এবং আবুল ফযল ও ফৈযীর সাহচর্যেও কাটান। কিন্তু মত ও রুচির বিভিন্নতার কারণে তাঁদের সঙ্গে তাঁর খাপ খায়নি। কয়েকবার তর্ক ও বাদানুবাদ পর্যন্ত তা গিয়ে গড়ায় এবং আবুল ফযলের লাগামহীন উক্তিতে তিনি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সেখানে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। আবু'ল-ফযল লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান ও ক্ষমা প্রার্থর্না করেন। একবার ফৈযী যিনি সে সময় নুকতাবিহীন তাফসীর سواطع الالهام রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এক স্থানে উপযোগী নুকতাবিহীন শব্দ পেতে ও মর্ম প্রকাশে বাধার সম্মুখীন হন। ফলে কলম থেমে যায়। হযরত মুজাদ্দিদ-এর সঙ্গে তাঁরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সমস্যার সমাধান করেন। ফলে ফৈযীকে তাঁর যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করতে হয়।

আগ্রায় তাঁর অবস্থান কিছুটা দীর্ঘ হয়ে যায়। পিতার তাঁকে দেখার সাধ জাগে। বার্ধক্য ও সফরের দুরত্ব সত্ত্বেও তিনি আগ্রায় তাশরীফ নেন। হযরত মুজাদ্দিদ স্বয়ং ওয়ালেদ বুযুর্গের সঙ্গে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লী ও সরহিন্দের মাঝে যখন তাঁরা থানেশ্বর শহর অতিক্রম করছিলেন তখন সেখানকার রঈস ও অমাত্য, একই সঙ্গে সেযুগের অন্যতম 'আলিম ও ফাযেল এবং সুল-তানের নৈকট্যপ্রাপ্ত ও থানেশ্বরের তৎকালীন শাসক শায়খ সুলতান অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদেরকে গ্রহণ করেন ও মেহমান হিসাবে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করেন। অতঃপর এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে এবং হযরত মুজাদ্দিদ-এর আমল-আখলাক ও বৈশিষ্ট্যদৃষ্টে তাঁকে আপন কন্যা সম্প্রদানের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। ওয়ালেদ সাহেব এই সম্বন্ধ কবুল করেন এবং সেখানেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বর-বধূকে রুখসত করত সরহিন্দ তশরীফ নেন।

সুলূক-এ প্রশিক্ষণ ও পরিপূর্ণতা লাভ এবং হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র হাতে বায়'আত গ্রহণ

এক্ষেত্রে তাসাওউফ ও সুলূক-এর অপরিহার্যতা এবং এর শরঈ ও ইল্মী

১. মুসালসাল হাদীস ও অন্যান্য হাদীসের সনদ যুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থে বিদ্যমান।

প্রমাণপঞ্জীর উপর নতুন করে লিখবার দরকার করে না। কেননা এই সিরিজের (তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত সিরিজ যা 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই তিনটি খণ্ড পাঠকমহলে পৌছে গেছে।-অনুবাদক) পাঠক ১ম খণ্ডের অধ্যয়ন থেকেই, যেখানে হযরত খাজা হাসান বসরী, সায়্যিদুনা হযরত 'আবদুল কাদির জিলানী ও মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর আলোচনা স্থান পেয়েছে এবং তৃতীয় খণ্ডে তো আগাগোড়া ভারতবর্ষের দু'জন বুযুর্গ-শ্রেষ্ঠের জীবনীই স্থান পেয়েছে, এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন। যদি আরও জানতে চান, তৃপ্তি পেতে চান তাহলে মৎপ্রণীত "তাযকিয়া ও ইহ্সান তাসাওউফ ও সুলূক" (এ বইটিও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।-অনুবাদক) নামক পুস্তকটি পড়ুন।

এখানে কেবল এতটুকু বলা প্রয়োজন মনে করছি যে, যেই পরিবেশ ও যেই যুগে হযরত মুজাদ্দিদ (র) কে স্বীয় নাযুক ও কষ্টসাধ্য পুনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড আনজাম দিতে হয়েছিল সেখানে তাসাওউফ ইসলামী সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে এমনভাবে ঘুলিয়ে গিয়েছিল যে,তা এর মেযাজ ও রুচিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বিশিষ্ট লোকদের কথা তো পরে, সাধারণ লোকেরা অবধি কোন 'আলিম, শিক্ষক কিংবা সংস্কারককে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে, তাঁর ভক্ত সমর্থকে পরিণত হতে এবং তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি ও বিদ্যা-বুদ্ধি থেকে উপকৃত হতে চাইত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা তাসাওউফ ও সুলূক-এর গলি-খুপচির সঙ্গে পরিচয় এবং মকবূল ও নির্ভরযোগ্য কোন সিলসিলা বা তরীকার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোন পীর-মাশায়েখের সাহচর্য্য ধন্য না হতেন। এমনিতেও কোন না কোন দর্জায় তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি, ইখলাস ও য়াকীন, ব্যথা ও জ্বালা ব্যতিরেকে (যা সাধারণত অধিক যিকর ও সাহচর্য ছাড়া হাসিল হয় না) শুধু 'ইল্ম-এর প্রাচুর্য ও বাগ্মিতার জোরে কোন প্রকৃত বিপ্লব সাধিত হয় না। মোটের উপর সেই যুগ ও পরিবেশে তাসাওউফ ও সুলূক, রূহানী কুওত (আধ্যাত্মিক শক্তি) ও হৃদয়ের জ্যোতি ব্যতিরেকে সংস্কার ও বিপ্লবের প্রয়াস চালানো ছিল ঠিক তেমনই যেমন অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণ, অনুশীলন বা মহড়া ছাড়াই কোন ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে অবতণ করা এবং কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র ফৌজের মুকাবিলা করা অথবা কোন এমন লোক যিনি বাকশক্তি থেকে প্রকৃতিগতভাবেই বঞ্চিত- শেখাবার ও বুঝাবার দায়িত্ব পালন করতে চান। এটা ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি ও ঐশী কৌশলেরই দাবী যে, সংস্কার ও বিপ্লবের এই ময়দানে অবতরণের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত শায়খ আহমদ

আস-সরহিন্দীকে তাসাওউফ ও সুলূকের কেবল সূক্ষ্মতত্ত্ববিদই বানাননি বরং কামালিয়াতসম্পন্ন ও পুর্ণতাপ্রাপ্ত বুযুর্গদের সাহচর্য ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, অতঃপর ঐশী অনুগ্রহ ও বিশেষ মনোনয়নের মাধ্যমে তাঁকে এতে ইমামত (নেতৃত্ব) ও ইজতিহাদের দর্জায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যেন তিনি এই বিরাট দায়িত্বকে পূর্ণ প্রস্তুতি ও পরিপূর্ণ আস্থাসহকারে আনজাম দিতে পারেন এবং এর প্রভাব পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণে কোণে ও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও কায়েম থাকে।

ذلك تقدير العزيز العليم

সরহিন্দ পৌঁছে পিতার জীবিত কাল অবধি তাঁরই খেদমতে অতিবাহিত করেন, তাঁর থেকে অপরিমেয় বাতেনী ফায়দা হাসিল করেন এবং চিশতিয়া ও কাদিরিয়া তরীকার সুলূক অতিক্রম করেন। এরই সাথে জাহিরী ইল্‌ম-এর তা'লীমের সিলসিলাও অব্যাহত রাখেন।

এসময়ই হজ্জ-ই বায়তুল্লাহ্‌ ও মদীনা শরীফের যিয়ারতের প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে এবং এই আগ্রহের আতিশয্য তাঁকে অশান্ত ও অস্থির করে তোলে। কিন্তু যেহেতু বুযুর্গ পিতা ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং বাহ্যত দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় মুহূর্তও ঘনিয়ে আসছিল বিধায় এমতাবস্থায় তাঁকে ছেড়ে যাওয়াও তিনি সমীচীন মনে করেন নি। অতঃপর ১০০৭ হিজরীতে পিতার মৃত্যুতে সেই প্রতিবন্ধকতা যখন আর রইল না তখন ১০০৮ হিজরীতে হারামায়ন শারীফায়ন উপস্থিতি ও বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ আদায় মানসে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সরহিন্দ থেকে যাত্রা করে দিল্লী পৌঁছেন। দিল্লীর উলামা ও ফুযালা-ই কিরাম যাঁদের কানে তাঁর বুযুর্গী ও কামালিয়াতের খ্যাতি পূর্বেই গিয়ে পৌঁছেছিল—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। এঁদের মধ্যে মওলানা হাসান কাশ্মীরীও ছিলেন যাঁর সঙ্গে তিনি পূর্বেই পরিচিত ছিলেন। আলাপচারিতার সময় তিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র উচ্চ মর্তবা ও আধ্যাত্মিক শক্তির উল্লেখ করেন যিনি কিছু দিন আগেই মাত্র দিল্লী এসেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় পিতার সুত্রে নক্‌শবান্দিয়া তরীকার আলোচনা ও এব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কথা শুনেছিলেন বিধায় তিনিও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং একে হারামায়ন শারীফায়ন-এ উপস্থিতির প্রস্তুতি ও এর একটি সওগাত মনে করে হাযিরা দেবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং মওলানা হাসান কাশ্মীরী[১]-র সমভিব্যাহারে সেখানে

১. হযরত মুজাদ্দিদ (র) সমগ্র জীবনভর তাঁর (হযরত হাসান কাশ্মীরীর) অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন। যেহেতু তাঁর মাধ্যমেই তিনি এই চিরন্তন সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন (দেখুন পত্র নং ২৭৯, ১ম দফতর)।

গিয়ে হাযির হন। সম্ভবত সেই মুহূর্তে অদৃশ্য লোক থেকে এই আওয়াজ ভেসে এসে থাকবে ঃ

آمد آں یارے کہ ما می خواستیم

বন্ধুর শুভাগমন ঘটল আমরা যার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম।

এই قران السعدین-এর অবস্থা বর্ণনা করবার ও এর পরবর্তী ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করবার পূর্বে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্-র পরিচিতি পেশ করা জরুরী মনে করছি।[১] এই ধারাবাহিকতায় আমরা সেই নিবন্ধ উদ্ধৃত করছি যা নুযহাতুল-খাওয়াতির (৫ম খণ্ড)-এর লেখক হযরত খাজা (কু-সি)-র আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন এবং তাই হবে যথেষ্ট। যেহেতু উক্ত গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির সারাংশ এসে গেছে।

হযরত শায়খ আবদুল বাকী নক্‌শবন্দী দেহলভী (খাজা বাকী বিল্লাহ্)

মহান শায়খ কুতুবু'ল-আকতাব ইমামুল-আইম্মা রাদিয়্যুদ্দীন আবু'ল মুআয়্যিদ 'আবদুল-বাকী ইব্‌ন আবদিস-সালাম বাদাখ্‌শী (বাকী বিল্লাহ্ নামে খ্যাত), অতঃপর দেহলভীর অস্তিত্ব পৃথিবীর জন্য বরকত ও সৌন্দর্যের কারণ ছিল। তাঁর পবিত্র জীবন ও অস্তিত্ব ছিল সৃষ্টিজগতের মহান উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের বিকাশ ও অভিব্যক্তি।[২] তাঁর পবিত্র যবান ছিল হাকীকতের মুখপাত্র এবং তাঁর পবিত্র সত্তা ছিল আল্লাহ্ পরিচিতির সংক্ষিপ্ত-সার, ইল্‌ম ও মা'রিফতে আল্লাহর উন্মুক্ত নিদর্শন। বিলায়াত ও রূহানিয়াতের আলোকোজ্জ্বল এই মিনার ৯৭১-৭২ হিজরীর প্রান্তরেখায় কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং মওলানা মুহাম্মদ সাদিক হালওয়াঈর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁর সাথে মাওয়ারাউন-নাহ্‌র সফর করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। অতঃপর তাঁর অন্তর মানসে সূফী তরীকায় প্রবেশের আগ্রহ জন্মে যার পরিণতিতে প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ বিদ্যার্জন পরিত্যাগ করেন এবং মাওয়ারাউন-নাহ্‌র-এর শহরসমূহের বহু বুযুর্গশ্রেষ্ঠ-এর মজলিসে হাযিরা দিতে থাকেন। তিনি সর্বাগ্রে মখদূম আ'জম দহবেদীর খলীফা মওলানা লুতফুল্লাহর খলীফা শায়খ খাজা উবায়দ-এর হাতে তওবা করেন। কিন্তু

১. নকশবন্দিয়া তরীকার বুযুর্গ শ্রেষ্ঠদের, বিশেষত এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ-এর জীবনী, এই সিলসিলার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ নিসবতের সংক্ষিপ্ত অবহিতি লাভের জন্য সিলাসিলার প্রস্ফুটিত পুষ্প হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দেহলভী রচিত গ্রন্থাদি বিশেষ করে الانتباه فی سلاسل اولیاء الله অধ্যয়ন করুন।

২. অর্থাৎ এই আয়াত وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون (আমি জিন্ন ও ইনসানকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আমার ইবাদত করে) এর বাস্তব ব্যাখ্যা ও উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

ইস্তিকামত (দৃঢ়তা,স্থিরতা)-র চিহ্ন যখন ফুটে উঠল না তখন শায়খ আহমদ য়াসুভী সিলসিলার বুযুর্গ শায়খ ইফতিখার-এর সমরকন্দ আগমনে তিনি তাঁর হাতের উপর দ্বিতীয় বার তওবা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারও যখন স্বীয় দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্পের ক্ষেত্রে ঘাটতি অনুভব করলেন তখন অস্থির অবস্থায় আমীর 'আবদুল্লাহ্ বল্খীর হাতে তৃতীয় দফা তওবা করেন এবং কিছুকাল এর সীমারেখা রক্ষায় পাবন্দ থাকেন। কিন্তু শেষ অবধি এই তওবাও অটুট রইল না। ইতিমধ্যে তিনি স্বপ্নে হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ-এর যিয়ারত লাভ করেন এবং আল্লাহ্ওয়ালাদের তরীকার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। যেখানেই সম্ভব হত তিনি সেখানেই গমন করতেন, এমন কি তিনি কাশ্মীরে শায়খ বাবা কুবরাবীর খেদমতে পৌঁছেন এবং তৎকর্তৃক উপকৃত হন। তাঁর সাহচর্যে তাঁর উপর ঐশী অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হয় এবং এই সিলসিলার পরিচিত অদৃশ্যতা ও অস্তিত্বহীনতার (غيبت و فنائيت) চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত শায়খ-এর ইনতিকালের পর তিনি শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এভাবে ভ্রমণ ও কল্যাণ অন্বেষার কাল অতিবাহিত হবার পর হযরত খাজা 'উবায়দুল্লাহ আহরার (র)-র রূহ প্রকাশিত হয়ে তাঁকে নক্শবন্দী তরীকার তা'লীম দেন এবং তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন। এরপর তিনি মাওয়ারাউ'ন-নাহ্র যান। সেখানে শায়খ মুহাম্মদ আমকিনকীর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাঁকে তিন দিন পর তরীকার এজাযত প্রদান করত বিদায় দেন। অতঃপর তিনি হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লাহোরে একবছর অবস্থান করেন। এখানে বহু 'উলামায়ে কিরাম তাঁর থেকে উপকৃত হন। এরপর তিনি সেখান থেকে রাজধানী দিল্লীতে তাশরীফ নেন এবং ফীরূযী দুর্গে অবস্থান করেন। দুর্গের ভেতর একটি বড় খাল ও একটি বিরাট মসজিদ ছিল। ওফাত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন।

তিনি উচ্চ পর্যায়ের সাহিবে ওয়াজ্দ ও যওক এবং নেহায়েত নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের লোক ছিলেন। অপরিচিত ও ভিন লোকদের থেকে স্বীয় উন্নততর হালত লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন এবং নিজেকে হেদায়েত দানের যোগ্য মনে করতেন না। কেউ যদি তাঁর নিকট বাতেনী উপকার ও কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করত তখন তিনি তাঁকে বলতেন ঃ আমার কাছে কিছু নেই, অন্য কোন বুযুর্গের খেদমতে গমন করুন। আর তেমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেলে আমাকেও বলবেন। মোটকথা, এতদুদ্দেশ্যে আগমনকারী লোকদের খেদমত ও অন্তরকে প্রবোধ দানে মশগুল থাকতেন এবং কোন প্রয়োজন বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মসলার বিশ্লেষণ দানের নিমিত্তই কেবল মুখ খুলতেন ও সম্বোধিত ব্যক্তির পথ

প্রদর্শনের নিমিত্তে মসলার পূর্ণ বিশ্লেষণ করতেন। তিনি বন্ধুদেরকে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন এবং নিজেকে তাদেরই ন্যায় একজন মনে করতেন ও সকল অবস্থায় তাদের সঙ্গে সমব্যবহার ও সমআচরণ করতেন। বিনয় ও নম্রতার ধারণায় তিনি খালি মাটির উপরও বসে যেতেন।

তিনি অত্যাশ্চর্য রূহানী ও প্রভাব শক্তির অধিকারী ছিলেন। যার উপর তাঁর নজর পড়ে যেত তার অবস্থা বদ্‌লে যেত এবং পয়লা সাহচর্যেই যওক ও শওক এবং মা'রিফতের অধিকারী লোকদের কায়ফিয়াত তথা অবস্থা লাভ ঘটত এবং প্রথম তাওয়াজ্জুহ ও তালকীনেই প্রার্থীর কলব জারী হয়ে যেত। তাঁর ফয়েয ও সৃষ্টিকুলের উপর স্নেহধারা এত সাধারণ ও ব্যাপক ছিল যে, ভীষণ শীতের এক রাত্রে কোন কাজে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে যান। ফিরে এসে দেখতে পান যে, লেপের ভিতর এক বিড়াল শুয়ে। তিনি তাকে জাগানো ও সরিয়ে দেবার পরিবর্তে ভোর অবধি বসেই কাটিয়ে দেন। একবার লাহোর অবস্থানকালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় তিনি কিছু খাননি। তাঁর নিকট যেই খাবারই আসত অভাবী ও হাজতমন্দদের মাঝে তা বিলিয়ে দিতেন। লাহোর থেকে দিল্লী যাবার পথে একজন অক্ষম ও অসহায় লোকদৃষ্টে সওয়ারী থেকে নেমে পড়েন এবং তাকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর পরিচিত লোকদের হাত থেকে বাঁচার নিমিত্ত তিনি আপন মুখ ঢেকে তার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পায়ে হেটে চলেন, এরপর তিনি আরোহণ করেন। ভুল স্বীকার করতে এবং নিজেকে অপরাধী ভাবতে তিনি আদৌ ইতস্তত করতেন না। তিনি তাঁর সাথীদের থেকেই নয় বরং সর্বসাধারণ থেকেও নিজেকে বিশিষ্ট ভাবতেন না।

কথিত আছে যে, তাঁর প্রতিবেশী এক যুবক সর্বপ্রকার কুকর্মে জড়িত ছিল। তিনি সব কিছু জানা সত্ত্বেও তা বরদাশ্‌ত করতেন। একবার তাঁর মুরীদ খাজা হুসামুদ্দীন দেহলভী স্থানীয় শাসনকর্তার নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে শাসনকর্তা তাকে বন্দী করেন। শায়খ জানতে পেরে মুরীদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মুরীদ জানায়, "হযরত! যুবকটি বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির।" হযরত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ জী, হাঁ! তোমরা ছিলে বড়ই সৎ ও সাধু আর তাই তার অন্যায় ও দোষ-ঘাট তোমাদের অনুভবে ধরা পড়েছে। কিন্তু আমিতো আমাকে তার চেয়ে ভাল মনে করি না আর নিজেকে ফেলে শাসনকর্তা অবধি তার সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে দৌড়েও যাইনি। এরপর চেষ্টা-তদবীর করে শাসনকর্তাকে বলে তাকে ছাড়িয়ে আনেন। ওদিকে সে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে শুধরে নেয় এবং পরিশীলিত ও মার্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

যখনই তাঁর মুরীদদের থেকে কোন অন্যায় কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেত তখনই তিনি বলতেন যে, এছিল আমারই অন্যায় ও বিচ্যুতি যা তার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ইবাদত-বন্দেগী ও পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। সেজন্য প্রথম দিকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। কেননা এব্যাপারে বহু হাদীস ও শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

এই যে কয়েকটি ঘটনা পেশ করা হল তা তাঁর ফযীলত ও কামালিয়াতের এক মা'মূলী অংশ এবং তাঁর বিশাল চরিত্র-সিন্ধুর একটি বিন্দু মাত্র। এজন্যই দেখা যায় যে, অত্যল্পকালের মধ্যেই কত বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর থেকে বাতেনী ফয়েয লাভে ধন্য হয়েছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যতদুর জানা যায়, এই মুবারক সিলসিলা (নক্শবান্দিয়া তরীকা) তাঁরই মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে যা তাঁর আগে আর কেউ জানতও না।[১]

শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন ফযলুল্লাহ্ বুরহানপূরী বলেন যে, ওয়াজ-নসীহতে ও লোকদেরকে সৎপথ প্রদর্শনে তাঁর কোন তুলনা ছিলনা। কেননা মাত্র তিন চার বছরের মুদ্দতে স্বীয় কল্যাণকর ও ফলপ্রসু প্রয়াসের মাধ্যমে জগতে তিনি আলোর বিস্তার ঘটান। এর বিস্তৃত বিবরণ মুল্লা হাশেম কাশ্মীর "যুবদাতু'ল-মাকামাত" নামক গ্রন্থে মিল্বে। তিনি মাত্র চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং ভারতবর্ষে আগমনের পর কুল্লে চার বছর জীবিত ছিলেন। আর এই স্বল্পকালের ভেতর তাঁর সঙ্গী-সাথী ও বান্ধববর্গ কামালিয়াতের সর্বোচ্চ সোপানে পৌছে যান, এমনকি তাঁরা বিগত কালের সিলসিলাগুলোর প্রভাব বিলুপ্ত করে দেন এবং নক্শবান্দিয়া তরীকা সমস্ত সিলসিলার উপর বিজয় লাভ করে।

মুহাম্মদ ইব্ন ফযলুল্লাহ্ মুহিব্বী "খুলাসাতু'ল-আছার" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, "হযরত শায়খ আল্লাহ্র একটি নিশানী, প্রদীপ্ত জ্যোতি, ঐশী গুপ্ত-রহস্য,

---

১. নক্শবান্দিয়া সিলসিলা ভারতবর্ষে দু'টো পথে পৌছে। তন্মধ্যে একটি আমীর আবুল 'আলা আকবরাবাদীর মাধ্যমে যিনি আপন পিতৃব্য আবদুল্লাহ আহরারী থেকে নক্শবান্দিয়া তরীকায় এজাযত ও খিলাফত লাভ করেছিলেন। এই তরীকায় চিশতিয়া ও নক্শবান্দিয়া তরীকা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও জড়িত। কাল্পী, মারহারা, দানাপুর প্রভৃতি জায়গায় আবুল আলাঈ সিলসিলা তাঁর দ্বারাই চালু আছে। দ্বিতীয় পথ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র। মূলত ভারতবর্ষে এই সিলসিলার প্রচার হযরত খাজার আগমন এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই সিলসিলায় প্রবেশের মাধ্যমে ঘটে। অতঃপর তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে (আচ্ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যা ফি'ল-হিন্দ, নুযহাতুল খাওয়াতির-এর গ্রন্থকার মওলানা সায়্যিদ আবদুল হাই কৃত)।

ইল্‌মে জাহের ও বাতেন ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। নীরব প্রকৃতি, বিনয়ী ও এমন সচ্চরিত্রের মালিক ছিলেন যে, মানুষের মধ্যে আদৌ বিশিষ্ট ভাবতেন না, এমন কি তিনি সাথী-বান্ধবদেরকে তাঁর সম্মানে দাঁড়াতে বাধা দিতেন এবং তাঁর সঙ্গে মা'মূলী আচার-আচরণ প্রদর্শনের কথা বলতেন।

মুহিব্বী বলেন যে, তাঁর থেকে অলৌকিক সব ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। যার উপর তাঁর চোখ পড়ত অথবা যেই তাঁর সিলসিলায় দাখিল হত অমনি তার উপর বিলুপ্তি ও ফানার প্রভাব জেঁকে বসত যদিও এই পথের সঙ্গে তার কোন পূর্ব সম্বন্ধ নাও থাকত। মানুষ তাঁর দরজায় বেহুশের মত পড়ে থাকত। কারো কারোর উপর প্রথম পাদেই 'আলমে মালাকূত উদ্ভাসিত হয়ে যেত যা ছিল অদৃশ্য আকর্ষণেরই পরিণতি।

তাঁর মুরীদদের মধ্যে মুজাদ্দিদিয়া তরীকার ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র), হযরত শায়খ তাজুদ্দীন ইব্‌ন সুলতান উছমানী সম্ভলী, শায়খ হুসসামুদ্দীন ইব্‌ন শায়খ নিজামুদ্দীন বাদাখশী, শায়খ ইলাহদাদ দেহলভী (র)-র মত জলীলুল-কদর মাশায়েখ ও সৃষ্টিকুলের মারজা' (প্রত্যাবর্তনস্থল) বুযুর্গ ছিলেন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কতিপয় দুর্লভ পুস্তিকা, মূল্যবান পত্র ও পবিত্র কবিতা রয়েছে যন্মধ্যে "সিলসিলাতু'ল-আহরার" নামক গ্রন্থ রয়েছে যে গ্রন্থে তিনি ফারসী ভাষায় ব্যক্ত শ্লোকে স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

১০১৪ হিজরীর জুমাদা'ল-আখিরার ১৪ তারিখে বুধবার চল্লিশ বছর চার মাস বয়সে দিল্লীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর কবর পশ্চিম দিল্লীতে কদম রসূল (স)-এর সন্নিকটে অবস্থিত। প্রত্যহ বহু লোক তাঁর কবর যিয়ারত করে থাকে।

বায়'আত ও পূর্ণতা প্রাপ্তি

হযরত মুজাদ্দিদ (র) হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ (র)-র খেদমতে হাযির হন। হযরত খাজা যেন তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিলেন। সাদর আগ্রহ ও স্নেহভরে তিনি তাঁকে গ্রহণ করেন। হযরত খাজা (র)-র স্বভাব প্রকৃতিতে ছিল প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ এবং তিনি বিলম্বে ধরা দিতেন। কাউকে নিজে থেকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতেন না। কিন্তু এখনকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রার্থীত জনই স্বয়ং প্রার্থী। আল্লাহ্ পাকই চাচ্ছিলেন হযরত খাজা (র) কর্তৃক হযরত মুজাদ্দিদকে রূহানী পূর্ণতা দান করতে এবং সেই নিসবতে খাস প্রদান করতে যা সেই যুগে নক্‌শবান্দিয়া তরীকা বহন করছিল, যার বাতেনী সুলূক-এর জগত ও ভারতবর্ষের এই রূহানী পরিবেশে প্রয়োজন ছিল এক নতুন ধরন ও

পদ্ধতিতে দীনের তাজদীদ অথবা নবজীবন দানের কাজ নেওয়া, তরীকতকে শরীয়তের অধীনে স্থাপন, সুলুকের মনযিল (স্তর)-সমূহকে অতিক্রম করানো এবং উপায়-উপকরণের সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান। হযরত খাজা (র) তাই প্রথা-বিরুদ্ধভাবে বলেন ঃ আপনি কিছু দিন আমাদের মেহমান হিসাবে থাকুন। এক মাস, নিদেনপক্ষে এক সপ্তাহই থাকুন।

হযরত খাজা (র) যখন ভারতবর্ষে আগমনের এরাদা করেন তখন তিনি ইস্তিখারা করেছিলেন। ইস্তিখারার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, একটি সুন্দর তোতা পাখী, খুব মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, উড়ে এসে তাঁর হাতের উপর বসল। তিনি তাঁর মুখের থুথু পাখীর মুখে দিচ্ছেন আর পাখী তার চঞ্চু দ্বারা তাঁর মুখে চিনি পরিবেশন করছে। হযরত খাজা (র) তাঁর পীর ও মুরশিদ হযরত খাজা আ-মকিনকীকে এই ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বলেন যে, তোতা ভারতবর্ষীয় পক্ষী। তোমার প্রশিক্ষণের দ্বারা ভারতবর্ষে এমন কোন ব্যক্তির জন্ম লাভ ঘটবে যাঁর মাধ্যমে বিরাট এক জগত আলোকদীপ্ত হবে। এর একটি অংশ তুমিও লাভ করবে।[১]

এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জন্য কোনরূপ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কিংবা ওযর পেশের সুযোগই-বা ছিল কোথায়? কেননা তাঁর নিজের ভেতরই তো একজন খিযির-এর ন্যায় পথ-প্রদর্শক ও ঝর্ণা আবেহায়াতের সন্ধানে আকুলি-বিকুলি করছিল। তিনি এই দাওয়াত কবুল করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অবস্থান এক মাস দুই সপ্তাহে গিয়ে দাঁড়ায়। এই নিকট সান্নিধ্যে নক্শবান্দিয়া তরীকা হাসিলের প্রতি তাঁর এত বিপুল আগ্রহ জন্মে যে, তিনি বায়'আত হবার দরখাস্ত পেশ করেন। হযরত খাজা (র) নির্দ্বিধায় তাঁর আবেদন কবুল করেন এবং নিভৃতে নিয়ে গিয়ে কলবী যিকিরের তালকীন করেন। তাঁর তাওয়াজ্জুহের ফলে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কলবী যিকির জারী হয়ে যায় এবং তিনি এর এমন মিষ্টতা ও স্বাদ অনুভব করেন যে, দিনের পর দিন বরং প্রতি মু-হূর্তে তা বর্দ্ধিত হতে থাকে। হযরত খাজা (র) তাঁর এই অবস্থা ও উন্নতির বিদ্যুৎ গতি দৃষ্টে বুঝতে পারেন যে, এই সেই অপরূপ দর্শনীয় তোতা যা তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল এবং এরই অপরূপ সৌন্দর্যে ও কণ্ঠ-সংগীতের দ্বারা ভারতবর্ষের ফুলবাগিচায় বরং ইসলামের বাগিচায় নবতর বসন্তের সমাগম হবে।

جہانے را دگر گوں کرد یك مرد خود آگا ہے

---

১. যুবদাতুল মাকামাত, ১৪০-৪১. হাযারাতুল -কুদ্স, ২৬-২৭ পৃ.।

আত্মসচেতন এক পুরুষ পৃথিবী পাল্টে দিল, পাল্টে দিল পৃথিবীর পরিবেশ।

এই দুই-আড়াই মাসে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর যে বাতেনী কায়ফিয়াত (আধ্যাত্মিক অবস্থা) ও উন্নতি লাভ ঘটে এবং তিনি সুলূক-এর যেসব স্তর অতিক্রম করেন তা বর্ণনা করা ও শব্দের গাথুনীতে তা উপলব্ধি করা কিংবা করানো সম্ভব নয়।[১]

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد زباغباں
بلبل چہ گفت وگل چہ شنید وصباچہ کرد

কার এমন দুঃসাহস যে বাগানের মালিকে জিজ্ঞেস করবে যে, বুলবুল কি বলল, ফুল কি শুনল আর ভোরের স্নিগ্ধ কোমল বাতাস কি বার্তা বয়ে আনল।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এরপর সরহিন্দ তশরীফ নেন। এই প্রথম বারেই হযরত খাজা (র) তাঁকে সুখবর দেন যে, তুমি নক্শবান্দিয়া তরীকার নিসবত পরিপূর্ণরূপেই লাভ করেছ। আশা করা যায় এতে দিন দিন তোমার উন্নতি লাভ ঘটবে। দ্বিতীয় বার যখন তিনি দিল্লীতে হাযির হন তখন তিনি (হযরত খাজা) তাঁকে খেলাফতের খেলাত দ্বারা ধন্য করেন এবং আল্লাহ্ সন্ধানীদেরকে তরীকতের তা'লীম, ইরশাদ ও হেদায়েত দানের এজাযত দেন এবং তাঁর বিশিষ্টতম সাথীদেরকেও তরীকতের তা'লীম প্রদানের জন্য তাঁর নিকট সোপর্দ করেন।

এরপর হযরত মুজাদ্দিদ তৃতীয় ও শেষ বারের মত হযরত খাজা (র)-র খেদমতে হাযির হন। হযরত খাজা (র) বহু দূর অবধি বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ও বিরাট সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি তাঁকে তাওয়াজ্জুহ্র হাল্কার মধ্যমণি বানান এবং মুরীদদেরকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে কেউ যেন তাঁর (হযরত খাজার) প্রতি মনোনিবেশ না করে। বিদায় দেবার সময় বলেন যে, "খুবই দুর্বল বোধ হচ্ছে। জীবনের আশা খুবই কম। এরপর তিনি তাঁর দুই দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ ও হযরত খাজা 'আবদুল্লাহকে তাঁর উপস্থিতিতে তৎকর্তৃক (হযরত মুজাদ্দিদ) তাওয়াজ্জুহ প্রদান করেন এবং বলেন যে, এদের মাকেও গায়েবানা তাওয়াজ্জুহ দিন। তাওয়াজ্জুহ্র আছরও তাৎক্ষণিকভাবেই দেখা দেয়।[২]

১. যদি কেউ তা দেখতে চান তাহলে তিনি হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্র দুই পুত্র হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ ও খাজা আবদুল্লাহর নামে লিখিত ৪র্থ খণ্ডে সংরক্ষিত দফতর ১-এর ২৯৬ নং পত্র দেখুন। মওলানা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মীর নামে লিখিত ৫ম খণ্ডের দফতর ১-এর ২৯০ নং পত্রও পাঠ করতে পারেন।

২. যুবদাতুল মাকামাত, ১৫৫ পৃ.।

হযরত মুজাদ্দিদ-এর উচ্চতর মরতবা সম্পর্কে হযরত খাজা (র)-র মৌখিক সাক্ষ্য

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) তাঁর এক অকৃত্রিম বন্ধুকে এই সম্পর্কের পর একটি পত্রে লিখেন ঃ সরহিন্দের অধিবাসী শায়খ আহমদ বিপুল বিদ্যাবত্তার অধিকারী শক্তিশালী 'আমলওয়ালা বুযুর্গ। অধীনের সঙ্গে কয়েক দিনের উঠা-বসায় তাঁর অত্যদ্ভুত কামালিয়াত ও গুণাবলী ধরা পড়েছে। আশা করা যায় যে, সে এমন এক প্রদীপে পরিণত হবে যদ্দ্বারা এক বিশাল জগৎ প্রদীপ্ত হবে। তাঁর সামগ্রিক অবস্থার উপর আমার অটুট আস্থা রয়েছে।

স্বয়ং হযরত মুজাদ্দিদ-এর প্রথম তাওয়াজ্জুহ ও তালকীন থেকেই দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, তিনি এই পথের সর্বোচ্চ সোপানে গিয়ে উপনীত হবেন। এরই সাথে নিজের দোষ-ত্রুটি ও আপন অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কেও তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এই সঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রায় আবৃত্তি করতেন ঃ

ازیں نورے کہ از تو برد لم تافت
یقین دانم کہ آخر خواهمت یافت[১]

তোমার থেকে যে নূর আমার অন্তরজগতে প্রজ্জ্বলিত হল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অবশেষে তা কাংক্ষিত প্রেমাস্পদকে পেয়েই যাবে।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই আধ্যাত্মিক তরক্কী এবং ইল্‌মী ও 'আমলী ফযীলত তথা মর্যাদার সাথে সাথে স্বীয় শায়খ ও মুরশিদকেও অত্যন্ত আদব ও সম্মান করতেন। কোন সময় শায়খ (র) যদি তাঁকে ডেকে পাঠাতেন তখন চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তাঁর শরীরে কাঁপন দেখা দিত।[২] এদিকে শায়খ-এর আচরণও তাঁর সঙ্গে এমন ছিল যা খুব কমই কোন শায়খ তার মুরীদের সঙ্গে করে থাকেন। একবার তিনি বলেন ঃ

شیخ احمد آفتاب است کہ مثل ما ہزاراں سیار گاں در ضمن ایشاں گم اند

"শায়খ আহমদ সেই প্রদীপ্ত ভাস্কর যার আলোক—বিভায় আমাদের মত হাযারো তারকা নিষ্প্রভ।"[৩]

---

১. যুবদাতুল মাকামাত, ১৪৫ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ১৪৯ পৃ. ।
৩. প্রাগুক্ত, ৩৩০ পৃ.।

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, অবস্থা, হেদায়েত, তা'লীম ও তরবিয়তী তৎপরতা এবং ওফাত

সরহিন্দে অবস্থান

হযরত খাজা থেকে ফয়েয লাভ ও কামালিয়াত হাসিলের পর হযরত মুজাদ্দিদ (র) সরহিন্দ গিয়ে একান্ত নিভৃত জীবন অবলম্বন করেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি রূহানিয়াত প্রার্থীদেরকে তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) দানে বিরত থাকেন এবং নিজের মধ্যে ঘাটতি তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্রুততর গতিতে হচ্ছিল এবং তাঁর প্রকৃতিও ছিল উত্থানমুখী। এমতাবস্থায় প্রার্থীদের তা'লীম ও তরবিয়তের প্রতি মনোনিবেশ করা ছিল তাঁর পক্ষে দুষ্কর। এর জন্য অধঃমুখী হওয়া দরকার ছিল যা তখন অবধি হয়নি।

এক পত্রে তিনি লিখেছেন যে, (এই অবস্থায়) "আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কিত জ্ঞান দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। যে সব প্রার্থী আমার নিকট জড়ো হয়েছিল তাদেরকে একত্র করে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি বললাম এবং তাদেরকে বিদায় দিলাম। কিন্তু ঐ সব প্রার্থী একে আমার বিনয় ভেবে আমার প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ত্যাগে রাযী হলনা। কিছু কাল পর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় হাবীব (স.)-এর তোফায়ল-এ অপেক্ষমান ও প্রত্যাশিত আহওয়াল দান করেন।"[১]

অবশেষে সেই মুহূর্তও ঘনিয়ে এল ও তাঁর ফয়েয সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হল এবং প্রার্থীদের পূর্ণতা দান ও হেদায়েত প্রদানের কাজ শুরু হল। মুজাদ্দিদ সাহেব স্বীয় মুরীদ ও তরীকতের ভ্রাতৃবৃন্দের অবস্থা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বিস্তৃত আকারে আপন শায়খকে লিখে জানাতে থাকেন। এমন সব সুস্বপ্ন ও কায়ফিয়াত প্রকাশিত হয় যদ্দ্বারা তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁকে দিয়ে বড় কোন কাজ নেবেন এবং তাঁর দ্বারা দীনের কোন আজীমু'শ-শান খেদমত

---

১. মকতূবাত, পত্র নং ২৯০, দফতর ১।

আনজাম পাবে।[১] তৃতীয় বারের উপস্থিতির পর আর হযরত খাজা (র)-র সাহচর্য ভাগ্যে জোটেনি।

লাহোর সফর

হযরত মুজাদ্দিদ কিছুকাল সরহিন্দে অবস্থানপূর্বক স্বীয় শায়খ-এর ইঙ্গিতে ও নির্দেশে লাহোর সফর করেন। দিল্লীর পর লাহোর ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় 'ইলমী ও দীনী মারকায (শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্র)এবং সেখানে বহু সংখক 'উলামা ও মাশায়েখ বর্তমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক তাঁর আগমন বার্তা শ্রবণে তাঁকে সাদর ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেন।[২] মওলানা তাহের লাহোরী (যিনি পরে হযরত মুজাদ্দিদ-এর বিশিষ্ট খলীফাদের অন্তর্গত হন), মওলানা হাজী মুহাম্মদ,মওলানা জামালুদ্দীন তালভী তাঁর হস্তে হস্ত স্থাপন পূর্বক বায়'আত করত মুরীদ দলভুক্ত হন। এখানে যিক্‌র ও মুরাকাবার হালকা কায়েম হত এবং সাহচর্যের মজলিস সরগরম থাকত।[৩]

হযরত মুজাদ্দিদ লাহোর অবস্থান কালেই হযরত খাজা (র)-র ইনতিকালের খবর পান। মুজাদ্দিদ-এর উপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। অস্থির ও বিপর্যস্ত অবস্থায় তিনি দিল্লী দিকে সফরের মোড় ঘুরিয়ে দেন। পথেই সরহিন্দ কিন্তু তথাপিও ঘরে না গিয়ে সোজা স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের মাযারে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি শায়খ (র)-এর পুত্রদের ও তরীকতের ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি শোক জ্ঞাপন করেন এবং তাদের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্ত কয়েক দিন দিল্লী অবস্থান করেন। অতঃপর তরবিয়ত ও হেদায়েতের যেই মাহফিল খাজা (র)-র অবর্তমানে শূন্য হয়ে গিয়েছিল তা পুনরায় জীবন্ত এবং বিমর্ষ ও শোকাহত দিল সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।[৪]

কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি সরহিন্দ গমন করেন। এরপর মাত্র একবার দিল্লী ও দু'তিনবার আগ্রা যাবার সুযোগ ঘটে। শেষ জীবনে তিন বছর শাহী সৈন্যের সঙ্গে (যার বিবরণ সামনেই মিলবে) কয়েকটি শহর ও স্থান অতিক্রম কালে সে সব শহর ও স্থানের লোকজন তাঁর সাহচর্য থেকে উপকৃত হয়।[৫]

১. দ্র. পত্র নং ৮৪, দফতর ২।
২. যুবদাতুল-মাকামাত, ১৫৭ পৃ.।
৩. যুবদাতু'ল-মাকামাত, ১৫৮ পৃ. রওদাতু'ল-কায়্যুমিয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এই সফরে খান খানান ও মুর্তাযা খান (সায়্যিদ ফরীদ) বায়'আত ও মুরীদ হন। ১১৭ পৃ.।
৪. প্রাগুক্ত, রওদাতু'ল-কায়্যুমিয়া, ১৬৬-৬৭।
৫. প্রাগুক্ত, রওদাতু'ল-কায়্যুমিয়া, ১৬৬-৬৭।

দাওয়াত ও তাবলীগ, হেদায়াত ও তরবিয়তের বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা এবং তৎপ্রতি ধাবমান ব্যাপক জনস্রোত

১০২৬ হিজরীতে তিনি তাঁর বহু খলীফাকে হেদায়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের প্রেরণ করেন। এঁদের ৭০ জনকে মওলানা মুহাম্মদ কাসিমের নেতৃত্বে তুর্কিস্তানের দিকে পাঠিয়ে দেন, ৪০ জনকে মওলানা ফররুখ হুসায়নের নেতৃত্বে আরব,য়ামন, শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন,জর্দান ও ফিলিস্তীন) ও রোম (তুরস্ক)-এর দিকে পাঠানো হয়। ১০ জন যিম্মাদার ও তরবিয়তপ্রাপ্ত হযরত মওলানা মুহাম্মদ সাদিক কাবুলীর অধীনে কাশগড়ের দিকে,৩০ জন খলীফা মওলানা শায়খ আহমদ বাকীর নেতৃত্বে তূরান, বাদাখশান ও খুরাসান গমন করেন। এ সমস্ত হযরত স্ব-স্ব স্থানে বিরাট সাফল্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ এঁদের থেকে উপকৃত হয়।[১]

বহু নামী-দামী উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ যাঁদের আপন আপন জায়গায় বিরাট সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হত, দুর্গম ও দুরতিক্রম্য মনযিল অতিক্রমপূর্বক সরহিন্দ-এ উপস্থিত হন এবং বায়'আত গ্রহণ করেন ও আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করেন। এঁদের মধ্যে বাদাখশানের শাহের আস্থাভাজন শায়খ তাহের বাদাখ্‌শী, তালিকানের বিখ্যাত 'আলিম শায়খ আবদুল হক শাদমানী, মওলানা সালেহ্ কূলাবী, শায়খ আহমদ বরসী, মওলানা ইয়ার মুহাম্মদ ও মওলানা য়ুসুফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এঁদের অধিকাংশকেই খিলাফত ও এজাযত প্রদান করত দাওয়াত ও হেদায়াতের নিমিত্ত স্ব-স্ব স্থানে পাঠিয়ে দেন।[২]

ভারতবর্ষেও তিনি বিভিন্ন জায়গায় তাঁর খলীফাদেরকে দাওয়াত ও হেদায়াতের নির্দেশ দেন। খাজা মীর নু'মানকে খিলাফত প্রদান করত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তাঁর খানকাহে কয়েকশ' আরোহী ও অগণিত মানুষ পায়ে হেটে যিক্‌র ও মুরাকাবার উদ্দেশ্য হাযির হ'ত। শায়খ বদী'উদ্দীন সাহারনপূরীকে খিলাফত প্রদান করত প্রথম সাহারনপুর, অতঃপর শাহী সৈন্যনিবাস আগ্রায় মোতায়েন করেন। সেখানে তিনি লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং সর্বজনগ্রাহ্য হন। সাম্রাজ্যের বহু অমাত্য তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হন। সেনাবাহিনীর হাযার হাযার সদস্য তাঁর মুরীদ হয়। প্রতিদিন লোকের এত বেশী ভীড় হ'ত যে,

১. যুবদাতুল মাকামাত, ১৫৯ পৃ.।

২. বিস্তারিত দ্র. রওদাতু'ল-কায়্যূমিয়্যা, ১২৮-২৯, হাযারাতু'ল-কুদ্‌স-এও খলীফাদের আলোচনায় নানাভাবে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ এবং হেদায়াত ও তরবিয়তের নিমিত্ত নির্দেশ দানের উল্লেখ রয়েছে। দ্র. ২৯৯-৩৬৯ পৃ.।

বড় বড় আমীর-উমারা খুব কষ্টে তাঁর যিয়ারত লাভে সক্ষম হ'ত। মীর মুহাম্মদ নু'মান কাশ্মীকে যিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র অন্যতম খলীফা ছিলেন, পুনরুপি বায়'আত করত এজাযতনামা প্রদান পূর্বক বুরহানপুর প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি সকলের প্রত্যাবর্তন স্থলে পরিণত হন। লোকের অবস্থার সংশোধন ও পরিশুদ্ধি ঘটে। শায়খ তাহের লাহোরীকে লাহোর (যা ছিল ভরতবর্ষের দ্বিতীয় শিক্ষা ও রাজনৈতিক কেন্দ্র)-এর আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসুদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। তাঁর মাধ্যমে পার্শ্ববতী এলাকায় আধ্যাত্মিক ফয়েয পৌঁছে। শায়খ নুর মুহাম্মদ পাটনীকে এজাযত প্রদান করত পাটনা শহরের দিকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর মাধ্যমে তৎসন্নিহিত এলাকায় হেদায়াত ও তাবলীগ এবং ধর্মীয় জ্ঞান (দীনী ইল্ম) থেকে ফায়দা হাসিলের ধারা শুরু হয়। শায়খ হামীদ বাঙ্গালী[১]কে সুলুকের মনযিলসমূহ অতিক্রম করিয়ে এবং তা'লীম ও তরীকতের এজাযত প্রদানপূর্বক বাঙ্গালা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। শায়খ তাহের বাদাখ্শীকে কামালিয়াত হাসিলের পর তা'লীম ও তরীকতের এজাযত দান করত জৌনপুর প্রেরণ করেন। মওলানা আহমদ বার্কী তা'লীম ও তরবিয়তে অনুমতি লাভের পর বার্ক পৌঁছে জনগণকে সৎপথ প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ দানে মশগুল হয়ে পড়েন এবং স্বীয় মুরীদদের অবস্থাসমূহ পত্রের মাধ্যমে হযরতের খিদমতে লিখে পাঠাতে থাকেন। শায়খ আবদুল হাই হিসার শাদমান (ইস্ফাহান এলাকার)-এর অধিবাসী ছিলেন। মকতূবাত-এর ২য় দফতর তৎকর্তৃক বিন্যস্ত ও সংকলিত। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাকে তা'লীম ও তরীকতের অনুমতি প্রদান পূর্বক পাটনা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। শায়খ আবদুল হাই শহরের মধ্যে তরীকত পিয়াসীদের তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। শায়খ নূর মুহাম্মদ গঙ্গা নদীর ধারে হেদায়াত ও তরবিয়তের ঝর্নাধারা জারী করে রেখেছিলেন। শায়খ হাসান বার্কীও আপন স্বদেশভূমিতে সুন্নাহ ও তরীকা প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। সাইয়্যিদ মুহিব্বুল্লাহ মানিকপূরীকে খিলাফত প্রদান করত মানিকপুর প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর অনুমতিক্রমে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হন। শায়খ করীমুদ্দীন বাবা হাসান আবদালী বিশেষ তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ধন্য হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[২] ১০২৭ হি. পূর্ণ হয়নি—হযরত মুজাদ্দিদ-এর জালালতে শান, হেদায়াত ও তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) শক্তির কথা ভারতবর্ষের বাইরেও পৌঁছে গিয়েছিল। লোকে দলে দলে হযরত মুজাদ্দিদ-এর যিয়ারত ও তাঁর থেকে উপকার লাভের আশায় আগমন

১. পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটে তাঁর মাযার বর্তমান। —অনুবাদক।

২. হাযারাতু'ল-কুদ্স ও অপরাপর গ্রন্থ।

করতে থাকে। মাওয়ারা উন-নাহ্‌র, বাদাখশান, কাবুল ও অপরাপর অনারব দেশের অনেক শহরেই তাঁর খ্যাতির কথা গিয়ে পৌঁছেছিল। ভারতবর্ষে এমন শহর খুব কমই ছিল যেখানে তাঁর কোন প্রতিনিধি কিংবা কোন দাঈ ইলাল্লাহ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারী) বিদ্যমান ছিলেন না।

সমকালীন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি

১০১৪ হিজরীতে সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের মৃত্যু হয় এবং (তদীয় পুত্র) নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহন করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যে অব্যাহত চাপ ও নির্যাতন নেমে এসেছিল যা এই বিশাল ভূখণ্ড (যা মুসলিম বিজেতাগণ তাদের টাটকা খুন, ইসলামের সংস্কারক ও সেবকগণ তাঁদের শরীর নিঃসৃত ঘর্ম এবং আধ্যাত্মিক সাধকগণ নিশীথ রাতের কান্নার মাধ্যমে আর্দ্র ও সিক্ত করেছিল) থেকে ইসলামের মূলোৎ-পাটনের কাজ যে শক্তি ও পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছিল তা তাঁর ব্যাথাতুর দিল্ ও ইসলামের মর্যাদাবোধ-উদ্দীপ্ত প্রকৃতিকে অস্থির করে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কিছুটা তাঁর অবস্থার পূর্ণতা সাধন ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিতে গভীরভাবে নিমগ্নতার দরুন আর কিছুটা এজন্যও বটে যে,ফেতনা তখন মধ্যাহ্ন গগনে অবস্থান করছিল এবং তখন অবধি সেই সব প্রান্তিক উপায়-উপকরণ তাঁর হাতে এসে পৌঁছেনি যে সবের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্য ও তার প্রবণতা এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তার রাজনীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারেন। তিনি তাঁর সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনমূলক কর্মকাণ্ড তখন অবধি পূর্ণ শক্তিতে শুরু করেন নি আর যদি শুরু করেও থাকেন তবে তার বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে মেলে না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি খানে খানান সায়্যিদ সদর জাহান, মুর্তাযা খান প্রমুখ আমীর ও অমাত্যের মাধ্যমে সম্রাটকে উপদেশপূর্ণ বার্তা প্রেরণ করেন। ঐসব অমাত্য সম্রাটের আস্থাভাজন ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন। অপর দিকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও তাদের অন্তরে আসন গেড়ে ছিল।

জাহাঙ্গীরের ইসলামের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতামূলক মানসিকতা ছিলনা, তাই নয় বরং এক ধরনের প্রসন্ন দৃষ্টি ও ভক্তি বিজড়িত মানসিকতাই ছিল এবং কোন নতুন ধর্মের প্রচলন ও আইন জারীর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ কিংবা আগ্রহ ছিল না। তাঁর জীবন-দর্শন ছিল তাঁর প্রপিতামহ (সম্রাট বাবর)-এর এই বাণী ঃ

بابر بعیش کوش که عالم دوباره نیست

"বাবর! আনন্দ-আয়েশে মত্ত হও; পৃথিবী আর পুনরায় ফিরে আসবে না।"

তিনি সম্রাটের এই সরল ও উদার প্রকৃতি থেকে ফায়দা গ্রহণ করে ভারতবর্ষের মাটি থেকে সেই সমস্ত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ করবার সংকল্প নেন যা সাবেক সম্রাটের আমলে জন্ম নিয়েছিল এবং যার বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে বিবৃত হবে।

কিন্তু এই বিপ্লবাত্মক মিশন শুরুর পূর্বেই গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁর বন্দিত্ব বরণের ঘটনা সংঘটিত হয় যা একদিক দিয়ে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনের এবং সেই যুগের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাযকিরাহ ও জীবনীমূলক সাধারণ গ্রন্থ-পুস্তকে উল্লিখিত হয়ে আসছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে "মাকতূবাত" (পত্রাবলী)-এর সেই সব সূক্ষ্ম বিষয় পেশ করা হয় যার উপলব্ধি ও অনুধাবন তাসাওউফের পরিভাষা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ এবং লেখকের উদ্দেশ্য ও মানসিকতা উপলব্ধি ও অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল। বস্তুতপক্ষে তা ছিল সেই সব সাময়িক কাশফ ও অনুভূতির বিষয় যা সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর আধ্যাত্মিক জগতে ভ্রমণ ও চলাকালে সাময়িকভাবে দেখা দিয়ে থাকে এবং যেগুলি সম্পর্কে স্বীয় শায়খ ও মুরুব্বীকে অবহিত করা জরুরী।[১]

জাহাঙ্গীরের জন্য এই সব বিষয় উপলব্ধি ও অনুধাবন ছিল তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত এবং যেসবের ভেতর একজন সহজ সরল সুন্নী আকীদা বিশিষ্ট মুসলমানের জন্য যিনি কাশফ, ওয়াকি'আ, 'উরূজ ও ইস্তিকরার-এর পার্থক্য জানেন না, ভীত-সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হবার পরিপূর্ণ উপকরণ বিদ্যমান ছিল। তিনি এতে বিরাট বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং সে সবকে সাধারণ মুসলমান এবং আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের স্বীকৃত আকীদার পরিপন্থী ভাবেন, একে আত্মপূজা

১. দ্র. পত্র নং ১১, দফতর ১ম হযরত মুর্শিদ খাজা বাকী বিল্লাহর নামে। জাহাঙ্গীর ছাড়াও আধ্যাত্মিকতার এই জগত সম্পর্কে যারা অজ্ঞ—এ ধরনের অনেক পাণ্ডিত্যের অধিকারী লোকও এজাতীয় লেখা পড়ে সংকটে নিপতিত হন। এঁদের মধ্যে খ্যাতনামা আলিম, ইলমে হাদীসের প্রকাশক, শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বয়ক হযরত শায়খ আবদুল হক বুখারী দেহলভীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এবিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর হযরত মুজাদ্দিদের সঙ্গে পত্র বিনিময়ও হয়েছিল। অবশেষে তাঁর সকল সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটে এবং তিনি তওবা করেন যা তিনি তাঁর এক পত্রে বলেছিলেন। তদীয় পুত্র শায়খ নূরুল হক বর্ণনা করেন যে, "গভীর অনুসন্ধানে একথা জানা গেছে যে, হাসান খান নামক জনৈক পাঠান যে হযরত শায়খ (মুজাদ্দিদ)-এর অন্যতম মুরীদ ছিল—কোন কথায় ব্যথা পেয়ে ও অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যায় এবং তাঁর নিকট রক্ষিত শায়খ-এর মকতূবাতের একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিকৃত ও বর্ধিত করত বিকৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে ছড়িয়ে দেয়" (মানাকিবু'ল-'আরিফীন, শাহ ফতেহ মুহাম্মদ ফতেহপূরী চিশতী, ১২৬পৃ)। ভুল বোঝাবুঝি এবং গোলমাল ও হাঙ্গামার ভিত্তি এই সব বিকৃত পত্র (মকতূব) ও হস্তলিপিগুলো।

জ্ঞান করেন। স্বীয় আত্মজীবনী "তুযুক"-এ যেখানে ঘটনাবলীর আলোচনা পেশ করেছেন সেখানে তাঁর বিস্ময়ের পরিষ্কার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে। মুজাদ্দিদ সাহেবের উল্লেখ করেছেন তিনি খুবই অনুচিত পন্থায় ও কতকটা অবজ্ঞাভরে।[১] এথেকেও পরিমাপ করা যায় যে, তিনি (সম্রাট) মুজাদ্দিদ সাহেবের মর্তবা ও মকাম সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিলেন না এবং তিনি একজন তূরানী মুগল আমীরের কলম দিয়ে যিনি মুসলমানদের সাধারণ আকীদা-বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু জানেন না, যিনি নিজেকে তাদের মদদগার ও মুহাফিজ মনে করেন, নির্দ্বিধায় স্বীয় ধারণা ব্যক্ত করছেন। শায়খ বদী'উদ্দীন সাহারনপূরী শাহী সৈন্যদের মধ্যে যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের যে হারে তাঁর খেদমতে আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল একেও লোকেরা রঙ চড়িয়ে ও ফুলিয়ে ফাপিয়ে পেশ করতে শুরু করে এবং এর দ্বারা বিপদাশংকার কথা ব্যক্ত করা হয়। এও বলা হয় যে, হযরত মুজাদ্দিদ শায়খ (বদী'উদ্দীন)-এর মাধ্যমে সৈন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা আঁটছেন। এ সময় শায়খ বদী'উদ্দীনের দ্বারা স্বীয় ভক্তির আতিশয্যে এমন কতকগুলো বেফাস কথা ও অসতর্কতাও প্রকাশ পায় এবং তিনি তাঁর কতক ঘটনা কাশ্‌ফ-كلموا الناس على قدر عقولهم (জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ অনুযায়ী লোকের সাথে কথা বল)-এর উপদেশের প্রতি দৃকপাত না করে এর এমন কিছু বিবরণ দেন যা عوام كا الانعام এবং خواص كالعوام (অর্থাৎ অনেক সময় সমাজের বিশিষ্ট লোকেরাও সাধারণ লোকের মত এবং সাধারণ মানুষ পশুর ন্যায় আচরণ করে)-এর বোধ ও উপলব্ধি শক্তি বহির্ভূত ছিল যা তাদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ও কানাঘুষার জন্ম দেয়।[২] এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র) অবধি গিয়ে পৌঁছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দরবারে তাঁর কান ভারী করবার মত লোকেরও অভাব ছিল না এবং যেহেতু মুজাদ্দিদ সাহেব শী'আদের বিভ্রান্তিকর আকীদা-বিশ্বাস এবং এর কার্যকর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার মুকাবিলা করে চলেছিলেন যা ইরানীদের (যাদের সকলেই ছিল শী'আ দলভুক্ত) ভারতে আগমন ও শাহী দরবারে জেঁকে বসার পর থেকে মুসলিম সমাজ জীবনের উপর ছেয়ে যাচ্ছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের

১. দ্র. তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী (সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী), ২৭২-৭৩ পৃ. ১৪তম রাজ্যাভিষেক বর্ষের ঘটনাবলী, ১০২৮ হি.।

২. যুবদাতু'ল-মাকামাত, ৩৪৮ পৃ.।

'আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করতেন। এথেকে যদি দরবারের প্রভাবশালী ইরানী আমীর-উমারা কোন প্রকার ফায়দা লুটতে চেয়ে থাকেন তবে অবাক হবার কিছু নেই। উল্লিখিত সমস্যাকে রাজনৈতিক রূপ দেবার পর এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় এবং সম্রাটও তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

এ ছিল এমন এক সময় যখন হযরত মুজাদ্দিদ (র) আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যাহ্ন গগনে বিরাজ করছিলেন এবং তাঁর ব্যস্ততা ও কর্মতৎপরতা, একই সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। সম্ভবত এর ভেতর আল্লাহর কোন অপার কুদরত ও হিকমতও থেকে থাকবে যে, তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও উত্থানের যৌবন লগ্নে তাঁকে এই বিপদ ও পরীক্ষার মাঝে নিক্ষেপ করত 'আবদিয়ত তথা গোলামীর সেই সব মকাম অতিক্রম করানো হবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সেই মকামে উন্নীত করা হবে স্বভাবত যা মুজাহাদা ও পরীক্ষা ব্যতিরেকে হাসিল হয় না।

গোয়ালিয়রে দুর্গে বন্দী হবার কারণসমূহ

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থের সাধারণ বই-পুস্তকে গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁর নজরবন্দী করার পেছনে কারণ হিসেবে সেই বিশেষ পত্রের (মকতূব যা হযরত মুজাদ্দিদ স্বীয় শায়খ ও মুরশিদকে লিখেছিলেন) নাযুক তথা সংবেদনশীল বিষয়াদি, মুকাশিফাত ও আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণের সিলসিলার সেই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহকেই দায়ী করা হয় যদ্দ্বারা তিনি বহু আকাবিরে উম্মত (উম্মাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম সন্তান)-এর মধ্যে উচ্চতর মকামের অধিকারী বলে প্রমাণিত হন।

কিন্তু লেখকের মতে এতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে, হযরত মুজাদ্দিদের উপর এই বিপদ কেবল এই ভুল বোঝাবুঝির দরুন এসেছিল এবং এর কারণ ছিল জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় মর্যাদাবোধের ও জমহূর আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা-বিশ্বাস ও স্বীকৃত বিষয়াদির প্রতি সমর্থন কিংবা কেবল দরবারী 'আলিম অথবা সেই যুগের সম্মানিত 'আলিম ও শ্রদ্ধেয় মাশায়েখদের দাবী ও পীড়াপীড়ির দরুন করা হয়। জাহাঙ্গীর কোন কালেই এধরনের মন-মানসের লোক ছিলেন না এবং তাঁর ধর্মীয় অনুভূতিও কখনও এতটা তীব্র ও সংবেদনশীল ছিলনা যে, তিনি তাঁর উপলব্ধি ও বোধশক্তি বহির্ভূত একটি সম-স্যার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের কিংবা রাজনীতির সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিলনা যদ্দরুন এমন একজন উন্নত মর্যাদর অধিকারী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এতবড় বিরাট

পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যিনি হাযার হাযার মানুষের ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কেন্দ্র ছিলেন।

এর আগে তাঁর পিতা (সম্রাট আকবর) ও পিতামহ (হুমায়ুন)-এর আমলে শায়খ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রী মে'রাজের দাবী করেছিলেন এবং এর দরুন উলামায়ে কিরামের মধ্যে গোলযোগ ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল।[১] তাঁর বিরুদ্ধে ফতওয়াও প্রদত্ত হয়েছিল। কিন্তু তদসত্ত্বেও সম্রাট হুমায়ূন কিংবা আকবর তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। স্বয়ং জাহাঙ্গীরের আমলেই বহু মাশায়েখ "ওয়াহদাতু'ল-ওজুদ"-এর শেষ সীমা "স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক ও অভিন্ন" এই অবধি পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের এসব মত খোলাখুলি প্রকাশও করতেন। সেই যুগেই শায়খ মুহিব্বুল্লাহ এলাহাবাদী[২] আরবীতে التسوية নামক গ্রন্থ লিখেন এবং ফারসীতে এর ভাষ্য লিখেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর এসবের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। একথা মনে রাখতে হবে যে, বিতর্কিত পত্র ১১ (যাকে গোটা কাহিনীর ভিত্তি বানানো হয়েছিল) হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র নামে ১০১২ হি. তে লিখিত এবং তিনি বন্দী হন ১০২৮ হিজরীতে এর ১৬ বছর পর।

লেখকের মতে এর প্রকৃত কারণ ছিল এই যে, দরবারের আমীর-উমারা ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ-এর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা হযরতকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন যা এমন একজন তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন শাসকের পক্ষে, যিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন এবং সম্রাটের অপরাপর পুত্রদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তৎপ্রতি সন্দেহ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। এও সম্ভব যে, সম্রাট সেই প্রভাবমণ্ডিত ও জ্বালাময়ী পত্রগুলো সম্পর্কেও অবহিত হয়ে থাকবেন যেসব পত্র হযরত মুজাদ্দিদ সাম্রাজ্যের ঐ সব অমাত্য বরাবর অবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন এবং ইসলামের সমর্থনে সমর্থনকারী ভূমিকা কামনায় লিখেছিলেন।

দরবারের এসব আমীর-উমারা ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের মধ্যে ছিলেন খান আ'জম মির্যা 'আযীযুদ্দীন, খান জাহান খান লোদী, খান খানান মির্যা আবদুর রহীম, মির্যা দারাব, কিলীজ খান প্রমুখ।[৩]

১. বিস্তারিত দ্র. অধ্যাপক মুহাম্মদ মাস'উদের শাহ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রী নামক গ্রন্থ, করাচী সং।

২. মৃ.১০৫৮ হি.।

৩. এথেকেও এমতের সমর্থন মিলে যে, জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই লিখছেন যে, শায়খ-এর খলীফা প্রতিটি প্রদেশ ও নগরে নিয়োজিত (২৭২ পৃ.)। অধিকন্তু তাঁর গ্রেফতারের কারণ ছিল জনগণের উত্তেজনা প্রশমন (২৭৩)।

মুগল সম্রাটগণ মাশায়েখ-ই ‘ইজামের প্রতি জনগণের সীমাতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা, তাঁদের দিকে ব্যাপক জনস্রোত এবং তাঁদের চতুষ্পার্শে পতঙ্গের ন্যায় জনসমাগমকে সব সময় ভীতির চোখে দেখতেন। মুজাদ্দিদ সাহেবের শ্রেষ্ঠতম খলীফা হযরত সায়্যিদ আদম বিন্নুরীর সঙ্গেও একই ব্যাপার ঘটে। ১০৫২ হিজরীতে তিনি যখন লাহোর তশরীফ নেন তখন তাঁর সঙ্গে উলামা, সায়্যিদ বংশীয় লোক ও মাশায়েখ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দশ সহস্র ভক্ত-অনুরক্ত ছিল। সম্রাট শাহজাহান তখন লাহোরেই অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর লোকপ্রিয়তায় ভীত ও আতংকিত হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যাতে তিনি ভারতবর্ষ থেকে হিজরতপূর্বক পবিত্র ভূমির দিকে (মক্কা ও মদীনা) গমন করেন। গোয়ালিয়র দুর্গের কারাজীবন শেষ হবার পরও দীর্ঘকাল অবধি শায়খকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাখার পেছনে সম্ভবত এটাই ছিল কারণ যাতে সম্রাট বুঝতে পারেন-সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও অমাত্যবর্গের সঙ্গে শায়খ-এর সম্পর্কের প্রকৃতি কি এবং তিনি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, তাঁর থেকে সাম্রাজ্যের কিংবা ক্ষমতার প্রতি বিপদাশংকার কোন কারণ নেই কিংবা কোন প্রতিপক্ষ ও ভাগ্যান্বেষী শক্তির পক্ষে তাঁকে দিয়ে ফায়দা লুটবার সুযোগ নেই। সম্রাট যখন তাঁর কর্মপন্থা দৃষ্টে পরিপূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর ইখলাস (ঐকান্তিক নিষ্ঠা), আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিতচিত্ততা, নিঃস্বার্থপরতা ও উন্নত মর্যাদা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তিনি যখন নিজেই প্রত্যক্ষ করলেন যে, দুনিয়ার শান-শওকত ও জাঁকজমক তাঁর নিকট কানাকড়ির মূল্যও বহন করে না তখন তিনি তাঁকে সরহিন্দে স্বাধীনভাবে অবস্থানের অনুমতি দেন।

গোয়ালিয়র দুর্গে নজর বন্দী

সে যাই হোক, সম্রাট হযরত মুজাদ্দিদকে স্বীয় আবাসে (আগ্রায়) ডেকে পাঠান এবং সরহিন্দের শাসনকর্তাকে যে কোন প্রকারেই হোক শায়খকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। (নির্দেশ প্রাপ্তির পর) শায়খ সে সময় উপস্থিত পাঁচজন মুরীদ সমভিব্যাহারে রওয়ানা হন। সম্রাট তাঁর আগমন সংবাদ শ্রবণের পর স্বীয় আমীরদেরকে হযরত শায়খকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করেন, শাহী মহলের নিকট তাঁবু স্থাপন করান এবং সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি দরবারে গমন করেন, কিন্তু শরীয়ত বিরোধী হওয়ায় সম্রাটকে কুনির্শ করেন নি। জনৈক খোদাভীতিহীন সভাসদ বিষয়টির প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, জাহাঁপনা! শায়খ দরবারের রীতিনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। সম্রাট এর কারণ জিজ্ঞেস করায়

তিনি বলেনঃ আমি অদ্যাবধি আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা) নির্দেশিত আদব-কায়দা ও নির্দেশ অনুসরণ করে আসছি। এর বহির্ভূত অন্য কোন আদব ও রীতিনীতির সঙ্গে তিনি পরিচিত নন। সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সিজদা করতে বলেন।[১] উত্তরে শায়খ বলেন ঃ আল্লাহ ভিন্ন কাউকে যেমন কখনও সিজদা করিনি, কখনও করবও না। সম্রাট এতে আরও অসন্তুষ্ট হন এবং গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁকে নজরবন্দী করবার নির্দেশ দেন।[২]

এই ঘটনার পূর্বে শাহজাহান (শায়খ-এর প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন) আল্লামা আফযাল খান ও খাজা 'আবদুর রহমান মুফতীকে শায়খ-এর কিতাবাদি ও এই পয়গামসহ হযরত মুজাদ্দিদ-এর নিকট পাঠান যে, এজাতীয় পরিস্থিতিতে সম্রাটদের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা (সিজদা-ই তাহিয়্যা)-র অনুমতি রয়েছে। আপনি যদি সম্রাটকে সিজদা করেন তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, এ বিষয়ে আমি জামিন হতে ও দায়িত্ব নিতে রাজী আছি। শায়খ উত্তরে জানান যে, এ অনুমতি শুধু কারও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্যই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের মূল স্পিরিটের ('আযীমত-এর) দাবী এই যে, আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকে সিজদা করা যাবে না।[৩]

গ্রেফতারীর এই দুঃখজনক ঘটনা মার্চ ১৬১৯/১০২৮ হিজরীর রবীউস-ছানী মাসের কোন এক সময় সংঘটিত হয়। কেননা সম্রাট তাঁর আত্মজীবনীতে এই মাসের সংঘটিত ঘটনাবলীর মাঝেই এর উল্লেখ করেছেন। গ্রেফতারীর পর তাঁর ঘর-বাড়ী, কুয়া, বাগান ও কিতাবাদি সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।[৪]

গোয়ালিয়র কারাভ্যন্তরে সুন্নত-ই য়ূসুফী (আ) পালন

গোয়ালিয়রের এই বন্দী জীবন আল্লাহ তা'আলার বহু হিকমত, অপার অনুগ্রহ, ধর্মীয় উপযোগিতা, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বর্ধিত জনপ্রিয়তার উপর স্থাপিত ছিল। হযরত য়ূসুফ (আ)-এর সুন্নত অনুসরণপূর্বক কারা-সঙ্গীদের মাঝে তিনি দীনের তাবলীগ ও হেদায়াতের পয়গাম পৌঁছুবার

---

১. দরবারী সিজদার প্রচলন ঘটে সম্রাট আকবরের আমল থেকে এবং তা রাজকীয় আদবের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্রাট আওরঙ্গযীব তা উঠিয়ে দেন।

২. হাযারাতুল কুদ্স ,১১৭ পৃ.।

৩. প্রাগুক্ত, ১১৬ পৃ. ।

৪. তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, ২৭২-২৭৩ পৃ. ও মকতূব ২, দফতর ৩য়।

কাজ জোরে-শোরে শুরু করেন। হযরত য়ূসুফ (আ)-এর মতই তিনি তাঁর কারা-সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করতেন ঃ

يا صاحبى السجن أ أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار

(হে কারা সঙ্গীদ্বয়! বিভিন্ন প্রতিপালক উত্তম নাকি একক পরাক্রমশালী আল্লাহ্?" সূরা য়ূসুফ ঃ ৩৯ আয়াত)-এর আওয়াজ এত সজোরে উচ্চারণ করেন যে, দুর্গের প্রতিটি দরজা ও দেওয়াল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে এবং এর আওয়াজ দুর্গের বাইরে থেকেও শ্রুত হয়। কথিত আছে যে, কয়েক হাযার অমুসলিম কয়েদী তাঁর দাওয়াত ও তবলীগ, তাঁর সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ ধন্য হয়ে ইসলাম কবুল করে এবং শতশত কয়েদী মুরীদও সাহচর্য ধন্য হয়ে উচ্চতর মকামে উন্নীত হতে সক্ষম হয়। ডঃ টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড-এর ভাষায় ঃ

"সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-১৬২৮ খৃ.) শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদ নামক একজন সুন্নী আলিম শী'আ 'আকীদা-বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে খুবই মশহূর ছিলেন। সে সময় শাহী দরবারে শী'আদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তারা কোন এক অজুহাতে তাঁকে বন্দী করতে সক্ষম হয়। দু'বছর তিনি বন্দী ছিলেন। আর এই সময়কালের মধ্যে তিনি তাঁর কারা-সঙ্গীদের ভেতর থেকে শতশত মূর্তিপূজককে ইসলামে দীক্ষিত করেন।"

তেমনি Encyclopaedia of Religion and Ethics -এ ইসলামের প্রচার প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, "১৭শ শতকে ভারতবর্ষে শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদ নামক জনৈক 'আলিমকে অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কারাগারে থাকাকালে তিনি তাঁর সাথীদের মধ্য থেকে কয়েকশ' মূর্তিপূজারীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন।"[১]

বন্দী জীবনের নে'মত ও স্বাদ

গোয়ালিয়র দুর্গের এই স্বল্পকালীন বন্দী জীবনে হযরত মুজাদ্দিদ-এর উপর যে হারে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং তাঁর যে আধ্যাত্মিক উন্নতি, প্রকৃত বিনয়-নম্রতার স্বাদ ও নির্জনে আল্লাহ্র বিস্ময়কর শানের উপলব্ধি-রূপ স্বাদ লাভ ঘটে হযরত তাঁর বিশিষ্ট খাদেমদের নামে প্রেরিত পত্রে নে'মতের শুকরিয়া হিসেবে অত্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে তা উল্লেখ করেছেন। মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রে যা তিনি গোয়ালিয়র থেকে পাঠিয়েছিলেন— বলেন ঃ

---

১. য়ূরোপের দৃষ্টিতে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী, মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী কৃত। দ্র. আল-ফুরকান, মুজাদ্দিদ সংখ্যা, ১৩৫৭ হি.

"যদি কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহে ঐশী ফয়েয ও অনুগ্রহ বর্ষণের ধারা এবং তাঁর অফুরন্ত পুরস্কার ও বদান্যতার উপর্যুপরি প্রকাশ এই অধমের কারান্তরালের সঙ্গী না হত তাহলে হতাশা ও নিরাশার গভীর পংকে নিমজ্জিত হবার সমূহ আশংকা বিদ্যমান ছিল এবং আশা- ভরসার ক্ষীণ সুত্রটুকুও ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। সেই সর্বময় সত্তার যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে মহাদুর্যোগের মধ্যেও নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দান করেছেন, অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্যেও সম্মানিত করেছেন, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমার প্রতি ইহসান (সদয় আচরণ) করেছেন, আরাম ও মুসীবতের মাঝে শুকরিয়া জ্ঞাপনের তওফীক দিয়েছেন এবং আম্বিয়া' আলায়হিমু'স-সালাত ওয়া'স-সালামের আনুগত্য ও আওলিয়া-ই কিরামের পদাংক অনুসরণকারী এবং 'উলামা ও বুযুর্গদের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত ও বরকত প্রথমে আম্বিয়া-ই কিরাম 'আলায়হিমু'স-সালামের উপর, অতঃপর তাঁদের অনুসরণকারীদের উপর নাযিল হোক।"[১]

মনে হয় সম্রাটের নির্দেশে হযরত মুজাদ্দিদ-এর গ্রেফতারীর খবর চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর নানা রকম আলোচনা ও গুঞ্জন শুরু হয়। এক কিসিমের লোক এর উপর রঙ চড়িয়ে ফলাও প্রচার করে এবং নানা রূপ কাল্পনিক জল্পনা-কল্পনা চলে। খাদেম ও ভক্তকুল স্বাভাবিকভাবেই এতে আহত ও কষ্ট অনুভব করে। নানাজনের নানা মন্তব্য ও সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিতপূর্বক তিনি তাঁর অপর এক নিষ্ঠাবান ভক্ত শায়খ বদী'উদ্দীনকে কারাগার থেকে লিখেন ঃ

"অধম যখন এই কারাগারে পৌঁছে তখন প্রথম অবস্থাতেই অনুভব করছিল যে, লোকের নিন্দা ও কটু-কাটব্যের ঢেউ শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জের দিক থেকে দ্যুতিময় মেঘের ন্যায় উপর্যুপরি ধেয়ে আসছে এবং আমার আধ্যাত্মিক অবস্থাকে নীচু স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর আমাকে জামালী তরবিয়তের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর মকামসমূহে উত্তরণ ঘটানো হয়েছে আর এখন জালালী তরবিয়তের মাধ্যমে সেই সমস্ত মকাম অতিক্রম করানো হচ্ছে। অতএব আপনার সবর (ধৈর্য)-এর নয় বরং রিদা (তুষ্ট) ও তসলীম (সমর্পিতচিত্ততা)-এর মকামে অবস্থান করা দরকার এবং জামাল ও জালাল (স্নিগ্ধতা ও তীব্রতা-ঐশী সত্তার দুইটি রূপ) কে সমতুল্য ও সমরূপ জ্ঞান করুন।"[২]

---

১. পত্র নং ৫, দফতর ৩য়, ৭ম খণ্ড, হযরত মওলানা আবদুশ শাকূর অনূদিত, ইমাম রব্বানী নামক নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

২. পত্র নং ৬, দফতর ৩য়, ৭ম খণ্ড।

হযরত মুজাদ্দিদ কারাগার থেকে তাঁর পুত্রদেরকেও পত্র লিখেন। এসব পত্রে তাদেরকে ধৈর্য ধারণ, আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাঁর ফয়সালাকে অবনত মস্তকে মেনে নেবার জন্য উপদেশ দেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ দান, দু'আ ও মুনাজাত, যিক্‌র ও তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে সব কিছুকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং নিজেদের লেখাপড়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দানের জন্য অব্যাহত তাকীদ প্রদান করতে থাকেন।[১]

কতক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মুজাদ্দিদ-এর এই অহেতুক গ্রেফতারীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দরবারের ধর্মভীরু আমীর ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের মাঝে দেখা দেয়। কোন কোন জায়গায় হাঙ্গামা ও গোলযোগের ঘটনাও ঘটে।[২] আবদুর রহীম খান খানান, খান-ই আ'জম, সায়্যিদ সদর জাহান, খান জাহান লোদী প্রমুখ জাহাঙ্গীরের এই পদক্ষেপে অসন্তুষ্ট ও মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। সমকালীন ইতিহাস থেকে এই হাঙ্গামা ও গোলযোগের খুব একটা বেশি সক্ষ্য পাওয়া যায় না এবং পূর্ণ নির্ভরতার সাথে একথাও বলা যায় না যে, এসবের সাথে হযরত মুজাদ্দিদ-এর গ্রেফতারীর সম্পর্ক কতটা ছিল।

সে যাই হোক, (যে কোন কারণেই হোক)[৩] সম্রাট স্বীয় পদক্ষেপের দরুন লজ্জিত হন কিংবা তাঁর এই বন্দিত্বকালকেই যথেষ্ট মনে করেন এবং হযরত মুজাদ্দিদ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ ব্যক্ত করত শাহী মহলে আগমনের দাওয়াত জানান। হযরত মুজাদ্দিদ পূর্ণ এক বছর গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন। এতদ্দৃষ্টে তাঁর মুক্তি জুমাদা'ল-আখিরা ১০২৯ হি./ মে ১৬২০ হয়ে থাকবে মনে হয়।

শাহী সৈন্য ও রাজকীয় সাহচর্যে অবস্থান এবং এর প্রভাব ও বরকত

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বিরাট সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিন দিন সরহিন্দ অবস্থান পূর্বক আগ্রার শাহী সেনানিবাসে তশরীফ নেন। যুবরাজ শাহযাদা খুররম এবং উযীরে আ'জম তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

---

১. পত্র নং ২, দফতর ৩য়, ৭ম খণ্ড, হযরত খাজা মুহাম্মদ সাঈদ ও খাজা মুহাম্মদ মাসূমের নামে প্রেরিত পত্র।

২. এই ধারায় সেনাপতি মহাবত খানের বিদ্রোহের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মহাবত খানের বিদ্রোহের ঘটনা ১০৩৫/১৬২৬ সালের। এর চার পাঁচ বছর পূর্বেই হযরত মুজাদ্দিদ মুক্তি পেয়েছেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। কাজেই উল্লিখিত তথ্য সত্য নয়।

৩. কথিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বপ্নে হযরত রসূল মকবুল (স)-এর যিয়ারত লাভ করেন। তিনি দেখতে পান যে, সরওয়ারে কায়েনাত (সা) আফসোসের সাথে আঙুল দাঁতে কামড়ে বলছেন ঃ জাহাঙ্গীর! তুমি কত বড় এক ব্যক্তিকে বন্দী করে রেখেছ।

সম্রাট কয়েক দিন শাহী সৈন্যের মাঝে অবস্থানের জন্য তাঁর আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি এতে সম্মত হন। এই সাহচর্যের দ্বারা সম্রাট ও তাঁর সৈন্যকুল খুবই উপকৃত হন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, "শায়খকে মুক্তি দানের পর আমি শায়খকে শাহী খেলাত ও ব্যয় নির্বাহের জন্য এক সহস্র (স্বর্ণ) মুদ্রা প্রদান করি এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কিংবা তাঁর (সম্রাটের) সঙ্গে অবস্থানের এখতিয়ার দিই। তিনি আমার সাথে অবস্থানকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেন।"

হযরত মুজাদ্দিদ শাহী সেনানিবাসে তাঁর এই অবস্থান এবং এর উপকারিতা ও বরকত সম্পর্কে তাঁর পুত্রদেরকে লিখেন যে, সেনাশিবিরে এভাবে স্বার্থলেশহীনভাবে থাকাকে আমি খুবই দুর্লভ সম্পদ মনে করছি এবং এখানকার একটি মুহূর্তকে অন্য যে কোন স্থানের সহস্র মুহূর্তের তুলনায় শ্রেয় জ্ঞান করছি।[১]

অপর একপত্রে তিনি লিখেন ঃ

"আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা এবং তাঁর মনোনীত বান্দাগণের উপর সালাম। এদিকে যে অবস্থা ও রূপ লাভ করছে তা আল্লাহ্র প্রশংসা ও স্তুতিলাভের যোগ্য। অত্যাশ্চর্য ও বিস্ময়কর সাহচর্যের মাঝে আমার দিন কাটছে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে ধর্মীয় ব্যাপারে ও ইসলামের মূলনীতি বিষয়ে আলোচনায় কোনরূপ ছাড় প্রদানের কিংবা সমঝোতার অবকাশ পড়েনা।

"আল্লাহ পাকের রহমতে ঐসব মজলিসে সেই সব কথাবার্তাই আলোচিত হয় যা একান্ত বৈঠকে ও নিভৃত মাহফিলে আলোচিত হয়ে থাকে। একটি বৈঠকের অবস্থা লিখতে গেলেও বিরাট ভলিউমের দরকার পড়বে।"[২]

সে সময় অনুষ্ঠিত একটি শাহী মজলিসের বিবরণ পেশ করতে গিয়ে অপর এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"আমার পুত্রদের প্রেরিত পত্র পেলাম। আল্লাহর প্রশংসা যে, আমি ভাল আছি। অদ্যকার সদ্য সংঘটিত একটি ব্যাপারে তোমাদেরকে লিখছি, ভালভাবে মনে রেখ। অদ্য শনিবার রাত্রে শাহী মজলিসে গিয়েছিলাম। রাত্রির একপ্রহর অতিক্রান্ত হবার পর সেখান থেকে ফিরে আসি। এরপর হাফিজ থেকে তিন পারা কুরআন শরীফ শুনি, রাত্র দ্বিপ্রহরের অতীত হলে ঘুম আসল।"[৩]

খাজা হুসসামুদ্দীনকে লিখিত অপর এক পত্রে বলেন ঃ

---

১. পত্র নং ৪৩, দফতর ৩য়;

২. পত্র নং ১০৬, দফতর ৩য়;

৩. পত্র নং ৭৮, দফতর ৩য়; মওলানা সায়্যিদ যিওয়ার হুসায়ন কৃত "হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেছানী"র উর্দূ অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত।

"আমার পুত্র ও সঙ্গী-সাথীদের যারাই আমার সাথে রয়েছে তারা আধ্যাত্মিক পথে দ্রুত উন্নতি করছে। তাদের উপস্থিতির দরুন এই সেনা ছাউনী যেন খানকায় পরিণত হয়েছে।"[১]

শাহী সৈন্যের সঙ্গে তিনি লাহোর পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি সরহিন্দ যাত্রা করেন। সরহিন্দে তিনি সম্রাটকে ভোজের দাওয়াত জানান। হযরতের ইচ্ছা ছিল সরহিন্দ থেকে যাবার, কিন্তু তাঁর বিচ্ছেদ সম্রাটের মনঃপুত ছিল না। সেখান থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে বানারস, অতঃপর বানারস থেকে আজমীর গিয়ে অবস্থান করেন।

জাহাঙ্গীরের উপর মুজাদ্দিদের প্রভাব

কোন কোন গ্রন্থে অধুনা যেসব গ্রন্থে মুজাদ্দিদের জীবনী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে হযরত মুজাদ্দিদের সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের গভীর শ্রদ্ধা ও রীতি মাফিক বায়'আতের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস গ্রন্থেই এর সমর্থন মেলে না। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর "আত্মজীবনী"তে কয়েক স্থানে যেভাবে হযরত মুজাদ্দিদ-এর উল্লেখ করেছেন তা থেকে উল্লিখিত বর্ণনার সত্যতা সমর্থিত হয় না। একজন সম্রাট ক্ষমতার নেশায় যতই মোহগ্রস্ত হোন এবং তাঁর লেখার ভঙ্গী যতই রাজকীয় হোক, তিনি তাঁর শায়খ-এর আলোচনা এরূপ ভঙ্গিতে করতে পারেন না। অধ্যাপক ফ্রাউমান তদীয় গ্রন্থেও (পৃ.৩৫-৩৬) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদের হাতে মুরীদ হবার কথা প্রমাণিত নয় এবং তাঁর মধ্যে বড় রকমের কোন পরিবর্তনও সাধিত হয় নি। অপরাপর প্রথমিক প্রাচীন জীবনীকারদের কেউই না জাহাঙ্গীরের বায়'আতের উল্লেখ করেছেন, না শাহজাহানের কথাই উল্লেখ করেছেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদ-এর সাহচর্য থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর মধ্যে নতুন ধর্মীয় প্রেরণা জাগ্রত হওয়া, বিধ্বস্ত মসজিদগুলোর পুন নির্মাণ এবং বিজিত এলাকায় মকতব-মাদরাসা কায়েমে তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্রে এর বিরাট ভূমিকা ছিল। ১০৩১/১৬২১ সালে কাংড়া দুর্গ জয়ের সময় তিনি যেভাবে ইসলামী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেখানে ইসলামী প্রথা-পদ্ধতির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন[২] এথেকেও তাঁর এই পরিবর্তন ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতির পরিচয় মেলে যাকে মুজাদ্দিদ সাহেবের সাহচর্যের ফয়েয (ফল) বলা যেতে পারে।

১. পত্র নং ৭২, দফতর ৩য়;
২. দ্র. তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, ৩৪০ পৃ. ৭ম অধ্যায়;

জীবনের অন্তিম যাত্রা

খাজা মুহাম্মদ কাশ্মী লিখেন যে, ১০৩২/১৬২২ সাল। তিনি (হযরত মুজাদ্দিদ) তখন আজমীরে। তিনি তাঁর ভক্তদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তাঁর বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। সরহিন্দে অবস্থানরত তাঁর পুত্রদেরকে লিখিত একপত্রে তিনি বলেন ঃ ایام انقراض عمر نزدیك وفرزندگان دور "জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনায়মান আর সন্তানগণ দূরে।" পুত্রেরা পত্র পেতেই আজমীরে এসে উপস্থিত হন। একদিন একান্তে পেতেই দুই পুত্র খাজা মুহাম্মদ সা'ঈদ ও খাজা মুহাম্মদ মা'সূমকে বললেন ঃ এখন আর আমার এই পার্থিব জগতের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ কিংবা ভ্রূক্ষেপ নেই। উর্ধ্বজগতের চিন্তা-ভাবনাই এখন আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং অন্তিম যাত্রার মুহূর্ত অতি সন্নিকট মনে হচ্ছে।[১]

সেনা ছাউনি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সরহিন্দে হযরত মুজাদ্দিদ-এর অবস্থান ছিল ১০ মাস ৮ কিংবা ৯দিনের মত।[২] আজমীর থেকে সরহিন্দ প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নিভৃত জীবন এখতিয়ার করেন। তদীয় পুত্রগণ ও দু'তিনজন বিশিষ্ট খাদেম[৩] ব্যতিরেকে সেখানে অপর কারুর গমনা-গমনের অনুমতি ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমু'আ ভিন্ন তিনি বাইরে বের হতেন না। গোটা সময় যিক্‌র ও ইস্তিগফার এবং জাহিরী ও বাতেনী আমলের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। এ সময় تبتل اليه تبتيلا (সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল তাঁরই হও)-এর ছিলেন তিনি মূর্তরূপ।

যি'ল-হজ্জের মাঝামাঝি তাঁর শ্বাস কষ্টের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রায়ই কাঁদতেন এবং রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে প্রায়ই اللهم الرفيق الاعلى "হে আল্লাহ! আমার সর্বোত্তম সাথী ও বন্ধু" বলতেন। এরই মধ্যে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে এবং কয়েক দিন সুস্থতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। তাঁর এই সুস্থতা দৃষ্টে বিমর্ষ আত্মীয়-পরিজন ও আহত ভক্তকুল কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এমতাবস্থায় তিনি বলতেন ঃ রোগজনিত দুর্বলতার মধ্যে যে স্বাদ ও মিষ্টতা

---

১. যুবদাতু'ল-মাকামাত, ২৮২ পৃ.

২. হযরত মুজাদ্দিদ ও তাঁর সমালোচকবৃন্দ, ১৬৪-৬৫ পৃ.

৩. এই সব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে খাজা মুহাম্মদ হাশিম কাশ্‌মীও ছিলেন। কিন্তু তিনি ইনতেকালের সাতমাস পূর্বে রজব ১০৩৩ হিজরীতে তাঁর দাক্ষিণাত্য থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আসবার জন্য (সেখানে তখন অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছিল) চলে গিয়েছিলেন। এই সময় শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দী তাঁর খেদমতে ছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলোর অবস্থা তাঁরই সুত্রে যুবদাতুল-মাকামাত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে তাঁর পুত্রদের প্রদত্ত তথ্যও রয়েছে।

অনুভূত হত আজ কয়েক দিনের সুস্থতার মাঝে তা পাচ্ছি না। এমত অবস্থায় তিনি অধিক পরিমাণে সদকা ও দান-খয়রাত করতেন। ১২ই মুহার্রাম তারিখে তিনি বলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, ৪৫ দিনের মধ্যেই তোমাকে এই জগৎ ছেড়ে অপর জগতের দিকে যাত্রা করতে হবে এবং আমাকে আমার কবরের জায়গাও দেখানো হয়েছে। একদিন তাঁর পুত্রেরা দেখতে পেলেন তিনি খুব কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন ঃ আমার প্রভুর সঙ্গে মিলন কামনায় কাঁদছি। পুত্রেরা বলল ঃ আমাদের প্রতি এই (অস্বাভাবিক) ঔদাসিন্য ও উপেক্ষার কারণ কি? উত্তর ছিল ঃ আল্লাহ্র যাত (সত্তা) তোমাদের তুলনায় অধিকতর প্রিয় বলে।

২২ শে সফর তারিখে তিনি খাদেম ও আত্মীয়-বান্ধবদেরকে ডেকে বললেন যে, আজ চল্লিশ দিন পূর্ণ হল। দেখা যাক, বাকী সাত-আট দিনে কী ঘটে। এর পর আল্লাহ্র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অপরিমেয় পুরস্কারের কথা বলতে থাকেন। ২৩শে সফর তারিখে তিনি তাঁর সমস্ত কাপড় ও পোশাকাদি খাদেমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। যেহেতু তাঁর শরীরের কোন সূতী বস্ত্র ছিলনা বিধায় তিনি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন এবং পুনরায় জ্বর দেখা দেয়।[১] ফলে হযরত সরওয়ারে কায়েনাত (স)-এর মুবারক মেযাজ অসুখ থেকে কিছুটা সুস্থতা ফিরে পাবার পর যেভাবে পুনর্বার রোগাক্রান্ত হন হযরত মুজাদ্দিদ কর্তৃক এই সুন্নতও আদায় হয়।

এই পীড়িতাবস্থায় ঐশী জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যের ভাণ্ডার তাঁর সামনে নতুনভাবে উন্মোচিত হতে থাকে এবং তিনি তাঁর বর্ণনা দিতে থাকেন। পুত্র খাজা মুহাম্মদ সাঈ'দ পীড়িতাবস্থায় এই ধরনের গুরুভার আলোচনা তাঁর পক্ষে উপযোগী নয় বিধায় তা অন্য কোন সময়ের জন্য (সুস্থতা ফিরে আসা অবধি) মুলতবী রাখার অনুরোধ জানান। উত্তরে হযরত মুজাদ্দিদ জানান ঃ প্রিয় বৎস! সেই সময় ও প্রয়োজনীয় অবকাশ আর কবে মিলবে যে, এই সব বিষয় তখনকার জন্য তুলে রাখব ? রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির এই দিনগুলোতেও জামা'আত ব্যতিরেকে সালাত আদায় করতেন না। কেবল জীবনের শেষ চার-পাঁচ দিন সকলের অনুরোধে সাড়া দিয়ে একাকী আদায় করেন। এতদ্ভিন্ন বিবিধ দু'আ ও ওজীফা, দু'আ মাছুরা, যিক্র ও মুরাকাবা প্রভৃতি নিয়মিত আমলের ক্ষেত্রে এতটুকু ব্যত্যয় ঘটতে দেন নি। শরীয়ত ও তরীকতের বিবিধ আদব ও আহকামের ক্ষেত্রেও তিনি এতটুকু বিচ্যুতি আসতে দেন নি। একবার রাত্রের শেষ

১. সম্ভবত এসময় নভেম্বর মাস ছিল। কেননা ইনতেকাল হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে আর এসময় এই এলাকায় শীতকাল।

তৃতীয়াংশে উঠে ওযু করলেন, দাঁড়িয়েই তাহাজ্জুদ আদায় করলেন, এরপর বললেন ঃ এটাই আমার জীবনের শেষ তাহাজ্জুদ নামায। তাই হয়েছিল, এরপর আর তাহাজ্জুদ আদায়ের সুযোগ আসে নি।

ইনতিকালের কিছু পূর্বে غيبت ও ইস্তিগরাকের প্রাবল্য দেখা দেয়। তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় উত্তরে তিনি জানান যে, তাঁর এই অবস্থা দুর্বলতার কারণে নয় বরং ইস্তিগরাকের কারণে। যেহেতু কতকগুলো আধ্যাত্মিক ব্যাপার তাঁর সম্মুখে উন্মোচিত ও উদ্ভাসিত হচ্ছিল। এইরূপ দুর্বল অবস্থা ও রোগের তীব্রতা সত্ত্বেও তিনি সুন্নতের পাবন্দী, বিদ'আতের পরহেয এবং সার্বক্ষণিক যিক্‌র ও মুরাকাবায় লিপ্ত থাকার জন্য ওসিয়্যত করতেন এবং বলতেন ঃ সুন্নত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখবে। তিনি বলেন ঃ সাহিবে শরীয়ত (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) الدين نصيحة। "দীনের অপর নাম কল্যাণ কামনা" মুতাবিক উম্মতের কল্যাণ কামনায় ও সদুপদেশ দানের ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্রটি রাখেন নি। অতএব দীনের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে সুন্নাহর আনুগত্য ও পূর্ণ পাবন্দীর রাস্তা পেতে এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকতে চেষ্টা করবে। তিনি আরও বললেন ঃ (মৃত্যুর পর) আমার দাফন-কাফনের ক্ষেত্রে সুন্নতের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করবে। একটি সুন্নতও যেন বাদ না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ করে বললেন ঃ তোমার পূর্বেই আমি বিদায় নিচ্ছি বলে বোধ হচ্ছে। অতএব আমার কাফনের ব্যবস্থা তোমার মোহরের অর্থ দিয়ে করবে। তিনি তাঁর পুত্রদেরকে আরও বললেন ঃ কোন অজ্ঞাত স্থানে আমাকে কবর দেবে। পুত্ররা হযরতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, প্রথমে তো হযরতের ওসিয়্যত ছিল আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাজা মুহাম্মদ সাদিককে[১] যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে দাফন করার। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তোমরা ঠিকই বলছ বটে, তবে এমুহূর্তে আমার এই আগ্রহই প্রবল। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর উত্তরে পুত্রেরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে এবং এব্যাপারে তারা দ্বিধান্বিত তখন তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, যদি তা না হয় তবে শহরের বাইরে আমার বুযুর্গ পিতার পাশে, না হয় বাগানে কোথাও দাফন করবে আর আমার কবরকে মাটির রাখবে যাতে অল্পদিনেই আমার কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কোনরূপ নাম-নিশানা যেন অবশিষ্ট না থাকে। এতেও যখন দেখতে পেলেন তাঁর পুত্রেরা চিন্তায় পড়ে গেছে তখন তিনি স্মিত হেসে বললেন ঃ ঠিক আছে, যেখানে ভাল মনে কর সেখানেই আমাকে কবর দিও।

১. খাজা মুহাম্মদ সাদিক ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ-এর জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি ১০২৫ হিজরীর ৯ই রবীউ'ল-আওয়াল তারিখে পিতার জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।

২৭শে সফর মঙ্গলবার রাত পরের দিন তাঁর ইহলোক থেকে বিদায় নেবার পালা। যেসব খাদেম রাত জেগে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, তাদেরকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন ঃ বড়ই পরিশ্রম করেছ তোমরা। আর মাত্র এই রাত্রির পরিশ্রমটাই বাকী রয়ে গেছে; এরপর তোমাদের ছুটি। শেষ রাত্রে বললেন ঃ اصبح ليلا রাতটা কেটে যাক, ভোর হোক। সকালের দিকে পেশাবের জন্য পাত্র চেয়ে পাঠালেন। পাত্র আসলে দেখা গেল তাতে বালি নেই। এতে কাপড়ে পেশাবের ছিটা লাগতে পারে ভেবে তা ফিরিয়ে দিলেন। উপস্থিত কেউ বলল যে, হেকীমকে দিয়ে পরীক্ষা করাবার জন্য বোতলে পেশাব করানো যাক। তিনি বল-লেন যে, আমি আমার ওযু নষ্ট করতে চাইনা। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও। তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন আর বেশী দেরী নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ইহজগত থেকে বিদায় নিতে হবে। নতুন ভাবে ওযু করার অবকাশ আর মিলবে না। বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলে সুন্নত তরীকা মুতাবিক ডান গালের নিচে ডান হাত রেখে যিক্‌র-এ মশগুল হয়ে পড়লেন। পুত্রেরা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা দৃষ্টে কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করলেন। জানালেন, ভাল আছি। আরও বললেন ঃ আমি যে দুই রাক'আত নামায পড়েছি তাই যথেষ্ট। এরপর 'আল্লাহ্'! আল্লাহ! যিক্‌র ছাড়া আর কোন কথা বলেন নি। মুহূর্তের মধ্যে তিনি তাঁর জীবন প্রদীপকে পরম প্রভু সমীপে পেশ করলেন। দিনটা ছিল মঙ্গলবার সকাল ১০৩৪ হিজরীর ২৮শে সফর মুতাবিক ১০ই ডিসেম্বর, ১৬২৪ঈ।

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية

ইনতেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।[১]

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর লাশ যখন গোসল প্রদানের জন্য বাইরে আনা হল দেখা গেল সালাতে কিয়ামরত অবস্থায় যেরূপ দুই হাত পরস্পর বাঁধা অবস্থায় থাকে তেমনি বাম হাতের কব্জীর উপর ডান হাতের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে বাঁধা। পুত্রেরা হাত দু'টো পরস্পরের থেকে আলাদা করে দেন। কিন্তু গোসল প্রদানের পর দেখা গেল হস্তদ্বয় পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিল। মুখের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মুচকি হাসছেন।

هم چناں زی که وقت رفتن تو۔ همه گریاں شوند تو خنداں

এমন জীবন তুমি করহ গঠন; মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।

হাত যতই আলাদা করা হচ্ছিল ততই আপনা-আপনিই পূর্বের ন্যায় এসে

১. মওলানা যায়দ আবু'ল হাসান-এর গবেষণায় চন্দ্রবর্ষের হিসাবে তাঁর বয়স ছিল ৬২ বছর ৪মাস, ১৪দিন আর সৌরবর্ষ অনুসারে ৬০বছর ৬মাস ৫দিন।

যাচ্ছিল। দাফন-কাফন সব কিছুই সুন্নত মুতাবিক আঞ্জাম দেওয়া হয়। বুযুর্গ পুত্র খাজা মুহাম্মদ সাঈদ জানাযায় ইমামতি করেন। অতঃপর দেহ মুবারক কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়।[১]

আচার-অভ্যাস ও দৈনন্দিন কর্মসূচী

খাজা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেদমতে তাঁর জীবনের শেষ তিন বছর ঘরে বাইরে সর্বত্র সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। হযরত-এর আচার-অভ্যাস ও দৈনন্দিন কর্মসূচী তিনি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।[২] এখানে তাঁর লিখিত অংশের সংক্ষিপ্ত-সার পেশ করা হচ্ছে। মওলানা বদরুদ্দীন সরহিন্দীর গ্রন্থ "হাযারাতু'ল-কুদ্স"-থেকে কিছুটা বর্ধিত অংশও পেশ করা হয়েছে।[৩]

"হযরতকে প্রায়ই একথা বলতে শুনেছি যে, আমাদের আমল ও চেষ্টা-সাধনার মূল্যই বা কতটুকু। যা কিছু তা সবই আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহ। কিন্তু এর মাধ্যম বা উপায়-উপকরণ হিসেবে যদি কোন কিছুকে গণ্য করা হয় তবে তা সায়্যিদু'ল-আওয়ালীনা ওয়া'ল-আখিরীন (স.)-এর আনুগত্য যার উপর সকলের কর্মের ভিত্তি মনে করি। আল্লাহ তা'আলা যাই কিছু দান করেছেন তাঁরই পায়রবী ও সদয় অনুসরণের পথে দিয়েছেন—তা অল্পই হোক কিংবা বিস্তর, আংশিক বা সামগ্রিক। আর যা পাইনি তা এজন্য পাইনি যে, মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাজনিত কারণে পূর্ণ আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও ঘাটতি ছিল। একদিন বললেন, একদিন পায়খানায় প্রবেশের সময় ভুলক্রমে প্রথমে ডান পা রেখেছিলাম। সেদিন আমি বহু রূহানী হালত থেকে বঞ্চিত ছিলাম। এক বার তিনি তাঁর শাগরিদ সালেহ খাতলানীকে তাঁর কাপড়ের ব্যাগ থেকে কয়েকটি লুঙ্গি নিয়ে আসার জন্য বলেন। তিনি গিয়ে ছ'টি লুঙ্গি নিয়ে আসেন। এতদ্দৃষ্টে তিনি খুবই অসন্তোষ ভরে বললেন ঃ আমাদের সূফীর এখনও জানা নেই যে, হাদীসে বলা হয়েছে ঃ الله وتر يحب الوتر। (আল্লাহ বেজোড়, বেজোড়কেই তিনি পছন্দ করেন)। এটি মুস্তাহাব। লোকে মুস্তাহাবকে কি মনে করে? যদি দুনিয়া ও আখিরাতও এমন কোন নেক আমলের বিনিময়ে দিয়ে দেওয়া হয় যে নেক আমল আল্লাহ পছন্দ করেন তবে এরূপ দুনিয়া ও আখিরাতেরও কোন মূল্য নেই। জনৈক খাদেম বলেন যে, আমি শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন ফযলুল্লাহ (কু. সি)-কে বললাম,

---

১. যুবদাতু'ল-মাকামাত থেকে সংক্ষেপিত, পৃ. ২৫৬, ৩০০;

২. প্রাগুক্ত, ১৯২-২১৫ পৃ;

৩. প্রাগুক্ত,

"আপনি সরহিন্দে যা কিছু দেখেছেন আমাদেরকেও কিছু শোনান।" তিনি বললেন, "অন্ধের চোখে কি পড়বে আর কি দেখবে সে। যেটুকু দেখেছি তাতো এই যে, সুন্নতের আদব ও ছোট-খাটো জিনিসের ভেতর থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি পরিত্যক্ত হবার সুযোগ দিতেন না। সুন্নতের এতটা ইহতিমাম অপর কারুর পক্ষে নেহায়েত দুরূহই বটে।"

আরেক জন সাক্ষ্য দিলেন যে, হযরতের আধ্যাত্মিক অবস্থা আমাদের অনুভব ও উপলব্ধির বাইরে। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে, হযরতের হালতদৃষ্টে ইসলামের প্রথম যুগের আওলিয়া-ই কিরামের অবস্থা বই-পুস্তকে যতটা পড়েছি তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে এবং এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়েছি যে, তাতে এতটুকু অতিশয়োক্তি করা হয়নি বরং জীবনী লেখকগণ যেটুকু লিখেছেন কমই লিখেছেন। তাঁর (হযরত মুজাদ্দিদ-এর) গোটা দিন ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্র-আযকারের মধ্যেই কেটে যেত। একজন বিশিষ্ট খাদেম (যার খেদমত হযরতের ওযূ করানো, জায়নামায বিছানো ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট ছিল) বলেন ঃ দুপুরে খাবার গ্রহণের পর হযরতের বিশ্রাম গ্রহণকালে এবং রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হবার পর আমার কিছুটা ফুরসত মিলত। তিনি তাঁর খাদেম ও শাগরিদদেরকে অধিক পরিমাণে সার্বক্ষণিক ইবাদত-বন্দেগী, যিকর ও মুরাকাবার মাঝে অতিবাহিত করবার জন্য তাকীদ দিতেন এবং বলতেন ঃ এই দুনিয়া দারুল 'আমল তথা কর্মের ময়দান এবং আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বাহ্যিক আমলের সাথে সমন্বয় ও সম্মিলন ঘটাও। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের (আল্লাহর মাহবূব ও উচ্চ মরতবার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও) ইবাদতের আধিক্যের দরুন পা মুবারক ফুলে যেত।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফিক্হ শাস্ত্রে ও মূলনীতি বিষয়ে (উসূলে ফিক্হ) গভীর পাণ্ডিত্য রাখতেন। এতদসত্ত্বেও এব্যাপারে তিনি এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি পর্যালোচনা করতেন এবং ঘরে থাকুন কিংবা বাইরে সফরেই হোন সে সব সাথেই রাখতেন। ইখতিলাফী মসলার ব্যাপারে মুফতীদের সম্মিলিত রায় ও ফকীহকুল শ্রেষ্ঠদের অগ্রাধিকার প্রদত্ত অভিমতের উপর আমল করতেন। অধিকাংশ সময় নিজেই ইমামতি করতেন। একবার এর পেছনের নিহিত কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ শাফিঈ ও মালিকী মযহাবের অনুসারীদের নিকট সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতিরেকে সালাত আদায় হয় না বিধায় তারা ইমামের পেছনেও সূরা ফাতিহা পাঠ করে। বহু হাদীস থেকেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

কিন্তু আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে মুকতাদীর পক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠ জায়েয নয়। হানাফী মযহাবের ফকীহদেরও এটাই মযহাব। যেহেতু আমি বিভিন্ন মযহাবের মাঝে সম্মিলন ও সমন্বয়ের জন্য কোশেশ করি এই জন্য ইমামতি করাকেই এর সহজ সূরত মনে করি।

শীত কিংবা গ্রীষ্ম যখনই হোক হযরতের ঘরে-বাইরের আমল ছিল নিম্নরূপঃ

"অধিকাংশ সময় রাত্রির শেষার্ধে এবং কখন কখনও শেষ তৃতীয়াংশে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। সেই সময়ের জন্য হাদীসে যেসব দু'আ বর্ণিত আছে তা পাঠ করতেন। খুবই যত্ন ও সতর্কতার সাথে পরিপূর্ণরূপে ওযু করতেন যাতে প্রয়োজনীয় সকল অঙ্গের সর্বত্র ওযূর পানি গিয়ে পৌঁছে। কাউকে ওযুর পানি ঢালবার অনুমতি দিতেন না। ওযু কালীন কেবলামুখী হতেন। অবশ্য পা ধৌত করবার সময় উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে ফিরতেন। নিয়মিত মেসওয়াক করতেন। এসময় হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ পাঠ করতেন। এরপর পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে দীর্ঘ কেরাআত সহকারে নফল নামায পড়তেন। নফল সমাপ্তির পর বিনয় কাতর চিত্তে (খূশূ) ও ইস্তিগরাকের সাথে মুরাকাবার মাঝে মশগুল হয়ে যেতেন। ফজরের কিছু পূর্বে সুন্নত মুতাবিক সামান্য ঘুমিয়ে নিতেন এবং সুবহে সাদিকের পূর্বেই উঠে পড়তেন। নতুন করে ওযু করতেন। ফজরের সুন্নত ঘরেই আদায় করতেন। সুন্নত ও ফরযের মাঝে নীরবে سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم পাঠ করতে থাকতেন। ফজরের সালাত সুবহে কাযিব-এর শেষ ভাগ ও সুবহে সাদিকের প্রথম ভাগে আদায় করতেন যাতে করে "গুলুস ও আসফার" *সম্পর্কিত দু'টি মযহাবের উপরই আমল হয়ে যায়। স্বয়ং ইমামতি করতেন এবং ফজর নামাযে সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজের মধ্যবর্তী সূরাসমূহের যেকোন একটি পাঠ করতেন (যেমনটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত)। ফজরের সালাতের পর ইশরাক পর্যন্ত হাল্কা করতেন। অতঃপর দীর্ঘ সালাতু'ল-ইশরাক আদায় করত তসবীহ ও দু'আ মাছুরাসমূহ পাঠ থেকে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরতেন, ঘরের ও পরিবারের লোকজনের খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটাতেন। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিতেন।[১] এরপর তিনি তাঁর নিজের ঘরে ফিরে আসতেন এবং পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোনিবেশ সহকারে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে ডুবে যেতেন। তেলাওয়াত সমাপ্তির পর মুরীদ ও শাগরিদেরদেরকে ডেকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন ও প্রয়োজনীয় হেদায়েত দিতেন। এসময়ই বিশিষ্ট বন্ধু-

---

১. হাযারাতুল-কুদ্স, ৮২ পৃ.

বান্ধব ও শাগরিদদেরকে ডেকে তাদের রূহানী 'ইল্‌ম সম্পর্কে আলোকপাত করতেন এবং তাদেরকে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করতেন এবং তারাও নিজেদের অবস্থা ও কায়ফিয়্যাত সম্পর্কে শায়খকে অবহিত করতেন। তিনি তাদেরকে বুলন্দ হিম্মত, সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ, সার্বক্ষণিক যিক্‌র এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক শুদ্ধির অবস্থা গোপন রাখার জন্য তাকীদ প্রদান করতেন। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র 'আজমত তথা মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন ঃ সমগ্র বিশ্বজগত এই কালেমার মুকাবিলায় ততটুকু গুরুত্বও রাখেনা যতটুকু রাথে সমুদ্রের বিপুল জলরাশির মুকাবিলায় এক কাত্‌রা পানি। খাদেম ও উপস্থিত লোকদেরকে ফিক্‌হ্‌-এর গ্রন্থাদি অধ্যয়নের প্রতি তাকীদ এবং 'উলামায়ে কিরাম থেকে শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম তথা বিধি-বিধানসমূহের জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত করতেন।

"তিনি বলতেন ঃ কাশ্‌ফ-এর মধ্যে তিনি দেখতে পান যে, গোটা বিশ্ব বিদ'আতের অন্ধকার পংকে নিমজ্জিত আর এর মাঝে সুন্নতের আলোক-রশ্মি জোনাকীর আলোর ন্যায় মিটমিট করছে। গীবত (পরনিন্দা ও পরচর্চা) ও অপরের ছিদ্রান্বেষণের ব্যাপারে তিনি ভীষণ সতর্ক ছিলেন। তৎপ্রতি সম্মান ও ভীতির কারণে খাদেমগণও তাঁর সামনে গীবত করতে পারত না। নিজের অবস্থা ও কায়ফিয়াত সযত্নে লুকিয়ে রাখতেন। দু'বছরের সময়কালে তিন-চার বার ফোটা ফোটা অশ্রু দু'গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়তে দেখেছি। তেমনি তিন চার বার উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক আলোচনা কালে দু'গণ্ড ও চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেতে দেখেছি।

"ঠিক দ্বিপ্রহরে ও চাশ্‌তের সালাত আদায় অন্তে অন্দর মহলে গমন করতেন এবং ঘরের লোকজনের সঙ্গে একত্রে আহার করতেন। ছেলেরা কিংবা পরিবারস্থ লোকেরা কোন জিনিষ তৈরী করলে তা হযরতের সামনে পেশ করতেন। ছেলে ও খাদেমদের কেউ তখন না থাকলে তার অংশ তিনি আলাদা রেখে দিতেন। খাবার সময় অন্যকে খাওয়াতে বেশি ব্যস্ত থাকতেন এবং বেশির ভাগ সময় অন্যদের খোঁজ-খবর নেওয়া ও যত্ন-আত্তিরের মাঝেই অতিবাহিত হত। কখনও কখনও নামে মাত্র খাবার গ্রহণ করতেন। দেখে মনে হত খাওয়ার প্রবৃত্তি নেই, সুন্নতের পায়রবীই একমাত্র উদ্দেশ্য।[১] শেষ জীবনে যখন নির্জন ও নিভৃত জীবন যাপন করতে শুরু করেন এবং রোযা রাখতেন তখন খাবারও সেই একই ঘরেই গ্রহণ করতেন। খাওয়ার পর আম রেওয়াজ মাফিক ফাতিহা পাঠ করতেন না, যেহেতু সহীহ্‌ হাদীসে এর কোন প্রমাণ মেলে না। ফরয আদায়ের পরও ফাতিহা পাঠের অভ্যাস ছিল না যেমনটি অনেক বুযুর্গের নিয়ম ছিল।

১. হাযারাতু'ল-কুদ্‌স, ৮৭ পৃ;

"দুপুরের আহারের পর সুন্নত মাফিক অল্পক্ষণ গড়িয়ে নিতেন (কায়লুলা)। জোহরের প্রথম ওয়াক্তে মুওয়ায্যিন আযান দিতেন। তিনি ওযু করত সুন্নতে যওয়াল পড়তেন। জোহরের সালাত সমাপনের পর কোন হাফিজ থেকে কমবেশি একপারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনতেন। আর যদি দরস হত তবে দরস প্রদান করতেন। আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সঙ্গী-শাগরিদ ও খাদেমদের সাথে নীরবতা পালন ও মুরাকাবার মধ্যে নিমগ্ন হতেন এবং খাদেমদের আধ্যাত্মিক কায়ফিয়াতের দিকে মনোযোগ দিতেন। মাগরিবের সুন্নত আদায়ের পর সালাতুল আওয়াবীন পড়তেন, কখনো চার রাক'আত—কখনো ছয় রাক'আত। এশার ওয়াক্ত শুরু হবার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে তা আদায় করে নিতেন। বিত্র নামাযে হানাফী ও শাফিঈ উভয় মযহাবের দু'আ-ই কুনূতই একত্রে পাঠ করতেন। এরপর দু'রাকআত নফল কখনো বসে আবার কখনো দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। শেষ দিকে এই সালাত খুব কমই আদায় করেছেন। বিত্রের পর সাধারণভাবে পরিচিত দুই সিজদা দিতেন না।

"রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। এশার সালাত ও বিত্র আদায়ের পর বিশ্রামের জন্য খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন এবং দু'আ মাছুরা পাঠে মগ্ন হতেন। অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। বিশেষত জুমু'আ, সোমবার রাত্র ও দিনে তা আরও বেশি করে পড়তেন। কুরআন তেলাওয়াতের সময় চেহারা মুবারক ও পড়ার ভঙ্গিদৃষ্টে শ্রোতৃবর্গ অনুভব করত যে, কুরআন পাকের রহস্য ও বরকতের আয়াতসমূহের ফয়েয উপচে পড়ছে। সালাতের ভেতর ও বাইরে কুরআনের ভীতি প্রদর্শনমূলক আয়াতসমূহ পাঠকালে কিংবা যে সমস্ত আয়াত বিস্ময় প্রকাশক বা জিজ্ঞাসাবোধক সে সব আয়াত তেলাওয়াতকালে তাঁর মাঝেও অনুরূপ ভাব ও ভঙ্গি ফুটে উঠত। সালাতে সব রকমের সুন্নত, মুস্তাহাব ও এর প্রয়োজনীয় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তাহিয়্যাতু'ল-ওযু ও তাহিয়্যাতু'ল-মসজিদ সালাতও খুব ইহতিমামের সাথেই আদায় করতেন। তারাবীহ্ ব্যতিরেকে কোন নফল সালাত জামা'আত সহকারে আদায করতেন না। আশুরা কিংবা শবে কদরের নফল জামা'আতের সাথে আদায় করতে নিষেধ করতেন।

"পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে গমন করতেন এবং এসময় হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ পাঠ করতেন। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও গমন করতেন। কতক উচ্চ পর্যায়ের দীনী কিতাব (উদাহরণত তফসীরে বায়দাবী, সহীহ বুখারী, মিশকাতু'ল-মাসাবীহ্, ফিক্হ, উসূল ও ইলমে কালামের ক্ষেত্রে হেদায়া,

বায়দাবী, মাওয়াকিফ এবং ইলমে তাসাওউফে 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ-এর নাম করা যেতে পারে)-এর দরস প্রদান করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আলোচনা-সমালোচনা কিংবা তর্ক-বিতর্কের প্রশ্রয় দিতেন না। জীবনের শেষ দিকে এক্ষেত্রে দেবার মত সময় তাঁর খুব কমই ছিল। ছাত্রদেরকে ধর্মীয় 'ইলম হাসিলের প্রতি খুবই তাকীদ দিতেন এবং 'ইল্‌ম হাসিলকে সুলূক ও তরীকতের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। অধিক পরিমাণে হাম্‌দ ও ইস্তিগফার পাঠ করতেন এবং নে'মতের পরিমাণ অল্প হলেও বেশি শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতেন।

"রমযান মাসের বড়ই ইহতিমাম করতেন। কুরআন শরীফ কমপক্ষে তিন খতম করতেন। নিজে হাফিজে কুরআন ছিলেন। এজন্য রমযানের বাইরেও মুখস্ত তেলাওয়াত করতেন এবং বিভিন্ন হাল্‌কা বা বৈঠকেও শুনতে থাকতেন।[১] ইফতার তাড়াতাড়ি এবং সাহ্‌রীর ক্ষেত্রে বিলম্ব করতেন—হাদীসে যেমন বর্ণিত হয়েছে এবং এর খুবই ইহতিমাম করতেন।[২]

"যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ছিল এইরূপ ঃ কখনও কোথাও থেকে হাদিয়া কিংবা নযর-নেয়ায এসে গেলে তা বছর অতিক্রান্তির জন্য অপেক্ষা করতেন না, আসা মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে হিসাব করত যাকাত আদায় করতেন। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অভাবী, দুঃস্থ, বিধবা ও আত্মীয়দের অগ্রাধিকার দিতেন। কয়েকবার হজ্জ আদায়ের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা আর হয়ে ওঠেনি। সর্বদাই এর জন্য আগ্রহান্বিত ও লালায়িত ছিলেন এবং এই লালিত বাসনা বুকে নিয়েই এই নশ্বর জগত থেকে বিদায় নেন।

"চরিত্র ও বিনয়-নম্র ব্যবহার, আল্লাহর সৃষ্টিকুলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা, আল্লাহ্‌র ফয়সালার প্রাত সন্তুষ্টি প্রকাশ ও অবনত মস্তকে তা মেনে নেবার ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত দর্জায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মীয়-পরিজন, অনুরক্ত শাগরিদ ও ভক্তকুল অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা বেশ নিপীড়িত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এসবই সন্তুষ্টচিত্তে ও অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিলেন, অভিযোগের একটি বাক্যও মুখে আসতে দেন নি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কেউ আগমন করলে তিনি তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং মজলিসের মধ্যে তাকে বসতে দিতেন, তার স্বাদ, রুচি ও প্রকৃতি উপযোগী কথা বলতেন। অমুসলিম তা তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোন কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারীই হোন, তাকে তা'জীম করতেন না। আগেভাগেই সালাম করতেন। আমার মনে পড়ে না

১. যুবদাতু'ল-মাকামাত, সংক্ষেপিত, ১৯২-২১৫ পৃ;
২. হযরাতু'ল-কুদ্‌স,৯১ পৃ;

কেউ কখনো তাঁকে আগে সালাম দিতে পেরেছে। তিনি তাঁর উপর নির্ভরশীল লোকদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। কারুর ইনতিকালের খবর পেলে প্রভাবিত হতেন, ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন পাঠ করতেন, তার সালাতে জানাযায় শরীক হতেন এবং তাঁর জন্য দু'আ ও ঈসালে ছওয়াব করতেন।[১]

"তাঁর পোশাক ছিল একটি কুর্তা যার দুই কাঁধই ফাড়া হত। এর উপর আবা থাকত। কিন্তু গ্রীষ্মকালে কেবলই কুর্তা গায়ে দিতেন। সুন্নত মাফিক মাথায় পাগড়ী পরিধান করতেন এবং শামলা ঝুলে থাকত দুই কাঁধের মাঝে পিঠ বরাবর (কেবল পেশাব-পায়খানার সময় ছাড়া)। পাজামা টাখনুর উপর থাকত। জুমু'আ ও দুই ঈদে মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। নতুন কাপড় পরিধান করলে পূর্বের জোড়া কোন খাদেম কিংবা প্রিয় মেহমানকে দিয়ে দিতেন। সাধারণত ৫০-৬০ জন আলিম-উলামা, ওলী-'আরিফ, মাশায়েখ, হাফিজ ও নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য লোক তাঁর খেদমতে পড়ে থাকত। কখনো কখনো এ সংখ্যা শ'র কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছত। হযরত-এর মেহমান হিসেবেই তাঁরা আপ্যায়িত হতেন।"[২]

হুলিয়া মুবারক (চেহারা ও আকৃতি বর্ণনা)

হযরতের অন্যতম খলীফা এবং ১৭ বছরের সাহচর্য ধন্য শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দী "হাযারাতু'ল-কুদস" গ্রন্থে শায়খ মুজাদ্দিদ (র)-এর চেহারা-সূরত ও আকৃতি নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

"হযরত ছিলেন গৌর বর্ণের, সাদার ভাগই বেশী। ললাট দেশ ও গণ্ডদ্বয় এত উজ্জল আভামণ্ডিত যে, দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। প্রশস্ত ভ্রূযুগল ধনুকের ন্যায় বাঁকা, দীর্ঘ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, চিকন সূক্ষ্ম রেখাযুক্ত। চক্ষুদ্বয় প্রশস্ত, কালো অংশ খুবই কালো এবং সাদা অংশ খুবই সাদা, চোখের মণি উজ্জ্বল। ওষ্ঠদ্বয় পাতলা ও লালিমামণ্ডিত, মুখ মধ্যমাকৃতির, দাঁত পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ মুক্তার ন্যায় ঝলমলে,ঘন দীর্ঘ চাপ দাড়ি মর্যাদার প্রতীক। গণ্ডদেশে মাঝারি ধরনের কিছু চুল ছিল। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির ছিমছাম হাল্কা-পাতলা গড়নের।"[৩]

সন্তান-সন্ততি

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে সাতজন পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। এঁদের ভেতর দু'জন অল্প বয়সে হযরতের জীবদ্দশায়ই ইনতিকাল

---

১. হাযারাতু'ল-কুদ্‌স, শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দীকৃত, পাঞ্জাব আওকাফ বিভাগ থেকে মুদ্রিত, ১৯৭১ খৃ. ৯১-৯২ পৃ;

২ প্রাগুক্ত. ৯২ পৃ;

৩, প্রাগুক্ত ,১৫৫ পৃ.

করেন। শায়খ মুহাম্মদ ফররুখ, শায়খ মুহাম্মদ 'ঈসা ও শায়খ মুহাম্মদ আশরাফ দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় ইনতিকাল করেন। খাজা মুহাম্মদ সাদিক 'ইল্‌ম হাসিল ও সুলূক-এ পূর্ণতা প্রাপ্তির পর ১০২৫/১৬১৬ সালে ২৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিন পুত্র 'আলীকদর খাজা মুহাম্মদ সাঈদ, খাজা মুহাম্মদ মা'সূম ও খাজা মুহাম্মদ ইয়াহয়া শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই চারজন সম্পর্কে একথা বলা যায় ঃ

این سلسله از طلائے ناب ست * ایں خانه تمام افتاب ست

এ বংশধারা খাটি স্বর্ণের, এ খান্দান গোটাই উজ্জ্বল সূর্য।

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (র) এঁদেরকে দেখে খুবই প্রশংসনীয় উক্তি করেছিলেন এবং شجرةطيبة ও جواهر علويه দ্বারা তা'বীর করেছিলেন। বলেছিলেন ঃ

فقرائے باب الله اند دلهائے عجیب دارند

প্রথম পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ সাদিক হযরত মুজাদ্দিদ-এর সামনেই কামালিয়তের দর্জায় উপনীত হয়েছিলেন। হযরত তাঁর এই পুত্ররত্ন সম্পর্কে প্রশংসনীয় উক্তি করেছিলেন এবং তাঁর উচ্চ মানের জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ অধমের এই প্রাণপ্রিয় পুত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আধার এবং জয্‌ব ও সুলূক-এর মকামসমূহের সহীফা (পুস্তক) বিশেষ।[১]

দ্বিতীয় পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ সা'ঈদ ১০০৫/১৫৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭শে জুমাদা'ল-আখির, ১০৭০/২৮শে মার্চ, ১৬৬০ সালে ইনতিকাল করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সিলসিলার প্রচার, ভক্ত মুরীদ ও অনুরক্ত শাগরিদদের তা'লীম ও তরবিয়ত প্রদানে তিনি বিরাট অংশ নেন।[২]

তৃতীয় পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম যিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতার 'ইলম-এর ধারক-বাহক, ভাষ্যকার, গুপ্ত-রহস্যের ভাণ্ডার, বিশ্বস্ত রক্ষক, খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে মুজাদ্দিদিয়া তরীকা-এর তা'লীম ও তাছীর এমনভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে যে, কথক ঠিকই বলেছেন ঃ

چراغ هفت کشور خواجه معصوم * منور از فروغش هند تا روم

১. পত্র নং ২৭৭, ১ম খণ্ড, ফযীলত ও কামালিয়ত সম্পর্কে দ্র যুবদাতু'ল-মাকামাত, ৩০২-৩ পৃ;

২. দ্র. প্রাগুক্ত ৩০৮-১৫ পৃ.

খাজা মা'সূম সপ্ত মহাদেশের প্রদীপ; তাঁর আলোয় সমুজ্জ্বল ভারত থেকে রোম।

দিল্লীর বিখ্যাত খানকাহ্ যা আরব-আজমের আধ্যাত্মিক ধারার প্রাণকেন্দ্র ছিল (এবং যে খানকাহ্র স্ব-স্ব যুগে উত্তরাধিকারিত্ব বহন করেছিলেন খাজা সায়ফুদ্দীন, মির্যা মাজহার জানেজানাঁ, হযরত শাহ গুলাম 'আলী এবং হযরত শাহ আহমদ সা'ঈদ) তাঁরই সিলসিলার ছিল। মওলানা খালিদ রূমী কুর্দী এই খানকাহ্ থেকেই হযরত শাহ গুলাম 'আলীর পদতলে বসে দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক এই সিলসিলাকে সিরিয়া ও তুরস্ক পযন্ত নিয়ে যান যার থেকে এই তরীকা ইরাক, সিরিয়া, কুর্দিস্তান ও তুরস্কের নগর-বন্দরে ও ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

তাঁর পত্রসমূহ هر سه اجزاء মকতূবাত-ই ইমাম রব্বানী-র এক ধরনের ভাষ্য ও বিস্তৃত বিবরণ এবং ইল্‌ম ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্যের এক ভাণ্ডার বিশেষ। তাঁর জীবনের বিস্তৃত ঘটনাপঞ্জী ও কামালিয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলে একটি স্থায়ী গ্রন্থের আবশ্যক।

سفینہ چاھئیے اس بحر بیکر اں کیلئے

সম্রাট মুহ্‌য়িদ্দীন আওরঙ্গযীব তাঁরই হস্তে হস্ত স্থাপন পূর্বক বায়'আত হয়েছিলেন এবং তৎপুত্র খাজা সায়ফুদ্দীনই তাঁকে (সম্রাটকে) সুলূক-এ প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন। তিনি সম্রাটকে ভারতবর্ষের মুসলিম শাসক হতে এবং আকবরের প্রভাব থেকে পরিপূর্ণরূপে পাক-পবিত্র করে গড়ে তুলেছিলেন। সম্রাটকে তিনি তাঁর পত্রে شهزاده دین پناه নামে উল্লেখ করতেন।

১১ই শওয়াল, ১০০৭/২৭শে এপ্রিল,১৫৯৯ তারিখে খাজা মুহাম্মদ মা'সূম জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ই রবীউল-আওয়াল, ১০৭৯/ ৭ই আগস্ট, ১৬৬৮ তারিখে ইনতিকাল করেন।[২]

চতুর্থ পুত্র খাজা মুহাম্মদ ইয়াহয়া, হযরত মুজাদ্দিদ-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৯বছর। বুযুর্গ ভ্রাতাদের নিকট 'ইল্‌ম হাসিল করেন এবং তরীকতে কামালিয়াত লাভ করেন। ১০৯৬/১৬৮৫ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।[৩]

১. তাঁর ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাইলে দ্র. শরহে দুর্রে মুখতার প্রণেতা আল্লামা শামীর কিতাব سل الحسام الهندى لنصرة مولنا خالد النقشبندى এই সিলসিলার মাশায়েখ এখনও সিরিয়া, ইরাক, কুর্দিস্তান ও তুরস্কে বর্তমান। লেখক তাদের ভেতর কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে শায়খ ইবরাহীম গালা য়ামানী, শায়খ আবু'ল-খায়র ময়দানী, শায়খ মুহাম্মদ নাবহান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. গ্রন্থের শেষে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। নুযহাতু'ল-খাওয়াতির থেকে এ আলোচনা সংগৃহীত ও উদ্ধৃত।

৩. ভূপালের শাহ রঊফ আহমদ ও তাঁর পৌত্র হযরত শাহ পীর আবু আহমদ ও তাঁর প্রপৌত্র হযরত শাহ মুহাম্মদ ইয়া'কূব তাঁরই বংশধর।

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ-এর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু

হযরত মুজাদ্দিদ-এর আসল সংস্কার ও পুণর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ড বা অবদান কি ছিল?

দৃষ্টিসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ সকল লোকই যারা হি. একাদশ শতাব্দীর (যেখান থেকে হি. দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনা হয়) ইসলামের ইতিহাসের উপর সাধারণ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামের ইতিহাসের উপর বিশেষভাবে নজর বুলিয়েছেন[১] তারাই এবিষয়ে একমত যে, হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দীর দ্বারা ইসলামের হেফাজত ও এর শক্তি যোগানোর ক্ষেত্রে যেই ঐতিহাসিক ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালিত হয়েছে হাদীসের সহজ সরল পরিভাষায় যাকে "তাজদীদ"[২] বলা হয়েছে এবং এইক্ষেত্রে তিনি এমন খ্যাতি অর্জন করেছেন যা তাঁর নামের স্থলাভিষিক্তে পরিণত হয়েছে যার নজীর ইসলামের ইতিহাসে ইতো-পূর্বে আর পাওয়া যায় না।

শায়খ আহমদ সরহিন্দীর সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড কি ছিল? ইসলামের রূহ তথা প্রাণশক্তি ও চিন্তা-চেতনায় সজীবতা ও নবজীবন সঞ্চার, যুগের গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্গীনতরো ফেতনার উৎসাদন ও মূলোৎপাটন, মুহাম্মদী নবুওত ও ইসলামী শরীয়তের সত্যতা ও চিরন্তনতার উপর নতুন করে বিশ্বাস ও আস্থা পুনঃস্থাপন, আরবের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য ও

---

১. গ্রন্থের প্রথম দু'টি অধ্যায়ে এর উপর বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২. সুনানে আবী দাউদের বিখ্যাত হাদীস

ان الله عز وجل بعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় এমন একজনের আবির্ভাব ঘটাবেন যিনি এই উম্মাহর জন্য দীনের পুনর্জাগরণ ঘটাবেন (আবু দাউদ প্রভৃতি)। হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাইলে দ্র. আবদুল বারী নদভীকৃত جامع المجددين -এর মওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর ভূমিকা, ১৬-২৪ পৃ.।

অনুসরণ-অনুকরণ থেকে মুক্ত New-Platonist Theosohy তথা নব্য-প্লেটোবাদী ধর্মতত্ত্ব নির্ভর সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, সত্য-সন্ধান ও খোদা-সন্ধানী প্রয়াসের শূন্যগর্ভতা প্রদর্শন, "হামাউস্ত" ও ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ 'আকীদা ও মতবাদের খণ্ডন ও পর্দা উন্মোচন, যে আকীদা ও মতবাদ বিপুল প্রচার, জনপ্রিয়তা ও বাড়াবাড়ির চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যদ্দরুন মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসে ফাটল এবং সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা জন্মলাভ করছিল এবং এরই পাশাপাশি এর সমতুল্য 'ওয়াহ্দাতুশ-শুহূদ' আকীদা ও মতবাদকে শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ সহযোগে ও বিন্যস্ত আকারে পেশ করা, বিদ'আত (যা একটি স্থায়ী ও চিরন্তন শরীয়তের রূপ পরিগ্রহ করেছিল)-এর খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান ও সুস্পষ্ট বিরোধিতা, এমন কি "বিদ'আতে হাসানা"-র অস্তিত্বকেও অস্বীকার, অবশেষে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের উৎপাটিত পদসমূহকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন, আকবরের আমলের ইসলাম বিরোধী প্রভাব বলয়ের নিশ্চিহ্নকরণ এবং ভারতবর্ষে এমন একটি সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক ধর্মীয় বিপ্লব আনয়নের বিজ্ঞোচিত ও সফল প্রয়াস চালানো যদ্দরুন একদিকে সম্রাট আকবরের সিংহাসনে মুহ্য়ি'দ্দীন আওরঙ্গযীব আলমগীর সিংহাসনারূঢ় হন,অপর দিকে হাকীমু'ল-ইসলাম হযরত শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভী এবং তাঁর খলীফাবর্গ ও শাগরিদকুলের সেই সিলসিলা জন্মলাভ করে যাঁরা রূহানী ও বাতেনীভাবে এই সিলসিলার সঙ্গেই সম্পর্কিত ও সম্পৃক্ত ছিলেন এবং যাঁরা কুরআন-সুন্নাহ্র প্রচার ও প্রসারে, এর মর্ম অনুধাবন ও উদ্ঘাটনে, তাঁদের দর্স-তাদরীস তথা পঠন-পাঠনে ও মাদরাসা কায়েমে, আত্মিক পরিশুদ্ধি, আকীদা-বিশ্বাস ও প্রথা-পদ্ধতির সংস্কার সাধনে বিরাট খেদমত, অতঃপর সর্বশেষে জিহাদ ও আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত করার মাধ্যমে কেবল ভারতবর্ষেই ইসলামকে কায়েম ও ইসলামের বৃক্ষকে পল্লবিত ও বিকশিত করেন নি বরং একে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান (বিশেষ করে 'ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে), ইসলামের চিন্তা-চেতনা ও এর দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

কিন্তু এই বিরাট বিস্তৃত সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সেই আসল কাজ কি ছিল যা তাঁর সকল সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পাবার দাবী রাখে? বিভিন্ন জন তাদের স্ব-স্ব ধারণা ও রুচি মুতাবিক এর জওয়াব দিয়েছেন। এদের মধ্যে তিনটি দল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. একদলের মতে, তিনি এই জন্য মুজাদ্দিদ আলফেছানী (দ্বিতীয় সহ-স্রাব্দের মুজাদ্দিদ) হিসাবে অভিহিত হবার দাবীদার, যেহেতু তিনি ভারতীয়

উপমহাদেশকে পুনর্বার ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেন এবং একে ব্রাম্মণ্যবাদ অথবা এক ধর্মের কোলে যাবার পরিবর্তে পুনর্বার মুহাম্মদ আরাবী (সা)-র ও হেজাযী দীন (ইসলাম)-এর তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বাধীনে তুলে দেন এবং একে হিজরী একাদশ শতাব্দী (খৃষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতক)-এর মত গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দীতে সেই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন হি. ১৩শ/ ১৯শ শতাব্দীতে যে পরিণতি হতে যাচ্ছিল, বরং বস্তুতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতকে এই সর্বপ্লাবী আকীদাগত, মানসিক ও সাংস্কৃতিক ধর্মদ্রোহিতার তাৎক্ষণিক বিপদাশংকা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ করেন যে বিপদাশংকা সম্রাট আকবরের মত অটুট মনোবল ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অতুলনীয় প্রতিভাবান উপদেষ্টাত্রয় (মুল্লা মুবারক, ফৈযী ও আবু'ল-ফযল)-এর অপূর্ব ধী-শক্তিবলে একটি বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব এবং এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সভ্যতাগত ধর্মহীনতা সেই রাজনৈতিক অধঃপতন ও ক্ষমতাচ্যুতি থেকেও অনেক বেশী নাযুক, সঙ্গীন ও সুদূরপ্রসারী ছিল যা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় উপমহাদেশের বিকাশোন্মুখ অমুসলিম শক্তির উত্থান এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ শক্তির থাবা বিস্তার ও ক্ষমতালাভের মাধ্যমে দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত 'আল্লামা ইকবাল (র)তাঁর বিখ্যাত কবিতায় এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ঃ

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان * اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار

"ভারতবর্ষে মুসলিম মিল্লাতের তিনি সম্পদ রক্ষক;
আল্লাহ পাক তাকে সঠিক মুহূর্তেই সতর্ক করেছিলেন।"

২. দ্বিতীয় দলের মতে, তাঁর আসল সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কাজ ছিল এই যে, তিনি তরীকতের উপর শরীয়তের অগ্রাধিকার ও প্রাধান্যকে এমন প্রত্যয় ও আস্থার সাথে পর্যবেক্ষকসুলভ ও অভিজ্ঞ ভঙ্গীতে এতটা জোরের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে বিবৃত করেছেন যা তাঁর পূর্বে আর কেউ করেন নি। এর ফলে তরীকত যে শরীয়তের অনুগত ও খাদেম তা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। সূফী ও তরীকতপন্থী কোন কোন মহলে তরীকত শরীয়তের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত—এরূপ ধারণার ফলে কোথাও কোথাও শরীয়ত থেকে বিচ্যুতি, রিয়াযত ও মুজাহাদা (কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা) ও বাতেনী অনুভূতি ও শক্তির উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার যে ফেতনা শুরু হয়ে গিয়েছিল (যোগ ও সন্ন্যাসবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হবার কারণে) ভারতবর্ষ ছিল যার সর্বাপেক্ষা বড় টার্গেট, তা থেমে যায়। এরপর আর কারুর পক্ষে পষ্টাপষ্টিভাবে একথা বলার হিম্মত

হয়নি যে, "শরীয়ত ও তরীকত সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বস্তু এবং তরীকতের উপর শরীয়তের পাহারাদারী চলবে না"।

৩. তৃতীয় দল যারা মনে করেন যে, তিনি "ওয়াহদাতু'ল-ওজুদ"-এর 'আকীদা ও মতবাদের উপর এমন কার্যকর আঘাত হানেন যে, তাঁর পূর্বে অপর কেউ আর এমন আঘাত হানতে পারে নি। অতঃপর তিনি এর ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে থামিয়ে দেন বরং এর গতিমুখকে পাল্টে দেন যা শেষ শতাব্দীগুলোতে গোটা 'ইলমী ও আধ্যাত্মিক জগতকে আপন আয়ত্বে নিয়ে এসেছিল এবং যার বিরুদ্ধে লেখাপড়া জানা কোন মানুষের পক্ষে মুখ খোলা ও স্বীয় মুর্খতার প্রমাণ দেওয়া ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে-দুপুরে দাঁড়িয়ে দিনকেই অস্বীকারের নামান্তর ছিল। মওলানা সায়্যিদ মানাজির আহসান গীলানী মরহুম তদীয় هزاره دوم یا الف ثانی کا تجدیدی کارنامه নামক বিখ্যাত নিবন্ধে যথার্থই বলেছেন ঃ

"ওয়াহদাতু'ল-ওজুদ ও ওয়াহদাতুশ-শুহূদ-এর শাস্ত্রীয় আলোচনা-সমালোচনা কিংবা শরীয়ত ও তরীকতের মোল্লা ও সূফীসুলভ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর হযরত শায়খ আহমদ ফারূকী সরহিন্দী (র)-এর প্রকৃত সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ড এমনভাবে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে যে, আজ হযরত (কু. সি. আ) কে 'মুজাদ্দিদ আলফেছানী' বলা একটি প্রথাগত ব্যাপার ছাড়া বাহ্যত এর আর কোন সঙ্গত ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।"[১]

নবূওতে মুহাম্মদীর চিরন্তনতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর আস্থা পুনর্বহাল

কিন্তু বাস্তবে মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র আসল কৃতিত্ব যার আলোক-প্রভায় তাঁর সমগ্র সংস্কার ও পুর্ণজাগরণমূলক কর্মকাণ্ড সচল ও সজীব দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁর তাজদীদ-এর মূল উৎস যা থেকে তাঁর গোটা বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক কাজের স্রোতধারা উৎসারিত হয় এবং স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রবাহিত হয় তাহল নবুওতে মুহাম্মদী-এর চিরন্তনতা ও অপরিহার্যতার উপর মুসলিম উম্মাহ্র বিশ্বাস ও আস্থা পুনর্বহাল ও দৃঢ়করণ এমন এক পুণর্জাগরণমূলক ও বিপ্লবাত্মক অবদান যা তাঁর পূর্বে এত বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট সামর্থের সঙ্গে অপর কোন মুজাদ্দিদ আনজাম দেন নি। সম্ভবত আনজাম না দেবার কারণ এও যে, সে যুগে এর প্রয়োজনীয়তাই দেখা দেয় নি অথবা এর বিরুদ্ধে কোন সুসংগঠিত আন্দোলন কিংবা দর্শন সামনে আসে নি।[২]

১. তাযকিরায়ে ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানী, মওলানা মনজুর নু'মানীকৃত, ২৭ পৃ.।

২. এব্যাপারে সর্বাধিক সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কাছে পাওয়া যায়। বিশেষত তাঁর النبوات نقض المنطق والرد على المنطقيين নামক এতদসম্পর্কিত গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু এগুলোও ইশারা-ইঙ্গিত ও মোটামুটি আলোচনার বেশি এগোয় নি।

এই সংস্কার ও পুণর্জাগরণমূলক নীতি ও পদক্ষেপের মাধ্যমে ঐ সমস্ত ফেতনার মূলোৎপাটন ঘটে যা সেই সময় মুসলিম বিশ্বে মুখ ব্যাদান করে ইস-লামের পবিত্র বৃক্ষের এবং তাঁর গোটা 'আকীদাগত, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থাকে গিলে খাবার জন্য তৈরী ছিল। এসবের মধ্যে ইরানের নুকতাবী আন্দোলন এবং তার সমর্থক অনুসারীরাও শামিল যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূওত এবং তার স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিল এবং যারা ঘোষণা করেছিল যে, নবূওতে মুহাম্মদীর এক সহস্র বছর পূর্তি হল, এখন ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জীবনের নতুন পুনর্গঠন ও আইন প্রণয়নের এমন এক যুগ শুরু হতে যাচ্ছে যার বুনিয়াদ হবে বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনের উপর, যার নেতৃত্ব থাকবে মাহমুদ পীস খাওয়ান ও তার দলের হাতে আর যার কেন্দ্র হবে ইরান ও ভারতবর্ষ।[১] এসব ফেতনার মধ্যে সম্রাট আকবরের দীন-ই আকবরী (ইতিহাসে 'দীন-ই ইলাহী নামে পরিচিত।—অনুবাদক) ও 'আঈন-ই জাদীদও অন্তর্ভুক্ত যা ভারতবর্ষে নবূওত ও শরীয়তে মুহাম্মদীর স্থান দখল ও এর বিকল্প হবার দাবীদার ছিল। ধর্মীয় জীবন-যিন্দেগী, ইবাদত ও আমল এবং সমাজ ও সংস্কৃতির সেই সব ধর্মীয় বিদ'আতও এর অন্তর্গত যা একটি সমান্তরাল শরীয়ত হতে যাচ্ছিল এবং যার একটি স্থায়ী ফিক্হ বা আইন শাস্ত্র প্রণীত ও সংকলিত হচ্ছিল আর তাও বস্তুতপক্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ (স)-র সমাপ্তির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ও শরঈ আইন প্রণেতার দাবীদার ছিল।

এক্ষেত্রে ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ-এর দর্শনও এসে যায় যার ভিত্তি ছিল স্বীয় দাঈ ও পতাকাবাহীদের কথিত উক্তি মাফিক কাশ্ফী হাকীকতের উপর এবং যে দর্শন সম্পর্কে এর চরমপন্থী অনুসারীও একথা দাবী করে না যে, খাতামান্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এ দর্শন প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন, তিনি সাহাবায়ে কিরাম (র) এবং সাহাবায়ে কিরাম (র) পরবর্তী লোকদেরকে এর প্রতি দাওয়াত জানিয়েছেন। এই দাওয়াত ও দর্শনও নবূওতের পেশকৃত দাওয়াত ও তার সুস্পষ্ট শিক্ষামালা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের (জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে) প্রতিপক্ষে পরিণত হতে চলেছিল এবং এক্ষেত্রে তার যতটুকু সাফল্য অর্জিত হত, এর মূল দিল ও দিমাগে তথা মন-মস্তিষ্কে ও মুসলিম সমাজ দেহে গেঁথে যেত ততই আহকাম-ই শারী'আত তথা শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের উপর আমল করা, ইসলামই যে একমাত্র সত্য ধর্ম ও মুক্তি লাভের মাধ্যম এই বিশ্বাসে দুর্বলতা দেখা দিত এবং ধর্মদ্রোহিতা, বল্গাহীন স্বাধীনতা, কোন কিছুই দোষনীয়

১. পুস্তকের ১ম অধ্যায়, দশম শতাব্দীর বড় ফেতনা দ্র.।

নয় বরং সব কিছুই বৈধ—এই মানসিকতা, আমল অপ্রয়োজনীয় ইত্যাদি রকমের ধারণার রাস্তা খুলে যেত, চাই কি এর সতর্ক ও পরহেযগার কথক সূফী-মাশায়েখ স্বয়ং শরীয়তের যতই পাবন্দ হোন, তিনি নিজে শরীয়তের প্রতি যতই কেন শ্রদ্ধাশীল না হোন এবং এই কর্মপন্থার তিনি যত বিরোধীই কেন না হোন।

এ প্রসঙ্গে ইমামিয়া ফের্কার কথাও এসে যায় যাদের বুনিয়াদী আকীদা-সমূহের মধ্যে ইমামতের 'আকীদাও রয়েছে, যারা ইমামতের এমন তা'রীফ করে থাকে এবং তাঁর এমন সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয় যা তাকে প্রায় নবীর সমপর্যায় ও সমকক্ষে পরিণত করে।[১] ঠিক তেমনি সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর এক বিরাট সংখ্যক জামা'আত সম্পর্কে এমন সব অভিমত পোষণ করে যদ্দারা নববী সত্তার সাহচর্যের প্রভাব, তাঁর বিপ্লবাত্মক ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার উপর কলংক আরোপিত হয় এবং যা هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে এক জনকে পাঠিয়েছেন রসূলরূপে যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত)–এর পরিপন্থি। এই ফের্কার প্রভাব বিভিন্ন রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত কারণে ভারতবর্ষে তখন দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছিল এবং মুসলিম সমাজ (যার অধিকাংশই সুন্নী[২] আকীদায় বিশ্বাসী) তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও আচার-অভ্যাস দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল।

---

১. ইমামিয়া ফের্কার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে "ইমাম" সম্পর্কে যা কিছু প্রমাণিত হয় তার সার-সংক্ষেপ এই: ইমাম গোপন ও প্রকাশ্য সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত (নিষ্পাপ) ও পাক-পবিত্র হয়ে থাকেন। তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ বাধ্যতামূলক (ফরয) হয়ে থাকে। তাঁর হাতে মু'জিযা প্রকাশিত হয়। তিনি শরীয়ত সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান (কোন কিছুই যার আওতাবহির্ভূত নয়) 'ইলমে লাদুন্নী হিসাবে পেয়ে থাকেন যা কিয়ামত অবধি আল্লাহ্র দলীল হিসাবে প্রতিটি যুগেই প্রকাশ পাবে (আশ-শরীফ আল-মুরতাদাকৃত কিতাবু'শ-শাফী, তূসী কৃত তালখীসু'শ-শাফী ও আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ হুসায়ন আল-কাশিফুল-গিতা' কৃত আসলু'শ-শী'আ ওয়া উসূলুহা থেকে উদ্ধৃত)।

২. আল্লামা মুহাম্মদ আবূ যুহরা তদীয় তারীখু'ল-মাযাহিবিল-ইসলামিয়া (১ম খণ্ড) নামক গ্রন্থে ঐ সব উক্তির পর্যালোচনা পেশ করতে গিয়ে বলেন: ইমামিয়া ফের্কার সমস্ত আলিম এবিষয়ে একমত যে, তাদের নিকট ইমামের মর্তবা নবীর মর্তবার কাছাকাছি। এব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তিনি এও বিশ্লেষণ করেছেন وصى ও নবীর মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, وصى -এর উপর ওয়াহী আসেনা (পৃ. ৫৯)।

এভাবেই তিনি নবূওতে মুহাম্মদীর উপর ঈমান ও আস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে গ্রীক ও ইরানী দর্শন এবং মিসরীয়[১] ও ভারতীয় মরমীবাদী ভাবধারা থেকে উদ্ভাবিত সেই সব ভারী ও জটিল তালা খুলে দেন। একটি তীরের আঘাতেই তিনি সেই সব ফেতনার নির্মূল ঘটান মুসলমানদের প্রতিভাবান শ্রেণী যার শিকারে পরিণত হয়েছিল।

আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

মুজাদ্দিদ সাহেবের সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক অবদান হল, তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞামূলক এই উভয় জ্ঞানই যে বুদ্ধি বহির্ভূত জ্ঞান, আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলীর সঠিক পরিচিতি, সন্দেহাতীত জ্ঞান এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্যের নিশ্চিত উপলব্ধি থেকে অক্ষম তা তিনি প্রমাণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, এই উভয় উৎস থেকে অর্জিত ও লব্ধ জ্ঞান সন্দেহ ও সংশয়, ভূল-ভ্রান্তি, পদস্খলন ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ্র সঠিক জ্ঞান ও যথার্থ পরিচিতি কেবল নবীগণের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। যে রকম বুদ্ধির মর্যাদা অনুভূতি ও কল্পনার ঊর্ধ্বে তেমনি নবূওয়তের মর্যাদা বুদ্ধির উপর। আল্লাহ্র তা'জীম ও তাকরীম তথা তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান ও ইবাদতের নির্ভুল পন্থা সম্পর্কে অবহিতি নবূওয়তের উপর এবং নবীদের প্রদত্ত তথ্য ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। গ্রীক দার্শনিকগণ আল্লাহ্র সত্যিকার প্রকৃতি ও গুণাবলী সম্পর্কে সাংঘাতিক হোঁচট খেয়েছেন ও মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এবং হাস্যকর রকমের শিকার হয়েছেন। এজন্যই তা হয়েছে যে, যেমন বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে কিছু নেই এবং তেমনি খাটি ও নির্ভেজাল কাশ্‌ফ তথা আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞা বা intuition (যা অভ্যন্তরীণ কামনা-বাসনা ও বাইরের প্রভাব থেকে নিরাপদ) অত্যন্ত দুরুহ বরং দুষ্প্রাপ্য গুণ। মরমীবাদী ও দিব্যজ্ঞানিগণও দার্শনিকদের মতই হোঁচট খেয়েছেন এবং অনুমান, কষ্ট-কল্পনা ও মূর্খতার শিকার হয়েছেন। বুদ্ধি ও দিব্য জ্ঞান দুটো নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন (য়াকীন) ও আল্লাহ প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর অর্থ এই যে, কেবল নবূওয়তই আল্লাহ্র যাত ও সিফাত এবং তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম।

মুজাদ্দিদ আলফেছানী আরও ঘোষণা করেন যে, খাটি ও নির্ভেজাল জ্ঞান-বুদ্ধি কষ্ট-কল্পনার ন্যায় অসম্ভব এবং তা অন্তর্গত বিশ্বাস ও স্বীকৃত বিষয়াদি এবং বাইরের বিভিন্ন উপাদান ও প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এর বহু সিদ্ধান্ত ও

১. মিসর নব্য প্লেটোবাদের বিরাট কেন্দ্র ছিল যেখানে Polotinus Parphyry, Proclus প্রমুখের জন্ম হয় এবং নব্য প্লেটোবাদ নামে এক নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ফলাফল ঐ সব বাইরের রঙ দ্বারা রঞ্জিত ও মিশ্রিত হয়ে সামনে আসে যা তার ভেতর ও বাইরে পাওয়া যায়। তিনি প্রমাণ করেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি পরম সত্য আবিষ্কারের একটি ত্রুটিপূর্ণ মাধ্যম। পূর্ণ দলীল একমাত্র নবীদের নবূওয়ত আর নবূওয়ত ব্যতিরেকে প্রকৃত আত্মশুদ্ধি আদৌ সম্ভব নয়।

তিনি আত্মশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিশুদ্ধির মধ্যে একটি পার্থক্য রেখা টেনেছেন এবং উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, আম্বিয়া-ই কিরাম-এর রিসালতের সত্যতা সমর্থনকারিগণ তাদের বিশ্বাসের পক্ষে প্রচুর যুক্তি রাখেন। আম্বিয়া-ই কিরাম প্রদত্ত তথ্যকে আপন বুদ্ধিবৃত্তির অধীনে সংস্থাপন করা নবূওয়ত অস্বীকৃতির নামান্তর। তিনি এই বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন যে, জ্ঞান-বুদ্ধির বিরোধী হওয়া এক কথা আর এর আওতাবহির্ভূত হওয়া ভিন্ন কথা।

মুজাদ্দিদ সাহেবের বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা-নির্ভর গবেষণাপ্রসূত বিপ্লবী সিদ্ধান্ত যার ভেতর ঐশী সমর্থন ও নবূওয়তের প্রদীপ্ত শিখা থেকে লব্ধ আলো অন্তর্গত, জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, চিন্তা-চেতনার নতুন দ্বার উন্মোচনকারী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞান জগতের বহু সমকালীন মুদ্রাকে জাল প্রতিপন্নকারী, নবূওয়ত ও আসমানী শরীয়তের সত্যতা ও মর্যাদা ঘোষণাকারী ও ঐসবের উপর আবার গোড়া থেকে আস্থা পুনঃস্থাপনকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং এমন এক সংস্কারমূলক ও বিপ্লবাত্মক জ্ঞানগত ও গবেষণাধর্মী কৃতিত্ব যা এককভাবে সে সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা, জ্ঞানগত পরিবেশ ও মস্তিষ্কজাত প্রয়াস ও সাধনার ফল হতে পারে না। এজন্য যে, এর ভেতর এমন সব কথা বলা হয়েছে যার ভেতর থেকে কতকগুলো দর্শন ও চিন্তার জগতে শতাব্দীর পর পৌঁছেছে এবং যার সত্যতার উপর শেষাবধি জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সত্যতার সীলমোহর মেরে দিয়েছে। এ কেবল ঐশী সাহায্য ও মদদ এবং রব্বানী হেদায়েত তথা পথ-নির্দেশনার ভ্রূভঙ্গ ইঙ্গিত ছিল যা তাঁকে হি. দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনায় দীন-ধর্মের সংস্কার ও পুনর্জাগরণ এবং নবূওত ও শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রতিরক্ষার জন্য নির্বাচন করে, ছিল সেই ইখলাস (নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা), ধর্মীয় মর্যাদাবোধ এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের ফয়েয যার উপর তিনি প্রথম থেকেই পথ চলা শুরু করেছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ এবং এই সব ইশারা- ইঙ্গিতের স্পষ্টতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সেই পটভূমি ও অবস্থা অনুধাবন করা প্রয়োজন যেখানে এই সব গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের মর্যাদা ও মূল্য পুরোপুরিভাবে উদ্ভাসিত হবে।

কিছু মৌলিক প্রশ্নমালা ও তার জওয়াব

দীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক প্রশ্ন যার সঠিক উত্তরের উপর এই জীবনের সংশোধন ও বিশুদ্ধ ব্যবস্থাপনা এবং পারলৌকিক জীবনের নাজাত তথা মুক্তি নির্ভর করে—তা এই যে, এই পৃথিবীর স্রষ্টা কে? তাঁর গুণাবলী কি? আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি? আর আমাদেরই বা তাঁর সঙ্গে কী ও কেমন সম্পর্ক হওয়া দরকার? তাঁর পসন্দনীয় ও আনন্দের বস্তুই বা কী এবং অপসন্দনীয় ও অসন্তোষের জিনিষই বা কী? এই জীবনের পর আর কোন জীবন আছে কি? যদি থাকে তাহলে তার প্রকৃতি কি এবং তার জন্য এই জীবনে দিক-নিদের্শনাই বা কী?

এই সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলার যাত, সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী) ও আফ'আল (কর্ম), জগতের নিত্যতা ও অনিত্যতা তথা নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা, পরলোক, জান্নাত, জাহান্নাম, ওয়াহী ও ফেরেশতাদের অস্তিত্বের আলোচনা এবং এমন সব অধিবিদ্যামূলক আলোচনা এসে যায় যা যে কোন ধর্ম ও আদর্শের মৌলিক দিকের অন্তর্গত।

এসব প্রশ্নের উত্তর এবং এসব সমস্যার সমাধান মানুষ দু'ভাবে দিতে চেষ্টা করেছে। তন্মধ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে, দ্বিতীয়টি দিব্যজ্ঞান বা ঐশ্বরিক জ্ঞানের পথে। প্রথমটিকে আমরা দর্শন বলি আর দ্বিতীয়টিকে বলি মরমীবাদ (اشراقی تصوف)।

কিন্তু মৌলিকভাবে এই দু'টো পদ্ধতিই ভুল এবং তা কতকগুলো প্রাথমিক ভুল ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আমরা এগুলো ভূমিকা হিসাবে মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতূবাত থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে কিছুটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা সমীচীন মনে করি।

অবিমিশ্র যুক্তিবুদ্ধি ও নির্ভেজাল কাশ্‌ফ (তন্ময়তাপূর্ণ প্রেরণা)-এর সমালোচনা

বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে সর্বাগ্রে একথা মনে রাখতে হবে যে, সে তার প্রকৃতিগত দায়িত্ব পালন যেমন জানা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল নয়, সে তার থেকে কমতর বস্তুর মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল। অনুভূতি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে অন-অনুভূত ও অজ্ঞাত বস্তুর ইল্‌ম হাসিল তথা জ্ঞান লাভ স্বীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং সূচনা ও ভূমিকার সাহায্যে এবং তা ইল্‌মী উপায়ে বিন্যস্ত করত সে এই পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যা তার তখন

অবধি অর্জিত ছিল না। একথা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হতে পারত না। সমস্ত বোধগম্য বস্তু-নিচয়ের মিশ্রণ ও হজম এবং সে সবের পর্যালোচনা থেকে এ সত্যই ফুটে উঠবে যে, বুদ্ধিবৃত্তি ঐ সব সত্য ও বাস্তবতা এবং উন্নত জ্ঞান অবধি এই সব অনুল্লেখ্য অনুভূতি ও প্রাথমিক উপলব্ধিজাত জ্ঞানের সাহায্যেই পৌঁছেছে যা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত বিচার-বিশ্লেষণ ও বিন্যাস ছাড়াই ঐ বিরাট পরিণতি ও ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

অনন্তর এটা সুস্পষ্ট যে, যেখানে মানুষের অনুভূতি ও সাংবেদনিক ইন্দ্রিয়সমূহ একেবারেই অসহায়, যেখানে তার নিকট জ্ঞানের আদৌ কোন উপায়-উপরকরণই নেই এবং যার প্রাথমিক উপাত্ত থেকেও সে বঞ্চিত, যেখানকার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তার কোন ধারণা ও অভিজ্ঞতাই নেই এবং যেখানে ধা-রণা কিংবা অনুমানের ভিত্তিই বর্তমান নেই সেখানে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা, তার ধারণা কিংবা অনুমান কী করতে পারে? সেখানে তার জ্ঞান-বুদ্ধি তেমনি অসহায় যতখানি অসহায় একজন নৌকা ব্যতিরেকে সমুদ্র পাড়ি দেবার ক্ষেত্রে এবং এরোপ্লেন ব্যতিরেকে মহাশূন্য পাড়ি দেবার বেলায়। একজন লোক যতই মেধার অধিকারী হোক না কেন—সংখ্যা জ্ঞান ব্যতিরেকে তার পক্ষে অংক কিংবা বীজগণিতের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। যেই ব্যক্তি কোন ভাষার অক্ষর জ্ঞান শেখেনি এবং যে উক্ত ভাষার বর্ণমালা সম্পর্কে অজ্ঞ সে যতই মেধা ও প্রতিভার অধিকারী হউক না কেন এবং সে হাজার রকমের বুদ্ধি খাটাক, সহস্র প্রকার কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিক এবং যতই মাথার ঘাম পায়ে ঝরাক—উক্ত ভাষার একটি লাইনও পাঠ করতে সে সক্ষম হবে না। ঠিক তেমনিভাবে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান কেবল জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেও হতে পারে না। কেননা এর প্রাথমিক সূত্র বা উপাত্ত তো মানুষের লব্ধ নয় আর এক্ষেত্রে কষ্ট-কল্পনা কিংবা অনুমান-আন্দাজেরও কোন সুযোগ নেই।

আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির শক্তি ও কার্যকারিতার একটি সীমা রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মাঝে সে গণ্ডিবদ্ধ যার বাইরে সে যেতে পারে না। সেরকম মানব ইন্দ্রিয়ের আলাদা আলাদা গণ্ডি রয়েছে এবং এর কার্যকারিতা এসবের ভেতর সীমাবদ্ধ। দর্শন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হাজারো রকমের দর্শনীয় বস্তু দেখা যেতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা একটি শব্দও শোনার কাজ চলে না। অপরাপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এরপরও নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি ও কার্যকারিতা আপনাপন ক্ষমতা ও গণ্ডির মধ্যেও সীমাহীন নয়।

তেমনি বুদ্ধি যদিও ঐ সব বাহ্যেন্দ্রিয়ের ভেতর অধিকতর বিস্তৃত তথাপি তা সীমাবদ্ধ। ইব্ন খালদূনের ভাষায় ঃ

"বুদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তি একটি নির্ভুল তুলাদণ্ড। তার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ও নির্ভুল। কিন্তু তুমি যদি এই তুলাদণ্ডে তাওহীদ, আখেরাত, নবূওয়ত, সিফাত-ই ইলাহী তথা ঐশী গুণাবলী এবং সেই সব বিষয় যা বুদ্ধির ঊর্ধ্বের সত্য মাপতে চাও তবে তা মাপতে পারবে না, মাপতে গেলে তা হবে পণ্ডশ্রম মাত্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, এক ব্যক্তির সোনা মাপার তুলাদণ্ড দৃষ্টে সেই তুলাদণ্ডে পাহাড় মাপার সাধ জাগল। আর এতো জানা কথা যে, সোনা মাপার যন্ত্রে পাহাড় মাপা আদৌ সম্ভব নয়। অবশ্য এর দ্বারা তুলাদণ্ডের যথার্থতার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহ জাগছে না। কেননা সব কিছুরই একটা সীমা আছে। তদ্রূপ বুদ্ধির কর্মক্ষমতারও একটা সীমা আছে যার বাইরে সে যেতে পারে না। সে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বেষ্টন করতে পারে না। কেননা বুদ্ধি তাঁর অস্তিত্বের একটি ক্ষুদ্র অণু মাত্র।"[১]

তৃতীয় কথাটি এই যে, বুদ্ধির মধ্যে পরিপূর্ণ অবিমিশ্রতা এবং এর সিদ্ধান্ত ও ফলাফলসমূহের ভেতর পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা খুবই কঠিন। সত্যানুসন্ধানিগণ জানেন যে, নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তি ও একক বুদ্ধি থেকে অধিক দুর্লভ গুণসম্পন্ন বস্তু দুনিয়ার বুকে মেলা ভার। আবেগ-উদ্দীপনা ও কামনা-বাসনা,পরিবেশ, বিশেষ তা'লীম ও তরবিয়ত, নির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, খেয়ালী কল্পনা ও ভুল-ভ্রান্তির প্রভাব থেকে সে খুব কমই মুক্ত হয়ে থাকে। আর এজন্যই তার সিদ্ধান্তের ভেতর সব সময় অকপটতা ও বিশ্বস্ততা এবং তার ফলাফলের ভেতর অকাট্যতা সৃষ্টি হওয়া এতটা সহজ ও সাধারণ নয় যতটা মনে করা হয়।

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, দাশনিকগণ ঐ সমস্ত সত্যকে উপেক্ষা করে আপন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণে ভুলের শিকার হয়েছেন এবং আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী এবং তৎসম্পর্কিতের উপর কোনরূপ সামান-আসবাব ছাড়াই এবং কোন জ্ঞান ও আলো ছাড়াই এমন বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম এবং এমন আস্থা ও বিদ্যাবত্তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন যা একজন রসায়নবিদ তার রাসায়নিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা সম্পন্ন করার পর করে থাকেন। তাঁদের এই আলোচনা ও গবেষণা সমগ্রটাই আন্দাজ-অনুমান ও খেয়ালী- কাল্পনিক রহস্যের সংমিশ্রণ এবং কল্পনার পর কল্পনাই যার ভিত্তি। এ ঐশী দর্শনের এমনই এক কাল্পনিক রূপকাহিনী যার কিছু নমুনা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাওয়া যাবে।

১. মুকাদ্দিমা ইবন খলদূন, ৪৭৩ পৃ।

এই বুদ্ধিবৃত্তিবাদ ও দর্শনের মুকাবিলায় জ্ঞান আহরণের আরেকটি প্রয়াস রয়েছে যার নাম দিব্যজ্ঞান (Theosophy)। এর মূলনীতি হল এই যে, পরম সত্য ও নিশ্চিত জ্ঞান (হক ও য়াকীন)-এর অবহিতি লাভের জন্য বুদ্ধি, জ্ঞান ও দলীল-প্রমাণ উপকারী ও ফলপ্রসূ নয় বরং তা ক্ষতিকর। পরম ও নিশ্চিত সত্যের যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য মুশাহাদা তথা পরম সত্যের দর্শন ও পর্যবেক্ষণ শর্ত। আর এই মুশাহাদা কেবল তখনই সম্ভব যখন আধ্যাত্মিক আলো (نورباطنى), আত্মার পরিচ্ছন্নতা এবং এক অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় শক্তিকে জাগ্রত করা যাবে যা আধ্যাত্মিকতা ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু তেমনি উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারে যেভাবে এই বাহ্যিক চক্ষু বাহ্যিক বস্তুসমূহের অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে যখন বস্তুবাদকে একেবারে ধ্বংস এবং বাহ্যিক অনুভূতি শক্তিকে মুর্দা করে দেওয়া হবে। এই ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান (Cognition) কেবল অবিমিশ্র ও নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তি ও অভ্যন্তরীণ রৌশনীর (نورباطنى) মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব যা রিয়াযত, আত্মহনন, মুরাকাবা ও গভীর ধ্যানমগ্নতার দ্বারা সৃষ্টি হয়।

একথা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ অনুভব ও বোধশক্তি বর্তমান। এধরনের অপরাপর শক্তিও তার মধ্যে থাকা সম্ভব। কিন্তু সে যাই হোক, এসবই মানবীয় বোধশক্তিই তো, ঠিক তেমনি দুর্বল ও সীমাবদ্ধ, ভুলে ভরা ও সহজে পরিবেশ-প্রভাবের শিকার। সে রকম মানুষের সমগ্র শক্তি, জ্ঞান প্রকাশের গোটা মাধ্যম,এর অনুভব ও পর্যবেক্ষণেও ভুল ও আত্মপ্রতারণা সংঘটিত হয় যেমন অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে হয়। যদি এমনটি না হত তাহলে দিব্যজ্ঞানী ও মরমীবাদীদের তন্ময়তাপূর্ণ স্বজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও বিশ্লেষণের ভেতর সেই সব বিরাট রকমের পারস্পরিক বৈপরিত্য ও মতানৈক্য দেখা দিত না এবং বড় বড় সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের পদস্খলন ঘটত না ও তারা ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হতো না। আর এক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম মরমীবাদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[১]

সে যাই হোক, বুদ্ধিবৃত্তির মত এই বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষেও নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র হওয়া খুবই কঠিন। আর এর উপর বাইরের প্রভাব এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বস্তুর ছায়া ও প্রতিবিম্ব পড়ে। এ দর্পণও হাকীকত তথা যথার্থ ও বাস্তব সত্যের নির্ভুল চিত্র পেশ করেনা। দিব্যজ্ঞানী ও মরমীবাদীদের পরিবেশ, তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও অনুসিদ্ধান্তসমূহের এই প্রভাব তাদের পর্যবেক্ষণের উপর

---

১. বিস্তারিত উদাহরণের জন্য দ্র. গ্রন্থকারের "মাযহাব ও তামাদ্দুন' ("ধর্ম ও কৃষ্টি" নামে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের اشراقيت শীর্ষক ১ম অধ্যায়।

পড়ে। এটাই কারণ যে, বহু দিব্যজ্ঞানী ও মরমীবাদী দার্শনিক তাদের কাশ্‌ফ ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে এমন বহু ঐ সব গ্রীক ও মিসরীয় কল্পনা-বিলাস ও ধ্যান-ধারণার সমর্থন দেখতে পেত যার কোন মাথা-মুণ্ডু কিংবা হাত-পা ছিল না এবং এমন বহু কল্পনা বাস্তবরূপে চোখের সামনে ধরা দিত বাইরের জগতে কোথাও যার আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই।[১]

অতঃপর উল্লিখিত প্রশ্নমালা যেমন দর্শনের বিষয়বস্তু ও সীমারেখা বহির্ভূত তেমনি তা বহির্ভূত দিব্যজ্ঞানের সীমারেখারও। এর দ্বারা কেবল আলমে আরওয়াহ্ (আত্মার জগত)-র গুঢ় রহস্য ও আশ্চর্য বিষয়সমূহের ভ্রমণ সম্পন্ন হয়, কিছু সূরত দৃষ্টিগোচর হয়, কিছু রঙ নজরে আসে, কিছু আওয়াজ শ্রুত হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিস্তারিত জ্ঞান, তাঁর শরঈ কানূন, পারলৌকিক জগতের মনযিলসমূহ এবং এর অবস্থাদি সম্পর্কে তেমনি অজ্ঞ ও বেখবর যেমন অজ্ঞ ও বেখবর সাধারণ মানুষ।

বস্তুত দর্শন ও মরমীবাদের মধ্যে একই রূহ (প্রাণ) এবং একই মন-মানসিকতা কাজ করে। উভয়েই পরম সত্যকে পয়গম্বরদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই নিজেদের চেষ্টা-সাধনায় জানতে ও পেতে চায়। মনযিল উভয়েরই এক; পথ অতিক্রমের পন্থা তথা ভ্রমণের তরীকা ভিন্ন। একজন কল্পনার পাখায় ভর করে সেখানে পৌঁছুতে চায় আর অন্যজন কোন গোপন সুড়ঙ্গ পথে (আধ্যাত্মিক পন্থায়) সেখানে হাযির হতে চায়।

কিন্তু হাকীকত তথা বিমূর্ত ও পরম সত্তার জ্ঞান কেবল পয়গম্বরগণের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে যাঁদেরকে নবূওত ও রিসালত দ্বারা আল্লাহ্ পাক ধন্য করে থাকেন, অপর কোন মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। তাঁদেরকে (নবী-রসূলগণকে) তিনি তাঁর যাত ও সিফাত, আসমান ও যমীনের মালাকূত তথা যমীন ও আসমানের রাজত্বের সব চেয়ে বড় জ্ঞান দান করেন এবং আপন পসন্দ-অপসন্দ ও হুকুম-আহকাম-এর সরাসরি জ্ঞান দান করেন এবং তাঁদেরকে নিজের ও মানুষের মধ্যকার মাধ্যম বানান। তাঁদের নবুওত ও রিসালত দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্র সবচে' বড় নে'মত। আল্লাহ্র যাত ও সিফাতের আজীমুশ্-শান 'ইল্‌ম তাঁদের অনায়াসে ও বিনামূল্যে দান করেন। এর একটি কণাও সহস্র বছরের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা ও অনুধ্যান, আলোচনা-পর্যালোচনা, দলীল-প্রমাণ এবং শতশত বছরের মুরাকাবা-মুজাহাদা ও আত্মশুদ্ধি দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে না। "এ আমাদের ও লোকসকলের উপর আল্লাহ্র এক মহাঅনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

১. দ্র. প্রাগুক্ত।

একথা ঠিকই বলেছেন যে, "কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না"। দার্শনিক ও মরমী জ্ঞানের অধিকারীরা এই নবুওতরূপী নে'মতের অমর্যাদা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেই পরম সত্য অবধি তারা আপন শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে পৌঁছুতে চায় যে বিষয়ে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বেনিয়ায ও মুক্ত রেখেছিলেন। হাজার বছরের সেই শ্রম ও সাধনার সেইসব পরস্পর-বিরোধী হাস্যকর উক্তি ও গবেষণা যা ঐশী দর্শনের পুঁজি এবং যারা নিজেদের ভক্ত-অনুরক্ত ও পদাংক অনুসারীদেরকে আল্লাহর নিকট সান্নিধ্যে নিয়ে যাবার ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত করবার পরিবর্তে আল্লাহ্ থেকে অধিকতর দূরবর্তী এবং তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অপরিচিত, সম্পর্কচ্যুত ও মুক্ত করে দিয়েছে।

اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ـ

"তুমি কি ওদেরকে লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ওরা ওদের কওমকে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ময়দানে।" সূরা ইবরাহীম, ২৮ আয়াত;

হযরত মুজাদ্দিদ (র) দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা উভয়টির অলি-গলি ও অন্ধি-সন্ধি সম্পর্কে বেশ ভাল জানেন। অপর দিকে তিনি 'ইল্‌মে নবুওতের ওয়ারিছ এবং ওয়াহী ও রিসালতের মর্তবা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল। তিনি দার্শনিক ও নব্য প্লেটোবাদীদের সেই কর্মপন্থা ও পদ্ধতির উপর বিরাট বিশেষজ্ঞসুলভ সমালোচনা করেছেন যা তাঁর সুবিপুল জ্ঞান ও গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। এই আলোচনা তাঁর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক শাখা আর তা এই জন্য যে, গোটা শারী'আতে ইলাহী ও গোটা দীনী নিজাম তথা ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার বুনিয়াদ এই আলোচনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যে, অকাট্য জ্ঞান ও নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যম ও উৎস এবং মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাত, আপন উদ্ভব ও পরিণতি এবং স্বীয় কল্যাণ ও মুক্তির সঠিক উৎস কি? তা কি চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞানগত আলোচনা -সমালোচনা ও যুক্তি-তর্ক দর্শন যার প্রতিনিধিত্ব করে অথবা অভ্যন্তরীণ আলোক বিকীরণ, আত্মহনন, পরিশুদ্ধিকরণ, মনশ্চক্ষে পর্যবেক্ষণ ও এমন জ্ঞান যা গোপন ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে হাসিল হয়ে থাকে যাকে ঐশী ও মরমীবাদী দর্শন বলা হয় অথবা এতদুভয়ের বিপক্ষে আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম-এর আনুগত্য অনুসরণ ও তাঁদের উপর ঈমান-এর দ্বারা? এটাই সেই সূচনা বিন্দু যেখান থেকে রাস্তা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনটি ভিন্নমুখী পথের দিকে ধাবিত হয় এবং যা পরে আর কোথাও গিয়ে মিলিত হয় না।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه ذَالِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

"এবং এই পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এই ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।" সূরা আন'আম,১৫৩ আয়াত;

এই সূত্রে মুজাদ্দিদ সাহেব-এর কলম থেকে যেই দুর্লভ ও অমূল্য গবেষণা, উন্নততর জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান বের হয়েছে এবং তাঁর চিঠিপত্রের ভলিউম দফতরের মধ্যে যা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে সে সবের তরজমা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে পেশ করা হচ্ছে।

বুদ্ধিবৃত্তির সীমাবদ্ধতা এবং সার্বভৌম স্রষ্টার জ্ঞান

"আল্লাহ তা'আলার শোক্র যিনি আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন, ইসলা-মের পথে পরিচালিত করেছেন এবং মুহাম্মদ মোস্তফা ('আলায়হি'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম দুনিয়াবাসীর জন্য (আল্লাহ্র) রহমতস্বরূপ। কেননা হক সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সমস্ত হযরতকে প্রেরণের মাধ্যমে আমাদের ন্যায় সীমিত ও স্বল্পবুদ্ধির লোকদেরকে এবং ভোতা উপলব্ধির অধিকারী মানুষগুলোকে স্বীয় যাত ও সিফাতের খবর দিয়েছেন এবং আমাদের বুদ্ধি যেই পরিমাণ ভোতা ও ক্ষুদ্র সেই পরিমাণ আপন সত্তা ও গুণাবলী (যাত ও সিফাত) সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তাঁর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় বস্তসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে এবং আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ- অকল্যাণ তথা লাভ-ক্ষতি বৈশিষ্ট্য সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদি ঐ সমস্ত হযরতের মহান অস্তিত্ব আমাদের মাঝে না থাকত তাহলে মানবীয় বুদ্ধি এই বিশাল কারখানার যিনি স্রষ্টা তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে কষ্ট ও দুর্বিপাকে নিক্ষিপ্ত হ'ত এবং সেই পবিত্র সত্তার কামালাত তথা তাঁর শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় উদঘাটন করতে ব্যর্থ হত। প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ যাঁরা তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির কারণে নিজেদের সবচে' বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করত, বিশ্বজাহানের স্রষ্টাকে অস্বীকার করত এবং আপন বুদ্ধির অভাব ও সংকীর্ণতার দরুন বস্তুসামগ্রীকে কালের দিকে সম্পর্কিত করত। আসমান-যমীনের স্রষ্টা সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে নমরূদের বিতর্ক আলোচনা প্রসিদ্ধ। কুরআন মজীদেও এর উল্লেখ রয়েছে। হতভাগা

ফেরআওন বলত, مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ "মিসরবাসী! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন শাসক ও উপাস্য আছে বলে তো আমার জানা নেই।" অধিকন্তু সে হযরত মূসা (আ) কে সম্বোধান পূর্বক বলেছিল, لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ "হে মূসা! যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে শাসক ও উপাস্য মেনে নাও তবে অবশ্যই তোমাকে আমি কারাগারে পাঠাব।" হামানকে এই হতভাগাই বলেছিল, يَا هَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ط اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا "হামান! আমার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ কর যাতে এতে আরোহণ করত আমি আসমানে উপনীত হতে পারি এবং উঁকি মেরে মূসার আল্লাহকে দেখতে পারি। আর আমিতো মূসার আল্লাহকে মিথ্যাই জ্ঞান করি।" মোটকথা এই যে, বুদ্ধি এই মহাসম্পদকে প্রমাণ করতে অক্ষম এবং ঐ সব আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর পথ-নির্দেশনা ছাড়া এই অমূল্য সম্পদের সন্ধান লাভে অসমর্থ।"[১]

আল্লাহ্‌র পরিচয়ের ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের নির্বুদ্ধিতা

সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও কুশলী ব্যবস্থাপকের অস্তিত্ব গ্রীক দাশনিকগণ যাঁকে 'আদি কারণ' (First Cause) নামে স্মরণ করে থাকেন এবং তাঁর কর্ম, সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে আসা সম্পর্কে ঐ সব দার্শনিক যেই বুদ্ধির ঘোড়া ছুটিয়েছেন ও কল্পনার পাহাড় গড়েছেন, তৈরী করেছেন কল্পনার আকাশচুম্বী প্রাসাদ সে সবের বিস্তৃত বিবরণ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থে এবং ও সবের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা ও সমালোচনা আকাইদ ও কালামশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। এখানে সেসবের সুযোগ নেই।

কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর উন্নততর জ্ঞান অনুধাবনের জন্য এবং একথা জানার জন্য যে, ঐ সব কল্পনার ফানুস প্রত্যাখ্যানে, যা কেবলই গ্রীক মস্তিষ্ক-প্রসূত ও কল্পনা শক্তির আবিষ্কার-উদ্ভাবন, তাঁর লেখনী এত শক্তিশালী এবং তাঁর বর্ণনায় এতটা জোশ্‌ কেন সৃষ্টি হয়, সক্রিয় বুদ্ধি গ্রীক দার্শনিকদের নিকট, বস্তুত যা বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপক ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে কার্যকর, বংশ-তালিকা পেশ করা হচ্ছে যা ঐ সমস্ত দার্শনিক ধারণা ও অনুমান করেছেন এবং যেসবের উপর তারা গোটা সৃষ্টি ও অনুজ্ঞা জগতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তার এক একটি শব্দের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি-প্রমাণের বিরাট ফিরিস্তি পেশ করেছেন। কিন্তু এখানে সেসবের ভেতর থেকে কেবল তালিকা-সূচি পেশ করাকেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করছি।

১. খাজা ইবরাহীম কুবাদয়ানীর নামে পত্র;

"আদি কারণ বা আদি সত্তা (স্বয়ম্ভু) যেহেতু সার্বিক বিষয়ে একজন এবং এটাও স্বীকৃত যে, এক থেকেই একের বহিঃপ্রকাশ বা নির্গমন ঘটতে পারে (একাধিক বা যৌগিক নয়)। অপর দিকে বিশ্বজগত বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে গঠিত। সুতরাং আদি সত্তা বা কারণ থেকে এর নির্গমন বা অস্তিত্ব লাভ ঘটতে পারে না বরং তার অস্তিত্ব বা সত্তা থেকে তার সম্মতি, ইচ্ছা বা অবগতি ব্যতিরেকে প্রথম আক্ল, দার্শনিক মতে ফেরেশতা বা প্রধান ফেরেশতা জিবরীলের অভ্যুদয় এমনভাবে হল যেভাবে প্রদীপ হতে আলোর বিচ্ছুরণ (প্রকাশ) ঘটে এবং যেরূপ মানুষের ছায়া (তার ইচ্ছা ও অবগতি ব্যতীতই) অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। প্রথম আক্ল (The universal spirit) এমন একটি সত্তা যা স্বীয় সত্তায় সত্তাবান। সে নিজে দেহ (জড়) নয় এবং অন্য কোন দেহও তার পাত্র (অবস্থান ক্ষেত্র) নয়। সে নিজ সত্ত্বা সম্বন্ধে অবহিত এবং নিজের 'সূচনাক্ষেত্র' (অস্তিত্ব সূত্র) সম্পর্কেও অবহিত। এখন তাকে ফেরেশতা নামে অথবা প্রথম আকল নামে কিংবা অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায়। এর অস্তিত্ব দ্বারা তিনটি বিষয় অনিবার্য হয়ে পড়ে : (১) দ্বিতীয় আকল, (২) আকল-সমূহের ঊর্ধ্বতম আকল (ফালাকুল আফ্লাক) (অথবা নবম আকল অথবা আরশে আজীম)-এর সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর দ্বিতীয় আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে তৃতীয় আকল তথা (নক্ষত্রলোক) নক্ষত্র আকাশের সত্ত্বা ও তার জড় দেহ। অতঃপর তৃতীয় আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে চতুর্থ আকল তথা শনি আকলের (শনিলোক) (শনি -সৌরজগত) সত্ত্বা ও তার জড় দেহ। অতঃপর চতুর্থ আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে পঞ্চম আকল তথা বৃহস্পতি আকলের (বৃহস্পতিলোক) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর পঞ্চম আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে ষষ্ঠ আকল তথা মংগল আকলের (মংগল লোক) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর ষষ্ঠ আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করে সপ্তম আকল তথা রবি-আকলের (রবিলোক) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর সপ্তম আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করে অষ্টম আকল তথা শুক্র আকলের (শুক্রলোকের) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর অষ্টম আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করে নবম আকল তথা বুধ আকলের (বুধলোক) সত্ত্বা ও তার জড় দেহ। অতঃপর নবম আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করে দশম আকল তথা শনি (চন্দ্র) আকাশের (চন্দ্রলোকের) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। এটিই সর্বশেষ আকল এবং এই আকলকেই ফা'আল বা ক্রিয়াশীল (কর্মতৎপর, কর্মচঞ্চল = The active spirit) বলা হয়। এতে চন্দ্রলোকে কোন স্থিত দ্বারা 'অভ্যন্তর পূর্ণ' হওয়া অনিবার্য হল। এটি মূলত একটি জড় পদার্থ বিশেষ যা

কর্মতৎপর আকল ও শূন্যলোক (নিরীক্ষ)-সমূহের স্বভাবজাত ক্রিয়ার ফলে 'অস্তিত্ব ও বিনাশ'-কে গ্রহণ করে। এ ছাড়া গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের আবর্তন প্রক্রিয়ার কারণও জড় পদার্থসমূহে বহুবিধ সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয়, ফলে জন্ম লাভ করে খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজ বস্তুসমূহ। মোটকথা, এ হচ্ছে (তথাকথিত দার্শনিকদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত) দশ আকল (জড়দেহ মুক্ত= spirit) এবং নয় আকল (নিরীক্ষ বা 'লোক')।"

এ সব মূলত গ্রীক পণ্ডিতদের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট আবিষ্কার।.... মূলত এ সব (আজগুবি কাহিনী) হচ্ছে গ্রীক প্রতীমা-বিদ্যা, যা তারা 'দর্শন' ও ঐশী বিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছে এবং মানুষ তা নিয়ে সতর্কতা ও সচেতনতার সংগে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা আরম্ভ করে দিয়েছে। অথচ এ সব হচ্ছে কাল্পনিক ও রূপকথা (যেমন বর্তমানে বৈজ্ঞানিক রূপকথা লেখা হয়)। এ প্রসংগে স্বতঃস্ফূর্তরূপে পবিত্র কুরআনের বাণী মনে পড়ে যায় ঃ ما اشهدتهم خلق

"আমি তো আসমান ও যমীন সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এমন কি তাদের নিজেদের সৃজনপ্রক্রিয়ায়ও তাদের (স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের) সাক্ষী বানাইনি এবং ভ্রষ্টতা সৃষ্টিকারীদের তো আমি হাত-পা (সহায়ক)-রূপে গ্রহণ করি না (সূরা কাহফ, ৫১)।

ইমাম গাযালী (র) (উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করার পর) যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "এ সব নিছক দাবী ও আপনি মোড়ল জাতীয় সিদ্ধান্ত (যুক্তি-প্রমাণবিহীন উদ্ভট দাবী); বরং এ হচ্ছে 'আঁধারে আচ্ছাদিত (আঁধারের তলায়) আঁধার' (ظلمات فوق ظلمات) মাত্র। কেননা, কেউ যদি এটাকে তার দেখা স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলে দাবী করে তবুও তা হবে তার অসুস্থতা ও স্বভাব বিকৃতির প্রমাণ" (তাহাফতুল ফালাসিফা, পৃ. ৩০)।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "আমার প্রচণ্ড বিস্ময় জাগে যে, কোন উন্মাদ ব্যক্তিও কি করে নিজের এ মনগড়া বয়ানে তৃপ্ত হতে পারে? অথচ তারা 'বুদ্ধিজীবী' ও 'বিজ্ঞানী' নামধারী, যারা তাদের দাবী মতে বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়সমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণে দক্ষতাবান" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩)।

দার্শনিক প্রবরগণ আল্লাহ পাকের জন্য সমগ্র ও পরিপূর্ণতার গুণাবলী এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি করা অস্বীকার করে তাকে সম্পূর্ণ 'অথর্ব' (কর্মহীন) ও 'ইচ্ছাশক্তি বর্জিত' সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের তথাকথিত দাবী মতে, এসব করেছে অনাদি একক সত্তা (ওয়াজিবুল ওয়াজূদ)-এর মাহাত্ম্য ও নিষ্কলুষতা বিধানের স্বার্থে। এ প্রসংগে ইমাম গাযালীর লেখনী স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লিখেছেন—

"যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য উল্লিখিত (কর্মবিহীন ও ইচ্ছাহীন সত্তা) হওয়ার মর্যাদা প্রদানে তুষ্ট তারা তো তাঁকে সেসব সত্তা হতেও তুচ্ছ সাব্যস্ত করল যার অন্তত নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি রয়েছে। কেননা, যে নিজের ও অপরের অস্তিত্বের অনুভব করার ক্ষমতা রাখে সে মর্যাদায় ঐ সত্তার চেয়ে উন্নত হবে যার নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি নেই। আল্লাহকে মহিমান্বিত করার এ উদ্ভট গবেষণা তাদের এ পর্যায়ে উপনীত করেছে যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের সকল প্রচলিত ও সহজবোধ্য মর্ম ও ব্যাখ্যাকে তারা বাতিল করে দিয়ে তাকে এমন এক 'নির্জীব' বস্তুতে পরিণত করেছে দুনিয়ার (বিশ্বজগতের) কোথায় কি হচ্ছে সে সবের কিছুই যার জানা নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, (মৃত ও নির্জীব তো নিজের খবরও রাখে না,) এ সত্ত্বা অন্তত নিজের খবর রাখে।

মূলত যারা আল্লাহর পথ হতে সরে যায় এবং হিদায়তের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পাশ কাটিয়ে যায় আল্লাহ্ তাদেরকে অনুরূপ শাস্তিই দিয়ে থাকেন। যারা আল্লাহর এ বাণী ঃ ما اشهدتهم আমি তো তাদের আসমান-যমীন সৃষ্টির সাক্ষী বানাইনি .... কে অস্বীকার করে, আল্লাহ্ সম্পর্কে যাদের ধারণা মন্দ, যারা মনে করে যে, বিশ্ব সৃজন ও প্রতিপালন (তথা আল্লাহর কাজ) -এর বাস্তবতা ও গভীরতা মানুষ তার বুদ্ধি বলে আয়ত্ত করতে সক্ষম, যারা নিজেদের বুদ্ধিগর্বে গর্বিত, যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষের যেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে সুতরাং নবীগণ ও তাঁদের বিশিষ্ট অনুসারীদের অনুসরণ করা আবশ্যকীয় নয়। এ সবের অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে এই যে, তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পর্কে এ স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হল যে, কেউ তা তার দেখা স্বপ্নরূপে বর্ণনা করলেও তা কাল্পনিক ও বিস্ময়করররূপ বিবেচিত হবে" (প্রাগুক্ত ৩১)।

এসব দেখার পরে (অর্থাৎ পৃথিবীর স্বঘোষিত বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানের এ দূরবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর) রিসালাত নে'মতটির গুরুত্ব ও মূল্য উপলব্ধিতে আসে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

'আমাদের কোন ক্ষমতা ও যোগ্যতা ছিল না হিদায়াত লাভের, যদি না আল্লাহ্ আমাদের পথ দেখাতেন; নিশ্চিতই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য সহকারে (সত্য নিয়ে) এসেছেন।" অন্যথায় বুদ্ধি দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া আমাদের জন্য সম্ভব ছিল না। বস্তুত এ হচ্ছে 'বুদ্ধি'-র অসহায়ত্ব এবং ঐশী ও অতিজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (তথাকথিত) জ্ঞানধর, বুদ্ধিমান ও

পণ্ডিতদের (যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা গণিত ও বাস্তব কর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান যথা প্রকৌশল, রসায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফল হলেও) চরম ব্যর্থতার শিক্ষণীয় নমুনা। কেননা, তারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন সব বিষয় কিরূপে আরোপিত করল যেগুলো তাদের নিজেদের, এমনকি নিকৃষ্টতম সৃষ্টির জন্য আরোপ করতেও তারা সম্মত হবে না। কিরূপে তারা আল্লাহকে "অথর্ব, ইচ্ছাশক্তিবিহীন (নিরেট জড়) ও অবহিতিশূন্য সাব্যস্ত করল এবং এসব (অযোগ্যতা)-কেই তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের দাবিদার সাব্যস্ত করল? سبحان ربك পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা তোমার পালনকর্তার, যিনি ইজ্জতের মালিক, সে সব (অযোগ্যতা) হতে যা তারা আরোপ করে। শান্তি ও নিরাপত্তা রাসূলগণের জন্য (নিবেদিত)। সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীন তথা জগতসমূহের স্রষ্টা-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

এখন হযরত মুজাদ্দিদ (র)–এর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ মনযোগ সহকারে পাঠ করুন। এগুলি তাঁর পত্রাবলীর বিভিন্ন স্থান হতে চয়ন করা হয়েছে ঃ

"বুদ্ধিই যদি আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য যথেষ্ট হত তবে গ্রীক দার্শনিকরা, যারা বুদ্ধিকে নিজেদের পুরোধা সাব্যস্ত করেছিল, তারা ভ্রান্তির প্রান্তরে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াত না এবং অন্যদের তুলনায় তারাই আল্লাহর পরিচয় অধিক পরিমাণে লাভ করত। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে এরাই সর্বাধিক অজ্ঞ। কেননা, তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অথর্ব ও নিষ্কর্ম সাব্যস্ত করেছে এবং তারা তাঁকে একটি বিষয় (তাদের কল্পিত ও কথিত কর্মতৎপর আকল) ব্যতীত অন্য কিছুর স্রষ্টা স্বীকার করে না। তদুপরি (তাদের ধারণা মতে) এই একটি সৃষ্টিও তাঁর দ্বারা ইচ্ছাবিহীন ও বাধ্যগত রূপে অস্তিত্ব লাভ করেছে, 'কর্মতৎপর আকল' বিষয়টিও তাদের নিজেদের মনগড়া আবিষ্কার। বিশ্বজগতের ঘটনাবলীকে আসমান ও যমীনের স্রষ্টার সংগে সম্পর্কিত না করে তারা এগুলোকে সে কল্পিত আক্লের সংগে সম্বন্ধযুক্ত করে। আর বিশ্বে চলমান ক্রিয়াসমূহকে প্রকৃত ক্রিয়াশীল সাব্যস্ত করে। তারা এরূপ করতে বাধ্য। কেননা তাদের দৃষ্টিতে কর্ম ও ঘটনা (মা'লূল) আর নিকটতম (প্রত্যক্ষ) কারক ('ইল্লাত)-এর ক্রিয়া ও পরিণতি। কর্ম ও ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে দূরবর্তী (পরোক্ষ) কারকের কোন প্রভাব ও কার্যকারিতা তারা স্বীকার করে না। এটাও তাদের একটি মূর্খতা যে, আল্লাহর সংগে এ সব ক্রিয়া-কর্মের সম্বন্ধ না থাকাকে তারা আল্লাহর জন্য পূর্ণতার গুণ বিবেচনা করে এবং তাঁকে অথর্ব ও নিষ্কর্ম সাব্যস্ত করাকেই তাঁর মর্যাদা মনে করে। অথচ (এমন 'ঠুঁটো জগন্নাথ' ও 'মিলাদ-যিয়ারতে'র রাষ্ট্রপতি হওয়া যে কোন পূর্ণাংগতা নয়, তা এ সব জ্ঞানধররা

ছাড়া সাধারণ জ্ঞানী মাত্রই বুঝতে পারে।) আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজেকে আকাশ ও পৃথিবীর (তথা সমুদয় বিশ্বের) স্রষ্টা ঘোষণা- رب المشرق والمغرب পূর্ব-পশ্চিম তথা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মালিক করে নিজের প্রশংসা করেছেন। এ নির্বোধের হাঁড়িদের ধারণায় 'আল্লাহ' থাকার কোন প্রয়োজন নেই এবং তাঁর কাছে আকুতি-মিনতি বা প্রার্থনা করারও কোন দরকার নেই। (তা হলে আমার প্রশ্ন) প্রয়োজন, ঠেকাঠেকি, বিপদাপদ ও সমস্যাগ্রস্ততার ক্ষেত্রে তারা যেন তাদের সে 'কর্মতৎপর আকল'-এর দ্বারে ধর্ণা দেয় এবং নিজেদের প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্য সে আকলের কাছেই প্রার্থনা করে। কেননা, তাদের ধারণায় প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে সে আকলের অধিকারেই; বরং তাদের ধারণা মতে সে কর্মতৎপর আকলও তার কাজ-কর্মে বাধ্য ও ইচ্ছাশক্তি রহিত। সুতরাং তার কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনাও অযৌক্তিক ব্যাপার।

"মূল বিষয় হচ্ছে তেমনই যা কুরআন করীমে বিঘোষিত হয়েছে যে, ان الكافرين لا مولى لهم - কাফিরদের কোন 'মাওলা' বা কর্মবিধায়ক নেই। এ বুদ্ধিমানদেরও কোন অভিভাবক ও কর্মসাধক নেই। আল্লাহ্ নেই এবং কর্মতৎপর আকলও নেই। পুনশ্চঃ কথিত আক্‌লটি আসলে কি বস্তু যে নাকি সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করে এবং ঘটনাবলীর সৃষ্টি ও বহিঃপ্রকাশে যার সংগে সম্পর্কিত করা হয়? তার মূল অস্তিত্ব ও তা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারেই তো রয়েছে শত শত (হাজার হাজার) প্রশ্ন ও বক্তব্য। কেননা, তার অস্তিত্ব শুধু দর্শনের এমন কতগুলি মনগড়া প্রাক-প্রমাণ উক্তির উপর নির্ভরশীল, যেগুলো ইসলামের প্রামাণ্য মূল-নীতিমালার বিচারে অপূর্ণাংগ ও অকেজো। সব কিছুকে স্বকীয় ক্ষমতাবান সত্তা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রতি সম্পর্কিত না করে একটি কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়ের প্রতি সম্পর্কিত করা কোন আহম্মকেরই কর্ম হতে পারে । বরং বস্তু-নিচয়ও তাদের সৃষ্টিকে দর্শনের মনগড়া তৈরী কোন অবাস্তব বিষয়ের সংগে সম্পর্কিত করাকে হাজার লজ্জা ও কলংকের ব্যাপার মনে করবে; বরং এ সব কিছু তাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধ এক শক্তিমান মহান স্রষ্টার সংগে হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে কোন অবাস্তব কাল্পনিক বিষয়ের সংগে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার তুলনায় নিজেদের অস্তিত্ববিহীন হওয়াতে সম্মত ও আনন্দিত হবে এবং (এরূপ অপমানিতরূপে) অস্তিত্ব লাভের কোন কামালাত তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। (পবিত্র কুরআনের ভাষায়) كبرت كلمة...كذبا--অতি জঘন্য সে উক্তি যা তাদের মুখ গহবর হতে নিঃসৃত হয়, তারা যা বলে তা শুধু মিথ্যাই। 'দারুল হরব' (আল্লাহদ্রোহী কাফির রাজ্য) -এর কাফিররাও তাদের মূর্তি পূজা সত্ত্বেও এ দার্শনিকদের চেয়ে শ্রেয়।

কেননা, সংকট কালে তারা আল্লাহ সুবহানাহু-র কাছেই প্রার্থনা করে এবং মূর্তিগুলিকে তাঁর দরবারে সুপারিশের মাধ্যম মনে করে।

"আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কিছু লোক এ আহম্মক (গ্রীক দার্শনিক)-দের 'হুকামা' (বুদ্ধিজীবী) নামে অভিহিত করে থাকে এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার প্রতি তাদের সম্বন্ধ স্থাপন করে। এদের (দার্শনিকদের) অধিকাংশ বিষয়, বিশেষত ইলাহিয়্যাত (আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান - যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য) সংক্রান্ত তাদের ভাষ্য ভ্রান্ত এবং কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী। তাদের পূঁজি হচ্ছে অকাট্য মূর্খতা এবং যারা নিজেদের মূর্খ হওয়ার জ্ঞানের ব্যানারে মূর্খ--তাদের 'বুদ্ধিজীবী' ও পণ্ডিত নামে অভিহিত করা হল কোন মানদণ্ডে? তবে হাঁ, উপহাস ও কৌতুক-রূপে হলে হতে পারে কিংবা এরূপ হতে পারে যে জন্যে কোন অন্ধকে চক্ষুষ্মান (ও কোন বধিরকে শ্রুতিধর) বলা হয়" (মাকতূব, ৩/২৩, খাজা ইবরাহীম কুবাদয়ানীর নামে)।

"সা'দী, পরিচ্ছন্ন পথ-পরিক্রমা মুস্তাফা (স)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত অসম্ভব"।

জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি দীনী হাকীকত অনুধাবনের বেলায় যথেষ্ট নয়

"ঐ আল্লাহ্র শোক্র যিনি আমাদেরকে তাঁর দিকে হেদায়েত বা পথ-প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ স্বয়ং যদি আমাদেরকে পথ-প্রদর্শন (হেদায়েত) না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না। নিশ্চিতই আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর সত্যসহ আর্বিভূত হয়েছেন"। আম্বিয়া' আলায়হিমু'স-সালামকে প্রেরণের মাধ্যমে তিনি আমাদের উপর যে দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছেন কোন্ ভাষায় আমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করব এবং কোন্ দিল দিয়ে সেই করুণা-সিন্ধুর অন্তহীন দয়া ও বদান্যতার উপর বিশ্বাস পোষণ করব। আর সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই-বা কোথায় যে, নেক আমলের মাধ্যমে সেই মহা নেয়ামতের প্রতিদান দেব। যদি ঐ সব হযরতের পবিত্র অস্তিত্ব না থাকত তাহলে আমাদের মত স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন অর্বাচীনদেরকে আসমান যমীনের স্রষ্টা ও তাঁর ওয়াহদানিয়াতের দিকে কে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করত? গ্রীসের প্রাচীন আমলের দার্শনিকগণ তাঁদের মেধা সত্ত্বেও আসমান-যমীনের স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকে (অগ্রসর হবার) রাস্তা খুজেঁ পায়নি এবং সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বকে তারা "কাল" (دهر)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। এরপর যখন দিনকে দিন আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম-এর দা'ওয়াত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে চলেছে তখন পরবর্তী কালের (তথা শেষ যুগের) দার্শনিকগণ ঐ সব

আলোর বরকতে প্রাচীন যুগের দার্শনিকদের মত ও পথ প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরম স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নেন ও তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেন। অতএব আমাদের বুদ্ধি নবুওতের উজ্জ্বল আলোকমালার সাহায্য ব্যতিরেকে এ কাজে অসহায় ও অক্ষম এবং আমাদের উপলব্ধি আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম-এর অস্তিত্বের মাধ্যম ছাড়া এ ব্যাপারে বহু দূর অবস্থান করছে।"[১]

নবূওতের রীতি-পদ্ধতি বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনার রীতি-পদ্ধতির ঊর্ধ্বে

নবূওতের পন্থা-পদ্ধতি বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনা রীতি-পদ্ধতির থেকে ঊর্ধ্বে। যে সব বিষয় অনুধাবন করতে বুদ্ধি অক্ষম নবূওতের পথ ও পন্থায় সে সবের প্রমাণ মিলে। বুদ্ধি যথেষ্ট বিবেচিত হলে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম প্রেরিত হতেন কেন? (তাঁদের সকলের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) আর পরকালের আযাবকেই বা কেন নবী প্রেরণের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হত? আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

"আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আযাব পাঠাই না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নবী পাঠাই" (আল-কুরআন)। বুদ্ধি যদিও দলীল কিন্তু তা পূর্ণ ও অকাট্য দলীল নয়। পূর্ণ ও অকাট্য দলীল তো আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম আবির্ভাবের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং তা মান্য করতে ও পালন করতে বাধ্য এমন সব লোকের ওযর-আপত্তির সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

"রসূল যিনি সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী যাতে লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র উপর কোন দলীল না থাকে নবীদের প্রেরণের পর, আর আল্লাহ্ তো প্রবল পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ"। যখন কোন কোন মসলার ব্যাপারে বুদ্ধির অনুধাবন ও উপলব্ধির ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রমাণ হয়ে গেল, তখন শরীয়তের সমস্ত বিধি-বিধানকে বুদ্ধির নিক্তিতে মাপা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ঐ সব মসলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানকে বুদ্ধির ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা ও এর পাবন্দী বুদ্ধি যথেষ্ট হবার পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদানের সমার্থক এবং নবূওতের পথ ও পন্থাকে অস্বীকৃতির শামিল। আল্লাহ আমাদেরকে এর হাত থেকে পানাহ দিন।

১. পত্র নং ২৫৯, খাজা মুহাম্মদ সাঈদের নামে।

বুদ্ধি নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র হওয়া সম্ভব নয় এবং তা ঐশী সত্য অনুধাবনের জন্য (চাই কি তার নব্য-প্লেটোবাদী ও আত্মশুদ্ধির সহায়তা লাভ ঘটুক) উপকারী নয়

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, (যার ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও উচ্চস্তরের নির্ভুল চিন্তা-চেতনা ব্যতিরেকে আর কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়) এই হি. দশম শতাব্দী (খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) তে যখন সমগ পৃথিবীর উপর বিশেষ করে ইরান ও ভারতবর্ষের উপর যুক্তিবাদ ও দর্শনের সেই শিক্ষার প্রভাবে যা গ্রীক দর্শনের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং যা প্লেটো ও এ্যারিস্টোটলকে অভ্রান্ত ও সকল প্রকার নির্দোষিতার সার্টিফিকেট পর্যন্ত প্রদান করেছিল, মস্তিষ্কের উপর বুদ্ধিবৃত্তির এমন প্রভাব জেঁকে বসেছিল যে, বুদ্ধিবৃত্তির ভূমিকা থেকে যৌক্তিক পন্থার উপর কোন ফলাফলকে প্রমাণ করে দেবার উপর এবং গ্রীক দার্শনিকগণ যে সব বস্তুকে অকাট্য ও নির্ভুল বলেছেন তাদের নাম নিয়ে নেবার পর ভাষা মূক এবং দৃষ্টি ঘোলা ও ফ্যাকাশে হয়ে যেত বরং যুক্তিবাদ ও দর্শনের পূজারী ঐ সব ধর্তব্য সত্যের সামনে সিজদাবনত হয়ে যেত।

মুজাদ্দিদ সাহেব (র) (আমাদের জানামতে কমপক্ষে উলামায়ে ইসলামের মধ্যে) প্রথমবার এই আওয়াজ সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র হওয়া শারীরিক উপাদানের সম্পর্ক ও পরিবেশের মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো জল্পনা-কল্পনা, আকীদা-বিশ্বাস ও স্বীকৃত বিষয়সমূহ, অধিকন্তু অন্তর্নিহিত প্রবণতা ও দৃঢ় আখলাক-চরিত্র ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব এমনকি এর (তথাকথিত নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তির) যদি অন্তর আলোক ও আত্মশুদ্ধির সাহচর্য ও সাহায্য-সহযোগিতা লাভও ঘটে তখনও ভেতর-বাইরের প্রভাব, তা'লীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ এবং সমাজ ও পরিবেশের ভেতর যে সব বস্তু স্বীকৃত সত্যের মর্যাদা লাভ করেছে সে সবের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা ও অনুভূতির অটল উত্তরাধিকারিত্বে উপনীত হওয়া এবং দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত পেশ করা الشاذ كا المعدوم। অর্থাৎ যা কদাচিৎ পাওয়া যায় তা না থাকারই নামান্তর-এর শামিল যার উপর আদৌ আস্থা রাখা চলে না। মুজাদ্দিদ সাহেব (র)-এর এই গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত এবং তাঁর লিখিত পত্রসমূহে বার বার এ বিষয়ে জোর প্রদান সেই যুগ ও পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং জ্ঞানগত ও চিন্তার জগতেও একটি নতুন আবিষ্কার এবং এ এমন এক বিপ্লবাত্মক ও সাহসী ঘোষণা যার মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্বের পরিমাপ সঠিকভাবে এখন পর্যন্ত করা হয়নি। অথচ একে আলোচনা, গবেষণা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু বানাবার হকদার ছিল।

এ এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য যে, মুজাদ্দিদ সাহেব (র)-এর প্রায় দু'শো বছর পর জার্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক ইম্মানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant, 1724-1804) বুদ্ধির নির্ভেজাল ও বিমূর্ত হওয়া এবং এর পরিবেশ, উত্তরাধিকারিত্ব, অভ্যাসসমূহ ও আকীদা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে অবাধ সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতার উপর তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে ও খোলাখুলিভাবে বুদ্ধির সীমারেখা নির্ধারণ করেন এবং ১৭৮১ খৃস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Critique of pure reason প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বিশ্বের চিন্তাশীল ও দার্শনিক মহলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ডঃ স্যার মুহাম্মদ ইকবালের ভাষায় "প্রগতিশীল ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারীদের কৃতিত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।"[১] পশ্চিমা বিশ্বে তাঁর এই মহান কৃতিত্বকে জাঁকজমকপূর্ণ উপায়ে অভিনন্দিত করা হয়। অনেকে তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, "তিনি (কান্ট) ছিলেন জার্মান জাতির জন্য আল্লাহ্র এক সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।" The History of Modern Philosophy (আধুনিক দর্শনের ইতিহাস)-এর লেখক Dr. Harold Hoffding এই পুস্তকের উপর পর্যালোচনা পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, এই পুস্তকটি দর্শনের উপর লিখিত ডঃ কান্টের এক অমর ও অবিস্মরণীয় কীর্তি (An immortal master-piece of Philosophy) যা মানুষের চিন্তাজগতের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় মাইলস্টোনের ভূমিকা পালন করেছে (a work which stands as a milestone in the long wandrings of human thought)।

কান্টের মতে, চিন্তা কাজ শুরু করে যুক্তি-তর্কের তোয়াক্কা না রেখে বদ্ধমূল ধারণার ভিত্তিতে অর্থাৎ সে অনিচ্ছা সহকারে অধিকাংশ সময় সাদা-সিধাভাবে আপন শক্তি-সামর্থ্য ও কল্পনাশক্তির সুস্থতার উপর আস্থার ভিত্তিতে। সে বিশ্বাস করে যে, সর্বপ্রকার সমস্যার আমিই সমাধান করতে পারি এবং সৃষ্টিজগতের রহস্যমূল অবধি আমার গতি ও বিচরণ। এরপর একটা যুগ আসে যখন সে বুঝতে পারে যে, এই চিন্তা-গঠন মহাজগত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না এবং স্থপতিগণের ভেতর তাদের নকশা তথা পরিকল্পনা (প্লান) সম্পর্কে ঐকমত্য স্থাপিত হয় না। এই যুগটা সন্দেহ ও সংশয়ের যুগ। এরপর সে দেখতে পায় যে, এখনও এমন একটি কাজ বাকী যে কাজকে যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা বর্জনকারী বদ্ধমূল ধারণাবাদী ও সন্দেহ-সংশয় পোষণকারী উভয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল এবং তারা এটাকে উপেক্ষা করেছিল। আর তা ছিল এই যে, আমরা আমাদের

১. The Reconstruction of Religious Thought in Islam.P.5.

বুদ্ধিবৃত্তি ও আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করব এবং জানতে চেষ্টা করব যে, আমাদের ভেতর বস্তু-উপলব্ধির জন্য কি ধরনের তূরী ও শক্তি পাওয়া যায় এবং এসবের সাহায্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি?

এরপর এখন একজন মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদের যিনি ভারতবর্ষের সীমিত জ্ঞান ও ঐতিহ্যভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশে থেকেছেন, যিনি যুক্তিবাদ ও দর্শন শাস্ত্রের পরিবর্তে নবুওতের জ্ঞান এবং আল্লাহ্র পরিচয় ও সন্তুষ্টি লাভকেই আপন জীবনের লক্ষ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন,নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তির সমালো - চনায় দর্শনের ঘোর-প্যাঁচ ও জটিলতা থেকে দূরে অবস্থান করত সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষণ বর্ণনা পাঠ করুন। মুজাদ্দিদ সাহেব (র) এই প্রশ্নের জওয়াব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি আপন সত্তার দিক দিয়ে ঐশী বিধানের মুকাবিলায় ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ এবং তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, এমন কেন হতে পারে না যে,আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধির পর বুদ্ধিবৃত্তির ঐশীসত্তার সঙ্গে একটা নেশা ও মত্ততাহীন সম্বন্ধ সৃষ্টি হোক যার মাধ্যমে সে সেখান থেকে বিধি-বিধানসমূহ লাভ করবে এবং ফেরেশতার মাধ্যমে ওয়াহী প্রেরণের আর কোন প্রয়োজনই পড়বে না? এর উত্তরে মুজাদ্দিদ (র) বলেন ঃ

"ঐশী নীতির সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষাকারী ও সংযোগ স্থাপনকারী বুদ্ধিবৃত্তি এর দেহগত অস্তিত্বের সাথে, যে সম্বন্ধ কখনও পরিপূর্ণরূপে অপসৃত হয় না এবং তা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও অবিমিশ্রতা সৃষ্টি করতে পারে না। সন্দেহ ও সংশয় সর্বদাই তার সাথে চলে এবং কল্পনা তার ধারণাকে কখনো পরিত্যাগ করে না। ক্রোধ ও আকাংক্ষা ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে এবং লোভ ও মোহের মত নিন্দনীয় সিফাত হয় এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ভুল-ভ্রান্তি ও মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বভাবজাত; এগুলো মানুষ থেকে অপসৃত হয় না। অতএব বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভরশীল নয় এবং তার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বিধানসমূহ কল্পনা, অপরিপক্কতা ও অনুমানের আওতামুক্ত ও প্রভাব বহির্ভূত নয়, ভুল-ভ্রান্তির মিশ্রণ ও গলদের সন্দেহ থেকে নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতারা এসব সিফাত থেকে পবিত্র এবং এই সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অতএব নিঃসন্দেহে তারা নির্ভরযোগ্য এবং তাদের গৃহীত বিধানসমূহ কল্পনা ও খেয়াল-খুশীর মিশ্রণ ও ভুল-ভ্রান্তির সন্দেহ থেকে নিরাপদ। কোন কোন সময় অনুভূত হয় যে, সেই সব জ্ঞান যেগুলো সে আধ্যাত্মিকভাবে লাভ করেছে, পঞ্চেন্দ্রিয় অবধি সেগুলো পৌঁছুবার ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো বিষয় যা তার নিকট স্বীকৃত (কিন্তু অবাস্তব এবং ধারণা বা খেয়াল অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্জিত) বেএখতিয়ার ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে এভাবে শামিল হয়ে

যায় যে, সে সময় একেবারেই এর বাছ-বিচার করা যায় না। অন্য সময় কখনও এর পার্থক্য শক্তি বা বিশিষ্টতা দান করা হয়, আবার কখনও হয় না। অতএব অবশ্যাম্ভাবীরূপে ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঐ সব বিষয়ের অর্ন্তভূক্তির দরুন অবাস্তবতা ও অসত্যের রূপ সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তা বিশ্বাসযোগ্য থাকে না।"[১]

নব্য প্লেটোবাদী ও (মরমীবাদী) আত্মার পরিশুদ্ধি

নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন, বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল জ্ঞান, সভ্য ও মার্জিত চরিত্র, আত্মশুদ্ধি এবং এ সবের সাহায্যে মানবীয় সমাজ গঠন ও সুন্দর কৃষ্টি নির্মাণের একটি ত্রুটিমুক্ত ও নিষ্পাপ মাধ্যম হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই নব্য প্লেটোবাদ ও আধ্যাত্মিকতাকে জ্ঞান করা হয়েছে। প্রাচীন কালে মিসর ও ভারতবর্ষ ছিল এর বিরাট কেন্দ্র। এই আন্দোলনের বিস্তার ও এর হৃদয়গ্রাহিতার ভেতর সেই প্রতিক্রিয়াও কাজ করছিল যা একদিকে চরম বুদ্ধিবৃত্তি পূজা, অপরদিকে পাগল-ামী পর্যায়ের ইন্দ্রিয় পূজার বিরুদ্ধে গ্রীস ও রোমে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং শেষাবধি তা আলেকজান্দ্রিয়া (মিসর) কে, যা ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও নানা ধর্মের মিলনকেন্দ্র,—স্বীয় কেন্দ্রে পরিণত করে।

এই দর্শন ও আন্দোলনের আহবায়ক ও অনুসারীবৃন্দের উক্তি এই যে, নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের সবচে' বড় মাধ্যম হল মুশাহাদা তথা পর্যবেক্ষণ এবং এই মুশাহাদা লাভ করা যায় নূর-ই বাতেন তথা অভ্যন্তরীণ আলোকরশ্মি, আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও জাগ্রতকরণের দ্বারা। বাস্তব তথা প্রকৃত জ্ঞান লাভ সেই নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র বুদ্ধি এবং সেই অভ্যন্তরীণ আলোকরশ্মি দ্বারাই সম্ভব যা রিয়াযত, প্রবৃত্তির বিরোধিতা ও মুরাকাবা দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যদি একথা মেনে নেয়া হয় তাহলে এর নির্গলিতার্থ হল এই যে, মানুষের ভেতর পঞ্চইন্দ্রিয় ছাড়াও একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কর্মরত আছে এবং এর কর্মের পরিণ-তিতে (মুশাহাদাত) অদেখা আলো, অশ্রুত আওয়াজ এবং প্রথম থেকে অজানা হাকীকত (যথার্থ, বাস্তব ও প্রকৃত জ্ঞান ও সত্য) প্রতিভাত হতে থাকে। কিন্তু এর কি নিশ্চয়তা আছে যে, এই ইন্দ্রিয়ও মানুষের অপরাপর ইন্দ্রিয়ের মত সীমাবদ্ধ, ভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝির শিকার হবে না? যদি এমন হত তবে এর পরিণতিতে পরস্পর বিরোধিতার অস্তিত্ব এবং সন্দেহ ও সংশয়ের আশংকা পাওয়া যেত না। কিন্তু নব্য প্লেটোবাদের ইতিহাস বলে যে, এই অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধ ও অনুভূত বিষয়সমূহ এবং তা যে সব পরিণতি, ফলাফল ও 'আকাইদ

১. খাজা আবদুল্লাহ ও খাজা উবায়দুল্লাহর নামে লিখিত পত্র, ১ম খণ্ড, পত্র নং ২৬৬।

অবধি পৌঁছে সে সবের ভেতরও ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধিতা ও মতভেদ পাওয়া যায় যেমন গ্রীসের দার্শনিকবৃন্দ এবং প্রাচ্যের বিজ্ঞ-পণ্ডিত বুদ্ধিজীবিদের ভেতর পাওয়া যায়। প্রাচীন প্লেটোবাদকে বাদ দিয়ে (যার ইতিহাস নিরাপদ ও সুরক্ষিত নয়) নব্য প্লেটোবাদকেই নিন না কেন। এর নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের উপর বিন্যস্ত ও সম্পাদিত কর্মের ভেতর পরিষ্কার পারস্পরিক বৈপরিত্য পাওয়া যায়। Plotinus স্বীয় যুগের ধর্মীয় ব্যবস্থা ও প্রচলিত ইবাদত- বন্দেগীর সমর্থক নন। তিনি ছিলেন একজন মুক্তবুদ্ধি দার্শনিক যিনি কর্মের পরিবর্তে চিন্তা ও গভীর ধ্যানের উপর জোর দেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য Parphyry (233-305) একজন নীতিবাদী মরমী ছিলেন। Plotinus বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের আত্মা পশুরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে থাকে। কিন্তু Praphyry এধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। এই চিন্তাধারার তৃতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হলেন Proclus (A. B. 412-495) যিনি পুরো মিসরীয় প্রথা-পদ্ধতি মেনে চলতেন, ধর্মীয় ও মযহাবী আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন এবং দিনে তিনবার সূর্যের পূজা করতেন। তাঁর ধর্ম ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের এক জগা-খিচুড়ি। এরা সকলেই সত্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন।[১]

Parphyry খৃস্ট ধর্মের বিরোধিতা করেন এবং রোমকদের মূর্তিপূজা ও জাহিলী ভাবধারা (Paganism)-র পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে রোম সম্রাটকে সমর্থন করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক আলোক-রশ্মি শির্ক ও মূর্তিপূজার এই ডুবন্তপ্রায় জাহাজের সঙ্গে আপন ভাগ্য জড়াতে বাধা দেয়নি।

মুসলমানদের মধ্যেও যাদের নব্য প্লেটোবাদ ও কাশ্‌ফের শক্তির উপর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও কাশ্‌ফের মধ্যে অনেক বৈপরিত্য পাওয়া যায়। একজন কাশ্‌ফ-এর অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে অপর একজন কাশ্‌ফ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির এখতিলাফ ঘটে। তার কাশ্‌ফকে প্রকৃত ঘটনার বিপরীত বলে আখ্যায়িত করে এবং কখনো একে অচৈতন্য বা মত্তাবস্থা (سكر) ও ভাবোন্মাদনার আধিক্য বলে অভিহিত করে। বহিঃ অস্তিত্ব নেই সে সবের সঙ্গে এই সব আহলে কাশ্‌ফ করমর্দন করেন এবং সে সবের সঙ্গে নিজেদের সাক্ষাতের কথা প্রমাণ করেন ইত্যাদি। তাসাওউফের ইতিহাস এধরনের উদাহরণ দ্বারা ভরপুর।

---

১. বিস্তরিত দ্র. Encyclopaedia of Religion & Ethics-এর New Platonism অধ্যায়।

শায়খু'ল-ইশরাক (master of illumination) শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (মাকতূল)

ঐ সব মুসলিম নব্য প্লেটোবাদীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীর শায়খুল ইশরাক শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (৫৪৯-৫৮৭ হি./ ১১৫৪-১১৯১ খৃ.), যিনি 'মাকতূল' (নিহত) নামে পরিচিত, সবিশেষ খ্যাত। ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিক্ষিপ্তপূর্ণ 'আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার দরুন সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহিরের নির্দেশে ৫৮৭ হিজরীতে তাকে হত্যা করা হয়। তিনি নিজেকে মাশ্শাঈ (এরিস্টোটলের অনুসারী) ও সূফী বলতেন। তার নিকট মাশ্শাঈ অর্থাৎ এরিস্টোটলীয় ধ্যান-ধারণার সাথে S. V. Den Bergh-এর উক্তি অনুযায়ী "সেই সমস্ত মরমী দর্শন বর্তমান যা মুসলমানরা গ্রীক সামঞ্জস্য বিধান দর্শন (نظريہ تطبيق) নানা আকীদা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য ও সম্মিলন থেকে গ্রহণ করেছে। Encyclopaedia of Islam; Vol. iv.সুহরাওয়ার্দী শিহাবুদ্দীন-এর নিবন্ধকার Bergh-এর মতে, "মূলত এটি তার আলোক-দর্শন (Philosophy of Ishraq) যা তিনি নব্য প্লেটোবাদী আলোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধার করেছেন যা বস্তুর মৌলিক সত্য হিসাবে বিবেচিত।"[১]

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আশ-শাহ্রযূরী বলেন যে, "তিনি ইশরাকী দর্শন (Speculative Philosophy) ও মাশ্শাঈ দর্শন (Gnostic Philosophy) কে একত্রে মিশিয়ে ফেলেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম হিকমাতু'ল-ইশরাক যার ভাষ্য লিখেছেন 'আল্লামা কুতুবুদ্দীন শীরাযী। এটি 'শরাহ হিকমাতু'ল-ইশরাক' নামে পণ্ডিত ও ছাত্র-শিক্ষক মহলে বহুল খ্যাত।

শায়খুল ইশরাক সুহরাওয়ার্দী মনে করেন যে, উপলব্ধি ও বোধ-সমূহের সংখ্যা দশে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রতিটির নিমিত্তে একটি বুদ্ধি ও বোধশক্তি রয়েছে যা এর হেফাজত করে থাকে। তিনি এর নাম দিয়েছেন আনওয়ার-ই মুজাহাদা বা বিমূর্ত ও নিগূঢ় দ্যুতি। তাঁর মতে, আসমান একটি জীবিত মাখলূক। যেহেতু এর ভেতর বিমূর্ত আত্মা রয়েছে যা এতে গতি সঞ্চার করে থাকে। আসমান পরিবর্তন ও খণ্ড- বিখণ্ড হওয়া থেকে মুক্ত ও নিরাপদ। আসমান বাকশক্তির অধিকারী বিধায় এর ভেতর অপরাপর বোধশক্তিও পাওয়া যায়। তাঁর মতে, গোটা আসমান একটি জীবিত প্রাণী এবং আনওয়ার-ই 'আলিয়া অর্থাৎ পরম ও অসীম আলোর (Absolute Light) প্রভাব নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে এর উপর পড়ে এবং এ সবেরই মাধ্যমে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গতি সঞ্চারিত হয়। সবচে'

---

১. দাইরা-ই মা'আরিফে ইসলামিয়া।

বড় নক্ষত্র হল সূর্য। আলোকবাদীদের (ইশরাকিয়্যুন) ধর্মে সূর্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। নিখিল বিশ্বে সরাসরি ও মাধ্যমে আলো আর আলোরই রাজত্ব চলছে। গতি ও উত্তাপ আলো থেকে জন্ম হয়ে থাকে। আর আগুনের মধ্যে এদু'টো গুণ ও উপাদান বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যেভাবে নফ্স (আত্মা) 'আলম-ই আরওয়াহ্ তথা রূহের জগতকে আলোকোজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল করে ঠিক তেমনি আগুন আলম-ই আজসাম তথা ভৌতিক জগতকে আলোময় করে। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক জগতে নিজের একজন খলীফা তথা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। বোধের জগতে ১ম বোধ, মহাকাশ জগতে নক্ষত্ররাজি ও তাদের বাঙময় (نفس ناطقه) আত্মা এবং উপাদানসমূহের জগতে মানবাত্মা, নক্ষত্ররাজির আলোকশিখা ও বিশেষভাবে আগুন (রাত্রির অন্ধকারে) তাঁর খলীফা অর্থাৎ তাঁর সংস্কার-সংশোধন ও প্লান পরিচালনা করে থাকে। খিলাফতে কুবরা তথা বৃহত্তর ও উচ্চতর প্রতিনিধিত্ব আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পরিপূর্ণ আত্মাসমূহের অর্জিত হয়ে থাকে। খিলাফতে সুগরা তথা নিম্নতর ও ক্ষুদ্রতর প্রতিনিধিত্ব অগ্নির সঙ্গে সম্পর্কিত। কেননা অন্ধকার রাত্রে তা অসীম ও স্বর্গীয় জ্যোতি ও নক্ষত্ররাজির আলোক-শিখার প্রতিনিধিত্ব করে। খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য শাক-সবজীর পাকতে ও পুষ্ট হতে সাহায্য করে। শায়খুল-ইশরাক শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর মতে জগত অবিনশ্বর ও অসৃষ্ট (কাদীম) এবং সময় বা কাল চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। তিনি আত্মার পুনর্জন্ম বা পুনঃ দেহপ্রাপ্তি স্বীকার করেন না, আবার তা অস্বীকারও করেন না (কেননা এ বিষয়ে উভয় পক্ষের দলীল-প্রমাণ সান্ত্বনাদায়ক নয়)।[১]

এভাবেই আপন যুগের বিশিষ্ট ইশরাকী পণ্ডিত, যিনি প্রাচ্যে শায়খুল ইশরাক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, যাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, গভীর পাণ্ডিত্য ও সাধুতা তাঁর সমসাময়িকেরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, তাঁকেও তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদ, আত্মার পরিচ্ছন্নতা, গ্রীকদের কল্পিত মতবাদ ও ইরানী অগ্নি উপাসকদের তত্ত্বের কচ-কচানি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি রসূল (সা)-এর আবির্ভাব এবং এর উপর বিন্যস্ত ও সংকলিত হেদায়াত, ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণ ও আল্লাহ্র বিশুদ্ধ পরিচয় লাভ থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি একটি ভারসাম্যহীন, বিশৃংখল ও অরাজকতাপূর্ণ ব্যর্থ জীবন অতিবাহিত করেন এবং পশ্চাতে কোন পথ-নির্দেশনা, সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা না রেখেই ইহ-লোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

১. বিস্তারিত দ্র. হুকামা-ই ইসলাম, ২য় খণ্ড, মওলানা আবদুস সালাম নদভীকৃত।

বুদ্ধিবৃত্তি ও কাশ্‌ফ একই নৌকার আরোহী

দার্শনিক কান্ট (Kant) নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্বে খুবই সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে অবিমিশ্র থাকা, ভেতর ও বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তিনি কাশ্‌ফ ও বাতেনী ইল্‌ম-এর জগত সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ ও অপরিচিত। এজন্য তিনি এর থেকে সামনের কিছু বলতে পারেন নি। মুজাদ্দিদ সাহেব যিনি এই (বাতেনী ইল্‌মরূপ) সমুদ্রেরও সাতারু ছিলেন, এক কদম সামনে অগ্রসর হয়ে বিশুদ্ধ কাশ্‌ফ ও নির্ভেজাল ইলহামের কঠিন ও দুষ্প্রাপ্য হবার উপর বিস্তৃত আলোকপাত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, মরমীবাদ ও আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমেও সেই সব অদৃশ্য সত্য (হাকীকত)এবং অভ্রান্ত ও সন্দেহাতীত জ্ঞান অবধি পৌঁছা সম্ভব নয় যা আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম এবং তাঁদের আবির্ভাবের পথ ধরে সাধারণ ও বিশিষ্ট সর্বস্তরের লোক লাভ করে থাকে। ঠিক তেমনি নবীদের আবির্ভাব ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র মা'রিফত (জ্ঞান, পরিচয়) অবধি পৌঁছা যায় না, মুক্তিলাভও ঘটে না, তেমনি ঘটে না প্রকৃত আত্মশুদ্ধিও। এই সিলসিলায় তাঁর কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতি পেশ করছি, পাঠ করে দেখুন।

"ঐ সব নাদানদের (হুকামা') একদল আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ ব্যতিরেকেই মরমী সূফীদের (যারা প্রতিটি যুগেই আম্বিয়া-ই কিরামের অনুগত ও অনুসরণকারী) অনুকরণে রিয়াযত ও মুজাহাদার পথ অবলম্বন করেছেন এবং আপন যুগের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছেন আর স্বীয় স্বপ্ন ও ধারণার উপর নির্ভর করেছেন এবং নিজেদের কল্পিত কাশ্‌ফকে ইমাম বানিয়েছেন। ফলে তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ হয়েছেন তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহ করেছেন। এরা জানে না যে, এই পরিশুদ্ধি নফসের পরিশুদ্ধি যা গোমরাহীর দিকে পথ প্রদর্শন করে, কলব (হৃদয়)-এর পরিশুদ্ধি নয় যা কিনা হেদায়াতের বাতায়ন। এজন্য যে, কলবের পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধি আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামের অনুসরণের সঙ্গে সম্পর্কিত আর নফসের পরিশুদ্ধি (সংস্কার ও পরিশীলন) কলবের পরিশুদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শর্তে যে, সে নফসের এসলাহ ও তরবিয়ত (সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দান) করবে। কলব যা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার নূরের বিকাশস্থল-এর অন্ধকারের সঙ্গে নফস যেই পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করবে তার অবস্থা হবে সেই প্রদীপের ন্যায় যেই প্রদীপ এজন্যই আলোকোজ্জ্বল করা হয়েছে যা গোপন শত্রু অর্থাৎ অভিশপ্ত ইবলীসের (তার আলোকে) ঘরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে।

"মোটকথা এই যে, রিয়াযত ও মুজাহাদার পন্থা দৃষ্টি (نظر) ও দলীল-প্রমাণের রঙের মধ্যে সেই সময় বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করবে যখন তা আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের আনীত সত্য সহকারে হবে যে সত্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁরা প্রচার করতেন এবং তাঁর (আল্লাহ্র) সাহায্য তাঁদের (নবীদের) সাহায্য করত। ঐ সব হযরতদের ব্যবস্থা এমন সব ফেরেশতাদের অবতরণের কারণে (যাঁরা ভুল-ত্রুটি ও গোনাহ-খাতা থেকেও নিরাপদ) অভিশপ্ত দুশমনের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন ঃ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ "নিশ্চিতই আমার বিশিষ্ট বান্দা যাদের উপর (হে ইবলীস!) তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই, চলবেও না"। একথা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং সেই অভিশপ্ত শয়তানের অপবিত্র হাত থেকে তাদের রেহাই পাবার কল্পনাও করা যায় না। কেবল তারা রেহাই পাবে যারা আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের পায়রবী করবে ও তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলবে।

শায়খ সা'দী (র) সত্য বলেছেন ঃ

محالست سعدی که راه صفا
تواں رفت جز برپئے مصطفی

"সা'দী! শান্তির পথে চলতে চাইলে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-র অনুসরণ ব্যতিরেকে চলা অসম্ভব।" আল্লাহ্র দরূদ ও সালাম তাঁর উপর, তাঁর বংশধরদের উপর এবং বেরাদরানে আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের উপর বর্ষিত হোক।"

কাশ্ফে ভেজাল

"একথা বুঝতে হবে যে, কাশ্ফের ভুল-ত্রুটি সব সময় শয়তান কর্তৃক নিক্ষেপের ভিত্তিতেই হয়না। অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, কতক অবাস্তব ও সত্য থেকে মুক্ত কল্পিত বিধি-বিধানের ভেতর গিয়ে আসন গাড়ে। সেখানে শয়তানের কোন অধিকার থকে না। কিন্তুএই সব ধারণা ও কল্পনা বাইরে ছদ্মবেশ ধারণ করে আসে। এ ব্যাপারের একটি বিষয় হল এই যে, কোন কোন লোক স্বপ্নে নবী করীম (সা)-এর যিয়ারত লাভ করে থাকে এবং তারা নবী করীম (সা) থেকে এমন কতক বিধি-বিধান গ্রহণ করে (যা শরীয়তের প্রমাণিত মসলা-মাসাইল ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী হয়)। এমতাবস্থায় উক্ত নিক্ষেপ (ইলকা) শয়তান কর্তৃক কল্পিত নয়। উলামা-ই কিরামের সুচিন্তিত অভিমত হল, শয়তান আঁ-হযরত (সা)-এর অনুরূপ আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এমত অবস্থায় কেবল কল্পনারই ধারণা হয় যা অবাস্তব কে বাস্তব মনে করে বসেছে।"[১]

১. মুহাম্মদ সাদিক কাশ্মীরীর নামে লিখিত পত্র ১০৭,

অপর এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"নফস—চাই কি আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই তা নফসে মুতমাইন্নাঃ (প্রশান্ত আত্মা)-য় পরিণত হোক, কিন্তু তা কখনো আপন স্বভাব ও দোষ-গুণ থেকে পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে পারে না, হয় না। এজন্য ভুল-ত্রুটি তার ভেতরও রাস্তা করে নেবার সুযোগ পায়।"[১]

দার্শনিক এবং আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর শিক্ষার মধ্যে সংঘাত ও বৈপরিত্য

এতটুকু লিখার পর তিনি দার্শনিকদের এবং আম্বিয়া-ই কিরামের প্রদত্ত শিক্ষামালার মধ্যে সেই প্রকাশ্য সংঘাত ও বৈপরিত্যের দিকে ইঙ্গিত পূর্বক যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে এবং যে শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয় এবং যাঁদের (দার্শনিকদের) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস ও শূন্যমার্গে ভ্রমণ নিষ্ফল প্রয়াসের সমার্থক বৈ নয়,তিনি বলেন ঃ

"দার্শনিকদের অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি নবূওতের একেবারেই বিপরীত মেরুতে ও মুখোমুখি অবস্থানে অবস্থিত। নিখিল বিশ্বের প্রারম্ভিক উৎপত্তি সম্পর্কে যেমন, তেমনি পরলোক সম্পর্কেও—তাদের আলোচ্য সমস্যা ও সূত্র আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের শিক্ষামালার একেবারেই বিরোধী। তারা না আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসকেই দুরস্ত করেছে, না পরকালীন বিশ্বাসকেই ঠিক করেছে। তারা বলেন যে, বিশ্বজগত অসৃষ্ট বস্তু (কাদীম) অথচ য়ারা ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং নানা মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত তারা সম্মিলিতভাবে এটা সমর্থন করেন যে, জগত সৃষ্টি বস্তু তার সমস্ত শাখা-প্রশাখাসহ। তেমনি তারা আসমান বিদীর্ণ হওয়া, তারকারাজি খসে পড়া, পাহাড়-পর্বত টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, সমুদ্র উত্তোলিত হবার সমর্থক নন যেগুলো কিয়ামত সংঘটিত হবার কালে ঘটবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের কথাকেও তারা অস্বীকার করে থাকে এবং কুরআন করীমের খুটিনাটি বর্ণনা ও ব্যাখ্যাসমূহও অস্বীকার করে। তাদের পরবর্তীরা যারা নিজেদের দর্শনগত মূল-নীতির উপর দৃঢ় রয়েছেন এবং আকাশসমূহ, নক্ষত্ররাজি আর এমনিভাবে অন্যান্য বস্তুসমূহকে অসৃষ্ট (কাদীম) হবার তারা সমর্থক এবং এসব ধ্বংস ও বিনাশ না হবার দাবীদার। তাদের খোরাক হল কুরআনী ব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ, তাদের আহার্য হল ধর্মের মৌলিক ও নীতিগত মসলা-মাসাইলকে অস্বীকৃতি

১. শায়খ দরবেশের নামে লিখিত ৪১ নং পত্র।

জ্ঞাপন। এরা আশ্চর্য ধরনের মুসলমান যে, আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু আল্লাহ ও তদীয় রসূল যা বলেছেন সেগুলো গ্রহণ করে না। এর চেয়ে বড় আহম্মকী আর হতে পারে না। জনৈক কবি কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

فلسفه چوں اکثرش باشد سفه پس کل آں
هم سفه باشد که حکم کل حکم اکثر است

"ফালসাফাহ (দর্শন) শব্দের বৃহত্তর অংশই (পাঁচ অক্ষরের তিন অক্ষর যেহেতু 'সাফাহ' অর্থাৎ আহাম্মকী ও বোকামী) বিধায় এর গোটাটাই বোকামী ও আহাম্মকী। কেননা নীতিগত দিক দিয়ে বৃহত্তর অংশ সমগ্রের প্রতিনিধিত্ব করে।"

"এই দলটি তাদের জীবন এমন একটি যন্ত্র (যুক্তি বিদ্যা) শেখা ও শেখাতে ব্যয় করেছে যা চিন্তাগত ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষাকারী এবং এব্যাপারে খুবই কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা, গুণাবলী ও কর্মসমূহ সম্পর্কে আলোচনায় উপনীত হয়েছেন যা সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তখন তারা হাত-পা ছেড়ে দিয়েছেন এবং সেই যন্ত্রটিকে যা ভ্রান্তি থেকে রক্ষাকারী তা হাত থেকে ফেলে দিয়ে (দোরে দোরে) ঠোক্কর খেয়ে ফিরতে থাকলেন এবং গোমরাহীর বিজন মরু বিয়াবানে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরতে লাগলেন। যেমন একব্যক্তি বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধের সাজ-সামগ্রী তৈরী করতে থাকে, কিন্তু ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে হাত-পা ছেড়ে অবশ-বিবশ দেহে বসে পড়ে। তার দ্বারা যেমন কোন কিছু আশা করা যায় না এও ঠিক তেমনি।

"লোকে দর্শন শাস্ত্রকে খুব নিয়মতান্ত্রিক সুশৃঙ্খল শাস্ত্র বলে মনে করে এবং একে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ মনে করে। যদি একথা মেনেও নেওয়া যায় তাহলে এ সেই সব বিদ্যা বা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি একাই যথেষ্ট হতে পারে যা এখানে আলোচনা বহির্ভূত এবং অর্থহীন (অনুপকারী) বিষয়ের শামিল এবং চিরস্থায়ী আখিরাতের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন। পারলৌকিক মুক্তির সঙ্গেও এর কোন সম্পর্ক নেই। আলোচনা কেবল সেই সব জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে যা বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। আর তা কেবল নবুওতের তরীকার সঙ্গেই ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত, পারলৌকিক নাজাত ও মুক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।"

এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেন ঃ

"যুক্তিবিদ্যা এমন এক শাস্ত্র যা (পরবর্তী উচ্চতর জ্ঞানের জন্য) একটি যন্ত্র বিশেষ এবং এ সম্পর্কে লোকেরা বলেছে যে, তা অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা ভুল-ভ্রান্তি

থেকে রক্ষাকারী– তাদের কোন কাজে লাগেনা এবং মহান লক্ষ্যে তাকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেরও করে আনেনি। যা তাদের কোন কাজে আসেনি তা অন্যদের কোন্ কাজে আসবে এবং তাদের ভুলের থেকে কিভাবে বের করবে?

"(আল্লাহ তা'আলা থেকে তাঁরই ভাষায় দু'আ রয়েছে:)

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

"প্রভু হে! আমাদেরকে হেদায়াত দানের পর আমাদের হৃদয়কে আর বাঁকা করে দিও না। আর আমাদেরকে তোমার নিজের তরফ থেকে রহমত দান কর। নিশ্চিতই তুমি মহা দাতা।"

কিছু কিছু মানুষ যারা দর্শন শাস্ত্রে কিছুটা অধিকার রাখে এবং দার্শনিক কচ-কচানীর প্রতারণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত। এই দলকে হুকামা (বিজ্ঞ পণ্ডিত, দার্শনিক) জ্ঞানে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ মনে করে বরং তারা এতদূর পর্যন্ত পৌছে গেছে যে, তারা তাদের মিথ্যা শাস্ত্রকে সত্য জ্ঞান করত একে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের শরীয়তের উপর অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ আমাদেরকে খারাপ 'আকীদা থেকে রক্ষা করুন। তবে হাঁ, যে মুহূর্তে তাদেরকে হুকামা' জানবে এবং তাদের জ্ঞানকে 'হিকমত' বলবে তখন অহেতুক এই বিপদে জড়াবে। এজন্য যে, 'হিকমত বলা হয় কোন বস্তুর সেই জ্ঞানকে যা যথার্থ ও বাস্তবতানুগ। অতএব যে সব জ্ঞান (উদাহরণত আম্বিয়া-ই কিরামের শরীয়তসমূহ) ঐ সব হিকমতের জ্ঞানের বিরোধী হবে তা ঐ সব হুকামার ধারণায় যথার্থ ও বাস্তবতার বিরোধী হবে।

সার-সংক্ষেপ এই যে, তাদের সত্যতা এবং তাদের জ্ঞানের সত্যতার স্বীকারের অর্থই হবে আম্বিয়া-ই কিরামকে এবং আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের জ্ঞানকে মিথ্যা জানা। এজন্য যে, এতদুভয়ের (আম্বিয়া-ই কিরাম ও দার্শনিকদের) জ্ঞান পরস্পরের একেবারে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে। একটাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হল আরেকটাকে মিথ্যা জ্ঞান করা। এখন যার যেমন ইচ্ছা–হয় আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর আনীত দীনের অনুসারী হবে এবং আল্লাহ্র দলে অন্তর্ভুক্ত হবে, নাজাত লাভকারীদের দলে শামিল হবে। আর যার ইচ্ছা দর্শন শাস্ত্রানুসারী হবে, শয়তানের দলে নাম লেখাবে এবং অসফল ও ব্যর্থ হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ - اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ

يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ـ

"সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক, আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। এটা নিকৃষ্ট পানীয় ও আগুন কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!" সূরা কাহ্‌ফ, ২৯ আয়াত;

"আর শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা হেদায়াতের অনুসরণ করেছে এবং মুহাম্মদুর-রাসূলুল্লাহ (সা)-র আনুগত্যের পাবন্দী করেছে। আর রসূল (সা)-এর উপর, আম্বিয়া-ই কিরাম ও মালাইকা-ই ইজাম-এর উপর পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।"[১]

নবূওত ব্যতিরেকে প্রকৃত আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়

"আমরা একথা বলি যে, আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধি সেই সব নেক আমলের সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব আমল আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পসন্দনীয় এবং তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। আর এ বিষয়টি যা উপরে বর্ণনা করা হল নবূওতের উপর নির্ভরশীল। অনন্তর নবূওত ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধির হাকীকত লাভ হয় না।"[২]

নবী প্রেরণের আবশ্যকতা

মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) নবী ও রসূলদের প্রেরণের আবশ্যকতা, হেদায়াত লাভের ক্ষেত্রে তাঁদের অপরিহার্যতা এবং এককভাবে বুদ্ধিবৃত্তি (তা সে যত উন্নত মার্গেরই হোক না কেন) যথেষ্ট না হওয়ার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে অপর এক পত্রে বলেন ঃ

"আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের আগমন ও আবির্ভাব দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত। যদি তাঁদের অস্তিত্ব না থাকত তবে আমরা পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি ওয়াজিবু'ল-ওজূদ)-র সত্তা ও গুণাবলীর (যাত ও সিফাত) পরিচয়ের দিকে কে পথ প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় কাজের মধ্যে কে পার্থক্য-রেখা টেনে দিতেন?

"আমাদের ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি হযরত আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের দাওয়াতের আলোক-রশ্মির সাহায্য ব্যতিরেকে সেই মর্ম অনুভবে

১. খাজা ইবরাহীম কুবাদযানীর নামে লিখিত পত্র, ২৩/৩

২. খাজা 'আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহর নামে লিখিত, পত্র ২৬৬ নং।

অক্ষম এবং আমাদের অপূর্ণ উপলব্ধি ঐ সব হযরত-এর অন্ধ আনুগত্য ব্যতিরেকে এব্যাপারে অসহায় ও দুর্ভাগা।

"হাঁ, বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্যই দলীল, কিন্তু দলীল হবার ক্ষেত্রে অপূর্ণ এবং তা কখনো পূর্ণ নিশ্চয়তা, আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না। পরিপূর্ণ আস্থা ও প্রত্যয় কেবল আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের নবূওত দিতে পারে যার সঙ্গে চিরন্তন শান্তি ও পারলৌকিক পুরস্কার জড়িত।"১

ঐশী জ্ঞান ও নবূওত

নবূওত আল্লাহ্‌র রহমত আর তা এজন্য যে, তা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভের মাধ্যম যা সর্বপ্রকার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য সম্বলিত। নবূওতের এই সম্পদ থেকেই এ কথার জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যে, আল্লাহ্‌র তা'আলার উপযোগী শান কী আর অনুচিত তথা অনুপযোগীই বা কী? এজন্য যে, আমাদের অদূরদর্শী ও অক্ষম বুদ্ধি যা সম্ভাবনা ও সৃষ্টির কলংক ও ত্রুটি দ্বারা কলংকিত সে কি করে জানবে আল্লাহ তা'আলা যিনি চিরন্তন ও অসৃষ্ট (কাদীম), কোন্ নাম, গুণ ও কর্ম তাঁর শানের উপযোগী যেগুলো আত্মস্থ করা যায় আর কোনগুলো অনুপযোগী ও অসমীচীন যেগুলো থেকে এড়িয়ে চলা যায়। কেননা অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, আপন ত্রুটির দরুন আমাদের বুদ্ধি পূর্ণতাকে অপূর্ণ আর অপূর্ণতাকে পূর্ণ জ্ঞান করে। এই পার্থক্য জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য (যা নবূওত জন্ম দেয়) অধমের মতে, সর্বপ্রকার জাহিরী ও বাতেনী (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) নে'মতের চেয়ে বেশি। সে বড় হতভাগা যে অনুপযোগী ও অসমীচীন বিষয় ও অভদ্রোচিত বস্তুগুলো সেই পবিত্র সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে। নবূওতই বাতিলকে হকের থেকে পৃথক করে এবং সে সবের ভেতর যেগুলো ইবাদতের হকদার নয় ও হকদার—পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। নবূওতের মাধ্যমেই এই সব হযরত (আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম) আল্লাহ তা'আলার রাস্তার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও মাওলার মিলন সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করে থাকেন এবং এই নবূওতের দ্বারা 'আলা ও জাল্লা মালিক কিসে সন্তুষ্ট হন সেই সন্তুষ্টির জ্ঞান লাভ হয় যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং এর পার্থক্য ধরা পড়ে যে, তাঁর রাজ্যে বৈধ ও অনুমোদিত কোনটি আর কোন্‌টি অবৈধ ও অননুমোদিত। নবূওতের এধরনের উপকারিতা অনেক। অতএব এটা প্রমাণিত যে, আম্বিয়া-ই কিরামের আবির্ভাব ও আগমন আল্লাহ্‌র রহমত। যে ব্যক্তি নফসে আম্মারার (মন্দ

১. খাজা আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ্‌র নামে লিখিত, পত্র নং ২৬৬/১;

কর্মের, পাপ কর্মের প্ররোচক নফ্স) কামনা-বাসনার অনুসারী হয়ে অভিশপ্ত শয়তানের নির্দেশে নবূওতকে অস্বীকার করে এবং নবূওতের বিধি-নিষেধ ও চাহিদা মুতাবিক আমল না করে তবে সেক্ষেত্রে নবূওতের অপরাধ কোথায় আর তজ্জন্য নবূওতই বা রহমত হবে না কেন?"[১]

আম্বিয়া-ই কিরামের মারফতেই আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ঘটে

"যেহেতু আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালামের অব্যাহত ধারার কারণে আল্লাহ্র দিকে (যিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টা) তাঁদের দাওয়াত প্রদানের খ্যাতি ঘটল এবং ঐ সব হযরতের কালাম ও পয়গাম তথা কথা ও বার্তা সমুন্নত হল, তখন প্রতিটি যুগের নির্বোধেরা যারা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার প্রমাণের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ও সংশয়গ্রস্ত ছিল, নিজেদের ভুল সম্পর্কে অবহিত হয়ে বেএখতিয়ার স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিল এবং বস্তুসামগ্রী ও সৃষ্ট জীবজগতকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করল। এই আলোক-রশ্মি হযরত আম্বিয়া-ই কিরামের আলোকমালাসমূহ থেকেই গৃহীত এবং এই নে'মত আম্বিয়া-ই কিরামের নে'মতের খাঞ্চা থেকেই মিলেছে। আল্লাহ্র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক কিয়ামত বরং অনন্তকাল অবধি।

"ঠিক তেমনি (কুরআন হাদীসের) সেই সমস্ত বাণী (منقولات) যা আমাদের পর্যন্ত আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম কর্তৃক পৌঁছানোর দরুন পৌঁছেছে, যেমন আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী, আম্বিয়া-ই কিরামের নবূওত, ফেরেশতাদের নিষ্পাপ (معصوم) হওয়া (তাঁদের উপর দরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল হোক), হাশর-নশর, বেহেশ্ত-দোযখের অস্তিত্ব, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি এবং জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি এসব এবং এধরনের অন্যান্য বস্তুসামগ্রী যেই গুলি সম্পর্কে শরীয়ত আমাদেরকে অবহিত করে, খবর দেয়। বুদ্ধি এগুলো পেতে অক্ষম, ঐ সব হযরত (আম্বিয়া-ই কিরাম)-দের থেকে না শুনে সেগুলো প্রমাণ করতে অক্ষম এবং এককভাবে যথেষ্ট নয়।"[২]

ঈমানের সঠিক স্তর বিন্যাস (সহীহ্ তরতীব)

"সর্বপ্রথম রসূলের উপর ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর রিসালতকে সত্য বলে মানতে হবে যাতে করে তামাম হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে তাঁকে সত্য জ্ঞান করা যায় এবং তাঁর মাধ্যমে সন্দেহ ও সংশয়ের নিশ্চিত অন্ধকার থেকে মুক্তি

---

১. খাজা আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ্র নামে লিখিত, পত্র ২৬৬/১;

২. খাজা ইবরাহীম কুবাদয়ানীর নামে লিখিত, পত্র ২৩/২;

মেলে। এই ঈমানের মূল আর এ মূল সম্পর্কে প্রথমে যুক্তিসিদ্ধ ও অবহিত হতে হবে যাতে করে সমস্ত শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে অবলীলায় যুক্তিসিদ্ধ ও অবহিত হওয়া যায়। প্রতিটি শাখা-প্রশাখাকে আসল, সুদৃঢ় ও সুপ্রমাণিত করা ব্যতীত যুক্তিযুক্ত করা বড় কঠিন।

"এই সত্যতা অবধি পৌঁছা এবং আত্মিক প্রশান্তি লাভের নিকটতর রাস্তা হল যিক্‌র-ই ইলাহী তথা আল্লাহ্‌র যিক্‌র। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبِ۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى وَحُسْنَ مَاٰبَ ۔

"মনে রেখ, আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারাই আত্মিক প্রশান্তি লাভ ঘটে। যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তাদের জন্য সুসংবাদ ও সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল।"

"গভীর অনুধ্যান, গবেষণা ও যুক্তি-প্রমাণের পথে এই মহান লক্ষ্যে পৌঁছা অসম্ভব। কবির ভাষায় ঃ

پائے استدلالیاں چوبیں بود
پائے حوبیں سخت بے تمکیں بود

"যুক্তিবাদীদের পা হচ্ছে কাষ্ঠ র্নিমিত, আর কাষ্ঠ নির্মিত পা হয় নড়বড়ে ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।"[১]

আম্বিয়া-ই কিরামের রিসালত মান্যকারিগণ যুক্তিবাদী

"জানা দরকার যে, আম্বিয়া-ই কিরামকে যারা অনুসরণ করেন, অনুকরণ করেন তারা তাঁদের নবূওতকে প্রমাণ করবার পর এবং তাঁদের রিসালত সত্য বলে স্বীকার করবার পর তাদেরকে যুক্তিবাদীদের অন্তর্গত ধরতে হবে। আর এদের ঐ সব হযরতদের কথাকে দলীল ছাড়াই মেনে নেওয়া, সেই সময় (তাঁদের নবূওতকে যুক্তি-প্রমাণের সাথে মেনে নেবার পর) যুক্তি-প্রমাণ সিদ্ধ। যেমন একজন একটি মূলনীতিকে যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে গ্রহণ করে নিলেন। এর পর তার অর্থাৎ উক্ত মূলনীতির আওতায় যত শাখা-প্রশাখা জন্ম নেবে তা সবই ঐ প্রথম দলীল-প্রমাণের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে এবং সেই ব্যক্তি সেই মূল-নীতির দলীল-প্রমাণ সহকারে ঐ সমস্ত শাখা-প্রশাখার সমর্থনে দলীল- প্রমাণের অধিকারী হবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا ،

১. মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে লিখিত, পত্র ৩৬/৩

بِالْحَقِّ - وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

"আল্লাহ পাকের দরবারে হাম্‌দ ও শোক্‌র যিনি আমাদেরকে এর হেদায়াত দান করেছেন। আর আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান না করলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। নিশ্চিতই আমাদের প্রভু- প্রতিপালকের রসূল সত্যসহ আগমন করেছেন। আর শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা হেদায়াতের আনুগত্য করেছে।"[১]

আম্বিয়া-ই কিরামের শিক্ষামালাকে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির অধীনে আনয়ন নবূওত অস্বীকৃতির নামান্তর

"পাপ-পূণ্যের হিসাব, তূলাদণ্ড (মীযান) স্থাপন, পুলসিরাত সত্য। যেহেতু সত্য সংবাদবাহক (আ) এসবের সংবাদ দান করেছেন। নবূওতের তরীকা সম্পর্কে অজ্ঞ কারো কারোর এ সবের অস্তিত্বকে অসম্ভব জ্ঞান করা বিশ্বাসের অধঃপতন। কেননা নবূওতের পথ বুদ্ধির পথের ঊর্ধ্বে। আম্বিয়া-ই কিরাম প্রদত্ত সত্য শিক্ষামালা ও তথ্যসমূহকে বুদ্ধির আলোচনা-সমালোচনার নিরীখে ও বোধের দৃষ্টিতে সামঞ্জস্য বিধান করতে চাওয়া প্রকৃতপক্ষে নবূওতের পথকেই অস্বীকার করা। এসব বুদ্ধি-বহির্ভূত বিষয়ে আম্বিয়া-ই কিরামের কথাকে শর্তহীন ও প্রশ্নাতীতভাবে আমাদের মানতে হবে।"[২]

যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী এবং যুক্তিবুদ্ধির ঊর্ধ্বের মধ্যে পার্থক্য

"একথা মনে কর না যে, নবূওতের পথ ও পন্থা যুক্তিবুদ্ধি বিরোধী অথবা অযৌক্তিক বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বুদ্ধির পথ ও পন্থা (জ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণ) আম্বিয়া-ই কিরামের অনুসরণ অনুকরণ ব্যতিরেকে সেই মহান লক্ষ্য অবাধে পৌঁছুতে পারি না। যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী এক জিনিষ আর যুক্তি-বুদ্ধি বহির্ভূত বা ঊর্ধ্বে ভিন্ন জিনিষ। কোন চিন্তা-চেতনা কেবল তখনই বিচার-বিবেচনা করা যায় যখন বোধ ও উপলব্ধি এর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পন্থা কেবল নবীদের মাধ্যমেই জানা যায়

"আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই। কেননা দয়াল প্রভুর (যাঁর অস্তিত্ব যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে অবধারিতভাবেই প্রমাণিত ও অপরিহার্য)

---

১. মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে লিখিত, পত্র৩৬/৩, ২. ২৬৬/১;
২. খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র পুত্রদ্বয় খাজা 'আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহর নামে লিখিত, পত্র ২৬৬/১;

কৃতজ্ঞতার দিকে পরিচালিত এবং সেসব অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীর প্রতি জ্ঞানগত ও বাস্তব ভক্তি-শ্রদ্ধা কিভাবে প্রদর্শন করতে হবে তা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে জানিয়ে দেন। কেননা আল্লাহ্র নিকট থেকে না জেনে তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাঁর মর্যাদা উপযোগী নয়। আর তা এজন্য যে, মানবীয় ক্ষমতা তা ধা-রণা করতে অক্ষম বরং অধিকাংশ সময় দেখা যায় মানুষ অশ্রদ্ধা ও অভক্তিকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা বলে ধরে নিয়েছে এবং কৃতজ্ঞতাকে নিন্দা ও কুৎসার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আল্লাহ্র ইবাদত ও সম্মান-শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পন্থা নবূওতের মাধ্যমেই জানা যায় এবং আম্বিয়া-ই কিরাম প্রদত্ত জ্ঞান ও শিক্ষামালার উপর তা নির্ভরশীল। আওলিয়া-ই কিরামের প্রতি যে ইলহাম হয়ে থাকে তাও নবূওতের আলোক-রশ্মি থেকেই গৃহীত এবং আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের আনুগত্য ও অনুসরণের ফয়েয ও বরকত থেকে প্রাপ্ত।"১

পঞ্চেন্দ্রিয়ের তুলনায় যেমন বোধ-বুদ্ধি, তেমনি বুদ্ধি-বোধের তুলনায় নবূওতের মর্যাদা শ্রেষ্ঠতর

জ্ঞান-বুদ্ধির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যেমন পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর, যেমন পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় না, জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে তা লাভ করা যায়। তেমনি নবূওতের তরীকা জ্ঞান-বুদ্ধির পন্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে যা পরিমাপ করা যায় না তা নবূওতের মাধ্যমে উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। যে ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধির পন্থা ব্যতিরেকে জ্ঞান অর্জনের আর কোন পন্থার কথা স্বীকার করে না বস্তুত-পক্ষে সে নবূওতী তরীকাই স্বীকার করে না এবং সে হেদায়েতের বিরোধী।"২

নবূওতের মকাম

গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ভেতর (যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আম্বিয়া-ই কিরামের দা'ওয়াত এবং নবূওতের আলোক-রশ্মি থেকে বহু দূরে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হচ্ছিল) দিনরাত মশগুল থাকা এবং একেই জ্ঞান-প্রজ্ঞার চূড়ান্ত পর্যায় মনে করা, অপর দিকে কিতাব ও সুন্নাহর পথ-প্রদর্শন এবং এগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, হাদীস, সীরাত (আম্বিয়া-ই কিরামের বাণী ও জীবন-চরিত)-এর প্রতি আকর্ষণ ব্যতিরেকেই দৈহিক ব্যায়াম বা শারীরিক ক্রীড়া-কসরত, আত্মহনন ও চিল্লাকাশীর ভেতর সার্বক্ষণিকভাবে ডুবে থাকার কারণে বিগত শতাব্দীগুলোতে (যে শতাব্দীগুলোর সূচনা হয়েছে স্পষ্টত খৃ. অষ্টম

১. ইবরাহীম কুবাদয়ানীর নামে লিখিত, পত্র ২৩/৩;

২. প্রাগুক্ত;

শতাব্দী থেকে) নবূওতের মকাম তথা অবস্থানগত মর্যাদা সম্পর্কে কেবল এক ধরনের অপরিচিতি ও বিকর্ষণই নয় বরং এক রকমের অচেনা ও ভীতি সৃষ্টি হতে চলেছিল এবং যেহেতু আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের অবস্থা এমনিকি স্বয়ং নবী করীম (স)-এর জীবন-চরিত ঐ সব দার্শনিক পণ্ডিত ও মরমীবাদীদের সামনে এভাবে আসত যে, এই সব পবিত্রাত্মা সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতেন, বিয়ে-শাদী করতেন, সন্তান-সন্ততি থাকত, হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন, কোন কোন সময় তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করেছেন, পশুপাল চরিয়েছেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হতেন,খুশীর কথায় খুশী হতেন,দুঃখ ও ব্যথা-বেদনায় চিন্তিত ও বিষাদযুক্ত হতেন,তাঁদের জীবনে কোন কষ্ট-ক্লেশদায়ক ইবাদত ছিল না,না ছিল বছরব্যাপী,জীবনব্যাপী সিয়াম সাধনা ও চিল্লাকাশী যার উল্লেখ মধ্যম স্তরের আওলিয়া-দরবেশ ও সাধুদের জীবনে পাওয়া যায়। এরপর (অল্প বিস্তর যে সময়টুকু পাওয়া যায় তাও) রিসালতের দাওয়াত ও তাবলীগী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র মাখলুকের দিকে তাঁদেরকে মনোযোগ দিতে হয়। এ ছাড়া তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্ম পালন হতে পারত না। আর একদিকের মনোযোগ অপর দিকের মনোযোগের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। এজন্য নব্য-প্লেটোবাদী ও অধ্যাত্মবাদী ঐ সব মহলে যেখানে দীনী ইল্‌ম তথা ধর্মীয় জ্ঞান বিশেষত হাদীসের সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিলনা এবং যেখানে আওলিয়া-ই মুতাকাদ্দিমীন (প্রথম দিককার ওলীগণ) ও নব্য প্লেটোবাদীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গ ও নিভৃত জীবন যাপন, আত্মবিলোপ ও অনুপস্থিতির ঘটনাবলী দিনরাত তাদের মুখেমুখে ফিরে—এ ধারণা ব্যাপক হতে চলেছিল যে, ওলীর মকাম নবূওতের মকামের তুলনায় উত্তম আর ওলীর বিলায়েত গোটাটাই স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ এবং সৃষ্টিজগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির নাম আর নবূওতের বিষয়-বস্তু হল দাওয়াত যার সম্পর্ক হল সৃষ্টির সঙ্গে। ওলীআল্লাহ্‌র প্রতি সার্বক্ষণিক মনোযোগী থাকেন আর নবী থাকেন সৃষ্টির প্রতি। আর স্রষ্টার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী হবার অবস্থার তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ অবশ্য এক্ষেত্রে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করে বলেছেন যে, ওলীর বিলায়েত নবীর নবূওত থেকে মোটের উপর উত্তম নয়। যারা এমনটি বলেছেন তাদের একথা বলার অর্থ এই যে, নবীর বিলায়েত তাঁর নবূওত থেকে উত্তম এবং নবী যখন স্রষ্টাকে নিয়ে মশগুল হন তখন তাঁর এই অবস্থা সেই অবস্থা থেকে উত্তম যখন তিনি দাওয়াত ব্যাপদেশে সৃষ্টিজগতের সঙ্গে মশগুল হন। কিন্তু এই চিন্তাধারা এই কথার প্রমাণ দেয় যে, বিলায়েতের মকামের

'আজমত, তার কামালিয়াত ও উন্নতি দ্বারা ভীতি মুসলমানদেরও এক বিরাট বিস্তৃত ধর্মীয় মহলে সৃষ্টি হতে চলেছিল যা মুসলিম উম্মাহ্‌র আসল উৎস নবূওত ও শরীয়তের সঙ্গে সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলছিল। আর এটা ছিল এমন এক বিপদ যার মুকাবিলা করা ইসলামের মুজাদ্দিদ এবং আম্বিয়া-ই কিরামের প্রতিনিধিবর্গের জন্য জরুরী ছিল।

আমাদের জানামতে, এব্যাপারে সর্বপ্রথম জোরালো দলীল-প্রমাণসহ ও আবেগোদ্দীপক পন্থায় হি. অষ্টম শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের মশহূর ওলীয়ে 'আরিফ ও তত্ত্বজ্ঞ সূফী হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনয়ারী (হি. ৬৬১-৭৮৬) আওয়াজ তোলেন এবং স্বীয় মকতূবাতে একে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।[১] তিনি এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে, আম্বিয়া-ই কিরামের একটি নিঃশ্বাস আওলিয়া-ই ইজামের গোটা যিন্দেগী থেকে উত্তম। আম্বিয়া-ই কিরামের মাটির দেহ আপন পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও ঐশী নৈকট্যের ক্ষেত্রে আওলিয়া-ই কিরামের দিল ও দিমাগ, তাঁদের একান্ত ও নিভৃত কানাকানির তুল্য।[২]

হযরত মখদূম বিহারীর পর পুনরায় হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীই এই বিরাট জ্ঞান-সমুদ্র এবং এই হি. ২য় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ ও সমাপ্তকারী হন। তিনি তাঁর মকতূবাতসমূহে প্রমাণ করেন যে, আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) 'আকীদাগত, আধ্যাত্মিক, মেধাগত ও সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার শিল্পনৈপুণ্যের এবং ক্ষমা ও বদান্যতা গুণের সর্বোত্তম নমূনা হয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়ে থাকে যে, কোন মনেযোগ, দৃকপাত ও ব্যস্ততাই সেই সম্পর্কের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। এটা সেই বক্ষ সম্প্রসারণেরই নতীজা যদ্দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নির্দিষ্ট করে থাকেন। তাঁদের উদার মহানুভবতা, সহ্যশক্তি,চিত্তের প্রশস্ততা এবং তাঁদের পয়গাম ও কর্মের (যা তাঁদেরকে সোপর্দ করা হয়ে থাকে) চাহিদা ও দাবী চিরন্তন স্বাভাবিকতা (صحو دائم), সার্বক্ষণিক সজাগ ও জাগ্রতাবস্থা, উপস্থিত বুদ্ধি ও সজাগ-সচেতন অনুভূতি যা বিলায়েতের অধিকারী ওলী-দরবেশদের নেই। আম্বিয়া-ই কিরামের যেখানে শুরু আওলিয়া-ই ইজামের সেখানে শেষ অর্থাৎ আওলিয়া-ই ইজামের কামালিয়তের শেষ ধাপ যেখানে সেখান থেকে নবীদের যাত্রা শুরু হয়। নবূওতের অনুসরণ ও আনুগত্যে ফরযসমূহের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ ঘটে যেখানে নফলের দ্বারা নৈকট্যে পৌঁছুতে পারে না । বিলায়েতের

১. ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ৩য় খণ্ড দেখুন।

২. প্রাগুক্ত;

কামালিয়াত নবূওতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় ততটুকু গুরুত্ব রাখে যতটুকু রাখে এক ফোটা পানি সমুদ্রের বিপুল বারিরাশির মুকাবিলায়। এখন পাঠক মুজাদ্দিদ সাহেবের লেখনীর ভাষায় সেই সব হাকীকত ও উন্নত ইল্‌মের কথা শুনুন।

আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং সর্বোত্তম সম্পদ তাঁদেরকেই দেওয়া হয়েছে

"আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম সৃষ্টি আর সর্বোত্তম সম্পদই তাঁদেরকে দান করা হয়েছে। বিলায়েত নবূওতের অংশ মাত্র আর নবূওত হল সমগ্র। ফলে নিঃসন্দেহে নবূওত বিলায়েতের তুলনায় উত্তম হল—চাই তা নবীর বিলায়েতই হোক অথবা ওলীর বিলায়েতই হোক। অনন্তর স্বাভাবিক অবস্থা ইশ্‌ক-উন্মত্ত অবস্থা থেকে উত্তম। এজন্য যে, স্বাভাবিক অবস্থার ভেতর মত্তাবস্থা নিহিত যেমন বিলায়েত নবূওতের মাঝে নিহিত। অবশিষ্ট একক সচেতন অনুভূতি ও জাগ্রতাবস্থা যা সাধারণ মানুষের থাকে—আলোচনা বহির্ভূত। এই সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থার উপর প্রাধান্য দান কোন অর্থ বহন করে না। মত্তাবস্থা-নির্ভর স্বাভাবিক অবস্থা তো অবশ্যই মত্তাবস্থা থেকে উত্তম। ইলমে শরীয়ত যার উৎস হল নবূওত সরাসরি ধীর-স্থির ও স্বাভাবিক অবস্থা (صحو) হিসাবে কথিত। এই ইলম-এর বিরোধী যা কিছু হবে তা হবে سکر বা মত্তাবস্থা। মত্তাবস্থার অধিকারী ক্ষমার্হ। অনুসরণ-অনুকরণযোগ্য হল স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাকৃতিক জ্ঞান, মত্তাবস্থা জ্ঞান নয়।"[১]

চিত্ত সম্প্রসারণের (انشراح صدر) কারণে সৃষ্টিজগতের প্রতি আম্বিয়া-ই কিরামের মনোযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের প্রতিবন্ধক হয়না

"কতক মাশায়েখ আধ্যাত্মিক ভাবোন্মত্ত অবস্থার মুহূর্তে বলেছেন যে, বিলায়েত নবূওতের তুলনায় উত্তম। আবার অপর কতক লোক বলেছেন যে, এই বিলায়েত বলতে নবীর বিলায়েত বুঝানো হয় যাতে নবীর উপর ওলীর ফযীলতের ধারণা ও কল্পনাও যেন দূর হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা এর বিপরীত। এজন্য যে, নবীর নবূওত তাঁর বিলায়েত থেকে উত্তম। বিলায়েত-এ বক্ষের সংকীর্ণতার কারণে সৃষ্টির দিকে পুরোপুরি মনোনিবেশ হতে পারে না এবং নবূওতে বক্ষের বিপুল ব্যাপ্তি ও প্রসারতার দরুন আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ সৃষ্টিজগতের প্রতি মনোনিবেশে যেমন প্রতিবন্ধক হয়না, তেমনি সৃষ্টিজগতের

১. মিঞা সায়্যিদ আহমদ বিজওয়াড়ীর নামে লিখিত পত্র, ১০৮/১;

প্রতি মনোযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় না। নবূওতের ভেতর এককভাবে সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ হয়না যাতে বিলায়েতকে (যার অভিমুখ ও মনোযোগ হয় আল্লাহ্‌র দিকে) অগ্রাধিকার প্রদান করা যায়। عياذا بالله سبحانه আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি। অখণ্ড মনোযোগ সাধারণ লোকের বৈশিষ্ট্য। নবূওতের শান ও মর্যাদা এর থেকে উর্ধ্বের। এই হাকীকত অনুধাবন করা প্রেমোম্মত্ত সুফীদের পক্ষে দুষ্কর। এই জ্ঞান দৃঢ় চিত্তের অধিকারী সচেতন লোকদের পক্ষেই বুঝা সম্ভব।"

নবীদের অভ্যন্তরীণ দিক আল্লাহমুখী এবং বাহ্যিক সৃষ্টিমুখী

"কিছু কিছু মরমীবাদী সুফী বিলায়েতের জ্ঞানকে যা প্রেমোন্মত্ত অবস্থাভিমুখী, নবূওতের 'ইলমের উপর যা ধীরস্থির ও ভারসাম্যপূর্ণ —অগ্রাধিকার প্রদান করেন। আর এই প্রেমোন্মত্ত অবস্থারই উক্তি ঃ الولاية افضل من النبوة "নবূওত থেকে বিলায়েত উত্তম।" এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হল, বিলায়েতে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনঃসংযোগ ঘটে আর নবূওতের সৃষ্টি অভিমুখে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে,সৃষ্টিমুখী হবার তুলনায় আল্লাহমুখী হওয়া উত্তম। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, নবীর বিলায়েত তাঁর নবূওত থেকে উত্তম।"

"অধমের মতে, এধরনের কথা অর্থহীন ও অনভিপ্রেত। এজন্য যে, নবূওতে সৃষ্টির দিকেই কেবল মনোযোগ দেওয়া হয় না,বরং সৃষ্টিমুখী মনোযোগের সাথে আল্লাহর দিকেও মনোযোগ থাকে। মকামে নবূওতের অধিকারীর অভ্যন্তর আল্লাহ্‌র সঙ্গী হয়ে থাকে আর বাহ্যিক হয় সৃষ্টিমুখী। যাদের গোটা মনোযোগই সৃষ্টিমুখী তারা হয় রাজনীতিবিদ নতুবা জাহিলদের অন্তর্গত।"

"ওলী-আওলিয়ার শুরু, নবী-রসূলদের শেষ" এই উক্তির প্রত্যাখ্যান

"এই উক্তি একেবারেই অর্থহীন যে, ওলী-আওলিয়ার যেখানে শুরু নবী-রসূলদের সেখানে শেষ। ওলী-আওলিয়ার শুরু এবং নবী-রসূলদের শেষ, তাদের মতে এর দ্বারা শরীয়ত বোঝান হয়েছে। যেহেতু তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানা নেই সেজন্য এই ধরনের কথা যবান থেকে সে বের করতে পেরেছে। এই ধরনের বিষয় আর কেউ বর্ণনা করেনি বরং অধিকাংশ লোক এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণাই ব্যক্ত করেছে। আর এটি দুর্বোধ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু যারা সত্য ও ন্যায়পন্থী, যারা আম্বিয়া আলাহিমু'স-সালামের বুযুর্গী ও মাহাত্ম্যের দিকটিও দেখে থাকেন এবং শরীয়তের 'আজমত ও মর্যাদা তার উপর ভর করে থাকে তারা এসব সূক্ষ্ম রহস্যকে গ্রহণ করতে পারে এবং একে ঈমান বুদ্ধির ওসীলা বানাতে

পারে।[১] আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) দাওয়াতকে সৃষ্টিজগতের উপর নির্ভরশীল রেখেছেন এবং কেবল কলব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

"হে বৎস! শোন, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম দাওয়াতকে সৃষ্টিজগতের উপর নির্ভরশীল রেখেছেন। হাদীস শরীফে আছে যে, ইসলামের বুনিয়াদ পাচটি জিনিষের উপর (কলেমা শাহাদাত তথা আল্লাহ্র ওয়াহদানিয়াতের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত)। আর যেহেতু হৃদয়ের সঙ্গে সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক সম্পর্ক রয়েছে সেজন্য হৃদয় দিয়ে এসত্য গ্রহণেরও তাঁরা আহবান জানান এবং হৃদয়োর্ধ্ব যে সব বস্তু রয়েছে সেগুলোকে তাঁরা আলোচনার আওতায় আনেন নি,লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও গণনা করেন নি। লক্ষ্য কর, বেহেশ্তের আরাম-আয়েশ, দোযখের জ্বালা-যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় কষ্ট, দীদারে ইলাহী-রূপ সম্পদ আর বঞ্চনার দারিদ্র্য–এসবই সৃষ্টিজগতের (আলমে খাল্ক) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত – আলমে আম্র তথা অনুজ্ঞা জগতের এসবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"[২]

নবূওতের অনুসরণে কু'র্ব বি'ল-ফারাইদ অর্জিত হয়

"ঠিক তেমনি ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের আমলসমূহের যথাযথ আদায়। এর সম্পর্ক হল মানব দেহের সঙ্গে যা সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত। আর যে সব আল-মে আম্র তথা অনুজ্ঞা জগতের অংশ তা নফল আমলসমূহের অন্যতম। যে নৈকট্য ঐসব আমলের যথাযথ আদায়ের পরিণাম ফল তা আমল মাফিক হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে যে নৈকট্য ফরয আদায়ের ফল তা আলমে খাল্ক-এর অংশ এবং যে নৈকট্য নফল আদায়ের ফল তা আলমে আম্র-এর অংশ। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ফরযের মুকাবিলায় নফল কোন গণনার মধ্যেই বিবেচ্য নয়। তার মর্যাদা তো এতটুকুও নয় যতটুকু মর্যাদা এক বিন্দু পানির সমুদ্রের বিপুল বারিবাশির মুকাবিলায়। সুন্নতের মুকাবিলায় নফলেরও একই অবস্থা। এখেকে এই দুই নৈকট্যের পারস্পরিক পার্থক্য ধারণা করা যেতে পারে এবং আলরে আমর-এর উপর আলমে খাল্ক-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য এই পার্থক্য থেকে উপলব্ধি করা যাবে।"[৩]

বিলায়াতের কামালিয়াত নবূওতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় কোন গুরুত্ব বহন করে না

"আল্লাহ তা'আলা এই অধমের নিকট সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বিলায়েতের কামালিয়াত নবূওতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় কোনরূপ গণনার

১. মখদুমযাদা শায়খ মিঞা মুহাম্মদ সাদেকের নামে পত্র, ২৬০/১;
২. মখদুমযাদা শায়খ মিঞা মুহাম্মদ সাদেকের নামে পত্র, ২৬০/১;
৩. প্রাগুক্ত;

মধ্যেই আসে না। অতটুকু হিসাবের মধ্যেও পড়ে না যতটুকু পড়ে এক বিন্দু পানির সমুদ্রের বিপুল বারিরাশির মুকাবিলায়। অতএব যে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য নবূওতের পথে হাসিল হয়ে থাকে তা বিলায়াতের পথে অর্জিত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের থেকে কয়েকগুণ বেশি। অনন্তর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সাধারণভাবে ও সম্পূর্ণত আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-ই লাভ করে থাকেন,আর ফেরেশতাগণ অংশত মর্যাদা লাভ করে থাকেন। এজন্য জমহূর 'উলামায়ে কিরামের কথাই ঠিক।

"এই বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হল যে, কোন ওলীই নবীর দর্জাই উপনীত হতে পারেন না (আ), বরং ওলীর মস্তকই নবীর পায়ের নীচে স্থাপিত হবে।"[১]

'আলিম-উলামার জ্ঞান-গবেষণার বিশুদ্ধতা ও অগ্রাধিকারের কারণ

"যে সমস্ত ক্ষেত্রে 'আলিম-উলামা ও সূফীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে,সে সব ক্ষেত্রে তুমি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে সত্য আলিম-উলামার পক্ষে রয়েছে। এর পেছনে রহস্য এই যে, আম্বিয়া-ই কিরামের পদাংক অনুসরণের কারণে 'আলিম-উলামার দৃষ্টি নবুওতের কামালিয়াত ও জ্ঞান অবধি পৌঁছে যায় আর সূফীদের দৃষ্টি বিলায়াতের কামালিয়াত ও তাঁর ইল্‌ম ও মা'রিফতের ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অতএব নিঃসন্দেহে যে জ্ঞান নবূওতের আলোক-পুঞ্জ থেকে আহরিত ও গৃহীত তা অধিক বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও যথার্থ হবে সেই জ্ঞানের তুলনায় যা বিলায়াতের মর্তবা থেকে আহরিত ও গৃহীত।"[২]

"অধম তাঁর সকল গ্রন্থে ও পত্রে লিখেছে এবং বিচার-বিশ্লেষণ করেছে যে, নবূওতের কামালিয়াত সমুদ্রের ন্যায় আর বিলায়াতের কামালিয়াত সেই তুলনায় বারিবিন্দু। কিন্তু কি করা যাবে। একদল নবূওতের কামালিয়াত পর্যন্ত না পৌঁছুনোর দরুন বলেছে, الولاية افضل من النبوة। বিলায়াত নবূওতের থেকে উত্তম। অপর এক দল এর এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, নবীর বিলায়াত তাঁর নবূওত থেকে উত্তম। এই দুই দল নবূওতের হাকীকত তথা প্রকৃত তাৎপর্য না জানার কারণে অদৃশ্যের ওপর ফয়সালা দিয়ে বসেছে। এই ফয়সালারই নিকট-বর্তী প্রেমোন্মত্ত অবস্থাকে সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থার ওপর প্রাধান্য দেওয়াও। যদি তারা সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থার হাকীকত সম্পর্কে অবহিত হত তবে কখনোই প্রেমোন্মত্ত অবস্থাকে সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত করত না।

چه نسبت خاک را با عالم پاک

---

১. খাজা 'আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ্‌র নামে লিখিত পত্র, ২৬৬/১

২. খাজা 'আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ্‌র নামে লিখিত পত্র, ২৬৬/১;

"সম্ভবত তারা বিশিষ্ট লোকদের (elite) সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থাকে জনসাধারণের সতর্ক ও জাগ্রতাবস্থার অনুরূপ ভেবে মত্তাবস্থাকে এর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। ঠিক তেমনি বিশিষ্ট লোকদের মত্তাবস্থা (سكر) কে সাধারণ মানুষের নেশা ও মত্তাবস্থার অনুরূপ আখ্যায়িত করে একই রায় দেয়। কেননা বিজ্ঞজনদের নিকট এটা প্রমাণিত যে, সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থা মত্তাবস্থা (سكر) থেকে উত্তম। যদি সজ্ঞান, সুস্থির ও মত্তাবস্থা রূপক হয় তবুও, আর যদি আক্ষরিক অর্থেই হয় তবুও। এক্ষেত্রে অর্থের বা ব্যাখ্যার কোন হেরফের হবে না।"[১]

আম্বিয়া-ই কিরামের মর্যাদা নবূওতের কারণে

"এতটুকু অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম যা কিছু মর্যাদা ও বুযুর্গী লাভ করেছেন তা নবূওতের পথে লাভ করেছেন, বিলায়াতের পথে নয়। বিলায়াতের স্থান নবূওতের জন্য একজন খাদেমের বেশী নয়। নবূওতের ওপর যদি বিলায়াতের আদৌ কোন অগ্রাধিকার কিংবা প্রাধান্য থাকত তাহলে মালা-ই আ'লা'র (সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বতম আকাশের) ফেরেশতামণ্ডলী যাদের বিলায়াত সমস্ত বিলায়াতের তুলনায় অধিকতর কামিল—আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম থেকে উত্তম হতেন। এই দলের একটি গ্রুপ যেহেতু বিলায়াতকে নবূওতের তুলনায় উত্তম বলে মেনে নিয়েছে সেহেতু মালা-ই আ'লার বিলায়াতকে আম্বিয়া-ই কিরামের বিলায়াত থেকে পূর্ণতরো ভেবেছে এবং স্বাভাবিক কারণেই মালা-ই আ'লার ফেরেশতামণ্ডলীকে আম্বিয়া-আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়াস-সালাম থেকে উত্তম ধরে নিয়েছে বিধায় তারা জমহূর আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এসব কিছু ঘটেছে নবূওতের হাকীকত সম্পর্কে অনবধানতা ও অজ্ঞতার ফলে। যেহেতু নবূওত যুগের থেকে দূরত্বের কারণে লোকের চোখে নবূওতের কামালিয়াত বিলায়াতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ দৃষ্টিগোচর হয় সেজন্য এই বিষয়টাকে আমি এই অধ্যায়ে বিস্তৃত ও খোলাখুলিভাবে লিখলাম এবং প্রকৃত অবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ বর্ণনা করলাম।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ۔[২]

---

১. খানখানান-এর নামে পত্র, ২৬৮/১;

২. খানখানান-এর নামে লিখিত পত্র, ২৬৮/১;

"হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং কর্মে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর" (৩ ঃ ১৪৮)।

ঈমান বি'ল-গায়ব (অদৃশ্যে বিশ্বাস) আম্বিয়া-ই কিরাম, সাহাবা, উলামা এবং সাধারণ মু'মিনদের অংশ

"বাদ হাম্‌দ ও সালাত! আমার বন্ধু ও ভাই মীর মুহিব্বুল্লাহ্‌র জানা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সমুদয় গুণাবলীর ওপর অদেখা বিশ্বাস আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'ত-তাসলীমাত ও তাঁর সঙ্গী-সাথীবৃন্দের অংশ এবং সে সমস্ত আওলিয়ার যাঁরা তামাম ও কামাল (সৃষ্টিকে তাঁর পরম স্রষ্টার দিকে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে) প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁদের (পয়গম্বরদের) নিসবতও সাহাবাদের নিসবত হয়ে থাকে যদিও তা কমতরো ও অল্প। আর এই ঈমান বি'ল-গায়ব 'আলিম-উলামা ও সাধারণ মুমিনদেরও অংশ এবং ঈমানে শুহূদী সাধারণ সূফীদের অংশ—তা তারা বৈরাগ্যবাদীই হোক অথবা ভোগবাদীই। এজন্য যে, ভোগবাদী সূফীগণ যদিও প্রত্যাবর্তনকারী (مرجوع) কিন্তু তাদের প্রত্যাবর্তন (desccnd) পরিপূর্ণ হয় না। তাদের অন্তরাত্মা (باطن) তেমনি উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে সৃষ্টিজগতের সঙ্গে থাকেন কিন্তু অন্তরগতভাবে থাকেন পরম স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সঙ্গে। এজন্য সর্বদাই ঈমান-ই শুহূদী তাঁদের ভাগে পড়ে। আর আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'ত-তাসলীমাত পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে থাকেন এবং ভেতর-বাহির সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দিকে আহ্‌বান জানাতে নিবিষ্ট থাকেন, সেজন্য ঈমান বি'ল-গায়ব তাঁদের ভাগে পড়ে।"

আম্বিয়া-ই কিরামের পূর্ণ প্রত্যাবর্তন পরম মার্গে উপনীত হবার আলামত

"এই অধম তাঁর কোন কোন পত্রে প্রমাণ করেছে যে, প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও ঊর্ধ্ব পানে তাকিয়ে থাকা অপরিপক্ক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ও ত্রুটির আলামত এবং পরিণতি বা পরম সত্য অবধি না পৌঁছুবার প্রমাণ। আর পরিপূর্ণ প্রত্যাবর্তন চূড়ান্ত মার্গে উপনীত হবার আলামত। সূফীগণ উভয় তাওয়াজ্জুহ বা মনঃসংযোগ (সৃষ্টির প্রতি মনঃসংযোগ ও স্রষ্টার প্রতি মনঃসংযোগ)-এর সামগ্রিকতাকেই কামালিয়াত মনে করেছেন এবং তাশবীহ (integration) ও তানযীহ (abstraction)-র সংযোগ ও সম্মিলনকেই আধ্যাত্মিক কুশলতার পরিপূর্ণতা গণ্য করেছেন।"

ان ایشا نند و من چنینم یا رب

শরীয়তের সাহায্য-সমর্থন, ‘আকীদার সংস্কার-সংশোধন এবং শির্ক ও জাহিলী রসম-রেওয়াজ প্রত্যাখ্যান (তাসাওউফ কি?)

আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী ও সুদৃঢ়করণ, অলসতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার হাত থেকে হেফাজত এবং আত্মিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার সেই পন্থা ও পদ্ধতি —কাল-পরিক্রমায় ও সময়ের বিবর্তনে এবং কতকগুলি কারণে পরবর্তীকালে যা তাসাওউফ নামে পরিচিতি লাভ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কুরআনী পরিভাষায় "তাযকিয়া" এবং সহীহ্ হাদীসের পরিভাষায় "ইহসান"-এরই সেই ধর্মীয় শাখা যাকে কুরআন মজীদে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুনিয়ার বুকে প্রেরণের লক্ষ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রসূলরূপে যে তাদের নিকট তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (৬২ ঃ ২)।

উম্মাহর এই খেদমত এবং দীনকে তার কলব (হৃদয়) ও কাঠামো, দেহ ও আত্মা, সংবিধান ও সম্পর্ক সহকারে কায়েম রাখার দায়িত্ব অর্পিত ছিল খাত-মান্নাবিয়্যীন (সা)-এর খুলাফায়ে রাশিদীন (পুণ্যাত্মা খলীফা চতুষ্টয়) ও তাঁর সত্যপন্থী প্রতিনিধি (উলামায়ে হক)-বৃন্দের যিম্মায়। তাঁরা শরীয়তে মুহাম্মদীর সাথে এই আত্মিক রোগ-ব্যাধির এই চিকিৎসার হেফাজত ও পুনরুজ্জীবন করতে থাকেন এবং জাহিরী ফিক্‌হশাস্ত্রের সঙ্গে বাতেনী ফিক্‌হ (তাযকিয়া বা তাসাওউফ)-এর প্রচার-প্রসারেও জোর তৎপর থাকেন। তাঁদের এই কাজ বিস্তারিতের পরিবর্তে সংক্ষিপ্তে এবং খুঁটিনাটির পরিবর্তে বেশির ভাগ মূলনীতির উপর স্থাপিত ছিল। কিন্তু খেলাফত সাম্রাজ্য ও মুসলিম বিজয়ের ক্রমবিস্তৃতি, বিপুল বিস্তৃত আকারে ইসলামের প্রচার, সম্পদ ও উপায়-উপকরণ, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য, নবুওতের যুগ-যমানা থেকে দূরত্ব এবং فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ "বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল"-এরই সমার্থক, যখন শয়তানের প্রতারণা ও কলা-কৌশলসমূহ, বস্তুবাদের ফেতনা, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক রোগব্যাধি নিত্য-নতুনরূপে এবং নিত্য-নব দর্শনসহকারে আর্বিভূত হল তখন "তাযকিয়া" ও

"ইহসান"-এর শাস্ত্রও "তাসাওউফ"-এর মত নব আবিষ্কৃত পরিভাষার সাথে সেরকমই একটি সুবিন্যস্ত শাস্ত্রে পরিণত হল যেভাবে অনারব জাতিগোষ্ঠীসমূহের সংমিশ্রণে ভাষার ব্যকরণ (نحو), শব্দরূপ ও ধাতুপ্রকরণ (صرف) এবং অর্থ ও বাকভঙ্গীশাস্ত্র (معانی وبیان)-কে (যেসবের মূলনীতি ও সূচনা আরবীভাষী জাতিগোষ্ঠীসমূহের প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট ছিল) নাহ্ও ও বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র)-এর বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম শাস্ত্রে রূপান্তরিত করে দেয় এবং এসব শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ জন্ম নেওয়া শুরু হয় যাঁরা স্থায়ী মাদরাসা ও জামে'আ (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন, এ সব শাস্ত্রের জন্য স্থায়ী পাঠ্য-সূচী তৈরী করেন। অতঃপর তাঁদের দিকে এসব শাস্ত্র শিখতে ও জ্ঞান আহরণে আগ্রহী শিক্ষার্থিগণ ধাবিত হতে থাকে।

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে এই চিকিৎসা পদ্ধতির (তাযকিয়া বা তাসাওউফ যাই বলি না কেন) কর্মপরিধি কিতাব ও সুন্নাহ, রসূল (সা)-এর জীবনাদর্শের অনুসরণ, তাঁর গুণাবলী ও চরিত্রের অনুকরণকে কেন্দ্র করে ছিল। কিন্তু কালের প্রভাব, অনারব ও নওমুসলিম জাতিগোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক মেলামেশা, অনারব সাধু-সন্ন্যাসীদের সাহচর্য ও তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিণতিতে তাসাওউফের ভেতর বিদ'আত, ইবাদত ও যুহ্দ-এর বাড়াবাড়ি ও সীমাতিরিক্ততা, একক নিঃসঙ্গপ্রিয়তা ও বৈরাগ্যবাদের জীবাণু ব্যক্তি বিশেষ ও শ্রদ্ধেয় লোকদের সীমাতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রথা এবং আরও বহু ভুইফোড় কাজ-কর্ম ও প্রথা প্রবেশ করতে শুরু করে। এমন কি এই সব অনৈসলামী এবং আপাদমস্তক অপরিচিত বাইরের 'আকীদা-বিশ্বাস কোন কোন আধ্যাত্মিক মহল ও সিলসিলার মধ্যে চুপিসারে ও অত্যন্ত সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে যে, নিষ্ঠা, ঐকান্তিক মগ্নতা ও পূর্ণ একাগ্রতার সাথে একটা উল্লেখযোগ্য সময় ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা এবং ফরয ও সুন্নতসমূহের পাবন্দী করা ও ইরফান-ই কামিল তথা পূর্ণ মা'রিফত হাসিল হবার পর একটি মনযিল এমনও আসে যখন সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর শরঈ ফরয ও প্রচলিত ইবাদতের আর বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং তিনি (সালিক) ঐ সবের পাবন্দীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে যান। এরই নাম "কষ্টের অবসান" (سقوط تکلیف)। এই 'আকীদা-বিশ্বাসের লোকেরা কুরআন মজীদের বিখ্যাত আয়াত وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ "তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়" দ্বারা দলীল পেশ করে। এ ছিল এক বিরাট ফেতনা যা গোটা শরঈ নিজামকে বেকার ও অকেজো এবং সালিককে বল্গাহীন ও ইবাদত-বন্দেগীর বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিত।

অনুমিত হয় যে, হি. ৪র্থ শতাব্দী থেকেই আব্বাসী খেলাফত যখন যৌবন তারুণ্যের শীর্ষে এবং বিরাট বিরাট মুসলিম শহর আপন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছিল, বিদ'আত ও বিকৃতির এই সিলসিলা খোলাখুলিভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাসাওউফের সবচেয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ যা সেই সময় পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল তা ছিল শায়খ আবুন্নাস্‌র সিরাজ (মৃ.৩৭৮ হি.)-এর কিতাবু'ল-লাম'। এর একটি অংশের নাম[১] "কিতাবু'ল-উসওয়া ওয়া'ল-ইক'তিদা' বি রাসূলিল্লাহ (সা)। এরপর হযরত সায়্যিদ 'আলী হুজবীরী[২] (মৃ. ৪৬৫ হি.)-র "কাশফু'ল-মাহজূব" নামক গ্রন্থে সম্ভবত এরই ভিত্তিতে اقامت حقيقت بے حفظ شريعت محال ..... و حقيقت بے شريعت نفاق- এর মত সতর্কতা প্রদানকারী শব্দ উচ্চারিত হয়। ইমাম আবু'ল-কাসিম কুশায়রী (মৃ, ৪৬৫ হি.)-র "রিসালা-ই কুশায়রিয়া" নামক তাসাওউফ গ্রন্থ ছিল সবচেয়ে প্রাচীনতম পথ-নির্দেশনামামূলক গ্রন্থ ও সংবিধান। তাঁর যুগেই তাসাওউফের ভেতর এতটা অবনতি ও পতন দেখা দিয়েছিল যে, তিনি তদীয় গ্রন্থে লিখেন ঃ

وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة فعدو اقله المبالاة بالدين اوثق ذريعة .....

واستخفوا باداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلوة-

"অন্তরসমূহ থেকে শরীয়তের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ বিদায় নিয়েছে। তারা দীন সম্পর্কে বেপরোয়া মনোভাবকে একটা বিরাট নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ভেবে নিয়েছে। ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদনকে তারা গুরুত্বহীন বিষয় ঠাওরিয়েছে এবং সিয়াম পালন ও সালাত আদায়কে মামূলী ব্যাপার ভেবেছে।"[৩]

তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামই হল 'শরীয়তের প্রতি তা'জীম ও তাকরীম' সম্পর্কিত এবং এতে তিনি পূর্বকালের সূফীয়ায়ে কিরাম ও মাশাইখ-ই 'ইজাম-এর শরীয়তের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সুন্নত অনুসরণের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন। শেষ অধ্যায়ে وصية المريدين শীর্ষক শিরোনামে তিনি লিখেন ঃ بناء هذا الامر وملاكه على اداب الشريعة "এই বিষয়টির (তাসাওউফের) বুনিয়াদ ও নির্ভরশীল ভিত্তি হল শরঈ আদবের হেফাজতের উপর।"

১. কিতাবুল-লাম', পৃ. ৯৩-১০৪, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ১৯১৪।

২. পূর্ণ নাম আবুল হাসান 'আলী ইবন উছমান ইব্‌ন আবী 'আলী আল-জাল্লাবী। সাধারণভাবে তিনি দাতা গঞ্জে বখ্‌শ নামে খ্যাত। লাহোরে মাযার আছে।

৩. রিসালা-কুশায়রিয়া, পৃ. ১, মিসর সং

সমগ্র পুস্তকটি শরীয়তের হাকীকত ও বিশুদ্ধ ইল্‌ম মুতাবিক লিখিত। মুহাক্কিক সূফীগণ একে একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

তরীকতের মাশায়েখ ও হাকীকতের ইমামদের মধ্যে শরীয়তের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ও সমর্থক ছিলেন সায়্যিদুনা শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র)। তিনি তাঁর শিক্ষামালার ভেতর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন সুন্নতের পাবন্দী ও শরীয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ও অনুসরণের ওপর। আর তাঁর গোটা জীবনই ছিল এর সাক্ষাৎ নমূনা।

'গুনিয়াতু'ত-তালিবীন' লিখে তিনি তরীকতের পাড় শরীয়তের আঁচলের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। "ফুতুহু'ল-গায়ব" নামক তদীয় মাওয়াইজ গ্রন্থের দ্বিতীয় নিবন্ধ "সুন্নতের অনুসরণ ও বিদ'আত বর্জন" সম্পর্কিত। তিনি এর সূচনা করেছেন এভাবে ঃ اتبعوا ولا تبتدعوا।

"সুন্নতের অনুসরণ কর এবং বিদ'আত এখতিয়ার কর না।" তরীকতকে শরীয়তের খাদেম ও অধীনস্থ বানানোর ক্ষেত্রে তিনি মুজাদ্দিদ-এর দর্জা হাসিল করেছিলেন। তিনি প্রথমে ফরযসমূহ, এরপর সুন্নতসমূহ, অতঃপর নফলে মশগুল হবার নির্দেশনা দান করতেন এবং প্রথমটি অর্থাৎ ফরয পরিত্যাগপূর্বক অন্যগুলোতে মশগুল হওয়াকে বোকামী ও ঔদ্ধত্য বলেন।

তাসাওউফের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হল শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর (মৃ. ৬৩২ হি.) 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ যাকে তত্ত্ববিদ বিশেষজ্ঞ সূফীগণ প্রতিটি যুগেই জীবন রক্ষাকবচ বানিয়ে রেখেছেন এবং বহু খানকাহ্‌তে এর নিয়মিত দ্‌রস অনুষ্ঠিত হত। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শরীয়তের রুকনসমূহের আদব ও গুঢ় রহস্যসমূহের বর্ণনাসম্বলিত। শায়খ (র) স্বীয় গ্রন্থে উপসংহার টেনেছেন এভাবে যে, "কথায় কাজে কর্মে ও অবস্থাগতভাবে সর্বস্তরে সর্বপর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুন্নত অনুসরণের নামই হল তাসাওউফ এবং এর ওপর সর্বদা কায়েম থাকার দ্বারা তাসাওউফের অনুসারীদের নফসমূহ পাক-পবিত্র হয়ে যায়, পর্দা উঠে যায় এবং প্রতিটি জিনিষের মধ্যে রসূল (সা)-এর অনুসরণ হতে থাকে।"[১]

হি. নবম শতাব্দীতে শায়খ মুহ্য়িউদ্দীন ইবন 'আরাবী এবং তাঁর ছাত্রদের বৈদ্যুতিক প্রভাবে যা মুসলিম বিশ্বে তীব্র ও বেগবান স্রোতের ন্যায় বিস্তার লাভ করছিল, তাসাওউফ একটি দর্শনে পরিণত হয় যেখানে গ্রীক অধিবিদ্যার বহু

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন "তাসাওউফে ইসলাম", মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীকৃত।

পরিভাষা ও বিষয়গত দিক অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ওয়াহদাতু'ল-ওজুদ তাসাওউফপন্থীদের প্রতীক চিহ্ন ও গর্বের বস্তুতে পরিণত হয় এবং খানকাহ থেকে শুরু করে মাদরাসা অবধি সর্বত্র এর জয়গান গীত ও ধ্বনিত হতে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে অপরিচিতি, হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং এর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে খানকাহগুলি এমন সব 'আকীদা-বিশ্বাস ও সমূহ আমলের লীলাভূমিতে পরিণত হয় যার সনদ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহে মেলা ভার এবং যে সম্পর্কে ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলমানরা একেবারেই অপরিচিত ছিল।

এদিকে ভারতবর্ষে যা হাজারও বছর থেকে যোগ ও সন্ন্যাসের কেন্দ্রভূমি ছিল, মুসলিম সূফীদের মুখোমুখি হতে হয় সেই সব বৈরাগ্যবাদী যোগীদের যারা তাদের ধ্যান ও নফসের শক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও যোগাসনসহ বিভিন্ন আসনের মাধ্যমে খুবই বাড়িয়ে নিয়েছিল। কোন কোন মুসলিম সূফী তাদের থেকে এই জ্ঞান অর্জন করে। অপর দিকে (গুজরাট বাদে যেখানে আরব 'আলিমদের শুভাগমন এবং হারামায়ন শারীফায়ন যাতায়াতের কারণে হাদীসের প্রচার লাভ ঘটেছিল এবং 'আল্লামা 'আলী মুত্তাকী বুরহানপূরী ও তাঁর খ্যাতিমান শাগরিদ আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পাটনী জন্মলাভ করেছিলেন) এই দেশটি সিহাহ সিত্তা ও সেই সব গ্রন্থকারদের কিতাবাদি সম্পর্কে অপরিচিত ছিল যারা গলদ হাদীস ও বিদ'আত প্রত্যাখ্যানে ভূমিকা রাখেন এবং বিশুদ্ধ সুন্নত ও প্রমাণিত হাদীসসমূহের আলোকে জীবনের কর্মসূচী পেশ করেন। ভারতবর্ষের ঐসব স্থানীয় আধ্যাত্মিক দর্শন ও অভিজ্ঞতাসমূহের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া স্বীয় যুগের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় শাত্তারী শায়খ মুহাম্মদ গাওছ গোয়ালিয়ারীর জনপ্রিয় "জওয়াহিরে খামসা"-তে দেখা যেতে পারে যার বুনিয়াদ ছিল বেশীর ভাগ বুযুর্গদের বাণী ও তাঁদের অভিজ্ঞতার ওপর। মনে হয় যে, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিংবা নির্ভরযোগ্য সীরাত ও শামাইল গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করাকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। এই গ্রন্থে নামায-ই আহযাব, সালাতু'ল-'আশিকীন, নামায তানবীরু'ল-কবর এবং বিভিন্ন মাসের নির্দিষ্ট নামায ও দু'আসমূহ রয়েছে যেগুলোর হাদীস ও সুন্নাহ্ থেকে কোন প্রমাণ নেই। "জওহারে দুওম"-এ "আসমায়ে আকবারিয়্যাঃ" তথা শ্রেষ্ঠ নামসমূহ খাস শায়খ-এর সংকলিত যেগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের হিব্রু ও সুরিয়ানী নাম রয়েছে এবং আহ্বানসূচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে যদ্দ্বারা আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্যের নিকট সাহায্য কামনা করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে। দু'আ-ই বাশমাখ নামক একটি দু'আও রয়েছে যার ভেতর হিব্রু ও

সুরিয়ানী ভাষার নামসমূহ আহবানসূচক হরফ (حروف ندا) সহযোগে আছে। গোটা গ্রন্থের ভিত্তি দা'ওয়াত-ই আসমার উপর। ঐসব নামের মক্কেল মেনে নেওয়া হয়েছে তাকে যে তার আসল মাহিয়ত তথা প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত। হুরূফ-ই তাহজী এবং সেসবের মক্কেলদের আলোচনাও করা হয়েছে এবং نادِ عليا مظهر العجائب- এর দু'আও আছে।

সুন্নত ও বিদ'আত, শরীয়ত ও দর্শন এবং তাসাওউফ ও যোগ-এর এই সংমিশ্রণের যুগে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কাজ শুরু হয়। এই অবস্থার চিত্রাংকন করতে গিয়ে তিনি স্বয়ং স্বীয় মাখদূম মুরশিদতনয় খাজা 'আবদুল্লাহকে এক পত্রে বলেন ঃ

"এই মুহূর্তে পৃথিবীতে বিদ'আত এত অধিকহারে প্রকাশিত হচ্ছে যে, মনে হচ্ছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সমুদ্র আছড়ে এসে পড়ছে আর সুন্নতের আলোক-শিখা এর মুকাবিলায় এই উত্তাল তরঙ্গের মাঝে এভাবে টিমটিম করছে যেন মনে হচ্ছে যে, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে কোথাও কোথাও জোনাকী পোকা তার (ক্ষীণ) আ-লোক-রশ্মি ছড়াচ্ছে।"[১]

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই নাযুক ও সংকটময় যুগে যখন ভারতবর্ষে মুসলিম সালতানাতের হাতে ইসলামের জড়েমূলে উৎসাদন এবং খানকাহগুলোতে সুন্নতের অসম্মান করা হচ্ছিল এবং পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছিল ঃ শরীয়ত ও তরীকত দু'টো ভিন্ন জিনিষ যার রাস্তা ও রসম একে অপরের থেকে পৃথক এবং যার আইন-কানুন তথা বিধি-বিধান একে অন্যের থেকে আলাদা" এবং যেখানে কোন ইল্ম-এর অধিকারী (আলিম) ও হকের প্রার্থীকে যদি তিনি কোন বিষয়ে শরীয়তের দলীল- প্রমাণ জিজ্ঞাসা করবার হিম্মত করে বসতেন তখন তাকে এই বলে স্তব্ধ ও নিশ্চুপ করে দেওয়া হত ঃ

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغان گوید
کہ سالک بے خبر نہ بود راہ و رسم منزلہا

তখন তিনি পূর্ণ শক্তিতে আওয়াজ তোলেন যে, "তরীকত শরীয়তের অনুগত ও খাদেম। শরীয়তের কামালিয়াত হাল ও মুশাহাদার উপর অগ্রগামী। শরীয়তের একটি হুকুমের উপর আমল করা হাজার বছরের রিয়াযতের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ ও উপকারী। সুন্নতের অনুসরণে কায়লূলা (দুপুরের খাবারের পর বিছানায় একটু গড়িয়ে নেয়া) ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণের তুলনায় উত্তম। হারাম ও হালালের ক্ষেত্রে সূফী-দরবেশদের আমল দলীল নয়। এজন্য কুরআন-সুন্নাহ ও

১. মকতূব ২৩/২ মখদূম যাদা খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্র নামে।

ফক্হ গ্রন্থের দলীল থাকতে হবে। গোমরাহ ও পথভ্রষ্টদের রিয়াযত-মুজাহাদা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম নয় বরং তা দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ। শিঙ্গা বা তূরী এবং অদৃশ্য রূপ বা আকৃতি (اشكال غيبي) ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্গত। শরীয়তের দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা কখনো অপসারিত হয় না।"

এখন এরপর মকতূবাতের সেই উদ্ধৃতি পাঠ করুন যা এই সব সত্যসম্বলিত।

"শরীয়ত তামাম জাগতিক ও পরকালীন সৌভাগ্যের যামানত দেয়। কোন কাম্য ও কাংক্ষিত বস্তু এমন নেই যে, তার পূর্ণতা সাধনের জন্য শরীয়ত ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তরীকত ও হাকীকত যা সূফীদের বৈশিষ্ট্য—উভয় শরীয়তের খাদেম এবং ইখলাস অর্জনে তার সহায়ক ও সহযোগী। ঠিক তেমনি তরীকত ও হাকীকত অর্জনে লক্ষ্য কেবল শরীয়তকে তার আসল রূহ তথা প্রাণসত্তার সাথে আমলের ভেতর নিয়ে আসা, অন্য কিছু নয় যা শরীয়তের বৃত্ত বা গণ্ডি বহির্ভূত। সেসব হালত, ওয়াজ্দ-এর কায়ফিয়াত, ইলম ও মা'রিফত, যা সূফীদের সুলূকের ভেতর হাসিল হয়ে থকে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। সেগুলো কিছু সমস্যা ও ধ্যান-ধারণা যার মাধ্যমে তরীকতের পথের শিশু পথিকদের মন ভোলান এবং তাদের সাহস বাড়ানো হয়ে থাকে। এসবগুলো অতিক্রম করে রিযা বা সন্তুষ্টির মকামে উপনীত হওয়া দরকার যা মকামাত, সলূক ও জযবার চূড়ান্ত পর্যায়।"[১]

সেই একই পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী হালত ও ওয়াজ্দকে উদ্দেশ্য ও মুশাহাদা (পর্যবেক্ষণ) এবং তাজাল্লিয়াতকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে গণ্য করে। এর অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, কষ্ট-কল্পনা ও নানাবিধ ধ্যান-ধারণার কারাগারে তারা হয় বন্দী এবং শরীয়তের কামালিয়াত থেকে মাহরূম।"[২]

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ - اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ -

অপর এক পত্রে নফলের উপর ফরযের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"যেসব আমলের দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা হয়ে থাকে সেগুলো হয়ত ফরয অথবা নফল। ফরযের মুকাবিলায় নফলের কোন গুরুত্বই নেই। স্ব-

১. মুল্লা হাজী মুহাম্মদ লাহোরীর নামে পত্র, ২৬/২;

২. প্রাগুক্ত;

ওয়াক্তে কোন ফরয আদায় এক হাজার বছরের নফলের থেকে উত্তম যদিও তা খালেস নিয়তে আদায় করা হয়।"১

অপর একটি পত্রে এই প্রসঙ্গে যে, নফসের ইসলাহ তথা সংস্কার- সংশোধন এবং এর যাবতীয় রোগ-ব্যাধি দূরীকরণ ও শরীয়তের হুকুম-আহকামের ওপর আমল হাজারও রিয়াযত-মুজাহাদার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসু ও উপকারী। তিনি বলেন ঃ

"শরীয়তের হুকুম-আহকামের ভেতর থেকে কোন একটি হুকুমের ওপর 'আমল প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা দূরীকরণে হাজার বছরের সেই সব রিয়াযত ও মুজাহাদা থেকে বেশি প্রভাবশীল যা নিজের থেকে করা হয়; বরং এই রিয়াযত ও মুজাহাদা যা শরীয়তের চাহিদার প্রেক্ষিতে হয় না তা প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা ও রোগ-ব্যাধিকে আরও বেশি শক্তি জোগায়। ব্রাহ্মণ ও যোগীরা রিয়াযত - মুজাহাদার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি, কিন্তু তা তাদের জন্য কিছুমাত্র উপকারী ও ফলপ্রসূ হয় নি। নিজের নফ্স তথা প্রবৃত্তিকে অধিকতর মোটা করা এবং তাকে আরও বেশি খাদ্য ও খোরাক জোগানো ছাড়া তা আর কোন কাজে আসেনি।"

অপর এক পত্রে শরীয়তের কামালিয়তের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেনঃ

"পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ স্বপ্ন ও কল্পনায় মগ্ন এবং বাদাম ও আখরোটকেই যথেষ্ট ভেবে নিয়েছে। তারা শরীয়তের কামালিয়াতের কি খবর রাখে এবং তরীকত ও হাকীকতের প্রকৃত হাকীকত সম্পর্কেই বা কি জানে? তারা শরীয়তকে 'খোসা' এবং হাকীকতকে 'মগজ' মনে করে। তারা জানেনা যে,হাকীকতে হাল তথা অবস্থার হাকীকত কি জিনিষ। সূফীদের ভাসা ভাসা কথায় তারা ধোকায় পড়ে, প্রতারিত হয়। তারা তাদের হাল ও মকামে আসক্ত।"২

এক পত্রে একটি সুন্নতে নববীর ওপর 'আমল করার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

"ফযীলত সমগ্রটাই রসূল করীম (সা)-এর সুন্নত অনুসরণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা শরীয়তের ওপর আমল করার সঙ্গে গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। যেমন দুপুরে খাবার গ্রহণের পর একটু শোয়া যা সুন্নত পালনের নিয়তে করা হয় তা কোটি কোটি শবে বেদারী বা রাত্রি জাগরণ থেকে উত্তম

১. শায়খ নিজাম থানেশ্বরীর নামে পত্র, নং ২৯।
২. পত্র নং ৪০/১ শায়খ মুহাম্মদ চিগল্লীর নামে।

এবং যাকাতের একটি পয়সাও আদায় করা পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করা অপেক্ষা উত্তম যা নিজের পক্ষ থেকে করা হয়।"[১]

অন্য এক পত্রে বলেন ঃ

"পথভ্রষ্ট সূফীগণ যিক্‌র-ফিকরকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভেবে ফরয ও সুন্নত আদায়ের ক্ষেত্রে অলসতার আশ্রয় নেয়, চিল্লা ও রিয়াযত-মুজাহাদা এখতিয়ার পূর্বক জুমু'আ-জামা'আত পরিত্যাগ করে। তারা জানেনা যে, জামা'আতের সঙ্গে একটি ফরয নামায আদায় তাদের হাজারো চিল্লা থেকে উত্তম। তবে হাঁ, যিক্‌র-ফিক্‌র যদি শরীয়তের আদব রক্ষাপূর্বক হয় তবে তা খুবই ভাল এবং জরুরীও বটে। ত্রুটিপূর্ণ আলিমগণও নফলের প্রচলন ঘটাবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেষ্ট, কিন্তু তার ফরযগুলোকে খারাপ ও নিকৃষ্টতর রাখে।"[২]

মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে লিখিত একপত্রে বলেন ঃ

"এই দলের (সূফীদের) ভেতর একটি জামা'আত যারা সালাতের হাকীকত সম্পর্কে অবহিত এবং এর নির্দিষ্ট কামালিয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে নি। তারা নিজেদের রোগ-ব্যধির চিকিৎসা অন্য জিনিসের দ্বারা অনুসন্ধান করে এবং নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত মনে করে বরং তাদের ভেতর থেকে একটি দল নামাযকে নিষ্ফল মনে করে এবং একে অন্য ও অন্যান্যের উপর স্থাপিত মনে করে। রোযাকে নামাযের তুলনায় উত্তম বিবেচনা করে যে, এর ভেতর বেনিয়াযী তথা পরমুখাপেক্ষীহীনতা গুণের প্রকাশ রয়েছে। আর বিপুল সংখ্যক একদল লোক নিজেদের অস্থিরতার প্রশান্তি 'সামা' ও সঙ্গীত, ভাবোন্মত্ততা ও প্রেম বিহবলতার ভেতর খুঁজে বেড়ায় এবং তারা নাচ ও নৃত্যকেও কামালিয়াত ভেবে নিয়েছে। তারা কি শোনে নি যে, ما جعل الله فی الحرام شفاء "আল্লাহ্ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে শিফা তথা রোগ মুক্তি রাখেন নি!" যদি তাদের সামনে সেই সব কামালিয়াত যা নামাযের মাধ্যমে হাসিল হয় একটি অণুও প্রকাশিত হয়ে যেত তাহলে তারা সামা ও সঙ্গীতের পেছনে ছুটে বেড়াত না এবং ভাবোন্মত্ততা ও আবেশ-বিহবলতাকে স্মরণ করত না।"[৩]

چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

একস্থানে নফসের পরিচ্ছন্নতার উল্লেখ করত যা অমুসলিম এবং পাপ-পংকিলতায় লিপ্ত মুরতাদ (مرتاض রিয়াযতকারী, কঠোর তপস্যাকারী)-দের অর্জিত হয়ে থাকে – লিখছেন ঃ

১. পত্র নং ১১৪/১ সূফী কুরবানের নামে।
২ .মাখদূমযাদা শায়খ মুহাম্মদ সাদেক-এর নামে পত্র,২৬০ নং পত্র।
৩. ২৬১ নং পত্র, মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে।

"প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি নেক আমল করার উপর নির্ভরশীল যা সালিকের মর্জির মধ্যে শামিল হবে। আর এ বিষয়টি নবূওতের উপর নির্ভরশীল যেমন উপরে বলা হয়েছে। অতএব নবূওত ও রিসালত ব্যতিরেকে প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা হাসিল হতে পারে না। সেই পরিচ্ছন্নতা যা কাফির ও পাপ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরা লাভ করে তা নফসের তথা প্রবৃত্তির পরিচ্ছন্নতা—কলব তথা হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা নয়। নফসের পরিচ্ছন্নতা গোমরাহী ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করে না এবং ক্ষতির রাস্তা ছাড়া আর কোন রাস্তাও দেখায় না। বাকী কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয়ের কাশ্‌ফ যা কাফির ও পাপীদের নফসের পরিচ্ছন্নতার মুহূর্তে কখনও সখনও হাসিল হয়ে যায় তা ইস্তিদ্‌রাজ। আর এ লাভ ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে আনা ব্যতিরেকে এদলের অনুকূলে আর কিছু বয়ে আনে না।"[১]

সালিক ও 'আরিফ তথ্য আধ্যাত্মিক পথের পথিক ও সাধক শরীয়তের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত এবং ফরয ও শরীয়তের হুকুম-আহকামের আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে নিষ্কৃতি মিলবার বিপজ্জনক আকীদা যা গোটা শরঈ ব্যবস্থাপনাকে খতম করে দেবার জন্য একটি জ্বলন্ত দাহ্য বস্তুর ভূমিকা পালন করতে পারত—প্রত্যাখ্যান করে একটি পত্রে লিখছেন ঃ

"ভ্রান্ত তাসাওউফপন্থী এবং পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ)-রা এই চিন্তায় মত্ত যে, তারা তাদের গর্দানকে শরীয়তের গোলামী থেকে মুক্ত ও স্বাধীন এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধানকে জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবে। তাদের ধারণা যে, বিশিষ্ট লোকেরা কেবল মা'রিফতের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকেন, যেমন সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও সুলতান ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। তারা বলেন যে, শরীয়তের উপর আমল করার উদ্দেশ্য হল মা'রিফত হাসিল করা। যখন মা'রিফতই হাসিল হয়ে গেল তখন শরীয়তের সকল দায়-দায়িত্ব চলে গেল। তারা তাদের দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে থাকে ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"আর তুমি তোমার রব-এর ইবাদত করবে তোমার মৃত্যু (ইয়াকীন) না আসা অবধি।"

একপত্রে তিনি বলেন যে, হালাল-হারামের ক্ষেত্রে সূফী- দরবেশদের আমল দলীল নয়। তিনি লিখেন ঃ

"হালাল-হারামের ক্ষেত্রে সূফীদের আমল দলীল বা সনদ নয়। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তাদেরকে এব্যাপারে মা'যূর মনে করি, তাদেরকে ভর্ৎসনা

১. মিএরা শায়খ বদীউদ্দীন-এর নামে পত্র, ২৭৪/১ নং ;

না করি এবং তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ্ তা'আলার সোপর্দ করি। এব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ য়ূসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-র উক্তি নির্ভরযোগ্য, আবূ বকর শিবলী বা আবু'ল-হাসান নূরীর আমল নয়। এই যুগের ভ্রান্ত সূফীরা তাদের পীরের আমলকে বাহানা হিসাবে খাড়া করে নাচ-গানকে তাদের দীন ও মিল্লাত হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং একে আনুগত্য ও ইবাদত বানিয়ে নিয়েছে। اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا তারা তাদের দীনকে ক্রীড়া- কৌতুকের বিষয়বস্তু বানিয়ে রেখেছে।"[১]

মুজাদ্দিদ সাহেব-এর শরীয়তের প্রতি এই সমর্থন জ্ঞাপন অন্ধ স্বাজাত্যবোধের (حمیت) পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল এবং তিনি যখন কুরআন ও সুন্নাহ এবং জমহূর আহলে সুন্নাহ্র 'আকীদা-বিরোধী কোন সূফিয়ানা গবেষণা কিংবা হাল সম্পর্কে শুনতে পেতেন এবং এর সনদ তাসাওউফের কোন গ্রন্থ অথবা বুযুর্গদের হালত, বাণী বা উক্তি থেকে নেওয়া হত তখন তাঁরা ফারূকী শিরা-উপশিরা চঞ্চল হয়ে উঠত এবং তাঁর কলম থেকে শরীয়তের সমর্থন ও সুন্নাহ্র মর্যাদাবোধের প্লাবন উপচে পড়ত।

একবার কোন এক খাদেম জনৈক বুযুর্গ (শায়খ আবদুল কবীর য়ামানী)-এর এধরনেরই কোন বিরল ও লোমহর্ষক উক্তি নকল করেছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব এটা সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর কলম থেকে স্বত:ই নিম্নোক্ত মন্তব্য-গুচ্ছ বেরিয়ে যায় ঃ

" মখদূম! ফকীর-এর এ ধরনের কথা শোনার মত ধৈর্য নেই। এ জাতীয় কথা শুনলে আমার ফারূকী শিরা-উপশিরাগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তা ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় না, তা এধরনের কথা শায়খ কবীর য়ামানীরই হোক অথবা শায়খ আকবর শামীরই হোক। আমাদের মুহাম্মদ 'আরাবী (সা)-র কালাম দরকার, মুহয়িউদ্দীন ইবনে 'আরাবীর'[২] কালামে আমাদের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সদরুদ্দীন কৌনবী ও শায়খ 'আবদুর-রাযযাক কাশীর কালামের। আমাদের নস-এ কাজ, ফস-এ[৩] কাজ নেই ফুতূহাত-ই মদীনা আমাদেরকে ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।[৪]

---

১. খাজা আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহর নামে, পত্র নং ২৬৬/১;

২. মৃত্যু দামিশ্কে এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৩. নস' দ্বারা 'নস-ই শরঈ' এবং 'ফস' দ্বারা শায়খ আকবরের 'ফুসূসুল-হিকাম-এর বিশেষ কোন অংশ বুঝান হয়েছে।

৪. পত্র ১০০, ২য় খণ্ড, মুল্লা হাসান কাশ্মীরীর নামে;

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর মতে, শরীয়ত মুতাবিক যে আমল করা হবে তা যিক্‌র-এর অন্তর্গত। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যিক্‌র-এ মশগুল রাখা দরকার। যে 'আমলই শরীয়ত মাফিক হবে তাই যিক্‌র-এর অন্তর্গত হবে, চাই কি তা কেনা-বেচাই কেন না হোক। অতএব সর্বপ্রকার চলাফেরা ও উঠা-বসার ভেতর শরঈ হুকুম-আহকামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে তা সবই যিক্‌র-এ পরিণত হতে পারে। এজন্য যে, যিক্‌র অলসতা ও গাফিলতি দূর করারই নাম। যখন সমগ্র ক্রিয়াকলাপের ভেতর শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি রে'আয়েত করা হবে তখন রে'আয়েতকারী এর আদেশ প্রদানকারী (আল্লাহ পাক যিনি একক সত্তা), যিনি প্রকৃত নির্দেশ প্রদানকারী ও নিষেধকারী, তাঁর প্রতি অলসতা প্রদর্শনের হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং সে সার্বক্ষণিক যিক্‌র-রূপ সম্পদ লাভ করবে।"[১]

এই সমর্থন ও শরঈ মর্যাদাবোধের ভিত্তিতে মুজাদ্দিদ সাহেব তা'জীমি সিজদার উপর কঠোর সমালোচনা করেন যা কোন কোন পীর- মাশায়েখের এখ-ানে প্রচলন ঘটতে শুরু করেছিল এবং তাঁর কিছু কিছু ভক্ত মুরীদের এখানে এব্যাপারে অলসতা ও গাফিলতির খবর পেয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছিলেন।[২] অধিকন্তু শির্কমূলক কার্যকলাপ ও প্রথা-পদ্ধতি প্রত্যাখ্যানে ও নিন্দা জ্ঞাপনে (যেসব ব্যাপারে সে যুগে অলসতা ও গাফিলতি শুরু হয়ে গিয়েছিল), শেরেকী প্রথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রর্থনা ও প্রয়োজন পূরণের শেরেকী 'আকীদা, কাফির মুশরিকদের পালা-পার্বনের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং তাদের রসম-রেওয়াজ ও আদব-অভ্যাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণ, বুযুর্গদের জন্য জীবন্ত পশু উৎসর্গ করা ও যবাহ করা, পীর ও তাদের বিবির নিয়তে রোযা রাখা, প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা জ্ঞাপনের ব্যাপারে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ব্যাখ্যাও প্রকাশ্য সতর্কবাণী সেই সব সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত পত্রসমূহে দেখা যাবে যা তাঁরই মুরীদ একজন নেককার মহিলার নামে তিনি লিখেছিলেন।[৩]

এই আকীদার সংস্কার-সংশোধন, শির্ক ও বিদ'আত প্রত্যাখ্যান এবং নির্ভেজাল দীনের প্রতি দাওয়াত প্রদান সেই মহান পুনর্জাগরণমূলক কাজ ছিল যা দীর্ঘকাল পর হযরত মুজাদ্দিদ (র) ভারতবর্ষের মাটিতে শুরু করেছিলেন (যার

১. পত্র ২৫, ২য় খণ্ড, খাজা মুহাম্মদ শরফুদ্দীন হুসায়ন-এর নামে;

২. দ্র. পত্র ৯২, ২য় খণ্ড , মীর মুহাম্মদ নু'মান ও পত্র ২৯, ২য় খণ্ড, শায়খ নিজামুদ্দীন খানেশ্বরীর নামে;

৩. পত্র ৪১ ৩য় খণ্ড بصالحه از اهل ارادت

মুসলিম জনবসতি অমুসলিম সংখ্যাধিক্যের ভেতর ঘেরাও এবং ইসলামের প্রাথমিক কাল হবার দরুন শির্কমূলক জাহিলিয়াতের বিপদাশংকা দ্বারা সর্বদা সন্ত্রস্থ ছিল), অতঃপর এর পূর্ণতা ও বিস্তৃতি সাধন তাঁরই সিলসিলার খ্যাতনামা মাশায়েখ হাকীমুল-ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দেহলভী ও তাঁর পরিবার[১] এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) ও তাঁর জামা'আত বক্তৃতা ও লেখনী, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা, কুরআন-হাদীসের তরজমা এবং স্বীয় ব্যাপক বিস্তৃত তবলীগী সফরের মাধ্যমে করেছিলেন।

সুন্নাহর প্রচলন এবং বিদ'আতে হাসানার প্রত্যাখ্যান

এমন কোন জিনিষ যা আল্লাহ ও রসূল দীনের অন্তর্ভুক্ত করেন নি এবং যা করবার জন্য হুকুমও দেননি তা দীনের ভেতর শামিল করে নেওয়া, তার একটি অংশে পরিণত করা এবং তা ছওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য করা, এর মনগড়া শর্ত ও আদবসমূহ বাধ্যতামূলক মেনে চলা–যেভাবে শরীয়তের একটি হুকুমকে মেনে চলা হয় –তাই বিদ'আত। বস্তুতপক্ষে বিদ'আত হল আল্লাহর দীনের ভেতর মনুষ্য- রচিত শরীয়ত গড়ে নেওয়া। এই শরীয়তের পৃথক ফিক্‌হশাস্ত্র রয়েছে, আরও রয়েছে স্থায়ী ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ যা কোন কোন সময় শরীয়তে ইলাহীর সমান্তরাল এবং কোন কোন সময় সংখ্যা ও গুরুত্বে তাকেও ছাড়িয়ে যায়। বিদ'আত এই সত্যকে উপেক্ষা করে যে, শরীয়ত পূর্ণতা পেয়েছে, যা নির্ধারিত হবার ছিল তা নির্ধারিত হয়ে গেছে, যেগুলো ফরয ও ওয়াজিব হবার ছিল সে সব ফরয ও ওয়াজিব বানানো হয়ে গেছে। দীনের টাকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন যদি কোন মুদ্রাকে উক্ত টাকশালের বলা হয় তবে তা হবে জাল মুদ্রা। ইমাম মালিক (র) কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة فان الله سبحانه يقول "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ" فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا -

"যে ব্যক্তি ইসলামের কোন বিদ'আতের জন্ম দেয় এবং একে সে ভাল মনে করে সে প্রকারান্তরে একথারই ঘোষণা দেয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম (না'উযু বিল্লাহ) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত

১. যার ভেতর তাঁর খ্যাতনামা পৌত্র মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (মৃ. ১২৪৬ হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

করেছেন। এজন্য যে, আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, "আজ আমি তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম।" অতএব যা রিসালত ও নবূওত যুগে দীন ছিল না তা আজও দীন হতে পারে না।"

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত শরীয়তের বৈশিষ্ট্য হল এর সহজ- সাধ্যতা এবং প্রতিটি যুগে এর কার্যোপযোগিতা, আর তা এজন্য যে, শরীয়ত প্রদাতা যিনি তিনি মানুষের স্রষ্টাও বটেন। তিনি মানুষের প্রয়োজন, তার প্রকৃতি এবং তার শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।"

সূরা মুলক, ১৪ আয়াত;

এজন্য শরীয়তে ইলাহী ও আসমানী শরীয়তে এসব কিছুরই অবকাশ রয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন নিজেই শরীয়ত প্রদাতা হয়ে যাবে তখন সে এসবের ভেতর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে না। বিদ'আতের মিশ্রণ এবং সময় সময় বুদ্ধির দীন এতটা কঠিন, জটিল ও দীর্ঘ হয়ে যায় যে, লোকে বাধ্য হয়ে এধরনের ধর্মের শেকল গলা থেকে খুলে ফেলে এবং وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই)-এর নে'মত ছিনিয়ে নেয়া হয়। এর নমুনা সে সব ধর্মের ইবাদত, প্রথা-পদ্ধতি, ফরয ও ওয়াজিবসমূহের দীর্ঘ তালিকা-সূচীতে দেখা যাবে যেসব ধর্মে বিদ'আত স্বাধীনভাবে তার কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।

দীন ও শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর বিশ্বব্যাপী একই রকম হওয়া। তা প্রতিটি যুগে ও প্রত্যেক কালে একই থাকে। দুনিয়ার কোন অংশের কোন মুসলমান অধিবাসী দুনিয়ার অন্য যে কোন অংশেই যাক তার দীন ও শরীয়তের উপর আমল করতে কোন বেগ পেতে হবে না। তাকে স্থানীয় কোন দিক-নির্দেশনা ও পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন পড়বে না। এর বিপরীতে বিদ'আতের ভেতর একই রূপ ও ঐক্য পাওয়া যায় না। বিদ'আত প্রতিটি জায়গায় স্থানীয় ছাঁচ এবং রাষ্ট্রীয় কিংবা শহরের টাকশাল থেকে মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসে আর তা হয় বিশেষ ঐতিহাসিক ও স্থানীয় কার্যকারণ এবং একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের ফল। এজন্য প্রতিটি দেশ বরং এর থেকেও সামনে অগ্রসর হয়ে কোন কোন সময় এক একটি প্রদেশ এবং এক একটি শহরের বিদ'আত, এরপর মহল্লা ও ঘরসমূহের ধর্মীয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ এসবেরই সঙ্গে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। আর এভাবেই শহরে শহরে ও ঘরে ঘরের দীন ভিন্ন হতে পারে।

এই সব চিরন্তন ও বিশ্বজনীন স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে বিদ'আত থেকে বাঁচার ও সুন্নতের হেফাজতের জন্য কঠোর তাকীদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন ঃ

من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"যে আমাদের দীনে নতুন কিছুর উদ্ভাবন কিংবা প্রবর্তন ঘটাবে যা এতে ছিল না তা রদ ও বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اياكم والبدعة فان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فی النار ۔

"বিদ'আত থেকে বাঁচ! কেননা সব রকমের বিদ'আতই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার নামান্তর আর সব রকমের গোমরাহীর পরিণতি হল জাহান্নাম।"

তিনি বিজ্ঞসুলভ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন ঃ

ما احدث قوم بدعة الا رفع بها مثلها من السنة

"যখন কোন জাতিগোষ্ঠী দীনের ভেতর নতুন কোন কিছুর উদ্ভাবন ঘটায় তখন এর পরিণতিতে সমপরিমাণ সুন্নত অবশ্যই উঠে যাবে।"

সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের পর আইম্মায়ে 'ইজাম ও ইসলামের ফকীহ-বৃন্দ, স্ব-স্ব যুগের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকগণ এবং উলামায়ে রব্বানী সর্বদাই আপন আপন কালের বিদ'আতের কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছেন এবং ইসলামী সমাজ ও ধর্মীয় মহলে ঐ সব বিদ'আত গৃহীত হবার ও প্রচলন ঘটার থেকে বাধা দেবার সাধ্য মত তাঁরা চেষ্টা করেছেন। এসব বিদ'আতের ভিতর সাধারণ মানুষ ও সরল বিশ্বাসী লোকদের যেই চুম্বক আকর্ষণ সব যুগেই থেকেছে এবং এথেকে সেই সব পেশাদার ও দুনিয়াদার ধর্মীয় দল-উপদল ও লোকের যেই সব ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত রয়েছে যার ছবি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের এই বিস্ময়কর আয়াতে এঁকেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔

"হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে।" সূরা তাওবা. ৩৪ আয়াত;

এর দরুন তাঁদেরকে তীব্র বিরোধিতা ও কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এর পরওয়া করেন নি এবং একে তাঁরা তাঁদের যুগের জিহাদ ও শরীয়তের হেফাজত এবং দীন তথা ধর্মকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচাবার পবিত্র কর্তব্য মনে করেছেন। বিদ'আতের এই সব বিরোধীরা এবং সুন্নতের পতাকাবাহিগণ স্বীয় যুগের সাধারণ গণমানুষ এবং সাধারণের মত বিশিষ্ট লোকদের পক্ষ থেকে "অনড় ও স্থবির", "কল্পনাপূজারী" "ধর্মের দুশমন" ইত্যাদির ন্যায় খেতাব লাভ করেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁরা এর পরওয়া করেননি। তাঁদের এই মৌখিক ও কলমী জিহাদ, হক প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের উৎসাদন প্রয়াসের ফলে বহু বিদ'আত এভাবে খতম হয়ে গেছে যে, সে সবের উল্লেখ কেবল সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসেই রয়ে গেছে আর যেগুলো এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে সে সবের বিরুদ্ধে হক্কানী (সত্যনিষ্ঠ) উলামায়ে কিরাম এখনও সংগ্রামে লিপ্ত।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَال صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ - وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً -

"মু'মিনদের ভেতর কতক আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই।" সূরা আহযাব, ২৩ আয়াত;

এই ব্যাপারে সবচে' বড় ভ্রান্তি ছিল বিদ'আতে হাসানার ভ্রান্তি। লোকে বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছিল ঃ বিদ'আতে সায়্যি'আঃ ও বিদ'আতে হাসানাঃ। তারা বলত যে, সব ধরনের বিদ'আতই বিদ'আতে সায়্যি'আঃ হয় না। বিদ'আতের অনেকগুলোই বিদ'আতে হাসানা তথা উত্তম ও কল্যাণকর বিদ'আত যা হাদীসে ব্যবহৃত كل بدعة ضلالة অর্থাৎ "প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী"-এর ব্যতিক্রম ও আওতামুক্ত।[১]

১. ঐ সব লোকের সবচে' বড় দলীল হযরত ওমর (রা)-এর উক্তি যা তিনি জামা'আত সহকারে তারাবীহ্ আদায়কারীদের দেখে করেছিলেন, نعمت البدعة هذه "এ বড় সুন্দর বিদ'আত।" অথচ সকলেই একমত যে, এখানে আভিধানিক অর্থেই একে বিদ'আত বলা হয়েছে। নইলে তারাবীহ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সে সব হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের। বিদ'আতের সংজ্ঞার জন্য ইমাম শাতিবীর الاعتصام بالسنة। এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদের ايضاح الحق الصريح فى احكام الميت والضريح শীর্ষক দু'টি এ বিষয়ক সর্বোত্তম পুস্তক, পাঠ করা দরকার।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) বিদ'আতের এই ধরনের ভাগ-বণ্টন এবং বিদ'আতে হাসানার বিরুদ্ধে যেই সর্বশক্তি প্রয়োগে জিহাদী পতাকা তুলে ধরেন, যেই আস্থা, শক্তি ও তাত্ত্বিক যুক্তি-প্রমাণ সহকারে একে প্রত্যাখ্যান করেন তার নজীর বহু দূর অবধি এবং বহুকাল অবধি পাওয়া যায় না। এপ্রসঙ্গে মকতূবাতের কতিপয় উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে।

সুন্নতে নববীর প্রচলন ও প্রচার-প্রসারের উৎসাহ এবং বিদ'আত উৎখাতের প্রেরণা দিতে গিয়ে স্বীয় মখদূমযাদা খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে লিখিত এক পত্রে বলেন ঃ

"এটা সেই সময় যখন হযরত খায়রু'ল-বাশার (সর্বোত্তম মানব অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং কিয়ামতের আলামতসমূহ জাহির হওয়া শুরু হয়ে গেছে–নবূওত যুগের দূরত্বের কারণে সুন্নত প্রচ্ছন্ন এবং যেহেতু মিথ্যা ও প্রতারণার যুগ, বিদ'আত প্রচলিত ও গৃহীত হচ্ছে, তখন কোন শ্যেনপক্ষী শাহবাযের প্রয়োজন যিনি সুন্নতের সাহায্য-সমর্থন করবেন এবং বিদ'আতকে পরাজিত করবেন ও পশ্চাতে নিক্ষেপ করবেন। বিদ'আতের প্রচলন দীনের ধ্বংসের নামান্তর এবং কোন বিদ'আতীকে সম্মান জ্ঞাপন ইসলামের প্রাসাদ-সৌধকে ধ্বসিয়ে দেবার সমার্থক। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে ঃ

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

"যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান প্রদর্শন করল সে ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করল।"

"পূর্ণ দৃঢ়তা, অটুট সংকল্প ও হিম্মতের সাথে এদিকে মনোযোগ দেবার দরকার রয়েছে যে, সুন্নতের ভেতর থেকে কোন্ সুন্নতের প্রচলন ঘটাতে হবে এবং বিদ'আতের ভেতর থেকে কোন্ বিদ'আতের উৎসাদন করতে হবে। একাজ সব সময়েই জরুরী ছিল। কিন্তু ইসলামের দুর্বলতার এই যুগে যখন ইসলামী প্রথাসমূহের প্রতিষ্ঠা সুন্নতের প্রচলন ও বিদ'আতের ধ্বংসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, এ কাজ আরও জরুরী হয়ে গেছে।"

এরপর তিনি একই পত্রে বিদ'আতের ভেতর কোন প্রকারের ভাল দিক রয়েছে কিংবা এর ভেতর সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে এই রূপ ধারণার এবং বিদ'আতে হাসানার ব্যাখ্যা ও পরিভাষার বিরোধিতা করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"অতীতের লোকদের ভেতর কেউ কেউ বিদ'আতের ভেতর কিছু কিছু ভাল দেখতে পেয়েছেন যে, বিদ'আতের কোন কোন প্রকারকে তারা ভাল বলে

অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই গরীব এই মাস'আলার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে একমত নন। গরীব কোন বিদ'আতকেই 'হাসানা' মনে করে না এবং এক্ষেত্রে অন্ধকার ও পংকিলতা ভিন্ন কিছুই তার অনুভূত হয়না। নবী করীম (সা) বলেন ঃ كل بدعة ضلالة "প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী।"[১]

অপর এক পত্রে যা তিনি মীর মুহীববুল্লাহকে আরবীতে লিখে ছিলেন —বলেন,

"বুঝতে পারি না যে, লোকে কোথা থেকে এমন কোন কাজের ভাল হবার ফয়সালা করল যা ইসলামের ন্যায় পরিপূর্ণ দীন এবং আল্লাহর পসন্দনীয় ও মকবূল ধর্মের ভেতর নে'মতের পূর্ণতা দানের পর আবিষ্কার করা হয়েছে। তাদের কি এই মোটা কথাটা জানা নেই যে, পরিপূর্ণতা, পূর্ণাঙ্গতা ও কবুলিয়াত দানের পর কোন দীনের ভেতর কোন কিছু নতুন উদ্ভাবন করা হলে তার ভেতর ভাল বা সুন্দর হতে পারে না? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَل "সত্যের পর গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী থাকে?"

"যদি তারা এটা জানত যে, পরিপূর্ণ দীনের ভেতর কোন নবোদ্ভূত ও নতুন সৃষ্ট বস্তুর ভাল হবার পক্ষে ফয়সালা দান তার অপূর্ণতা ও অপূর্ণাঙ্গতারই মেনে নেবার নামান্তর এবং একথার ঘোষণা যে, নে'মত এখনও পূর্ণ হয় নাই তবে তারা কখনোই এর দুঃসাহস করত না।"[২]

অপর এক পত্রে এই ব্যতিক্রমের উপর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ (দীনের ভেতর) যখন প্রতিটি নবোদ্ভূত ও নতুন উদ্ভাবিত বস্তুই বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আতই যখন গোমরাহী তখন কোন বিদ'আতে ভাল পাবার কী অর্থ? আর হাদীসে যখন পরিষ্কারভাবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিদ'আতই সুন্নত উঠিয়ে নেয় এবং এতে কোনরূপ নির্দিষ্টতা নেই তখন এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, প্রতিটি বিদ'আতই সায়্যি'আ:। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة

"যখন কোন সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠী দীনের ভেতর নতুন কিছুর উদ্ভাবন ঘটায় তখন এর ফলে সমপরিমাণ সুন্নত উঠিয়ে নেওয়া হয়। অতএব বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটাবার চেয়ে সুন্নত আঁকড়ে থাকা অনেক ভাল।"

হযরত হাসসান (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى

১. পত্র নং ২৩, ২য় খণ্ড, মখদুমযাদা খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহর নামে।

২. পত্র নং ১৯, ২য় খণ্ড, মীর মুহিবুল্লাহ্র নামে।

يوم القيمة-

"যখনই কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের দীনে কোন বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটাবে তখন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সেই সব সুন্নতের ভেতর থেকে কোন সুন্নত, যার উপর তারা 'আমল করত, ছিনিয়ে নেবেন। এরপর কিয়ামত অবধি আর তা ফিরিয়ে দেবেন না।"

জানা দরকার যে, কোন কোন বিদ'আত যেগুলোকে উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখগণ হাসানা মনে করেছেন যখন সেগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয় তখন মনে হয় সেগুলোও সুন্নত উত্তোলনকারী।

একই পত্রে বিদ'আতে হাসানার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করত তিনি লিখছেন ঃ

"লোকে বলে যে, বিদ'আত দুই প্রকার ঃ বিদ'আতে হাসানা ও বিদ'আতে সায়্যি'আ:। সেই নেক আমলকে বিদ'আতে হাসানা বলা হয় যা রিসালত যুগে ও খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে পরে জন্ম হয়েছে এবং যার কারণে কোন সুন্নত উঠে যায় না কিংবা বিদায় নেয় না। আর বিদ'আতে সায়্যি'আ: তাই যা সুন্নত উঠিয়ে দেয়। এই গরীবের ঐ সব বিদ'আতের ভেতর কোন বিদ'আতেই ভাল ও নুরানিয়াত চোখে পড়ে না এবং এতে সে অন্ধকার ও পংকিলতা ছাড়া কিছু অনুভব করে না। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, আজ কোন বিদ'আতী আমলের ভেতর দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার দরুন সজীবতা ও পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ছে, তাহলে কাল যখন দৃষ্টিশক্তি তার প্রাখর্য ও তীক্ষ্ণতা ফিরে পাবে তখন লোকসানের অনুভূতি ও লজ্জা ছাড়া আর কিছু মিলবে না।

بوقت صبح شود هم چوروز معلومت
که با که باخته عشق در شب دیجور

সায়্যিদু'ল-বাশার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد -

"যারা আমাদের দীনে এমন কোন কিছুর প্রবর্তন বা উদ্ভাবন ঘটায় যা এর মূলে ছিল না তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হিসেবে গণ্য হবে।"১

এই সব বিদ'আতে হাসানার ভেতর যা সে যুগে প্রচলন ঘটছিল অন্যতম ছিল মীলাদ মাহফিল। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মহত্তর সম্পর্কের কারণে একে বিদ'আত বলা ও এর বিরোধিতা করা খুবই নাযুক ও কঠিন কাজ ছিল। এর

১. পত্র নং ১৮৬, ১ম খণ্ড, খাজা আবদুর রহমান মুফতী কাবুলীর নামে।

ফলে জনগণের ভেতর ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়া এবং একে বেআদবী ও (রসূলুল্লাহর প্রতি) ভালবাসার কমতি হিসাবে ধরার আশংকা ছিল। কিন্তু মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র অন্তর মানস এব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃশংক ও দ্বিধামুক্ত ছিল যে, যে জিনিসের অস্তিত্ব খায়রু'ল-কুরূন যুগে নেই তাতে দীনের তরক্কী ও উম্মতের কল্যাণ নেই। কাল-পরিক্রমায় এতে বিভিন্ন রকমের ফাসাদের আশংকা রয়েছে। তাঁকে খোলাখুলিভাবে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে যে, যদি মীলাদ মাহফিল অবারিত হওয়া থেকে মুক্ত হয় তাহলে এতে ক্ষতি কি? জওয়াবে তিনি বললেন ঃ

"মাখদূম! গরীবের মাথায় যা আসছে তাতে যতক্ষণ পর্যন্ত এর দরজা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া না হবে কামনা পূজারীরা এর থেকে বিরত হবে না। এর জায়েয হবার অনুকূলে যদি বিন্দুমাত্র ফতওয়াও দেওয়া হয় তাহলে তা ক্রমান্বয়ে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে (তা কে জানে)!"[১]

قليلة يفضى الى كثيرة

এভাবেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র বিচক্ষণ ও সাহসী পদক্ষেপ (বিদ'আতের সাধারণ বিরোধিতা এবং বিদ'আতে হাসানার অস্তিত্ব সম্পর্কে মতভেদ)-এর ফলে একটি বিরাট বিপদাশংকার প্রতিরোধ এবং একটি বড় রকমের ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার দ্বাররুদ্ধ হয়ে যায় যা গায়র মুহাক্কিক আলিমদের সমর্থন,খানকাহগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ও সুধারণা, আমীর-উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সোৎসাহী সমর্থনের কারণে মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করে চলেছিল।

فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء

---

১. প্রাগুক্ত।

২. পত্র নং ৭২, ৩য় খণ্ড, খাজা হুসসামুদ্দীনের নামে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ অথবা ওয়াহ্‌দাতু'শ-শুহূদ

শায়খ আকবর মুহ্‌য়ি-উদ্দীন ইবন 'আরাবী ও ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ

প্রথম যুগের সুফীদের মুখ থেকে, যাঁরা আল্লাহ্-প্রেমে আত্মবিভোল হতেন, এমন সব উক্তি প্রকাশিত হয়েছে যদ্দারা ওয়াহদাতু'ল -ওজূদ মতবাদ প্রমাণিত হয়। এঁদের ভেতর বিখ্যাত শায়খ ও আরিফ হযরত বায়াযীদ বোস্তামীর (যিনি তরীকতের অধিকাংশ সিলসিলার শ্রেষ্ঠতম শায়খ) উক্তি ঃ سبحانی ما اعظم شانی "আমারই গৌরব! আমার মর্যাদা কত বিরাট!" ও لیس فی جبتی الا الله "আমার জুব্বার ভেতর আল্লাহ্ ভিন্ন কিছু নেই" এবং হুসায়ন ইবন মনসূর হাল্লাজ-এর "আনা'ল-হক" বিশেষভাবে মশহূর।

কিন্তু শায়খ মুহয়িউদ্দীন ইবন আরাবী (ম. ৬৩৮/১২৪০ হি) যিনি 'শায়খ-এ আকবর' নামে জগদ্বিখ্যাত–এই মতবাদের মুজাদ্দিদ ও সর্বশেষ ব্যক্তি এবং জ্ঞানগত তথা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এর প্রতিষ্ঠাতা ও ভিত্তি স্থাপনকারী এবং তাঁরই আমল থেকে এর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তা সূফীদের ভেতর মৌসুমী প্রভাবের মত দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে শক্তিশালী থেকে শক্তিশালীতরো মেযাজও সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে নি। এমনকি তা রুচিশীল ও বিদগ্ধ গবেষকদের প্রতীক চিহ্নে এবং তাদের বিশ্বজনীন উক্তিতে পরিণত হয় এবং একে অস্বীকার করা নিজের মুর্খতার প্রমাণ দেওয়া ও সূফী মরমীদের মাহফিলে অপরিচিত ও ছেলেমানুষ ঘোষণার সমার্থক ছিল। মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র ভাষায় ঃ

"তিনি এভাবে তাঁর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদসমূহ নির্ধারণ করেন যেভাবে 'ইলমে নাহ্ও ও সার্ফ-এ নিয়ম রয়েছে।"[১] শায়খ আকবর-এর নিকট ওয়াহদাতু'ল-ওজূদের হাকীকত কি এবং তিনি তা কিভাবে পেশ করেন, এর ওপর কি সব দলীল-প্রমাণ কায়েম করেন এবং তাকে কিভাবে ধ্রুব সত্য, একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কাশ্ফ ও মুশাহাদার ব্যাপারে বানিয়ে দেন এবং তা কিভাবে একটি স্থায়ী দর্শন ও একটি স্কুলে পরিণত হল, এর ওপর এতবড় লাইব্রেরী তৈরী হয়ে গেল যার মোটামুটি ও সামগ্রিক খতিয়ান নেবার জন্যও একটি বৃহৎ আকারের দফতর

১. পত্র নং ৮৯, ৩য় খণ্ড, কাযী ইসমাঈল ফরীদাবাদীর নামে।

প্রয়োজন। বক্ষ্যমান পুস্তকে এর প্রাসঙ্গিক ও সামগ্রিক আলোচনাও কঠিন বৈকি। যেহেতু দর্শন ও তাসাওউফের সূক্ষ্ম পরিভাষাসমূহ জানা জরুরী এবং যেহেতু এর বাতেন তথা অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক ভ্রমণ ও সুলূক (আধ্যাত্মিক রাস্তা)-এর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে তা আয়ত্ত্ব করা কঠিন। পাঠকদের ভেতর যেসব সুধী একে তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে আগ্রহী তারা শায়খ আকবর-এর বিখ্যাত রচনা "ফতূহাত-ই মাক্কিয়্যা" ও "ফুসূসু'ল-হিকাম" পাঠ করতে পারেন।[১] হযরত মুজাদ্দিদ (র) ওয়াহদাতু'শ-শুহূদ প্রমাণ করতে গিয়ে দীর্ঘ সব পত্র লিখেছেন। এ সব পত্রে শায়খ আকবরের মতবাদকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, যেভাবে তিনি এর সংক্ষিপ্ত-সার পেশ করেছেন ও এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন তা থেকেও এই মতবাদ, এর লক্ষ্য ও মর্ম অনুধাবনে সাহায্য পাওয়া যাবে। এর প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি এই নিবন্ধের স্বস্থানে আসবে।

আমরা এখানে লাখনৌর আল্লামা 'আবদু'ল-আলীর, যিনি বাহরু'ল-'উলূম নামে পরিচিত ও খ্যাত (মৃ. ১২২৫ হি.), ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ নামক পুস্তিকার কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি। লেখক দর্শন শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের এক অতল সমুদ্র হবার সাথে সাথে শায়খ আকবরের ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ মতবাদের একজন ব্যাখ্যাতা ও মুখপাত্র এবং তাঁর রচনাবলী, বিশেষত "ফতূহাতে মাক্কিয়্যা ও ফুসূসুল-হিকাম"-এর ডুবুরী ও সাতারু ছিলেন। এই সব উদ্ধৃতি কিছুটা হলেও শায়খ আকবরের মর্জি ও অভিরুচি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। যদিও এর মধ্যেও এমন কতগুলো পরিভাষা ও ব্যাখ্যা রয়েছে যে সম্পর্কে তারাই অবহিত যারা এ বিষয়ে সূফীদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে পরিচিত। এর থেকে অধিক সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যাখ্যা আমরা পাইনি বিধায় আমরা এর সাহায্য নিয়েছি।

"আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিরেকে যা কিছু আছে তা হয়ত বিভিন্ন অবস্থা নয়ত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসমূহের জগত। সর্বপ্রকার অবস্থা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসমূহ তাঁর মূর্ত প্রকাশ ও বিকাশ। তিনি এ সবের মধ্যে বিকশিত ও প্রকাশিত। তাঁর এই বিকাশ সেরূপ নয় হুলুল মতবাদে বিশ্বাসিগণ যার বিশ্বাস করে থাকে কিংবা সেরূপও নয় যেরূপ ইত্তিহাদ" মতবাদে বিশ্বাসিগণ বর্ণনা করে বরং এই বিকাশ সেই বিকাশের মত যা গণনার সংখ্যায় এক। গণনার সমস্ত সংখ্যা এক ভিন্ন আর কিছু নয়। সমগ্র বিশ্ব-জগতে একমাত্র সত্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আধিক্যের ভেতর তিনিই প্রকাশিত। আপন সত্তায় তিনি অধিক নন। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তার অস্তিত্ব থেকেই

১. এ বিষয়ে সৈয়দ শাহ্ আবদুল কাদির মেহেরবান ফাখরী ময়লাপুরী (মৃ. ১২০৪ হি.) اصل الاصول في بيان مطابقة الكشف بالمعقول والمنقول নামক গ্রন্থের অধ্যয়ন উপকারী এবং এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহরই সত্তা এই সব কিছুতে প্রকাশিত। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন; আল্লাহ যাবতীয় শরীক থেকে মুক্ত ও পবিত্র।"

"আল্লাহ্ তা'আলার নাম ব্যতিরেকে কোন প্রকাশমান বস্তুই প্রকাশিত হয় না। সেই পবিত্র নাম চাই কি তানযীহি (সর্বোৎকৃষ্ট, যাবতীয় দোষত্রুটি ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত অতি প্রাকৃত) অথবা তা তাশবীহি (অন্তর্বাসী ও পরিব্যাপ্ত) হোক। এখন এই সব নাম যখন তার প্রকাশের বেলায় ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে প্রকাশমান বস্তুর ওপর নির্ভরশীল এবং এগুলো ব্যতিরেকে যখন তার পূর্ণতা কল্পনাই করা যায় না তখন আল্লাহ তা'আলা জগতের আ'য়ান অর্থাৎ মূল ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহকে অস্তিত্ব দান করেন যাতে সেই সব বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ তাঁর প্রকাশস্থল হতে পারে এবং তাঁর নামসমূহের পূর্ণতা পুরোপুরি প্রকাশিত হতে পারে।"

আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি সত্তার পূর্ণতার ব্যাপারে অকাট্য রূপেই বেনিয়ায ও প্রাচুর্যের অধিকারী। কিন্তু নামসমূহের পূর্ণতার মর্যাদায় জগতের বাহ্যিক অস্তিত্ব থেকে বেনিয়ায নন। হাফিজ শীরাযী বলেন ঃ

پر تو معشوق گرافتاد بر عاشق چه -

ما بدو محتاج بوديم او به مسا مشتاق بود -

অর্থাৎ যদি মা'শূক তথা প্রেমাস্পদের ছায়া ও প্রতিবিম্ব 'আশিক তথা প্রেমিকের ওপর পড়ে যায় তো কি হল, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী ছিলাম এবং তিনি আমাদের জন্য পাগলপারা।

একথাটাই একটি হাদীসে কুদসী দ্বারা আরো বেশি প্রমাণিত হয়।

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق -

অর্থাৎ (আল্লাহ্ বলেন) "আমি ছিলাম এক গুপ্ত ভাণ্ডার। অনন্তর আমি চাইলাম আমি পরিচিত হই। অতঃপর আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলাম যাতে আমার প্রকাশ ঘটে আর সৃষ্টিজগত আমার প্রকাশস্থল হয় ও প্রকাশস্থল হয় আমার নামসমূহের।"

"যারা দুই সত্তার তথা দুই অস্তিত্বের সমর্থক যার একটি আল্লাহ্র অস্তিত্ব আর একটি আকস্মিক ও দৈব ঘটনার (ممكن) তারা অন্যায় করছে, শিরক করছে আর তাদের এই শির্ক হল শির্ক-ই খফী। আর যারা এক অস্তিত্বের সমর্থক তারা বলেন যে, অস্তিত্ব কেবল আল্লাহ্র। তিনি ব্যতিরেকে আর যা কিছু আছে তা তাঁর প্রকাশ এবং তাঁর প্রকাশের আধিক্য তিনি যে এক তার পরিপন্থী নয়। তবে এই ব্যক্তি মুওয়াহহিদ তথা তৌহীদবাদী।

"তোমরা প্রকৃত ও যথার্থ সত্তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নও। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ম্ভূ সত্তা আর তোমরা সীমিত ও নির্ধারিত গণ্ডীতে আবদ্ধ। আর নির্ধারিত গণ্ডীতে আবদ্ধ সত্তা কখনোই স্বয়ম্ভূ সত্তা হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, তোমরা নিজেদের হাকীকতের দিক দিয়ে যথার্থ সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভেতর নির্দিষ্ট হয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে যথার্থ অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের ভেতর নির্ধারণ ও সীমিতকরণের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন এবং নির্ধারণের বাধ্য-বাধকতা থেকে যুক্ত পাচ্ছ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে নির্দিষ্ট ও সীমিত বস্তুর ভেতর প্রকাশিত দেখতে পাচ্ছ। لا موجود الا الله لا اله الا الله লা আল্লাহ্ ভিন্ন কিছুর অস্তিত্ব নেই, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই, নেই কোন মা'বূদ।"[১]

এই মতবাদের প্রভাব শায়খ-ই আকবরের যমানার পর এতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল যে, বলা যেতে পারে, সূফী-দরবেশ, দার্শনিক ও কবিদের শতকরা নব্বই ভাগই এই মস্‌লার প্রবক্তা অথবা এর প্রভাবে ভীত হয়ে এর সমর্থকে পরিণত হয়। শায়খ-এর সঙ্গে মতানৈক্য পোষণকারীদের ভেতর অধিকাংশই ছিলেন মুহাদ্দিছ, ফকীহ এবং সেই সব 'আলিম-উলামা' যাঁদেরকে উলামায়ে জাহের বলা হয়। এঁদের ভেতর হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী, আল্লামা সাখাবী, আবূ হায়্যান মুফাসসির, শায়খুল ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইবন আবদুস-সালাম, হাফিজ আবূ যুর'আ, শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন আল-বুলুক্কীনী, মুল্লা আলী কারী, 'আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (র)-র মত খ্যাতনামা 'আলিম ও শাস্ত্রবিদ ছিলেন।

এসব হযরত যদিও তাঁদের জ্ঞান ও মনীষা, কুরআন-সুন্নাহ্র ওপর ব্যাপক-বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, ছিলেন বহু অগ্রসর, কিন্তু দুই -একজন বাদে তাসাওউফ-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধিতাকে الناس اعداء ما جهلوا। "মানুষ যা জানে না তার দুশমনে পরিণত হয়"-এর সাধারণ মূলনীতির আওতায় ফেলে বিচার করা হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া এবং
ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ আকীদার বিরোধিতা ও সমালোচনা

ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ মতবাদের বিরোধিতার সবচে' বড় পতাকাবাহী এবং এর ওপর কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ও এর প্রভাব ও ফলাফলের আলোকে যা নিকটকালে এই মতবাদ ও গবেষণা-অনুসন্ধান পরিচালনের ফলে সূফীমহলে ও সর্বসাধারণের ভেতর জাহির হওয়া শুরু হয়েছিল, সমালোচনা, পর্যালোচনা এবং এর সমাধান ও নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে শায়খুল ইসলাম তাকিয়্যুদ্দীন হাফেজ ইবনে

---

১. বাহরু'ল-উলূম আল্লামা আবদুল আলী আনসারী লাখনবীকৃত "ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ" নামক পুস্তিকা, অনু, মাওলানা শাহ যায়দ আবুল হাসান ফারুকী মুজাদ্দিদী, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন প্রকাশিত দিল্লী ২৯-৫৬ পৃ.।

তায়মিয়া (র)-র (৬৬১-৭২৮ হি.) নাম সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল। তিনি শায়খ-ই আকবরের ওফাতের (৬৩৮ হি.) তেইশ বছর পর জন্ম নেন। শায়খ-ই আকবরের যে শহরে ইনতিকাল হয় (দামিশকে) এবং যেই শহরে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত সেখানেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লালিত-পালিত ও বর্ধিত হন, লেখাপড়া শেখেন, বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করেন, তত্ত্বগত ও মানসিক পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেন। তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি যখন সাবালকত্বের সীমায় পৌঁছে এবং তিনি যখন পরিবেশ ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর সমালোচনামূলক দৃষ্টিক্ষেপণ করার যোগ্যতা লাভ করলেন তখন শায়খ-ই আকবরের ইনতিকাল ৪০-৪৫ বছরের বেশি অতিক্রম করেনি। মিসর ও সিরিয়া (শাম)-র পরিবেশ তাঁর তাত্ত্বিক দুর্লভ গবেষণার কল-কোলাহলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান (মা'রিফত)-এর পানশালা তাঁর একত্ববাদের স্বাদে মাতাল ছিল। মিসরে শায়খ আবুল-ফাত্‌হ নসর আল-মুনজী ছিলেন শায়খ আকবর (ইবনু'ল-'আরাবী)-এর কট্টর ভক্তদের অন্যতম এবং সাম্রাজ্যের প্রধান সচিব ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক রুকনুদ্দীন বায়বার্স আল-জাশনগীর ছিলেন শায়খ নসর আল-মুনজীর ভক্ত ও মুরীদ। সিরিয়ায় যেমন ঠিক তেমনি অধিকাংশ আরব দেশগুলোতে শায়খ আকবরের পুস্তকাদি, বিশেষত "ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যা" ও "ফুসূসু'ল-হিকাম" সাধারণভাবে হাতে হাতে ঘুরত এবং লোকে তা পড়ে মাথা দোলাত। স্বয়ং ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রা) স্বীকার করেছেন যে, ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যা, কুনহুল মুহকাম, আল-মারবূত, আদ-দূর্রুল ফাখিরা, মাতালি'উন-নুজূম প্রভৃতি গ্রন্থে বেশ ভাল জ্ঞানগত ও তত্ত্বগত উপকারিতা ও পয়েন্ট পাওয়া যায়। শায়খ আকবরের মতবাদের ধারক-বাহকদের ভেতর ইবন সাব'ঈন, সদরুদ্দীন কৌনবী (যিনি শায়খ-ই আকবরের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি শাগরিদ ছিলেন), বিলাইয়ানী ও তিলিমসানী বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এই পুরো দলের ভেতর শায়খ আকবরকেই সকলের ওপর অগ্রাধিকার দেন। এর ফলে জানা যায় যে, তিনি ইনসাফ ও যাচাই-বাছাইয়ের আঁচল একেবারে পরিত্যাগ করেন নি এবং কুরআনী নির্দেশ ঃ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل "আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি কর তখন ন্যায়-বিচার করবে"—এর ওপর আমল করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"এঁদের ভেতর ইবন আরাবীরই অবস্থান ইসলামের কাছাকাছি এবং তাঁর কথাবার্তা অনেক ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে ভাল। কারণ তিনি মাজাহির ও জাহির অর্থাৎ প্রকাশ পাবার স্থানসমূহ ও প্রকাশিতের ভেতর পার্থক্য করেন এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানসমূহকে আপন জায়গায় অনড় রাখেন। মাশায়েখ 'ইজাম যেসব আখলাক ও ইবাদতের প্রতি তাকীদ প্রদান করেছেন তা এখতিয়ার করার পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য বহু সূফী-দরবেশ তাঁর কথা থেকে আধ্যাত্মিকতা

তথা রূহানিয়াত গ্রহণ করে থাকেন যদিও তাঁরা সে সবের হাকীকত ভালভাবে উপলব্ধি করেন না, বোঝেন না। তাদের ভেতর যারা এসবের হাকীকত বোঝেন এবং সে সবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন তাদের ওপর তাঁর কথার তাৎপর্য প্রকাশিত হয়।"[১]

অপর এক জায়গায় একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মুসলমান সম্পর্কে সুধারণা পোষণ এবং তাঁর সম্পর্কে নিজের মতামত পেশের যিম্মাদারীর নাযুকতা অনুভব করে লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তাঁর (ইবনে 'আরাবীর) সমাপ্তি তথা ইনতিকাল কিসের ওপর হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমান নারী-পুরুষ জীবিত কিংবা মৃত সকলকে ক্ষমা করুন।

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم -

"হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর আর ক্ষমা কর আমাদের সেই সব ভাইদের যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" (সূরা হাশ্‌র, ১০ আয়াত)

ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ আকীদার চরমপন্থী প্রচারক এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

কিন্তু মনে হয় যে, এই গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিশেষ মেযাজ ও স্বাদ-এর খোলামেলা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা এবং এর শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যুৎসাহ ও অতি আগ্রহ এবং এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন না করার দরুন স্বয়ং সিরিয়ায়, যা ছিল দীনী 'ইল্‌ম-এর বিরাট কেন্দ্র এবং মিসরের মুসলিম তুর্কী হুকূমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ– এক ধরনের মানসিক ও নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। লোকে শরীয়ত, জ্ঞান-বুদ্ধি ও নীতি-নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করতে চলেছিল এবং এক ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতি মুসলিম সমাজে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। জনৈক বিজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি ঃ মূলে নয় ফলে বৃক্ষের পরিচয়। ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ আকীদার বৃক্ষ যেভাবে ফলে-ফুলে সুশোভিত হতে যাচ্ছিল তা একজন শরীয়ত সমর্থক ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আলিম ও দাঈর জন্য উদ্বেগের বিষয় ও সমালোচনার পাত্র ছিল।

---

১. শায়খ নসর আল-মুনজীর নামে শায়খুল ইসলামের পত্র, জালাউল-'আয়নায়ন. পৃ. ৫৭।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বর্ণনা করেন (এবং তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অত্যন্ত সংযত ও সতর্ক) যে, তিলিমসানী (যিনি এই মা'রিফাতের জ্ঞানে সবার চেয়ে অগ্রণী) ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের কেবল সমর্থকই নন বরং বাস্তবে এর নিষ্ঠাবান অনুসারীও ছিলেন। তিনি মদপান করতেন এবং অবৈধ ও নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত থাকতেন (সত্তাই যখন একজন তখন আর হালাল-হারামের পার্থক্য কেন?)। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখছেন ঃ

"আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তিলিমসানীর নিকট 'ফুসূসু'ল-হিকাম'-এর দরস গ্রহণ করতেন এবং একে আল্লাহর ওলী-'আরিফদের কালাম মনে করতেন। তিনি যখন 'ফুসূস' পড়লেন এবং দেখতে পেলেন যে, এর বিষয়বস্তু তো কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট বিরোধী, তখন তিনি তিলিমসানীকে বললেন যে, এই কালাম তো কুরআনের বিরোধী। তিনি (তিলিমসানী) জওয়াব দিলেন যে, কুরআন তো গোটাটাই শির্ক দ্বারা ভর্তি। এজন্য যে, সে (কুরআন) রব ও আব্‌দ-এর মাঝে পার্থক্য করে। তাওহীদ তো আমাদের কালামে আছে। তার এ ধরনের উক্তি রয়েছে যে, "কাশ্‌ফ দ্বারা সে সব বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যা সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি (আক্‌ল) বিরোধী"।

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"এক ব্যক্তি, যে তিলিমসানী ও তার ধ্যান-ধারণার সাথী ছিল, সমর্থক ছিল–আমাকে স্বয়ং শুনিয়েছেন যে, আমরা একবার এক মরা কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যার গায়ে ছিল ঘা। তিলিমসানীর সাথী তাকে লক্ষ করে বলল, "এও কি খোদাওয়ান্দ-এর যাত।" তিলিমসানীর জওয়াব ছিল, "কোন বস্তু কি তাঁর সত্তার বাইরে? হ্যাঁ, সব কিছুই তাঁরই সত্তার ভেতর।"

তিনি তাঁর অপর গ্রন্থ الرد الا قوم على فصوص الحكم-এ বলেন ঃ

"কেউ কেউ যখন জিজ্ঞেস করল যে, যখন ওজূদ এক তখন স্ত্রী কেন হালাল আর মা হারাম? এই পণ্ডিত উত্তরে বলেছিল যে, আমাদের কাছে সব এক। কিন্তু ঐ সব মাহজূবীন (যারা তাওহীদে হাকীকী সম্পর্কে অজ্ঞ ও অপরিচিত) বলল যে, মা হারাম। আমরাও বললাম যে, হ্যাঁ, তোমাদের (মাহজূবীনদের) ওপর হারাম।"

এটা বলা যায় না যে, এ ধরনের দুঃসাহসী কথাবার্তা ও উক্তি, সব কিছুই মুবাহ্‌র ধারণা এবং নৈতিক ও চারিত্রিক নৈরাজ্য ও অরাজকতার যিম্মাদারী শায়খ-ই আকবর-এর মত মুহাক্কিক আরিফের ওপর কিংবা তাঁর সব গ্রন্থের ওপর ফেলা যায় যিনি ছিলেন সুন্নতের কঠোর পাবন্দ, একজন আবেদ, যাহেদ, রিয়াযতকারী, মুজাহিদ, কঠোর কঠিন আত্মসমালোচক, শয়তানের চক্রান্ত ও কৌশল এবং নফসের প্রতারণা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁর এখানে এ ধরনের দুয়েকটি

চরম বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা পাওয়া যায় যদদ্বারা সূচকে ফাল বানাবার মত লোকদের হাতে দরকারী মাল-মসলা এসে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঃ

"মূসা (আ)-এর যুগে গো-বৎস পূজারীরা বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্‌র পূজা-অর্চনাই করেছিল। মূসা (আ) যে হারূন (আ)-কে সমালোচনা করেছিলেন তা মূলত এজন্য যে, তিনি গো-বৎস পূজার (যা মূলত আল্লাহ্‌র পূজাই ছিল আর তা এ জন্য যে, সর্বময় অস্তিত্ব তো একই) বিরোধিতা কেন করলেন? তাঁর মতে, মূসা (আ) সেই সব ওলী-'আরিফদের অন্তর্গত ছিলেন যাঁরা প্রতিটি জিনিসের ভেতর 'হক'-এর মুশাহাদা (পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ) করতেন এবং তাকে প্রতিটি বস্তুর যথার্থ প্রতিচ্ছবি মনে করতেন। তাঁর মতে, ফিরআওন তার দাবি انا ربكم الاعلى-এর ব্যাপারে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেননা সে প্রতিচ্ছবি ছিল। ফির'আওন যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে হুকূমতের অধিকারী ছিল, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল আর তাই সে 'সাহেবে হক' ছিল বিধায় সে সঙ্গতভাবেই انا ربكم الا على "আমি তোমাদের সর্বোত্তম প্রভূ" বলেছিল। কেননা যখন সকলেই কোন না কোনভাবে 'রব' বা প্রভূ-প্রতিপালক তখন আমি তাদের ভেতর সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। কেননা বাহ্যিকভাবে আমাকে তোমাদের ওপর হুকূমত করার ও তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন ঃ তারা বলে যে, যাদুকরেরা যখন ফির'আওনের দাবির সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারল তখন তারা তার বিরোধিতা করেনি, বরং তা স্বীকার করে নিয়েছে এবং বলেছে যে, اقض ما انت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا "তোমার যা ফয়সালা করবার তা করে ফেল; তুমি এই জগতে নির্দেশ দেবার, ফয়সালা করবার ক্ষমতা রাখ।" এজন্যই ফিরআওনের এ কথা বলা অত্যন্ত সঙ্গত ছিল যে, আনা রাব্বুকুমু'ল-আ'লা–"আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক।" তারা হযরত নূহ (আ)-এর ওপর সমালোচনা করে এবং তাঁর অবিশ্বাসী কওমকে যথার্থ ও সঠিক পথের পথিক ও সম্মানের পাত্র বলে মনে করে যারা পাথর পূজা করত। তারা বলে যে, ঐসব পাথর পূজারী আসলে আল্লাহ্‌র-ই ইবাদত করেছিল আর নূহ (আ)-এর তুফান ও প্লাবন মূলত মা'রিফাতে ইলাহীরই সয়লাব ছিল, ছিল উত্তাল তরঙ্গ যার ভেতর তারা নিমজ্জিত হয়েছিল"।[১]

আর এর দরুন এমন বহু আরিফ ও মাশায়েখ যারা শায়খ-ই আকবরকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার ওলী-আরিফ জ্ঞান করতেন এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র মকবূল

---

১. শায়খ আকবরের এসব উক্তি الرد الاقوم على فصوص الحكم এবং الفرق بين الحق والباطل থেকে গৃহীত এবং ইমাম তায়মিয়া "ফুসূসুল-হিকাম" থেকে এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এখানে এ কথা উল্লেখ করা জরুরী যে, শায়খ আকবরের জ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের এক দল মনে করেন যে, শায়খ রচিত গ্রন্থাদি বিশেষত "ফুসূসুল-হিকাম"-এ প্রচুর সংযোজন ও পরিবর্ধন ঘটানো হয়েছে।

বান্দাদের অন্তর্গত মনে করতেন তারা স্ব-স্ব ভক্ত মুরীদ ও অনুসারীদেরকে ঐসব কিতাবাদির সাধারণ অধ্যয়নের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। 'আন-নুরু'স-সাফির' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার শায়খ মুহয়িউদ্দীন আবদুল কাদির ঈদরূসী তদীয় শায়খ আল্লামা বাহরুক থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুর্শিদ সেকালের বুযুর্গ শায়খ আবূ বকর 'ঈদরূসী বর্ণনা করেছেন যে, আমার মনে পড়ে না, আমার আব্বা (শায়খ আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর হাদরামী) আমাকে কখনো মেরেছেন কিংবা তিরস্কার করেছেন। একবারই কেবল এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল আর এর কারণ ছিল এই যে, তিনি আমার হাতে শায়খ-এ আকবর-এর 'ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যাঃ'-র একটি খণ্ড দেখেছিলেন। দেখার পর তিনি খুবই রাগান্বিত হন। সেদিনের পর থেকে আর কখনো সে বই আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করিনি। তিনি বলতেন যে, আমার আব্বা শায়খ-এর "ফুতূহাত" ও "ফুসূস" নামক বই দু'টো পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কিন্তু একই সাথে শায়খ-এর প্রতি সুধারণা পোষণের জন্যও তাকীদ করতেন এবং এই বিশ্বাস পোষণের জন্যও বলতেন যে, তিনি আল্লাহ্র একজন শ্রেষ্ঠতম ওলী ও আরিফ ছিলেন।[১]

ভারতবর্ষে ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ আকীদা

অষ্টম শতাব্দীতে যখন এই আকীদা-বিশ্বাস ভারতবর্ষে আগমন করে তখন এর আগমনের হেতু ছিল এই যে, ভারতীয় উপমহাদেশ নিজেই এই মতবাদ ও দর্শনের প্রাচীনতম উৎসাহী সমর্থক ও প্রবক্তা ছিল এবং সূফী দর্শনের কতক ঐতিহাসিকের মতে, ইসলামের সূফিয়ায়ে কিরাম যারা ইরান, ইরাক ও মাগরিবে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাওহীদে ওজূদীর সবক ভারতবর্ষ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের পরও কোনরূপ বিরতি ছাড়াই এই ভূখণ্ড এই মতবাদ ও দর্শনের পতাকাবাহী "হামাউস্ত"-এর সমর্থক এবং আর্য সমাজের মেযাজ ও চিন্তা-চেতনা, তাদের ধর্ম ও দর্শনের (যা সেমিটিক জাতিগোষ্ঠী এবং আম্বিয়া-ই কিরামের জন্মভূমিতে সৃষ্ট ধর্মসমষ্টির বিপরীতে নির্ধারণ ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত ও পলায়নপর এবং ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ ও 'ওয়াহদাতে আদয়ান' তথা 'সর্বেশ্বরবাদ' ও 'সব ধর্মই সত্য'–এই মতবাদের সমর্থক) প্রায়োগিকতার কারণে এই চিন্তাধারা আরও বেশী গভীর ও নতুন পত্র-পুষ্প পল্লবে রূপ নেয়। এখানে এসে এই দর্শন ও মতবাদ স্থানীয় চিন্তা-চেতনার সঙ্গে মিশ্রিত ও সমন্বিত হয়ে এক নতুন উদ্দীপনা ও এক নতুন দর্শন ও চিন্তাধারার জন্ম দেয়। এখানকার সূফীদের এক বিপুল সংখ্যককে এই মতবাদের সমর্থক, ধারক-বাহক ও প্রবক্তা হিসেবে দেখা যায়। এঁদের ভেতর বিশেষভাবে চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার প্রখ্যাত বুযুর্গ শাহ আবদুল কুদ্দূস গঙ্গুহী (মৃ. ৯৪৪ হি./১৫৩৭ খৃ.), শায়খ আবদুর রাযযাক

১. আন-নূরু'স-সাফির, ৩৪৬ পৃ.।

ঝিনঝানুভী (মৃ. ৯৪৯ হি./১৫৪২ খৃ.), শুকুরবার নামে খ্যাত শায়খ আবদুল আযীয দেহলভী (মৃ. ৯৭৫ হি./১৫৬৮ খৃ.), শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ফাদলুল্লাহ বুরহানপুরী (মৃ. ১০২৯ হি./১৬২০ খৃ.) এবং শায়খ মুহিবুল্লাহ ইলাহাবাদী (মৃ. ১০৫৮ হি./১৬৪৮ খৃ.) প্রত্যেকেই স্ব-স্ব যুগের ও কালের ইবনে আরাবী এবং স্ব-স্ব শহর নগরের ইবনে ফারিদ (মৃ. ৬৩১ হি./১২৩৪ খৃ.) ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র কিছু পূর্বের কিংবা তাঁর সময়ের কাছাকাছি অথবা লাগোয়া যুগের খ্যাতনামা বুযুর্গ ছিলেন।

শায়খ আলাউদ্দৌলা সিমনানীর ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ মতবাদের বিরোধিতা

ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত মনীষী ও আলিম-উলামা ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বিরোধিতা করেছিলেন এবং যারা শায়খ আকবর মুহিয়উদ্দীন ইবনু'ল-'আরাবীর সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ইলমে জাহিরীতে পণ্ডিত হলেও ইলমে মা'রিফাত ও হাকীকত, আধ্যাত্মিক জগতের রিয়াযত ও মুজাহাদা, এর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্যসমূহ ও এর হাকীকত তথা তত্ত্বজ্ঞান, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও এর রুচি-প্রকৃতি সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ ও অপরিচিত। এজন্যই এই চিন্তা-চেতনার অনুসারীরা তাদের সমালোচনাকে এই বলে উপেক্ষা করতেন যে,

لذت نشناسی بخداتا بخشی এবং چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

সর্বপ্রথম যেই তত্ত্বজ্ঞানী আরিফ বিশেষভাবে ও গুরুত্ব সহকারে এই মতবাদের সমালোচনা করেন ও একে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি হলেন শায়খ রুকনুদ্দীন আবুল মাকারিম আলাউদ্দৌলা সিমনানী।[১]

আলাউদ্দৌলা আস-সিমনানী (৬৫৯-৭৩৬/১২৬১-১৩৩৬) খুরাসানের সিমনান নামক স্থানে একটি ধনী ও বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের সদস্যরা সরকারে ও প্রশাসনের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শায়খ নূরুদ্দীন 'আবদুর রহমান আল-কাসরাকী আল-ইসফারাইনীর নিকট কুবরাবী তরীকায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান হাসিল করেন এবং এজাযত লাভ করেন। তিনি শায়খ আকবর মুহয়ি উদ্দীন ইবনু'ল-'আরাবীর ওয়াহ্‌দাতুল-ওজূদ মতবাদের বিরুদ্ধে অতঃপর অব্যাহতভাবে বিতর্ক চালিয়ে যান এবং স্বীয় পত্রাবলীর ভেতর নানা জায়গায় এর আলোচনা করেন। তাঁর মতে, আধ্যাত্মিক পথের পথিকের (সালিক) সর্বোচ্চ

১. মকতূবাতে ইমাম রব্বানী, ৮৯ নং পত্র, ৩য় খণ্ড।

মনযিল তাওহীদ নয়, বরং 'উবূদিয়াত। তাঁর বাণীসমষ্টি তদীয় মুরীদ ইকবাল ইবন সালিক সীস্তানী সংকলন করেন যার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি "চিহ্‌ল মজলিস" বা "মালফূজাত-এ শায়খ 'আলাউদ্দৌলা আস-সিমনানী" প্রভৃতি নামে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে বিদ্যমান। জামীর "নাফাহাতুল-উন্‌স", পৃ. ৫০৪-১৫-এর অধিকাংশ অংশই এসব মালফূজাতের ওপর ভিত্তি করেই রচিত।[১]

ওয়াশহ্‌দাতুশ-শুহূদ

আমাদের জানা-শোনা মুতাবিক এমন দু'জন নামকরা ব্যক্তিত্ব গুজরে গেছেন যাঁদের কাছে ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ মতবাদের সমান্তরাল ওয়াহ্‌দাতু'শ-শুহূদ মতবাদের আলোচনা ও সেদিকে ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। এ দু'টোর ভেতর রুচি ও এ্যাপ্রোচগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেবল একটি ক্ষেত্রে ঐক্য বিদ্যমান আর তা হল সৎ নিয়্যত, সত্যের প্রতি অন্বেষা এবং ইখলাস তথা ঐকান্তিক নিষ্ঠা যার ওপর হেদায়েতের দরজা উন্মুক্ত হবার কুরআনী প্রতিশ্রুতি রয়েছে ঃ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "আর যারাই আমার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব" (আল-কুরআন ২৯ ঃ ৬৯)। তন্মধ্যে একজন হলেন শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া যিনি ছিলেন মূলত একজন মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুতাকাল্লিম। দ্বিতীয়জন হলেন মাখদূমুল মুল্‌ক শারাফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনয়ারী (র) যিনি ছিলেন মূলত একজন ওলী-আরিফ, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও তাসাওউফের ইমাম। প্রথমোক্ত জনের লিখিত "আল-'উবূদিয়াহ" নামক গ্রন্থ থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, তিনি ওয়াহ্‌দাতু'শ-শুহূদ মতবাদের গলি-খুপচী সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং এই হাকীকত সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন যে, সালিক তথা আধ্যাত্মিক পথের পথিক তার অধ্যাত্ম সাধনার পথে এই মকামের সম্মুখীন হন এবং তা আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম ও তাঁদের পূর্ণ অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম প্রমুখের মা'রিফাতের তুলনায় নিম্নস্তরের, কিন্তু ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদের মকাম থেকে উন্নত ও উচ্চতর।[২] কিন্তু যেহেতু এটা তাঁর আসল ময়দান ছিল না বিধায় এতদসম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থেকেছেন।

কিন্তু মখদূম বিহারী (মৃ. ৭৮২/১৩৮০) তদীয় মকতূবাতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানী গবেষণার আলোকে বলেন যে, "সাধারণভাবে যাকে ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ এবং আল্লাহ ভিন্ন আর সকল অস্তিত্বের শুধু নিশ্চিহ্ন ও পরিপূর্ণ ধ্বংস মনে করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে ওজূদে হাকীকী বা প্রকৃত সত্তার অস্তিত্বের সামনে অন্যান্য

১. Meir লিখিত নিবন্ধ, দা.মা.ই।

২. দেখুন رسالة العبودية ৮৫-৮৮ পৃ., وما النوع الثانى فهو الغناء عن شهود السوى।

অস্তিত্বশীল বস্তুর এমনভাবে নিষ্প্রভ ও পরাভূত হয়ে যাওয়া যেমন সূর্যের প্রদীপ্ত রৌশ্নীর সামনে তারকারাজির আলো নিষ্প্রভ এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তার অস্তিত্ব গুরুত্বহীন হয়ে যায়।" তিনি দু'টো শব্দে এই হাকীকত এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

نا بودن دیگر ونا دیدن دیگر

অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্বহীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এক জিনিস আর দৃষ্টিগোচর না হওয়া অন্য জিনিস। তিনি আরও বলেন যে, "এটা এমন একটি নাযুক ও সঙ্গীন স্থান যেখানে অনেক বড় বড় লোকেরও পদস্খলন ঘটে গেছে এবং যেখানে একমাত্র আল্লাহ্‌র তওফীক ও খিযির (আ)-এর মতো কামিল ওলীর পথ-প্রদর্শন ও নেতৃত্ব ব্যতিরেকে হাকীকতের সংকীর্ণ পথের ওপর কায়েম থাকা কঠিন।"

একজন নতুন সংস্কারকের প্রয়োজন

কিন্তু এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করবার জন্য এবং এ ব্যাপারে দালীলিক পূর্ণতা দানের জন্য এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যিনি আধ্যাত্মিক পথের দুরূহ ও কণ্টকাকীর্ণ সফর করেছেন এবং এর উচ্চতর মনযিলসমূহ অতিক্রম করেছেন, হাকীকত সমুদ্রের যিনি ডুবুরী, রূহানী সমুদ্রের দক্ষ সাতারু, যিনি সেই সব বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং এর উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হাকীকতের উপকূলে উপনীত হয়েছেন, যিনি কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে তার অস্তিত্বই নেই বলে একে দলীল বানাবেন না বরং নিজের চোখে দেখা একজন লোক এবং একজন বুলন্দ হিম্মত ও সমুন্নত দৃষ্টির অধিকারী মুসাফির (পর্যটক)-এর ন্যায় পূর্ণ আস্থার সঙ্গে চোখে দেখার মত এই বলে দেবেন যে, তৌহীদে উজূদীর সম্পর্ক যতটা তাতে

ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے اگاہ

ادھر سے مدتوں ایا گیا ہوں

"এই গলির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে আমি অবহিত; বহুকাল আমি এ পথে আসা-যাওয়া করেছি।"

কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলবেন,

ستاروں سے اگے جہاں اور بھی ہیں

"নক্ষত্রপুঞ্জের পরে আরও জগত রয়েছে।"

ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ-এর সিলসিলায় এ পর্যন্ত এর পক্ষে ও বিপক্ষে তিনটি মত রয়েছে ঃ

১. ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ-এর পরিপূর্ণ গ্রহণ ও স্বীকৃতি এবং একথা মেনে নেওয়া যে, তা এক অবধারিত সত্য এবং গবেষণা ও আধ্যাত্মিক মার্গের সর্বশেষ মনযিল বা চূড়ান্ত ধাপ।

২. ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ মতবাদ পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান এবং এ কথা মেনে নেওয়া যে, এ মতবাদ কল্পনাপ্রসূত, খেয়ালী শক্তির কার্যকারিতা এবং অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে আর কিছু নয়।

৩. ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের সমান্তরাল ওয়াহ্দাতু'শ-শুহূদ মতবাদের দর্শন এবং এটা যে, বাস্তবে আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালিক)-এর যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় মূলত তা نفس الامرى প্রকৃত বাস্তব।

তা এ নয় যে, ওজূদ এক এবং ওয়াজিবু'ল-ওজূদ ব্যতিরেকে সব ওজূদ মূলত নিষ্প্রভ ও অস্তিত্বহীন, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মওজূদাত স্বীয় স্থানে বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ওয়াজিবু'ল-ওজূদের উজূদে হাকীকীর নূর তার ওপর এমনভাবে পর্দা ফেলে দিয়েছে যে, তা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যেভাবে সূর্য উদিত হবার পর এর তীব্র আলোকরশ্মির সামনে নক্ষত্রপুঞ্জ ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে যায় এও ঠিক তেমনি। এমতাবস্থায় যদি কেউ বলে বসে যে, নক্ষত্রপুঞ্জের কোন অস্তিত্বই নেই তবে সে মিথ্যাবাদী হবে না। ঠিক তেমনি বিশাল সৃষ্টিজগত সেই পরিপূর্ণ ও হাকীকী সত্তার সামনে এমনি মূল্যহীন দৃষ্টিগোচর হয় যেন আদতে তার কোন অস্তিত্বই নেই।

মুজাদ্দিদ আলফেছানীর (র)-র অবদান

মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) এই তিন মতবাদের মুকাবিলায় চতুর্থ মতবাদ এখতিয়ার করেন। তাঁর মতে, ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালেক)-এর সায়র ও সলূকের একটি মনযিল। সাধনা পথে অগ্রসর হবার কালে সে প্রত্যক্ষ করে যে, সেই পরম প্রভু ও পরিপূর্ণ সত্তা ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই, যা কিছু আছে তা একই অস্তিত্ব। বাকী যা কিছু তা সবই তাঁর 'একই বস্তুর বহু আংগিকে ও বহু রূপ-বর্ণে আত্মপ্রকাশ (تلوينات وتنوعات) অথবা শায়খ আকবর ও তাঁর মতবাদী আরিফীনদের মতে, অনুগামী বহিঃপ্রকাশ (تنزلات)।

কিন্তু তৌফীক-এ ইলাহী যদি সঙ্গী হয় আর শরীয়তের প্রদীপ শিখা যদি হয় পথ-প্রদর্শক এবং আধ্যাত্মিক পথের পথিকের হিম্মত যদি বুলন্দ হয় তাহলে দ্বিতীয় মনযিলও সামনে এসে দেখা দেয় আর সেটা হল ওয়াহদাতু'শ শুহূদ-এর মনযিল।

এভাবেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ (যা কয়েকশ বছর যাবত সুযোগ্য সালেকীন ও আরিফীনের এবং সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী পণ্ডিত ও

দার্শনিকদের মতবাদ হিসেবে চলে আসছিল) প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর সর্বাপেক্ষা বড় প্রবক্তা ও ভাষ্যকার শায়খ-এ আকবর মুহ্য়িউদ্দীন ইব্ন 'আরাবীর (যাঁর জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব, সূক্ষ্মদর্শিতা ও রহস্যজ্ঞান এবং রূহানী কামালিয়াত অস্বীকার করা কঠিন) উচ্চ মর্তবা, আল্লাহ্র নিকট মকবূলিয়াত ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা (ইখলাস) অস্বীকার না করেও বরং উচ্চ কণ্ঠে তা স্বীকার করেও এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করেন এবং একটি নতুন অর্জন ও প্রাপ্তির ঘোষণা দেন যা একদিকে জমহূর মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তে হক মুতাবিক, অপর দিকে তা পেছনের দিকে টেনে নেবার এবং এক বিরাট দলের জ্ঞান ও গবেষণা একেবারে উড়িয়ে দেবার পরিবর্তে এমন একটি বিষয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন যদ্দারা শরঈ নস্, অকাট্য মূলনীতি সিয়ারে আনফুস ও আফাক-এর সর্বশেষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও গবেষণার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ

এই ভূমিকার পর হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর কতকগুলো উন্নতমানের পত্রের (যা তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য) উদ্ধৃতি পাঠ করুন।

স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ওয়াহদাতুল-ওজূদ মতবাদ থেকে ওয়াহদাতুশ-শুহূদ পর্যন্ত-উপনীত হবার হালত সম্পর্কে তাঁরই একজন সম্পর্কিত ভক্ত শায়খ সূফী'কে এক পত্রে লিখেছেন ঃ

"মাখদূম ও মুকার্রাম! অল্প বয়স থেকেই এই অধমের আকীদা-বিশ্বাস ছিল তওহীদবাদীদের আকীদা-বিশ্বাস। অধমের শ্রদ্ধেয় পিতাও বরাবর দৃশ্যত একই আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত তরীকার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।... সেই প্রবাদ অনুসারে যে, ابن الفقيه نصف الفقيه "ফকীহ্র পুত্রও আধা ফকীহ্ হয়ে থাকেন।" অধমও সেই নিসবতে জ্ঞানগত ও তত্ত্বগতভাবে পিতার সূত্রে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ লাভ করেছিল। আর সে এতে বড়ই স্বাদ ও মজা পেত। এমনকি আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা কেবলই আপন ফযল ও করমে হাকীকত ও মা'রিফত সম্পর্কে অভিজ্ঞ মুওয়ায়্যিদুদ্দীন শায়খে রাশেদ, আল্লাহ্র পথের পথ-প্রদর্শক (রাহনুমায়ে রাহে খোদা) মুহাম্মদ আল-বাকী কুদ্দিসা সিররুহূর খেদমতে আমাকে পৌঁছে দিল আর তিনি (খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্) এই অধমকে তরীকায়ে আলিয়া নকশবান্দিয়ার তা'লীম দিলেন এবং তার হালের ওপর গভীর মনোযোগ (তাওয়াজ্জুহ) প্রদান করলেন।

"এই তরীকার অব্যাহত যিক্র ও শোগলের পর অল্পদিনেই এই অধমের ওপর তওহীদে উজূদী উদ্ভাসিত হল এবং এই উদ্ভাসনের ক্ষেত্রে এক ধরনের চরম পন্থা

সৃষ্টি হল। এই মকামের ইল্‌ম ও মা'রিতের ফয়েয অধিক পরিমাণে দেখা দিল এবং এই মর্তবার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্যের ক্ষেত্রে এমন বিষয় খুব কমই ছিল যা উদ্ভাসিত করে তোলা হয় নি।

"শায়খ মুহ্য়িউদ্দীন ইব্‌ন আরাবীর নাযুক ও সূক্ষ্ম জ্ঞান যেমনটি দরকার ছিল সামনে এল এবং তাজল্লীয়ে যাতী যাকে 'ফুসূসুল হিকাম' প্রণেতা বর্ণনা করেছেন এবং তার সেই চরম উন্নতি লাভ ঘটল যে সম্পর্কে তিনি বলেন, ما بعد هذا الا العدم المحض। (এরপর কেবল বিরাট শূন্যতা ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই) দ্বারা তাকে ধন্য করা হল এবং সেই তাজাল্লীর সেই সব ইল্‌ম ও মা'আরিফ যাকে শায়খ (ইবনে আরাবী) খাতিমুল বিলায়াত (বিলায়েতের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত স্তর)-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট মনে করেন, বিস্তারিতভাবে ধরা পড়ল। অধম তাওহীদের এই মকামে হাল ও মত্ততার সেই সীমান্তে উপনীত হল যে, তার কোন কোন পত্রে (যা স্বীয় মুরশিদ) হযরত খাজা (বাকীবিল্লাহ) কে লিখেছিলেন, এ ধরনের মত্ততাবস্থার কবিতাও লিখে দিয়েছিল।

"অদৃশ্য জগতের খিড়কী দিয়ে দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলে। এমনকি মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। অবশেষে মেহেরবান মালিকের অসীম অনুগ্রহ অধমের প্রতি মুখ তুলে চাইল। সেই অবস্থা প্রকাশ প্রকাশের অঙ্গনে তাঁর শুভ পদার্পণ ঘটল এবং বর্ণনাতীত আকৃতি ও বর্ণে নিঃশব্দে ليس كمثله شئ (তাঁর অর্থাৎ সেই পবিত্র সত্তার মত কেউ নেই)-এর চেহারার ওপর যেই পর্দা পড়েছিল তা সরিয়ে দিল এবং পূর্বেকার সকল জ্ঞান যা ইত্তিহাদ ও ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদ (বিশ্বময় একক সত্তা)-এর খবর দিত তা অপসৃত হল এবং সীমান্ত ও (২) سريان নৈকট্য ও যাতী তথা একান্ত সত্তাগত সান্নিধ্য-সম্মিলন যা এই মকামে প্রকাশিত হয়েছিল, অবলুপ্ত হল। অতঃপর নিশ্চিত বিশ্বাস ও প্রতীতি দ্বারা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এই জগতের সঙ্গে ঐ সব নিসবতের ভেতর থেকে কোন নিসবত (সম্বন্ধ, সংযোগ) রাখেন না। তাঁর সীমান্ত বেষ্টনী ও নৈকট্য মূলত জ্ঞানগত ও তত্ত্বগত, যেমন সত্যপথের অনুসারী পথিকগণ বিশ্বাস করে থাকেন (আল্লাহ্ পাক তাঁদের সাধনা ও প্রয়াসকে পুরস্কৃত করুন)। সেই পবিত্র সত্তা চূড়ান্ত বিচারে কোন কিছুর সঙ্গেই একীভূত হন না। সেই সত্তা তা রূপ-বর্ণ ও আকার-আকৃতি বিমুক্ত, বিশ্বজগতই কেবল আকার-প্রকার ও রূপ-বর্ণের দাগযুক্ত। যে সত্তা 'কেমন ও কিরূপ'-এর ঊর্ধ্বে তা যা 'কেমন কিরূপ' (অর্থাৎ সৃষ্টিজগত) তাঁর মত ও তুল্য হবে কি করে? যা নিত্য ও আবশ্যিক সত্তা (ওয়াজিব) তাঁকে অনিত্য ও আবশ্যিকতাবিহীন সম্ভব (মুমকিন)-এর সঙ্গে একীভূত বলা যায় কি? যা অনাদি অন্তহীন অব্যয় (কাদীম) তা কখনো অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভকারী

(হাদিস)-এর হুবহু বা সদৃশ হতে পারে না। যার লয় ও ক্ষয় অসম্ভব তা "ক্ষয়িষ্ণু ও বিলীয়মানে"র সাথে অভিন্ন অস্তিত্ববান হতে পারে না। কেননা বুদ্ধিবৃত্তিক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে হাকীকত ও মৌলতত্ত্বের পরিবর্তন অসম্ভব এবং বাস্তবে ও প্রকৃত বিচারে একটিকে অপরটির সাথে প্রযুক্ত করা কখনো শুদ্ধ হতে পারে না। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, শায়খ মুহয়িউদ্দীন (ইবনুল আরাবী) এবং তাঁর অনুসারীরা মহান অনাদি স্রষ্টার সত্ত্বাকে নিরেট অপরিজ্ঞাত সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর সত্তাকে কোন 'বিধেয়'-এর উদ্দেশ্য মনে করেন না (যেমন আল্লাহ উদ্দেশ্য, অতি দয়ালু বিধেয় বাক্যটি তাদের চিন্তাধারায় প্রযোজ্য নয়)। এতদসত্ত্বেও সাত্ত্বিক পরিবেষ্টন এবং সত্ত্বাগত নৈকট্য ও অঙ্গাঙ্গী সান্নিধ্য (স্রষ্টা ও বান্দার মধ্যে) সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাহ্‌র আলিমগণের বক্তব্যই সঠিক ও যথার্থ (অর্থাৎ সব কিছুর যাকে ইবনুল আরাবী ও তাঁর অনুসারীরা 'একীভূত সত্তা' বলেছেন তার) ব্যাপার মূলত জ্ঞানগত নৈকট্য ও উপলব্ধিজাতি পরিবেষ্টন (বাস্তবিক নয়)।

"একীভূত সত্তা (তৌহীদে উজূদী) মতবাদের বিপরীত ও পরিপন্থী এই সব জ্ঞান ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জিত হওয়ার সময়টি এই অধমের জন্য ছিল প্রচণ্ড অস্থিরতার যুগ। কেননা সে সময়টাতে অধম এই একত্ববাদ (তৌহীদ) হতে উর্ধ্বতর অন্য কিছু বুঝত না, বোঝার জন্য প্রস্তুতও ছিল না। সেজন্য অধম অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সঙ্গে দোআ করত যাতে চলমান এই অভিজ্ঞান বিদূরিত না হয় (কেননা সম্ভবত এতে এক প্রকার মত্ততার স্বাদ থাকার কারণে তা অত্যন্ত প্রিয় ছিল)। অবশেষে সব পর্দা ও আবরণ যা সেই হাকীকতের ওপর পড়ে ছিল তা উঠে গেল এবং প্রকৃত সত্য উন্মুক্ত ও প্রস্ফুটিত হয়ে দেখা দিল। তখন বোঝা গেল যে, বিশ্বজগত যদিও আল্লাহ্ তা'আলার গুণগত পরিপূর্ণতার (কামালাত) জন্য আয়নার অবস্থানে রয়েছে, কিন্তু প্রকাশিত ও বিকশিত (আয়নায় যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়) তা অভিন্ন রূপে প্রকাশমান সত্তা (অর্থাৎ যার প্রতিবিম্ব সে) নয় এবং ছায়া তার মূল সত্তা (অর্থাৎ যার ছায়া তার) হুবহু অস্তিত্ব হতে পারে না। একীভূত সত্তার মতবাদ পোষণকারী যেমন অভিমত পোষণ করেন (যেমন সূর্য ও তার কিরণ বা রোদ অভিন্ন নয় এবং আয়নার বুকে প্রতিফলিত সূর্য আসমানের ঐ সূর্য নয়। কেননা আসমানের সূর্যের তুলনায় আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যের পরিধি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রও নয়)।

"একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যায়। যেমন সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী কোন আলিমের ইচ্ছা হল যে, তিনি তাঁর বহুবিধ জ্ঞানের (কামালাত) প্রকাশ করবেন এবং তাঁর লুক্কায়িত ও প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য ও গুণাবলী জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। তখন তিনি কতকগুলো হরফ ও ধ্বনি আবিষ্কার করলেন যাতে করে সে সব হরফ ও ধ্বনির দর্পণে তার লুক্কায়িত ও প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য ও গুণাবলীর বিচ্ছুরণ ও পরিস্ফুটন ঘটাতে পারেন। এমতাবস্থায় একথা বলা যায় না যে, এসব হরফ ও ধ্বনি

সমষ্টি যা ঐসব প্রচ্ছন্ন গুণের বিকাশ স্থল ও দর্পণরূপে পরিদৃশ্য হরফ ও ধ্বনিগুলো তার গুণাবলীর অভিন্ন সত্তা অথবা সে গুণাবলী পরিবেষ্টনকারী কিংবা সেগুলোর কাছাকাছি বা সেগুলোর সঙ্গে সত্তাগতভাবে একাত্মতাবোধক বরং সেগুলোর মধ্যে সেই সম্বন্ধই হবে যা নির্দেশক ও নির্দেশিত (দাল-মাদলূল)-এর মধ্যে এবং শব্দ ও অর্থের মধ্যে হয়ে থাকে। হরফ ও ধ্বনিগুলো ঐ সব গুণাবলীর নির্দেশক বা প্রমাণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় এবং যেই সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে তা হবে ধারণা ও কল্পনা-প্রসূত। বাস্তবে ঐ সব সম্বন্ধ প্রকাশ করতে পারেন। এরূপ অবস্থায় একথা বলা যাবে না যে, তার লুক্কায়িত সৌন্দর্য ও গুণাবলীর (সদৃশ্যতা, একাত্মতা, পরিবেষ্টিত নৈকট্য, সত্তার সাথীত্ব, সত্তায় লীন ইত্যাদি)-এর কোন সম্বন্ধই সপ্রমাণ নয়। কিন্তু যেহেতু গুণাবলী এবং হরফ ও ধ্বনিসমূহের মধ্যে আত্মপ্রকাশকারী ও প্রকাশিত, বিকাশমান ও বিকশিত এবং নির্দেশক ও নির্দেশিত হওয়ার সম্বন্ধ সাব্যস্ত রয়েছে, সে কারণে কিছু কিছু (অধ্যাত্মচারী) লোকের কিছু কিছু আনুষঙ্গিক ও পার্শ্বজাত বিষয়ের (পরগাছা) সূত্রে কল্পনাপ্রসূত (মনে মনে মিষ্টি খাওয়ার ন্যায়) সম্বন্ধ লাভ হয়। কিন্তু বাস্তবে সে সব পরিপূর্ণতা ও গুণাবলী এ ধরনের যাবতীয় সম্বন্ধ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। হক (চূড়ান্ত সত্য, পরম সত্য- আল্লাহ্) ও খাল্ক (স্রষ্টা ও সৃষ্টি)-এর মধ্যে উল্লিখিত নির্দেশক ও নির্দেশিত হওয়ার এবং প্রকাশমান সত্তা ও প্রকাশিত বিশ্ব হওয়ার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোন সম্বন্ধ নেই। একান্ততার মুরাকাবার (ধ্যান-নিমগ্নতার) আধিক্য কোন কোন মনীষী বুযুর্গের জন্য ঐ কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণ হয়ে থাকে। মুরাকাবা ও ধ্যানের রূপ-চিত্র কল্পনা শক্তির জগতে চিত্রায়িত হয়। আবার কতক মনীষী বুযুর্গের ক্ষেত্রে একাত্মতার জ্ঞান-চর্চা ও তার পুনঃপৌণিকতার কারণে ঐরূপ সিদ্ধান্তের এক ধরনের রুচি অর্জিত হয়। কিছু লোকের জন্য (ধ্যান ও জ্ঞান-চর্চা নয় বরং) এই দিকে আকৃষ্ট হবার অর্থাৎ ওয়াহদাতুল-ওজূদ মতাবলম্বী হবার সূত্র 'প্রেমের আতিশয্য'। কেননা প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমাতিশয্যের কারণে প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না এবং সেও তার প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না এবং সে তার প্রেমাস্পদ ব্যতীত কোথাও কিছু দেখতে পায় না (যা কিছুই দেখে তাকেই প্রেমাস্পদ ও 'লায়লা' মনে হয়। جدھر دیکھتا ہوں ادھر توہی توہے যেদিকেই তাকাই শুধু তোমাকেই দেখতে পাই (বইয়ের পাতার লেখাগুলো প্রেমাস্পদের মাথার কেশরাজি মনে হয়)। কিন্তু বাস্তবও এমন নয় যে, বাস্তবেই প্রেমাস্পদ-ব্যতীত কোথাও অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। কেননা তা ইন্দ্রিয় উপলব্ধি, জ্ঞান-বুদ্ধির উপলব্ধি ও শরীয়তের পরিপন্থী। কখনো এই প্রেমাতিশয্যই বেষ্টনীভুক্ততা ও সাত্তিক সান্নিধ্যের (সম্মিলন) সিদ্ধান্ত প্রদানে উদ্যত ও উজ্জীবিত করে। তবে তৌহীদ (একত্ববাদের মৌল বিশ্বাস)-এর এ স্তরটি পূর্ববর্তী স্তর (প্রকার) দু'টোর চেয়ে সমুন্নত এবং 'হালত' (হাল)-এর

পরিসীমার অন্তর্ভুক্ত যদিও তা যুক্তি-বুদ্ধি ও প্রকৃত বাস্তবের অনুকূল নয়। সেহেতু শরীয়ত ও প্রকৃত বাস্তবের সঙ্গে এ ধ্যান-ধারণার সমন্বয় বিধানের চেষ্টাও লৌকিকতা মাত্র। সার-কথা, এটি কাশ্‌ফ-এর বিচ্যুতি (খাতা) যা ইজতিহাদের বিচ্যুতির (خطاء اجتهادى) বিধানভুক্ত (অর্থাৎ মুজতাহিদের ভুল যেমন শাস্তি বা তিরস্কারযোগ্য নয় বরং ক্ষমার যোগ্য, তদ্রূপ এ ভুলও) তিরস্কার ও ভর্ৎসনার ঊর্ধ্বে বরং 'হাল' ও 'আত্মহারা' হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একে সঠিক ও যথার্থতার সনদ দেয়া যায়" (মকতূব ১/৩১, শায়খ সূফীর নামে)।

ওয়াহ্দাতুশ-শুহূদ বা তৌহীদে শুহূদী (দৃষ্টি একক সত্তায় সীমিত থাকা)

শায়খ ফরীদ বুখারীকে লিখিত এক পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলেন, "আধ্যাত্মিক পথের পথিক সূফীগণের তাদের সুলূক ও অধ্যাত্ম পথে চলার কালে যেই তৌহীদ অর্জিত হয় তা দুই প্রকার ঃ তৌহীদে শুহূদী ও তৌহীদে ওজূদী। তৌহীদে শুহূদী অর্থ একেকে দেখা অর্থাৎ অধ্যাত্ম পথের পথিক সালিক-এর দৃষ্টিতে এক ব্যতীত কিছুই থাকবে না, তার দৃষ্টি 'এক' থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যত্র পতিত হবে না। আর তৌহীদে ওজূদী হল 'অস্তিত্বকে একের মধ্যে সীমিত করে দেখা, একেকেই অস্তিত্ববান মনে করা এবং এক ব্যতীত অন্য সব কিছুকেই অস্তিত্বহীন মনে করা।"

একটু পরে গিয়ে লিখছেন,

"এক ব্যক্তি সূর্যের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হল। এ বিশ্বাসের আধিক্য তারকারাজির অস্তিত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে অত্যাবশ্যকীয় করে না। তবে যে সময় ও যেই মুহূর্তে সে সূর্যকে দেখবে, তারকারাজি দেখবে না। তার দৃষ্ট বস্তু সূর্য ব্যতীত অন্য কিছুই হবে না এবং সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার দরূন তারকা না দেখা অবস্থায়ও তার জানা থাকবে যে, তারকারাজি অস্তিত্বহীন নয় বরং সে জানবে যে, তারকা আছে তবে পর্দাবৃত ও আচ্ছাদিত অবস্থায় এবং সূর্য রশ্মির তেজঃপ্রভাবে পরাজিত ও নির্জীব অবস্থায় রয়েছে" (পত্র নং ১১/৪৩, শায়খ ফরীদের নামে)। সামনে অগ্রসর হয়ে লিখছেন ঃ

"আমার মুর্শিদ কেবলা হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) কিছুকাল তৌহীদে ওজূদী মতবাদ পোষণ করেছেন। তিনি তাঁর পুস্তক-পুস্তিকায় ও পত্রাবলীতে তা প্রকাশও করেছেন। কিন্তু শেষাবধি আল্লাহ্ তা'আলার পরম করুণা তাঁকে সেই অবস্থান (মকাম) থেকে তরক্কী দান করে এমন এক রাজপথে ও মহাসড়কে তুলে দেন যার ফলে তিনি পূর্ববর্তী স্তরের (তথ্য ও তত্ত্বাভিজ্ঞতার) সংকীর্ণতা ও সংকট থেকে মুক্তি পান" (প্রাগুক্ত)।

একটি পত্রে শায়খ-এ আকবর ও তাঁর অনুগামীদের মতবাদ বর্ণনা করতে গিয়ে

লিখেছেন ঃ

"তাঁরা ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের ধারণায়, বর্হিজগতে অস্তিত্ব বলতে একটিই, মাত্রই একটি আর তাহল আল্লাহ্‌র সত্তা (যাতে হক)। এর বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব আদতেই নেই, আদৌ নেই। অবশ্য এর জ্ঞানগত প্রমাণের তাঁরাও সমর্থক। তাঁদের কথা হল, الاعيان ماشمت رائحة الوجود। অর্থাৎ 'বস্তুজগত' বাহ্য অস্তিত্ব ও প্রকৃত সত্তার ঘ্রাণও পায়নি। তাঁরা বিশ্বজগতকে হক সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ছায়া বা প্রতিবিম্ব মনে করেন। কিন্তু তাঁদের মতে, এই ছায়ারূপী অস্তিত্বও কেবল উপলব্ধি ও অনুভবের পর্যায়ে, বাস্তবে ও বাহ্যজগতের তা শুধুই নাস্তি মাত্র।"

(পত্র নং ১/১৬০, ইয়ার মুহাম্মদ জাদীদ বাখশী তালিকানীর নামে)।

এ পত্রেই হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব ওয়াহদাতুল-ওজূদ-এর স্তর থেকে তাঁর নিজের উন্নতি ও অগ্রগতির কাহিনী শোনাতে গিয়ে বলেন ঃ

"এই পত্র লেখক একসময় তৌহীদে ওজূদী (ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ)-তে বিশ্বাসী ছিল। ছেলে বেলা থেকেই তাঁর এই তৌহীদের জ্ঞান অর্জিত ছিল এবং অন্তরেও তাঁর এ বিশ্বাস দৃঢ় মূল ছিল। যদিও এ ব্যাপারে তিনি 'সাহিবে হাল' ছিলেন না (অর্থাৎ বিষয়টি তখন 'হালত'-এর পর্যায়ে ছিল না)। সুলূকের পথে পা রাখতেই প্রথমেই তাঁর সামনে তৌহীদে ওজূদীর রাস্তা উদ্ভাসিত হয় এবং লেখক একটা সময় পর্ব পর্যন্ত সেই মকামের মনযিল ও স্তরগুলো পরিভ্রমণ করেছেন এবং উল্লিখিত মকামের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সম্বন্ধযুক্ত বহু তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করেছেন এবং তৌহীদবাদীদের সামনে আগত কঠিন পরিস্থিতি ঐসব উদ্ভাসিত ও ফয়েয লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে উত্তরণ ঘটল। এরপর একটা সময় পর্ব অতিক্রম করার পর দ্বিতীয় নিসবত এই অধমের ওপর জেঁকে বসল এবং এই জেঁকে বসা অবস্থায় তাঁর তৌহীদে ওজূদী সম্পর্কে বিরতি অনুভব করলাম। কিন্তু এই বিরতি সুধারণাপ্রসূত ছিল, অস্বীকৃতির কিংবা প্রত্যাখানের সাথে নয়। বেশ কিছুকাল এই অবস্থা চলল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপরটি অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং অধমকে দেখান হল যে, এই স্তর (ওয়াহদাতু'ল-ওজূদের মনযিল) তুলনামূলকভাবে নিম্নস্তরের এবং আমি ছায়ার মকাম পর্যন্ত পৌঁছলাম যা পূর্ববর্তী মকামের তুলনায় ঊর্ধ্বের। এই অস্বীকৃতির ব্যাপারে তাঁর (পত্র লেখকের) কোন এখতিয়ার ছিল না। কেননা সে এই মকাম থেকে বের হতে চাচ্ছিল না। এজন্য যে, অনেক বড় বড় বুযুর্গ মাশায়েখ এই মকামের ওপর এসে এমনভাবে আসন গেড়ে বসে গেছেন যে, আর উঠবার নামটিও করেন নি। এরপর তিনি (অধম পত্র লেখক) ছায়া ও প্রতিবিম্বের মকাম পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং নিজেকে ও বিশ্বজগতকে ছায়ারূপ পেলেন

তখন এই আকাংক্ষা জন্মাল যেন তাকে এই জগত (মকাম) থেকে পৃথক ও (কামাল-এর) মধ্যেই মনে করছিল। আর এই মকাম মোটের ওপর এর সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখে। অনুগ্রহে ও বদান্যতার এই মকাম থেকে তাকে আরও উর্ধ্বতর মকামে নিয়ে যান এবং আবদিয়াতের মকামে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই মুহূর্তে উল্লিখিত মকামের কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতা আমার দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর উচ্চতা ভেসে ওঠে। ফলে পত্র লেখক (মুজাদ্দিদ আলফেছানী) বিগত মকামগুলোর থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবাহ্ ইস্তিগফার করতে থাকেন, তাঁর দরবারে বিনীতভাবে ক্ষমা চাইতে থাকেন। যদি তিনি এই অধমকে ঐ রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে না যেতেন এবং এক মকামের অন্য মকামের ওপর অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে না দিতেন তাহলে সে এই মকামের মধ্যেই নিজের অধঃগমন মনে করত। সেজন্য তাঁর (লেখকের) মতে তৌহীদে ওজূদীর থেকে উচ্চতর কোন মকাম ছিল না।"

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل -

শায়খ-এ আকবর (ইবনুল আরাবী) সম্পর্কে ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ মত

মতের এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও শায়খ-এ আকবর সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে মুজাদ্দিদ আলফেছানী লিখেন ঃ

"এই অধম শায়খ মুহয়িউদ্দীন (ইবনুল আরাবী) কে আল্লাহ্‌র মকবূল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। কিন্তু তাঁর সেই সব ইল্‌ম ও জ্ঞান (যা জমহূর আলিম-উলামার আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য বিষয়গুলোর বিরোধী) কে তিনি ভুল ও ক্ষতিকর মনে করেন। লোকে তাঁর সম্পর্কে বাড়াবাড়ির পথ ধরেছে এবং মধ্যবর্তী ও ভারসাম্যপূর্ণ রাস্তা থেকে দূরে সরে গেছে। একদল শায়খ (ইবনুল আরাবী) কে তীব্র ভর্ৎসনা ও নিন্দার শিকারে পরিণত করেছে এবং তাঁর অভিজ্ঞান (মা'রিফত) ও হাকীকতসমূহকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়েছে। অপর দল শায়খ-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন করেছে ও তাঁর যাবতীয় মা'রিফত ও হাকীকতকে সত্য জ্ঞান করছে এবং দলীল-প্রমাণ ও সাক্ষ্য সহযোগে সে সবের সত্যতা ও যথার্থতা প্রতিপন্ন করছে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, উভয় দলই এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমের পথ ধরেছে এবং মধ্যবর্তী রাস্তা থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার যে, শায়খ মুহ্য়িউদ্দীন আল্লাহ্‌র মকবূল বান্দাদের কাতারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছেন এবং তাঁর অধিকাংশ অভিজ্ঞান (মা'রিফত) ও হাকীকত যা আহলে হকের বিরোধী—ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি"।[১]

এক স্থানে তিনি নিজের এবং তৌহীদে ওজূদীর অস্বীকারকারী ও বিরোধীদের

১. পত্র নং ১/২৬৬, খাজা আবদুল্লাহ ও খাজা উবায়দুল্লাহ্‌র নামে লিখিত;

মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"এই অধমের তৌহীদে ওজূদীর সমর্থকদের সঙ্গে মতের ভিন্নতা কাশ্‌ফ ও শুহূদের পথে এসেছে। উলামায়ে কেরাম এসবের (ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ এবং গায়রুল্লাহ্‌র অস্তিত্বের একেবারেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন)-অনিষ্টতার ব্যাপারে একমত। এই অধমের তৌহীদে ওজূদীর ঐসব কথিত উক্তি ও হালত-এর গুণ ও সৌন্দর্যের ভেতর কোন আপত্তি কিংবা অভিযোগ নেই। তবে এই শর্তে যে, এসবের অতিক্রম করে যাওয়া যায়।[১]

তৌহীদে ওজূদীর বিরোধিতা করার আবশ্যকতা

এখানে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তৌহীদে ওজূদী যখন সুলূক (অধ্যাত্ম্য পথ) -এর একটি মনযিল এবং সালিক (অধ্যাত্ম্য পথের পথিক, সাধক)-এর জন্য একটি সাময়িক স্তর বা পর্যায় যার ওপর অধ্যাত্ম্য পথের পথিক (সালিক) এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিতদের একটি বিরাট দল প্রতিটি যুগেই পৌঁছেছেন, এদের মধ্যে একটি বড় দল এই স্তরের ওপর পৌঁছে থেমে গেছেন এবং কাউকে আল্লাহ্ পাকের তৌফীক এই মনযিল থেকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে তৌহীদে শুহূদী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তখন এর মধ্যে অন্যায় ও অনিষ্টতা কোথায়? এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী এত তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করলেন কেন? আর এর মুকাবিলায় এত জোরে-শোরে তৌহীদে শুহূদীর প্রমাণ পেশ এবং এর ওপর অগ্রাধিকার প্রদানে এত কলম চালাচালি করলেনই বা কেন?

এর উত্তর এই যে, তৌহীদে ওজূদীর সমর্থক এবং এর প্রচারকদের ভেতর (হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের যুগেও) একটি বিরাট সংখ্যা এমন জন্মে গিয়েছিল যে, যারা নিজেদেরকে শরীয়তের বিধি-বিধান, ইসলামের ফরয ওয়াজিব-এর মত বিষয়াদি থেকে মুক্ত ভেবে বসেছিল এবং এই কথা মনে করে যখন সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং যখন সব কিছুই সত্য তখন হক-বাতিলের পার্থক্য এবং ঈমান ও কুফরের বিশিষ্টতার প্রশ্ন তোলা কেন?[২] তাঁরা শরীয়ত ও এর ওপর আমল করাকে সাধারণ পর্যায়ের একটি জিনিস ভেবে নিয়েছিল। তাদের নিকট আসল মকসূদ (তৌহীদে ওজূদী) হল এর থেকে উর্ধ্বতর মকাম এবং এর সম্মুখস্থ মনযিল যা এই রাস্তার কামিল পথিক ও আল্লাহ্ পর্যন্ত যারা পৌঁছে গেছে তাদের হাসিল হয়ে থাকে। হি. দশম শতাব্দীতে যেই যুগটি ছিল হযরত মুজাদ্দিদ ছাহেবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক (রূহানী) ক্রমোন্নতির যুগ-এই তৌহীদে ওজূদীর

১.পত্র নং২/৪২ খাজা জামাল উদ্দীন হুসায়ন-এর নামে লিখিত;

২. হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর উর্দূ সাহিত্যের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি মির্যা গালিব নিম্নোক্ত কবিতায় ঐসব লোকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ঃ ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم
ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہوگئیں۔

রঙ ভারতবর্ষের ওপর এমনভাবে ছেয়ে ছিল যে, 'আরিফসুলভ রুচির অধিকারী কবিরা সকলেই এর গীত গাইত এবং কুফর ও ঈমানকে সমান অভিহিত করত, এমন কি কোন কোন সময় কুফরকে ঈমানের ওপর অগ্রাধিকার দেবার সীমা-রেখায় পদার্পণ করত। সে যুগে এমন বহু কবিতা মানুষের মুখে মুখে ফিরত যেখানে পরিষ্কার ভাবে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পেশ করছি:

کفر وایمان قرین ایك دگرند ۔ هرکه را کفرنیست ایمان نیست

"কুফর ও ইসলাম পরস্পরের সঙ্গে জড়িত; যার ভেতর কুফর নেই-ঈমানও নেই।"

এরপর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে একটি বইয়ে লেখা হয়েছে:

پس ازیں معنی اسلام درکفرست وکفر در اسلام یعنی تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل مراد از لیل کفرست ومراد از نهاراسلام ۔

"এই অর্থে ইসলাম আছে কুফরের মধ্যে আর কুফর আছে ইসলামের মধ্যে। অর্থাৎ تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل এখানে লায়ল (রাত্রি) বলতে কুফর এবং নাহার (দিন) বলতে ইসলাম বোঝায়।"

অপর জায়গায় এই কবিতা উদ্ধৃত করেন:

عشق رابا کافری خویشی بود
کافری درعین درویشی بود

" প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে কুফরের সাথে;
আর কুফর রয়েছে দরবেশীর মধ্যে।"

সামনে অগ্রসর হয়ে লিখছেন:

العلم حجاب اکبر گشت مراد ازیں علم عبودیت که حجاب اکبرست ایں حجاب اکبر اگراز میاں مرتفع شود کفربه اسلام واسلام به کفر امیزد وعبادت خدائی وبندگی برخیزد۔[১]

"ইল্‌ম হল বড় পর্দা; এই ইলমের মর্মার্থ হল উবূদিয়াত বা আল্লাহ্‌র গোলামী যা বড় পর্দা। এই পর্দা তুলে নেওয়া হলে কুফর ইসলামের সঙ্গে এবং ইসলাম

১. রিসালায়ে ইশকিয়া ৭১-৭৩;

কুফরের সঙ্গে মিশে যাবে। আল্লাহ্‌র ইবাদত তখন উঠে যাবে।"

আল্লাহ্ তা'আলা মুজাদ্দিদ সাহেবকে প্রখর ধর্মীয় চেতনা এবং ফারূকী মর্যাদাবোধের একটি বড় অংশ দান করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেই হাদীছের বাস্তবায়ন দেখতে চাচ্ছিলেন যেই হাদীছে বলা হয়েছে (আর এটি তাঁর ভাগ্যে লেখা হয়ে গিয়েছিল) ঃ

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين -

"প্রত্যেক যুগে এই ইলমের ধারক-বাহক হবেন এমন সব ন্যায় ও ইসনাফপন্থী মুত্তাকী আলিম যারা দীনকে চরমপন্থীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের ভুল চিন্তা-চেতনা ও দাবি এবং মূর্খ জাহিলদের অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত রাখবেন" (মিশকাত, কিতাবুল-ইল্‌ম)।

এই জিনিসই উল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাস ও দাওয়াতের জ্ঞানগত ও ধর্মীয় খতিয়ান নেবার কারণ হয় যার প্রচার-প্রসারে সেই যুগে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে ও ব্যাপকভাবে কাজ করা হচ্ছিল। আর মুজাদ্দিদ সাহেব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, এর (ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদ-এর) প্রভাবে শরীয়তের বাঁধন স্বভাবতই ঢিলা ও আলগা হতে চলেছিল, এর (শরীয়তের) প্রতি মানুষের সম্মান ও পবিত্রতাবোধ হ্রাস পাচ্ছিল। মুজাদ্দিদ সাহেব নিজেই তাঁর এক পত্রে লিখছেন ঃ

"অধিকাংশ সমকালীন লোক কতক জিনিসকে অনুকরণ করতে গিয়ে কেউ কেউ আপন জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে, আবার কেউ এমন বিদ্যার ওপর ভিত্তি করে যার ভেতর তার রুচি-প্রকৃতিও শামিল (চাই কি তা সীমিত পরিমাপের হোক) এবং কেউ কেউ ধর্মদ্রোহী চিন্তা-চেতনার ওপর ভর করে তৌহীদে ওজূদীর আঁচল ধরে রেখেছে এবং তারা সব কিছুকেই সেই পরম সত্য সত্তার পক্ষ থেকে মনে করে বরং সত্য বলেই জানে। আর তারা নিজেদের গর্দানকে কোন না কোন কিছুর আড়াল নিয়ে শরীয়তের বেড়ী ও বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত করে নেয় এবং শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম তথা বিধি-বিধানের সম্পর্কে তারা অলসতা ও গাফিলতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তাদেরকে খুবই তৃপ্ত ও আনন্দিত দেখতে পাওয়া যায়। এসব লোক শরীয়ত নির্দেশিত বিষয়াদির ওপর আমলের আবশ্যকতার ব্যাপারে স্বীকৃতি দিলেও একে তারা সাময়িক ও গুরুত্বহীন মনে করে। তারা আসল মকসূদ তথা পরম লক্ষ্যকেই শরীয়ত-ঊর্ধ্ব ধারণা করে। না, কখখনো না। না,

১. মকতূবাত, ১/৪৩, শায়খ ফরীদ বুখারীর নামে;

কখখনো না। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে এ ধরনের বদ ও ভ্রান্ত আকীদা থেকে পানাহ চাই, আশ্রয় চাই।"[১]

এই পত্রেরই অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"এই যুগে ঐসব দলের এমন বহু লোক রয়েছে যারা সূফী দরবেশের বেশ পরে নিজেদের জাহির করে, তৌহীদে ওজূদী মতবাদ প্রকাশ্যে জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে। আর এ ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই কামালিয়াত বা বুযুর্গী মনে করে না। তারা ইলমের মাধ্যমে হাকীকত থেকে দূরে থেকে গেছে। সূফী-বুযুর্গদের উক্তি ও বানীকে তাদের মস্তিস্কজাত বিষয়ের ওপর টেনে নামিয়েছে এবং তাদেরকে নিজেদের অনুসরণীয় বানিয়ে রেখেছে ও কল্পনাপ্রসূত বিষয়গুলোর দ্বারা নিজেদের পড়ন্ত বাজার গরম করে রেখেছে"।[১]

মুজাদ্দিদ সাহেবের অনন্য বৈশিষ্ট্য

মুজাদ্দিদ সাহেবের তাজদীদি তথা সংস্কার ও পূনর্জাগরণমূলক কৃতিত্বপূর্ণ অবদান কেবল এই নয় যে, তিনি ওয়াহদাতুল ওজূদের সাধারণ্যে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ও সমকালের প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কে প্রমাণ করে দেন যে, তা সুলূক ও মা'রিফতের শেষ মনযিল নয় বরং এ অধ্যায়ে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যের মূল রহস্য এখানে নিহিত যে, এর ওপর তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে সমালোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি এই সমুদ্রে সাতার কেটে এবং এর তলদেশে ডুবুরীর মত ডুব দিয়ে উঠে এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র অপার সাহায্যে তিনি আপন মা'রিফতের জাহাজ ও গবেষণাকে কাংক্ষিত তীরে পৌঁছিয়েছেন। আর এ ময়দানে তাঁর কোন সমকক্ষ কিংবা সফরসঙ্গী নেই বললেই চলে। বিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক পিটার হার্ডি এ বিষয়ে যদিও কোন অথরিটি নন তদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে যথার্থই লিখেছেন যে,

"শায়খ আহ্মদ সরহিন্দীর সবচে' বড় সাফল্য এটাই যে, তিনি ভারতীয় ইসলামকে সূফীবাদী চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে স্বয়ং তাসাওউফের মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছেন। সম্ভবত এর কারণ এই যে, যেই মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তার মূল্য ও মর্মার্থের ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত গভীর জ্ঞান ছিল"।[২]

মুজাদ্দিদ সাহেবের পর তৌহীদে ওজূদী সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গ মাশায়েখদের সমঝোতামূলক আচরণ

১. মকতূবাত, ১/৪৩, শায়খ ফরীদ বুখারীর নামে।
২. Sources of Indian Tradition. N. Y. P. 449.

এই অধ্যায় সমাপ্ত করার আগে একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক হিসাবে এই সত্য প্রকাশ করা জরুরী মনে করছি যে, হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর পর (তাঁর সেই বিশেষ সিলসিলা বাদে যা হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষ ও এর বাইরে ছড়িয়েছে) ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ সম্পর্কে সেই স্পষ্ট অকাট্য ও চূড়ান্ত প্রবণতা এবং ওয়াহদাতুশ-শুহূদ-এর ওপর সেই প্রত্যয় ও সুনিশ্চিত প্রতীতি আর অবশিষ্ট থাকেনি মুজাদ্দিদ সাহেব যার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং যার ওপর তিনি সচেতনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি যার দাঈ (আহ্বায়ক)-ও ছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পরই তাসাওউফ ও মা'রিফতের হালকায় (সূফী-বুযুর্গদের মহলে) এবং সেই সব মহলেও যারা নিজেদেরকে এর সঙ্গে জড়িত মনে করতেন, ওয়াহদাতুল ওজূদ ও ওয়াহদাতুশ-শুহূদ-এর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমঝোতার মনোভাব প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং কতিপয় উচ্চস্তরের আলিম-উলামা ও বিশেষজ্ঞ এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে, "এ নিয়ে সৃষ্ট মতভেদ কেবলই শাব্দিক দ্বন্দ্ব বৈ কিছু নয়।" কেউ কেউ এও লিখেছেন যে, "মুজাদ্দিদ সাহেব এ ব্যাপারে ভুল বুঝেছেন এবং শায়খ-এ আকবর (ইবনুল আরাবী)-এর সব বই পড়েন নি।" এরই ওপর ভিত্তি করে মুজাদ্দিদিয়া তরীকার বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁর ইঙ্গিতে তাঁরই মুরীদ মাওলানা গোলাম ইয়াহ্ইয়া বিহারী (মৃ. ১১৮০ হি.) "কলেমাতুল হক" নামে একটি বই লিখেন, যে বই-এ তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের এ বিষয়ক গবেষণা ও মতবাদ পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছেন এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যা স্বয়ং এ সিলসিলার কতিপয় মহলে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ মুজাদ্দিদ সাহেবের পথ ধরে

এই সিলসিলায় হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের পর যদি কোন তরীকতপন্থী বুযুর্গ সূফী, আরিফ ও তত্ত্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞের কাছে ওয়াহদাতুশ-শুহূদ-এর সুস্পষ্ট ও নির্ভেজাল দৃষ্টিভঙ্গি ও সবক পাওয়া যায় যাঁকে হযরত মুজাদ্দিদ-এর পদাংক অনুসারী হিসাবে চোখে পড়ে তিনি হলেন মুজাদ্দিদিয়া আহসানিয়া[১] সিলসিলার বিখ্যাত শায়খ-এ তরীকত, দা'ঈ ইলাল্লাহ ও আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ (মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ) হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রায়বেরেলভী (শাহাদত ১২৪৬ হি.)[২]

---

১. হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর খলীফা হযরত সাইয়েদ আদম বানুরীর নির্দিষ্ট সিলসিলা যা আদমিয়া ও আহসানিয়া সিলসিলা নামে কথিত হয়।

২. এটি তাঁর খান্দানী রুচির ফসলও হতে পারে যে, তাঁর চতুর্থ পূর্বপুরুষ হযরত সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ (র) হযরত সাইয়েদ আদম বানুরীর বিশিষ্টতম খলীফা ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর নিজের গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তও হতে পারে। যেহেতু তিনি এ ময়দানে মুজতাহিদের মকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৩. দ্র. সিরাতে মুস্তাকীম, চতুর্থ হেদায়েত১/১২;

সপ্তম অধ্যায়

সম্রাট আকবর থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্যন্ত

সাম্রাজ্যের প্রশাসনকে সঠিকপথে আনার লক্ষ্যে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-এর নীরব সাধনা ও কর্মপ্রয়াস এবং আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনামলের সাহসী ও স্পষ্টভাষী উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গবৃন্দ

এখন আমরা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র সেই সব প্রশংসনীয় সাধনা ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করার আগে, যিনি সাম্রাজ্যের গতিমুখ অন্য দিকে পাল্টে দিয়েছিলেন, সেই সব বাস্তব সত্যের প্রকাশ জরুরী ও যুক্তিযুক্ত মনে করছি যে, সম্রাট আকবরের শাসনামল সম্পর্কে এমনতরো ধারণা করা ঠিক হবে না যে, ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত নীরব ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছিল এবং আকবরের কর্মপন্থা ও ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে

من رای منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه

فان لم یستطع فبقلبه وذالك اضعف الایمان - بخاری ومسلم -

"তোমাদের মধ্যে কেউ (শরীয়ত বিরোধী) অন্যায় ও গর্হিত কাজ দেখলে তা হাতের দ্বারা পাল্টে দেবে। যদি সে তা না পারে তবে মুখের দ্বারা তার পরিবর্তন ঘটাবে (প্রত্যাখ্যান করবে, প্রতিবাদ করবে)। আর তাও যদি না পারে তবে দিলের সাহায্যে (অর্থাৎ তাওয়াজ্জুহ শক্তির সাহায্যে, দুআর মাধ্যমে, নিদেনপক্ষে ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে) তার পরিবর্তনে সচেষ্ট হবে। আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর" (বুখারী-মুসলিম)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়েও কেউ আমল করে নি।

সম্রাট আকবরের শাসনামলের নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থে যেসব সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, তাঁরা স্ব-স্ব গণ্ডি ও বৃত্তের মধ্যে থেকে তাঁদের সাধ্য মতো এই অবস্থার ওপর নিজেদের অসন্তোষ ও ইসলামী আবেগের প্রকাশ ঘটান।

শায়খ ইবরাহীম মুহাদ্দিস আকবরাবাদী (মৃ. ১০০১ হি.) একবার আকবরের আহ্বানে ইবাদতখানায় আসেন এবং সম্রাটের জন্য নির্ধারিত শরীয়ত বহির্ভূত আদব ও সম্মান প্রদর্শনে বিরত থাকেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণামূলক ধারার আশ্রয় নেন এবং সম্রাটের শাহী প্রভাবে আদৌ ভীত হননি।

শায়খ হুসায়ন আজমীরি যিনি হি. ১০৯ সালের পর ইনতিকাল করেন, আকবরের আজমীর আগমনে অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে অন্যত্র গমন করেন। আকবর তাঁকে খানকাহ ও দরগাহের মুতাওয়াল্লীর পদ থেকে অপসারণ করেন এবং হেজায গমনের নির্দেশ জারী করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরও তিনি সম্রাটকে সম্মানসূচক সিজদা করেন নি। এতে সম্রাট তাঁর প্রতি নাখোশ হন, নারায হন এবং তাঁকে বাখর দুর্গে বন্দী করেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর বন্দী জীবন অতিবাহিত করেন। মুক্তিলাভের পরও তিনি সম্রাটকে সম্মানসূচক সিজদা করা ও আদব প্রদর্শন থেকে বিরত থাকেন। তিনি সম্রাট প্রদত্ত উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন।

শায়খ সুলতান থানেশ্বরী ছিলেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ও ঘনিষ্ঠ দরবারীদের অন্যতম। তিনি সম্রাটের নির্দেশে মহাভারত ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। গরু যবাহর দরুন তিনি সম্রাটের তিরস্কার ও ভর্ৎসনার শিকার হন। এজন্য তাঁকে বাখর নামক স্থানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এরপর আবদুর রহীম খানে খাঁনার সুপারিশে তাঁকে থানেশ্বর অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং খাজনা আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিছুকাল পর সম্রাটের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ আসে। আর এ অভিযোগ ছিল তাঁর ইসলামী রীতিনীতি ও জীবন যাপনের বিরুদ্ধে। এজন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এ ঘটনা ছিল হিজরী ১০০৭ সালের।[১]

এক্ষেত্রে সবচে' সাহসিকতামণ্ডিত ও পৌরুষোচিত পদক্ষেপ ছিল শাহবায খান কাম্বুহ (মৃ. ১০০৮ হি.)-র। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের দরবারের একজন বড় আমীর। শেষ দিকে তিনি মীর বখশীর পদও লাভ করেছিলেন। তিনিও সম্রাটের সামনে হক-কথা বলতে কখনো সংকুচিত হন নি। তিনি দাড়িও মুণ্ডন করেন নি কিংবা মদের কাছেও ঘেঁষেন নি। আকবর উদ্ভাবিত দীনে ইলাহীর প্রতিও তিনি কোন প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন করেন নি কিংবা সামান্যতম নমনীয়তাও দেখান নি। মাআছির-উল-উমারার লেখক শাহনওয়ায খানের বর্ণনা ঃ একদিন সম্রাট আকবর আছর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময় ফতেহপুর সিক্রীর একটি পুকুর পাড়ে পায়চারী করছিলেন। শাহবায খান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট তাঁর হাত ধরেন এবং পায়চারী অব্যাহত রাখেন ও তাঁর সঙ্গে নানাবিধ আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়েন। পার্শ্ববর্তী সকলেরই ধারণা ছিল, আজ শাহবায খান কিছুতেই সম্রাটের হাত থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারবেন না এবং আজ অবধারিতভাবে তাঁর মাগরিবের নামায কাযা হবেই। শাহবায খানের নিয়মিত অভ্যাস ছিল, তিনি আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কারুর সাথে কথা বলতেন না। শাহবায খান যখন দেখতে পেলেন, সূর্য

---

১. তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদ আলফেছানীর শ্বশুর (মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ)।

ডুবতে যাচ্ছে তখন তিনি সম্রাটের কাছে নামায আদায়ের অনুমতি চাইলেন। সম্রাট কোন রূপ রাখ-ঢাক ছাড়াই বললেন, আমাকে একাকী ও নিঃসঙ্গ ছেড়ে যেও না। পরে নামায কাযা করে নিও। শাহবায খান এতে সম্রাটের হাতের মধ্য থেকে নিজের হাত টেনে বের করে নেন এবং নিজের চাদর মাটির ওপর বিছিয়ে সেখানেই নামাযের নিয়্যত বাঁধেন। নামায থেকে মুক্ত হতেই তিনি প্রতিদিনের নিয়মিত আমল ওজীফা পাঠে মশগুল হন। সম্রাট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বকাবকি করতে থাকলেন। আমীর আবুল ফাত্‌হ এবং হাকীম আলী গীলানী এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা অবস্থার নাযুকতা অনুভব করে সামনে অগ্রসর হন এবং সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, আমরাও তো মহামতি সম্রাটের সুদৃষ্টি লাভের হকদার। অতঃপর সম্রাটের ক্রোধ কিছুটা শান্ত হয়। তিনি শাহবায খানকে ছেড়ে এ দু'জনের সঙ্গী হন।

শায়খ আবদুল কাদির উচাঈও সে সব সাহসী লোকের অন্যতম যারা শরীয়ত বিরোধী কর্মে সম্রাটকে কোনরূপ আনুকূল্য প্রদর্শন করেন নি, তাকে কোনরূপ সহযোগিতা করেন নি। একদিন সম্রাট তাঁকে আফিম খেতে দেন। তিনি তা খেতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। এতে সম্রাট মনঃক্ষুণ্ন হন। একদিন তিনি ইবাদতখানায় ফরয নামাযের পর নফল আদায় করছিলেন, এমন সময় সম্রাট মহল থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি তাঁকে নফল আদায় করতে দেখে বললেন, আপনার নফল আপন ঘরে গিয়ে পড়া উচিত। মাওলানা আবদুল কাদির জওয়াব দেন, হুযূরে ওয়ালা! এখানে (ইবাদতখানা) আপনার সাম্রাজ্য নয়। একথায় সম্রাট খুবই ক্রোধান্বিত হন। তিনি তাঁকে বলেন, আমার সাম্রাজ্য আপনার পছন্দ না হলে আপনি এখান থেকে চলে যান। তিনি তখনই উচ শহর অভিমুখে রওয়ানা হন এবং পরবর্তী জীবন ইবাদত-বন্দেগী ও সৃষ্টির সেবায় কাটিয়ে দেন। এ নামেই আরেকজন শায়খ ছিলেন যাঁর নামও ছিল আবদুল কাদের লাহোরী (মৃ. ১০২২ হি.)। সম্রাটের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি সম্রাটের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁকেও এজন্য সম্রাটের নির্দেশে হেজাযে চলে যেতে হয়।

মির্যা আযীযুদ্দীন দেহলভী কোকা (মৃ. ১০৩৩ হি.) ছিলেন সম্রাট আকবরের সমবয়সী ও দুধভাই। আকবর তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু তিনিও ইসলামের শরা-শরীয়ত, দীনি মসলা-মাসাইল ও ধর্মীয় ব্যাপারে আদৌ আকবরকে পরওয়া করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি সোজা-সাপ্টা ও স্পষ্ট বক্তব্য রাখতেন। আর এজন্য আকবর তাঁকে গুজরাটের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং এরপর বাংলা ও বিহারের সূবেদারীর পদে নিযুক্ত করেন। অধিকন্তু তাঁকে খান-ই আজম উপাধি দেন। এত ঘনিষ্ঠ ও নিকটজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্রাটের উদ্দেশ্যে তা'জীমি সিজদা, দাড়ি মুণ্ডন ইত্যাদি ব্যাপারে সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন নি এবং তাকে সহযোগিতাও দেন নি।

এঁদের অন্যতম ছিলেন শায়খ মুনাওয়ার আবদুল হামীদ লাহোরী (মৃ. ১০১৫ হি.)। আকবর তাঁকে ৯৮৫ হিজরীতে সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি আপন ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শনের দরুন সম্রাটের ক্রোধ ও ভর্ৎসনার পাত্রে পরিণত হন। সম্রাট তাঁর মালামাল ও সহায়-সম্পদ, এমন কি তাঁর কিতাবাদি ও বই-পুস্তক পর্যন্ত লুট করবার নির্দেশ জারী করেন। এরপর আগ্রায় ডেকে তাঁকে কঠিন বন্দীদশায় নিক্ষেপ করেন এবং সেখানেই তাঁর ইনতিকাল হয়।[১]

সম্রাট আকবরের পর জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর শাসনকালেও দীর্ঘকাল তাঁর পিতা আকবরের আমলের অনুসৃত রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি ও আইন জারী থাকে। ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতা ছাড়া আর সব ব্যাপারে পূর্বেকার নিয়ম-রীতিই সাম্রাজ্যে বহাল ছিল এবং তা ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকে যতদিন না জাহাঙ্গীরের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রতি সম্মান এবং ইসলামী শি'আরের প্রতি শ্রদ্ধা-বোধের দিকে ফিরেছে। এ আমলেও কয়েকজন উলামা ও মাশায়েখ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ঐসব শরীয়ত বিরোধী, বরং বলতে কি, দীন ও শরীয়ত পরিপন্থী আদব ও প্রথা-পদ্ধতি পালন করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করতে রাযী হন নি এবং হক-কথা বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। এঁদেরই একজন ছিলেন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইলয়াস হুসায়নী গুরগাশ্তী নামক একজন তরীকতপন্থী বুযুর্গ যাঁকে সম্রাট জাহাঙ্গীর দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি শাহী আদব ও প্রথা মাফিক সালাম ও আদব প্রদর্শন করতে অস্বীকার করেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী করেন। সেখানে তিনি তিন বছর বন্দী থাকেন। এরপর ১০২০ হিজরীতে তাঁকে বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জাহাঙ্গীর তাঁকে নিজের সাথে আগ্রায় নিয়ে আসেন।[২]

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, সাম্রাজ্যের পথভ্রষ্টতা ও ভুল পথে যাবার ব্যাপারটিকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ বিরোধিতা এবং একে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞোচিত প্রয়াস যিনি চালিয়ে ছিলেন তিনি হলেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী এবং দীনের হেফাজত ও ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য-সহায়তার কৃতিত্বপূর্ণ অবদান তাঁরই ভাগ্যে লেখা ছিল এবং তিনিই একে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়ে ভারতবর্ষের বুকে সেই নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করেন যার নজীর অমুসলিম বিশ্বের অপর কোন দেশ ও সাম্রাজ্যের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যার পরিণতিতে আকবরের পর মোগল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে যিনিই শাসক হিসেবে এসেছেন তিনি পূর্ববর্তী শাসকের থেকে উত্তম, ইসলাম বিরোধিতার জীবাণু থেকে মুক্ত ও নিরাপদ, ধর্মের

---

১. এসব নাম ও আকবরের বিরোধিতার ঘটনাবলী নুযহাতুল খাওয়াতিরের ৫ম খণ্ড থেকে গৃহীত হয়েছে।
২. নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড।

প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং ইসলামের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও বিশিষ্ট ছিলেন। এমন কি এ ধারাবাহিকতার সোনালী পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে মুহ্‌য়িদ্দীন আওরঙ্গযীব আলমগীরের সিংহাসন প্রাপ্তির মাধ্যমে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণ এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের সাম্রাজ্যের সংস্কার কর্মের সূচনা

সম্রাট জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের ইনতিকাল হয় হিজরী ১০১৪ সনে। সে সময় হযরত মুজাদ্দিদ-এর বয়স ছিল ৪৩ বছর। আকবরের শাসনামলের শেষ যুগে ভারতবর্ষে ইসলামের সম্মানজনক জীবন ও স্বাধীনতা এবং এদেশে ইসলামের বিজয়ী ও মাথা উঁচু করে টিকে থাকার পক্ষে পরিষ্কার বিপদাশংকা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মুজাদ্দিদ আলফেছানী (রা)-র আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও ক্রমউন্নতির যুগ ছিল এটা। সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের সাথে তাঁর কোন যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল না এবং সে সময়ও তখন আসেনি যে, তারা তাঁর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত তথা নিষ্ঠা ও একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সবকিছু করার তাঁর মন-মানসিকতা ও আধ্যাত্মিক-কামালিয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবেন, হবেন অবগত। এজন্যই আসলেই সেই সম্পর্ক ও যোগসূত্র তখনো তাঁর হাতে আসেনি যার সাহায্যে ও মাধ্যমে তিনি শাহী দরবার পর্যন্ত নিজের অনুভব অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া পৌঁছে দিতে পারেন অথবা দীন ও আইন সম্পর্কে হুকূমতের সাধারণ পলিসির ওপর প্রভাব জমাতে পারতেন। সে সময় সাম্রাজ্যের শাসকদের মেযাজ ও রুচি, সরকার ও রাজদরবার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও প্রশাসনে এমন সব ব্যক্তি জেঁকে বসেছিল যারা কোন মুখলিস ও নিষ্ঠাবান দীনদার লোককে সম্রাটের কাছা-কাছি যাবার সুযোগ দিত না। তারা এসবের চারপাশে এমন এক লৌহ-প্রাকার তৈরি করে রেখেছিল যা ভেদ করে বাইরের সজীব-সতেজ ও নিষ্কলুষ বাতাস এবং দেশের সাধারণ গণ-মানুষের পছন্দ-অপছন্দের কোন পরিমাপ ভেতরে প্রবেশ করতে পারত না। সে সময় ইসলাম ও মুসলমানদের এই বিশাল বিস্তৃত দেশে যেখানে তাদের স্বাধীন সাম্রাজ্য অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল, সেই অবস্থাই ছিল কুরআন মজীদ নিম্নোক্তভাবে যার ছবি এঁকেছে,

ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا

ان لا ملجأ من الله الا اليه ـ

"পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই।" [সূরা তাওবা, ১১৮-আয়াত]

কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের (হি. ১০১৪) পর এই অবস্থা আর থাকেনি। জাহাঙ্গীরের ভেতর সেই বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তথা তা'লীম-তরবিয়তের কারণে যা তিনি তাঁর পিতার ছত্র-ছায়ায় লাভ করেছিলেন, কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় কল্যাণকামিতা, শরা-শরীয়তের প্রতি আকর্ষণ এবং ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের নিয়মিত ও পূর্ণ বাধ্য-বাধকতার সঙ্গে পালন ও পরিষ্কার ধর্মীয় প্রবণতা যেমন পাওয়া যেত না, ঠিক তেমনি তাঁর ভেতর ইসলাম থেকে দূরত্ব ও এর প্রতি কোন প্রকার শংকা কিংবা ভীতি, অপর কোন ধর্মীয় দর্শন কিংবা জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা মুগ্ধ ও প্রভাবিত হওয়া এবং নতুন কোন ধর্ম ও আইন-বিধান জারির প্রতি কোন প্রকার আগ্রহ পরিলক্ষিত হত না। অন্য কথায় তিনি যেমন ইসলামের সমর্থক ছিলেন না, তেমনি ইসলামের প্রতি বিদ্বিষ্টও ছিলেন না। সাধারণত যারা রাজশক্তি ও শাহী তখতের মালিক হন, যেসব শাসক আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হন তারা সাধারণের কাছে প্রিয় ও গৃহীত কোন প্রচলিত রীতি-নীতির বাতিল ও অপসারণ এবং নতুন কোন রীতি-নীতির প্রচলনের ঝুঁকি নিতে চান না। তারা কেবল কাজ ও খেয়ালের মজা ভোগ এবং ক্ষমতা ও রাজত্বের সম্মাননা লাভের আকাংক্ষী। সাধারণভাবে দেখা গেছে, এ ধরনের লোকদের ভেতর এ সমস্ত লোকের প্রতি এক ধরনের গোপন ও প্রচ্ছন্ন ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা এই বস্তুগত স্তর থেকে একটু উঁচুতে এবং এই সব পার্থিব প্রদর্শন সর্বস্ব মানসিকতা ও পদমর্যাদাগত অবস্থানের প্রতি বিমুখ ও নিস্পৃহ হয়ে থাকেন। এসব লোকের মুকাবিলায় যারা কোন পদমর্যাদা লাভের দাবিদার কিংবা কোন নতুন আন্দোলন ও দর্শনের প্রতি আহ্বানকারী হন তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও সামর্থ্য বেশি পাওয়া যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে এ ধরনের শাসকদের সঙ্গেই বেশি সম্পর্কিত ছিলেন এবং তিনি যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন তখন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এবার সাম্রাজ্যের গতি পরিবর্তন এবং ক্রমান্বয়ে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার সময় এসে গেছে।

সঠিক কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি

সে সময় হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) এবং সে সব হযরতের জন্য যাঁরা ইলমে দীন ও বাতেনী কামালিয়াত দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন, স্বয়ং নিজেরা আল্লাহ্‌র ধ্যান-খেয়ালে মশগুল ও আল্লাহ্‌র মাঝে আত্মনিমগ্নতার মত সম্পদ দ্বারা ভরপুর এবং ধর্মীয় মর্যাদাবোধের চেতনায় উদ্দীপ্ত ও মাতাল ছিলেন, ঐ অবস্থার সামনে যা সে সময়কার সাম্রাজ্যের শাসকের ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল, তিনটি রাস্তাই ছিল ঃ

(১) দেশ ও সাম্রাজ্যকে তার নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জন্য এমন কোন নির্জন কোণ বেছে নেওয়া যেখানে নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল, সত্যপথের প্রার্থী ও পথিকদের প্রশিক্ষণ দান এবং ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্র-আযকারের একাগ্রতা ও উৎসাহ লাভ জুটতে পারত। এ ছিল সেই কর্মপন্থা যা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র যুগে বিশের অধিক বরং শত শত আলিম-উলামা ও মাশায়েখ এখতিয়ার করেছিলেন। দেশের সর্বত্র তাঁদের খানকাহ ছিল এবং তাঁরা পূর্ণ একাগ্রতা ও নিরব নিশ্চুপতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকুল তাঁদের থেকে মূল্যবান আধ্যাত্মিক ও ঈমানী ফায়দা লাভ করছিল।

(২) ভারতবর্ষের নামকা ওয়াস্তে মুসলিম সাম্রাজ্য ও তার শাসককে (মুসলিম খান্দানে যার জন্ম নেবার সৌভাগ্য জুটে ছিল) ইসলাম বিরোধী ও ইসলাম দুশমন মনে করে (যা প্রমাণের জন্য বহু আইন-কানূন ও বিধি-বিধান এবং ব্যক্তিগত আমল-আখলাক পাওয়া যেত) এর সংস্কার-সংশোধনের ব্যাপারে একেবারে হতাশ ও নিরাশ হয়ে গিয়ে তার বিরুদ্ধে একটি ধর্মীয় ফ্রন্ট কায়েম করা এবং ইসলামকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ ভেবে তার স্থায়ী বিরোধিতা ও তার বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

যদি এতেও কাজ না হয় তাহলে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, জিহাদ ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উজ্জীবিত এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ভক্ত-অনুরক্ত মুরীদান ও সাথীদেরকে একত্র করে, অতঃপর কোন সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সাম্রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিকতর নেককার ও দীনদার কোন লোককে (চাই কি তিনি মুগল রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ হন এবং হন বাবুরের বংশের সন্তানদের কেউ) বসাবার চেষ্টা করা যিনি গোটা সাম্রাজ্যের গতিমুখ পাল্টে দেবেন এবং অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

(৩) সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও দরবারের অমাত্যদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করে, যাঁদের সঙ্গে প্রথম থেকেই সম্পর্ক আছে এবং তারাও তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁর ইখলাস, আন্তরিক নিষ্ঠা ও অর্ন্তজ্বালার ওপর যাঁরা আস্থাশীল, তাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনা ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে এবং তাঁদের দিলের ভস্মস্তূপের মধ্যে যেই ঈমানী অগ্নিস্ফূলিঙ্গ চাপা পড়ে আছে তাকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় করে সম্রাটকে সৎ পরামর্শ প্রদানে অনুপ্রাণিত করা, তার ইসলামী চেতনাকে যা আপন পিতা-পিতামহ ও পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছেন আলোড়িত ও আন্দোলিত করা, তাকে ইসলামের সমর্থন, মুসলমানদের আহত দিলের সুচিকিৎসা ও বিগত যুগের ক্ষতিপূরণে উদ্বুদ্ধ করা, নিজে সর্বপ্রকার পদ ও মর্যাদা বরং এর ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলা এবং এ সবের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা, পরিপূর্ণ যুহ্দ ও নিস্পৃহতার প্রমাণ পেশ করা, রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের যারা উপযুক্ত তাদের

হাতেই রাজত্ব ও সাম্রাজ্য থাকুক এবং যারা যেসব পদ ও পদমর্যাদার উপযুক্ত তাদের কাছেই এসব থাকুক, এগুলো তাদেরকে সোপর্দ করা, এমন উঁচু দৃষ্টি ও নিঃস্বার্থপরতার প্রকাশ যাতে করে কোন কট্টর থেকে কট্টরতম বিরোধী ও চরমতম হিংসুকও পদমর্যাদা কামনা ও ক্ষমতা লাভের অপবাদ দিতে না পারে এবং কোন বিরোধী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রও যেন এ ব্যাপারে সফল হতে না পারে।

প্রথম নম্বর সম্পর্কে যতটা বলা যায় তাহলো এই যে, হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর পতিত স্বভাব এবং তাঁর শানে আযীমত তথা অটুট সংকল্পের শান ও সেই উচ্চ পদমর্যাদার সঙ্গে, যা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করেছিলেন, এর আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব-এর স্বীয় আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও প্রশিক্ষণের পরই একথার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়ে অন্য কোন কাজই করিয়ে নিতে চান এবং তাকে শুধুই কতকগুলো আবশ্যকীয় ও ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগী ও উন্নতি এবং পীর-মুরীদির জন্য পয়দা করা হয়নি। তিনি তাঁরই সিলসিলার একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শায়খ ও তরীকার ইমাম হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার (মৃ. ৮৯৫ হি.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করে প্রকারান্তরে নিজেকেই সেই স্থানে তুলে ধরেছেন। খাজা উবায়দুল্লাহ বলতেন ঃ

اگرمن شیخی کنم هیچ درعالم مرید نیابد امام مرا کاردیگر فرموده اند وان - ترویج شریعت وتائید ملت است ـ

"আমি যদি কেবল পীর-মুরীদি করতে নেমে পড়ি তাহলে দুনিয়ার বুকে অন্য কোন পীর মুরীদ পাবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে অন্য কোন কাজ সোপর্দ করেছেন; সে কাজ হল, শরীয়তের প্রচলন এবং মুসলিম মিল্লাতের সমর্থন-সহযোগিতা।"

অতঃপর উল্লিখিত বাক্যটিরই আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঃ

لاجرم بصحبت سلاطین منی فتند وبتصرف خود ایشان رامنقادمی - ساحتند وبتوسل ایشان ترویج شریعت می فرمودند ـ

"তিনি রাজা-বাদশাহদের দরবারে যেতেন এবং আপন আধ্যাত্মিক শক্তি ও রূহানী তাছীর তথা রূহানী প্রভাব দ্বারা তাদেরকে নিজের অনুগত ও বাধ্য বানিয়ে নিতেন। এরপর তাদের দিয়ে শরীয়ত জারী করতেন"।[১]

১. মকতূব নং ৬৫, খানে আজমের নামে।

দ্বিতীয় নম্বর সম্পর্কে যতটা বলা যায় যে, এটি এমন একজন রাজনৈতিক মানসিকতা পোষণকারী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী দা'ঈ অথবা নেতার কর্মপন্থা হতে পারে যিনি তার কাজ সন্দেহ-সংশয় ও খারাপ ধারণা নিয়ে শুরু করেন এবং আপন সত্বরতা প্রিয়তা, দাওয়াতী প্রজ্ঞা ও কৌশল এবং কল্যাণ কামনা ও উপদেশ প্রদানের ওপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ ঘোষণাকে অগ্রাধিকার দেবার পরিণতিতে সমকালীন হুকূমত ও ক্ষমতাধিকারীদেরকে স্বীয় প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে ফেলেন এবং ধর্মের বিজয়ী হবার সম্ভাবনা ও ক্ষেত্রকে আরও বেশি সংকীর্ণ করে তোলেন। একজন দা'ঈ ইলাল্লাহ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী) ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মপন্থা এ হতে পারে না যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আপন ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা দলীয় স্বার্থের জন্য ক্ষমতা লাভ নয়, কেবল দীনের প্রাধান্য ও বিজয় এবং আহকামে শরীয়তের প্রয়োগ ও প্রচলন যার একমাত্র লক্ষ্য তা সে যার হাত দিয়েই তা হোক না কেন।

কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপের সম্পর্ক যতটা তাতে করে একথা বলা যায় যে, এ পথ ছিল কঠিন বিপদ-আপদ পরিপূর্ণ এবং ভারতবর্ষের সে সময়কার রাজনৈতিক চিত্র ও পরিবেশে ইসলাম সম্পর্কে তা এক ধরনের আত্মহত্যার পথে একটি পদক্ষেপ হত। মোগল সাম্রাজ্যের ভেতর, যেই সাম্রাজ্য সম্রাট বাবর তাঁর সুদৃঢ় হাতে কায়েম করেছিলেন, হুমায়ুন যার জন্য ইরানের সপ্ত প্রদেশ অতিক্রম করেছিলেন এবং আকবর উপর্য্যুপরি বিজয় ও দেশের পর দেশ জয় করে তাকে সুদৃঢ় করেছিলেন, যেই সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কোন আলামত তখন পর্যন্ত জাহির হয় নি, শের শাহ্ সূরীর মত অটল মনোবলসম্পন্ন সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত সুলতান সলীম্ শাহও তাকে খতম করতে সক্ষম ও সফল হননি। বিভিন্ন সময় মোগল শাসনের বিরুদ্ধে দেশে উত্থিত বিদ্রোহগুলোর সবটাই ব্যর্থতায় পযবর্সিত হয়। এরপরও যদি মোগল শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করার প্রয়াস সফলও হত তবুও এর সমূহ আশংকা ছিল যে, রাজপূতরা যারা সম্রাট আকবরের শাসনামলে বিশেষভাবে উচ্চ পদগুলো লাভ করেছিল, যাদের সামরিক শক্তি স্বয়ং সাম্রাজ্যের অধিপতিদের কাছেই ছিল সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পুঁজি, হুকূমতের ওপর জেঁকে বসত এবং এদেশে মুসলিম শাসন চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত।

তাছাড়া এ ধরনের প্রয়াস এর আগেও ব্যর্থ হয়েছিল। সম্রাট আকবরের শাসনামলে শায়খ বায়েযীদের, যিনি 'পীরে রৌশন' (আলোর পীর) এবং 'পীরে তারীক' (অন্ধকারের পীর) এই পরস্পরবিরোধী নামে বিখ্যাত, নেতৃত্বে এক বিরাট বড় ধর্মীয় আন্দোলন এবং তানযীমে ফের্কা রৌশ্‌নাইয়া নামে শুরু হয়েছিল। শায়খ বায়েযীদ বছরের পর বছর ধরে মোগল সালতানাতের প্রবল পরাক্রান্ত সেনাবাহিনীকে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করেছিলেন। তিনি কোহে

সুলায়মানকে ঘাটি বানিয়ে খায়বার গিরিপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর ওপর আক্রমণোদ্যত হন। সম্রাট আকবর তার মুকাবিলায় রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল ও যয়েন খানকে পাঠান। কিন্তু তারা সবাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। রাজা বীরবল তো এক সংঘর্ষে মারাই যান। রৌশনাইয়ারা এক বিরাট বাহিনীর সাহায্যে গযনী দখল করে নেয়। এই ফেতনা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে দমন করা হয় এবং সম্রাট শাহজাহানের আমলেই কেবল পরিপূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের পরিণতি একমাত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই হয় নি। শেষাবধি তাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত মোগল সাম্রাজ্যের সামনে মাথা নত করতেই হয় এবং ইতিহাসে কেবল তার নামটিই অবশিষ্ট থাকে।

এ জাতীয় সামরিক পদক্ষেপ যা কোন সংস্কারের নামে গ্রহণ করা হয় সাম্রাজ্য ও ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের নানা রকম বদগুমান ও কুধারণার টার্গেটে পরিণত হয় এবং তারা ধর্মকেই নিজেদের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ধরে নিয়ে এর উৎসাদন ও নির্মূলকরণের ও এর অনুসারী ও সমচিন্তার লোকদের খুঁজে বের করে তাদেরকে উৎখাতের কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। সম্ভবত এরই ওপর ভিত্তি করে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দীত্ববরণ এবং সেনাবাহিনীর সাথে থাকার দায় থেকে রেহাই পাবার চার-পাঁচ বছর পর হি. ১০৩৫ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বিখ্যাত আমীর ও উযীর মহাবত খান যখন বিদ্রোহ করেন তখন দূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাকে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা পান। মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র ঈমানী দূরদর্শিতার এটি বিরাট বড় দলীল এবং তৌফিকে ইলাহীর এটি আলোকোজ্জ্বল প্রমাণ ছিল যে, তিনি অবস্থার মধ্যে বিপ্লব আনার জন্য বিপদপূর্ণ ও সন্দেহজনক রাস্তা এখতিয়ার করেন নি এবং ধ্বংসের পরিবর্তে নির্মাণ, নিগেটিভের পরিবর্তে পজিটিভ ও অবসান-উৎসাদনের পরিবর্তে স্থাপনের পথ ধরেন যা সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ ও ক্ষতির আশংকা থেকে মুক্ত ছিল।

এরপর মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সামনে একটি রাস্তাই অবশিষ্ট থাকে আর তা এই যে, সাম্রাজ্যের সেই সব আমীর-উমারা ও অমাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন যাঁরা আর যাই হোক মুসলমান ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব আপন গভীর জ্ঞান ও আল্লাহ-প্রদত্ত মেধার সাহায্যে জেনেছিলেন যে, আকবরের শাসনামলের ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা ও প্রোগ্রামে তাঁরা শরীক ছিলেন না। তারা আকবরের বহু পদক্ষেপকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু কী করবেন? তাঁরা অসহায় ছিলেন, মজবূর ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইসলামের প্রতি ভালবাসা এবং ধর্মীয় চেতনা ও মর্যাদাবোধ থেকে মুক্তও ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর শায়খ ও মুরশিদ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ এবং স্বয়ং তাঁর সঙ্গে পীর-মুরীদির

সম্পর্ক না থাকলেও প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তাঁরা হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, স্বার্থলেশহীনতা, ইসলামের জন্য দরদ ও ব্যথা সম্পর্কে জানতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিশিষ্ট। যেমন নওয়াব সাইয়েদ মুর্তাযা ওরফে শায়খ ফরীদ (মৃ. ১০২৫ হি.), খানে আজম মির্যা কোকা (মৃ. ১০৩৩ হি.), খান জাহান লোদী (মৃ. ১০৪০ হি.), সদর জাহাঁ পাহানবী (মৃ. ১০২৭ হি.) ও লালা বেগ জাহাঙ্গীরি।

মুজাদ্দিদ সাহেব উল্লিখিত আমীর ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করেন এবং তাঁদের সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করেন এবং কাগজের পৃষ্ঠায় দিলের ব্যথাকে টুকরো টুকরো করে স্থাপন করেন। এসব পত্র আপন ব্যথা ও ইখলাস, আবেগ ও প্রভাব, কলমের জোর ও লেখনী শক্তির দিক দিয়ে সেসব চিঠি-পত্র সংকলনের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার যা দুনিয়ার যে কোন ভাষায় এবং যে কোন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে লেখা হয়েছে এবং শত শত বছর অতিবাহিত হবার পর আজও তার ভেতর প্রভাব ও চিত্তাকর্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়।[১] এথেকেই পরিমাপ করা যায় ঐসব পত্র যাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল তাদের দিলের ওপর তা কী প্রভাব ফেলেছিল। প্রকৃত অর্থে এসব পত্রই মুজাদ্দিদ সাহেবের দাওয়াত ও তাবলীগের দূত, তাঁর আহত দিলের সঠিক মুখপাত্র, অশ্রুর ফোটা ও দিলের টুকরো এবং হিজরী দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে যেই বিরাট বিপ্লব সাধিত হয় এতে তাঁর মৌল অংশ ও সবচে' বড় ভূমিকা রয়েছে।

সাম্রাজ্যের আমীর-উমারার নামে প্রেরণামূলক ও দাওয়াতী পত্র

ঐসব প্রেরণামূলক ও দাওয়াতী পত্রের একটি বিরাট অংশ নওয়াব সাইয়েদ ফরীদের[২] নামে প্রেরিত হয় যিনি মোগল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং

১. মকতূবাতের সাহিত্যিক মান ও মর্যাদা সম্পর্কে লেখকের সেই পর্যালোচনা পাঠ করা জরুরী যা তিনি "তারীখে দাওয়াত ও আযীমত" (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস)-এর তৃতীয় খণ্ডে হযরত মখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রীর "মকতূবাত সহ-সদী" এবং "মকতূবাতে ইমাম রব্বানীর" আলোচনায় যা লেখা হয়েছে তা পাঠ করা যেতে পারে।

২. আমীরে কবীর নওয়াব মুর্তাযা ইবন আহমদ বুখারী যিনি সাইয়েদ ফরীদ নামে সমধিক পরিচিত, অত্যন্ত বিশাল ব্যক্তিত্ব, ব্যাপক গুণাবলী ও বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। রাজনীতি ও প্রশাসন, বদান্যতা ও অনুগ্রহ বিতরণ, বিনয় ও আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও দীনদার ধর্মভীরু লোকদের প্রতি ভালবাসা, উচ্চ মনোবল ও সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গির বিস্ময়কর নমুনা ছিলেন। আকবরের শাসন আমলেই মীর বখশীর পদ পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ করেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসতেই তাঁর আরেক দফা পদোন্নতি ঘটে এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন ও মুর্তাযা খান উপাধি লাভ করেন। প্রথমে গুজরাট, পরে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত হন যে পদে তিনি দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত থাকেন। দানের ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। কখনো কিছু না থাকলে শরীরের কাপড়টুকু পর্যন্ত দান করে দিতেন। বিধবা, অভাবী ও প্রয়োজন মুখাপেক্ষী লোকদের জন্য তিনি দৈনিক ও বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। পিতৃহীন সন্তানদের ওপর পিতার ন্যায় স্নেহ-মমতা বিতরণ করতেন। বিবাহ উপযোগী গরীব মেয়েদের বিয়ে ও যৌতুকের ব্যবস্থা করা তাঁর প্রিয় নেশা ছিল। তাঁর দস্তরখানে প্রতিদিন দেড় হাজারের কাছাকাছি লোক খেত। ফরীদাবাদ শহর তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিঃ ১০২৫ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। নু-খা. ৫ম খণ্ড।

প্রাদেশিক গভর্নরদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং আকবরের শাসন আমল থেকে সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন লোক ছিলেন। হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর নেতৃত্ব ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ থেকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী ফায়দা উঠিয়ে এবং এর দোহাই দিয়ে তাঁকে তাঁর নিজের দায়িত্ব ও পারিবারিক কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করেন যাতে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সাম্রাজ্যের গতিমুখ আকবরের রেখে যাওয়া পথে চলতে থাকা ইসলামের চাহিদা ও দাবিসমূহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও সম্পর্কহীনতা, ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দুর্দশা ও অসহায় অবস্থা থেকে দীনের সাহায্য-সমর্থন ও ইসলামের প্রতীক ও বিধি-বিধানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, এসব পত্রের ওপর তারিখ লেখা নেই। নইলে দাওয়াতের হেকমত ও ক্রমিক অগ্রগতির কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে আসত এবং জানা যেত তিনি কিভাবে তাকে যাকে তিনি চিঠি লিখেছেন এবং পত্র প্রাপক কিভাবে সম্রাটকে, অতঃপর সম্রাট কিভাবে সাম্রাজ্যের গতিমুখকে ইসলামের সাহায্য-সমর্থনের পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং বিগত হুকূমতের প্রভাব বলয় কিভাবে ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর ও নিস্তেজ থেকে নিস্তেজতর হল এবং সেই জায়গা ইসলাম দোস্তি ও ইসলাম পরিচিত নেওয়া শুরু করল। আমরা আমাদের পরিমাপ মুতাবিক সে সব পত্রের উদ্ধৃতি কিছুটা বিন্যস্ত সহকারে পেশ করছি।

নওয়াব সাইয়েদ ফরীদ বুখারীকে লিখিত একপত্রে, যা সম্ভবত সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের পর পরই লেখা হয়েছিল, লিখছেন ঃ

আপন শ্রদ্ধেয় পিতা-পিতামহদের, বিশেষ করে সায়্যিদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর দৃঢ়পদ থাকার দোআ করার পর লিখেছেন ঃ

"সম্রাটের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক ঠিক তেমনি যেমন সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে মনের। যদি মন ভাল থাকে, সুস্থ থাকে তাহলে শরীরও সুস্থ সবল থাকবে। আর মন যদি ভাল না থাকে তাহলে শরীরও খারাপ হবে, শরীরের ওপর এর প্রভাব পড়বে। সম্রাটের ভাল থাকাটার অর্থ দুনিয়াও ভাল থাকবে আর তাঁর খারাপ হবার অর্থ হবে দুনিয়া জাহানটাই খারাপ হওয়া।

"আপনার বেশ ভালই জানা আছে যে, বিগত কালে (আকবরের রাজত্ব কালে) মুসলমানদের মাথার ওপর দিয়ে কি বিপদের ঝড়টাই না বয়ে গেছে। এর পূর্বেকার শতাব্দীগুলোতে ইসলামের অসহায় অবস্থা থাকলেও মুসলমানদের লজ্জা ও অপমান

এর চেয়ে বেশি হয়নি। সে যুগে বেশির থেকে বেশি এই হয়েছে, মুসলমানরা নিজেদের ধর্মের ওপর থেকেছে এবং কাফির মুশরিকরা তাদের পথে অনড় থেকেছে। لكم دينكم ولى دين কিন্তু বিগত দিনগুলোতে অবিশ্বাসী কাফিররা প্রাধান্যে এসে খোলামেলা ভাবে ও প্রকাশ্যে মুসলিম দেশে কুফরী বিধানগুলো চালু করতো এবং মুসলমানরা ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ প্রকাশ করতে বাধ্য ছিল। যদি কেউ সাহসও করত তাহলে তার ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড জুটতো. واحسرتاه واحزاناه، ومصيبتاه، واويلاه হায় আফসোস! হায় কি মুসীবত! হায় কি নিদারুন দুর্ভোগ! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (যিনি আল্লাহ্ রাব্বুল-'আলামীনের মাহবুব) অনুসারীরা ছিল অবমানিত ও লাঞ্ছিত আর তাঁর নবূওত অস্বীকারকারীরা সম্মানিত ও আস্থাভাজন! মুসলমানরা ছিল তাদের আহত দিল্ নিয়ে ইসলামের বিলাপ গানে মত্ত আর প্রতিপক্ষ দুশমনেরা হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-মস্করার সাথে তাদের কাটা ঘায়ে নুন ছিটাচ্ছিল। হেদায়েতের প্রদীপ্ত সূর্য গোমরাহীর নিকষ কালো আধারের বুকে মুখ লুকিয়ে এবং সত্যের উজ্জ্বল আলো (নূর) ছিল বাতিল তথা মিথ্যার পর্দান্তরালে প্রচ্ছন্ন ও লুক্কায়িত।

"আজ যখন ইসলামের বিজয় ও সৌভাগ্য রবির পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর ও অপসৃত হবার এবং মুসলমানদের বাদশাহ সাম্রাজ্যের প্রধান হিসাবে সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের কানে কানে পৌঁছে গেছেন, মুসলমানেরা যখন তাদের অনিবার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাবছেন যে, তারা বাদশাহকে সাহায্য করবেন, সাহায্য করবেন শরীয়তের বিধান চালু করা ও মুসলিম মিল্লাতকে শক্তিশালী করার পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে, চাই সে সাহায্য ও শক্তি জোগান মুখ দিয়ে হোক কিংবা হাতে কলমে।"

অতঃপর কয়েক লাইন পর বিগত আমলের রোগ-ব্যাধি সঠিকভাবে সনাক্ত করে তিনি লিখছেন ঃ

"বিগত আমলে যেসব বিপদ-আপদ মুসীবতই মাথার ওপর এসেছে তা এসেছে উলামায়ে সূ' দলের অপকর্মের কারণেই। রাজা-বাদশাহদের এসব লোকই সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেয়। মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে যেই বাহাত্তর ফের্কা সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যে পথভ্রষ্টতার রাস্তা ধরেছে তাদের অনুসরণীয় নেতা ছিল এসব উলামায়ে সূ'ই।

"উলামায়ে কিরামের মধ্যে এমন পথভ্রষ্ট লোক কমই হবেন যাদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলবে, আছন্ন করবে। ঐ যুগের অধিকাংশ দরবেশরূপী মূর্খ সূফীও 'উলামায়ে সূ'র প্রভাব রাখে। তাদের সৃষ্ট ফেতনা-ফাসাদও বিধেয় ফাসাদ। যদি কোন লোক এই কল্যাণকর কাজে (দীনের সাহায্যের কাজে) দীনকে সাহায্য করার শক্তি-সামর্থ্য রাখে, যদি সে এক্ষেত্রে কোনরূপ দুর্বলতার

প্রকাশ ঘটায় এবং কারখানা ও ইসলামের ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে ত্রুটি ও গাফিলতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত হবে। এরই ওপর ভিত্তি করে এই নগণ্য ও দুর্বল চায় যে, সে মুসলিম সাম্রাজ্যের সাহায্যকারীদের কাতারে শামিল হোক এবং আপন সাধ্য মুতাবিক চেষ্টা-তদবীর চালিয়ে যাক। কেননা من كثر سواد قوم فهو منهم আশ্চর্য কি যে, এই অসহায় ও দুর্বলকে সেই মহান জামা'আতে শামিল করে নেয়া হবে। অধম তার দৃষ্টান্ত সেই বৃদ্ধার সাথে পেশ করতে চায় যে কিছু রশি নিলামে চড়িয়ে নিজেকে ইউসুফ (আ)-এর ক্রেতাদের কাতারে অর্ন্তভুক্ত করতে চেয়েছিল। আশা করি, খুব সত্বর এই ফকীর আপনার খেদমতে হাযির হবে। আপনার খেদমতে তার এও প্রত্যাশা, যেহেতু আপনি সম্রাটের বিশিষ্ট নৈকট্যধন্য এবং এসব কথা সম্রাটের গোচরে আনার সহজ সুযোগও আপনার আছে। অতএব আপনি প্রকাশ্যে অথবা নির্জনে একান্তে শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রচলনে কোশেশ করবেন এবং মুসলমানদেরকে এই দীন ও দরিদ্র-দশা থেকে বের করে আনবেন।"[১]

সাইয়্যিদ ফরীদের নামে অপর এক পত্রে বলেন,

"এই মুহূর্তে অসহায় মুসলমানেরা যারা এরূপ দুর্দশা ও অসহায় অবস্থার শিকার, মুক্তির আশা আহলে বায়ত-এর নৌকার সাথেই জুড়ে দিয়েছে। মহানবী (সা)-এর ইরশাদ ঃ مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك "আমার আহলে বায়ত-এর উদাহরণ হল নূহ-এর কিশতীর ন্যায়। যে তাতে আরোহণ করল মুক্তি পেল, বেঁচে গেল। আর যে পেছনে পড়ে রইল সে ধ্বংস হল।"[২]

"আপনি আপনার বুলন্দ হিম্মতকে সেই মহান লক্ষ্যের ওপর নিবদ্ধ করুন যাতে করে এই মহাসৌভাগ্যের অধিকারী আপনি হতে পারেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রভাবমণ্ডিত মর্যাদা ও শান-শওকত আপনার আছে। এই ব্যক্তিগত আভিজাত্য ও বংশগত মর্যাদার সাথে সাথে এই সৌভাগ্যও যদি আপনার ভাগ্যে জুটে যায় তাহলে সকল সৌভাগ্যবানদের আপনি ডিঙিয়ে যেতে পারবেন। এই নগন্য অধম এ ধরনের কিছু কথা আপনার সমীপে পেশ করার জন্য, যার উদ্দেশ্য ইসলামী শরীয়তের সমর্থন-সহযোগিতা ও প্রচলন, আপনার খেদমতে আগমনের অভিপ্রায় পোষণ করে।"[৩]

তৃতীয় আরেক পত্রে তিনি বলেন,

"সম্মানিত মহাত্মন! আজকের দিনে ইসলাম বড়ই অসহায় ও অপরিচিতির শিকার। একটি পয়সাও যদি কেউ এ মুহূর্তে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যয় করে

১. মকতূব নং ৪৭, ১ম দফতর;
২. মেশকাত, আবু যর (রা) বর্ণিত, মুসনাদ আহমদ সূত্রে;
৩. মকতূব ৫১, ১ম দফতর;

কোটি কোটির বিনিময়ে তা ক্রয় করা হবে। দেখা যাক, আল্লাহ পাক কোন সৌভাগ্যবানকে এই মহা সম্পদ দানে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেন। দীনের প্রচলন ও মুসলিম মিল্লাতকে শক্তিশালী করার কাজ যে যুগে যার দ্বারাই সম্পাদিত হোক তা উত্তম বিবেচিত হবে এবং তিনি সৌভাগ্যবান হবেন। বিশেষত এ সময় ইসলাম অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় রয়েছে এবং আপনার মত একজন সাইয়েদ বংশধরের জন্য এটাই শোভন হবে যে, এই সম্পদ আপনার খান্দানের জন্য পারিবারিক সম্পদ হবে। আপনার জন্য হবে তা সরাসরি নিজস্ব আর অন্যের জন্য তা হবে মাধ্যম। এই সম্পদ লাভের মধ্যে আপন পূর্বপুরুষের ওয়ারিশ হওয়া বিরাট মূল্য বহন করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে একবার বলেছিলেন, তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলা দশভাগের একভাগও যদি ছেড়ে দাও তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাদের পর একদল এমনও আসবে যে, তারা আদেশ-নিষেধগুলোর দশভাগের একভাগের ওপর আমল করলেও নাজাত পেয়ে যাবে। এই সময়ই সেই সময় এবং এই দলই সেই দল।"

گوئے توفیق وسعادت درمیان افگندہ اند

کس بہ میداں درنمی اید سواراں راچہ شد ۔

সাইয়িদ ফরীদের পর হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর বাছাইয়ের দৃষ্টি মোগল সাম্রাজ্যের অপর সভাসদ খানে আজম [১]-এর ওপর গিয়ে পড়ে যিনি শাহী খান্দানের ঘনিষ্ঠ ও নিকট সান্নিধ্যে ছিলেন। জাহাঙ্গীরও তাঁর গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা অনুভব করতেন। নকশ্‌বান্দিয়া সিলসিলার বুযুর্গদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহনের পরই সম্ভবত হযরত মুজাদ্দিদ তাঁকে নিম্নোক্ত পত্রটি লিখেছিলেন ঃ

ایدکم الله سبحانه ونصرکم علی الاعداء الاسلام فی اعلاء الاسلام ۔

---

১. মির্যা আযীযুদ্দীন নামে আকবরের একজন দুধ ভাই হবার সুবাদে কোকা এই খেতাব লাভ করেছিলেন। প্রথম তাঁর বাড়ি ছিল গযনীতে। এরপর তিনি দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। হিজরী ৯৮০ সালে তিনি গুজরাটের সুবেদার (গভর্নর) ছিলেন। তাঁকে মুহাম্মদ হুসায়ন মির্যার অবরোধ থেকে মুক্ত করবার লক্ষ্যে সম্রাট আকবর আগ্রা থেকে এক হাজার চারশো মাইল দূরে অবস্থিত আহমদাবাদ-এর সফর মাত্র নয় দিনে করেছিলেন। গুজরাটের পর বাংলা ও বিহারের সুবেদার হন। 'খানে আজম' উপাধি লাভ করেন। এই রূপ নিকট ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্ত্বেও আকবরের শরা-শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের দরুন তিনি তাকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন। এতদসত্ত্বেও শাহী সীলমোহর 'উযূক' তাকে সোপর্দ করা হয়েছিল এবং তাকে "উকীল মুতলাক"-এর পদ দান করা হয়। জাহাঙ্গীরও তাঁকে হুকূমতের গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলেন এবং গুজরাটর সূবেদারী প্রদান করেন। হি. ১০৩৩ সালে ইনতিকাল করেন (নুযহাতুল-খাওয়াতির, সংক্ষেপিত)।

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করুন, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ইসলামের বুলন্দী ও সমুন্নতির জন্য তোমাদেরকে সাহায্য করুন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ ঃ

الاسلام بداء غريبا وسيعود كما بداء فطوبى للغرباء ۔

"অসহায় ও অপরিচিতির মাঝ দিয়ে ইসলামের সূচনা হয়েছে, আবার সেই একই অসহায় ও অপরিচিতির মাঝেই সে ফিরে আসবে। অতএব তাদের জন্য মুবারক হোক যারা এই অবস্থার শরীক হবে।"

"ইসলামের এই অসহায় অবস্থা এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, কাফিররা প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে ইসলামের ওপর কটুকাটব্য করছে ও মুসলমানদের নিন্দা করছে এবং বাধাহীনভাবে কুফরী ও অনৈসলামী বিধানসমূহ জারী করছে এবং খোলা বাজারেও এসবের প্রশংসা গীত গাইতে লজ্জাবোধ করছে না। এর বিপরীতে মুসলমানরা ইসলামের হুকুম-আহ্কাম তথা বিধি-বিধান জারী করতে অসহায় বোধ করছে। আর কেউ যদি ইসলামী বিধানের ওপর আমল করে সেজন্য তাকে নিন্দিত ও ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়।"

پری نهفتهٔ رخ وديو درکرشمه وناز

بسوخت عقل ز حيرت که ايں چه بوالعجبی است ۔

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

"আজকের দিনে জনাবের অস্তিত্বকে আমরা মূল্যবান ও দুর্লভ মনে করি এবং হেরে যাওয়া বাজিতে আপনি ছাড়া আর কাউকে আমরা ময়দানে পাচ্ছি না। আল্লাহ্ আপনার মদদগার ও সাহায্যকারী। بحرمة النبى واله الامجاد عليه وعليهم الصلوات والتحيات والتسليمات والبركات হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, لن يومن احدكم حتى يقال انه مجنون 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পার না, পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাগল বলা হয়'। এই মুহূর্তে সেই পাগলামী যার ভিত্তি হল ইসলামী মর্যাদাবোধের আধিক্য তা আপনার স্বভাব ও প্রকৃতিতেই অনুভূত হয়। الحمد الله سبحانه على ذلك আজকের দিন সেই দিন যে, অল্প আমলকেই বিরাট পুরস্কারের বিনিময়ে বিরাট সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন। আসহাবে কাহ্ফ থেকে একমাত্র বাস্তব হিজরত ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য আমল হয়েছে বলে প্রমাণিত নয় যাকে এত গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। দুশমনের প্রাধান্য ও জয়লাভের মুহূর্তে যদি বিশ্বস্ত ও অনুগত সৈনিক সামান্য দৃঢ়তাও প্রদর্শন করে তাহলে সে বিরাট সম্মানের অধিকারী হয় সে সময়ের বিপরীতে

যখন শান্তিকালীন সময় এবং শত্রু তার নিজ অবস্থানে থাকে। বাক জিহাদের এই মওকা যা আজ আপনার সামনে সমুপস্থিত আপনার জন্য শ্রেষ্ঠতম জিহাদ, জিহাদে আকবর। একে দুর্লভ সুযোগ মনে করুন, সম্পদ মনে করুন এবং هل من مزيد আরও আছে কি! বলুন। এই বাক জিহাদকে অসির যুদ্ধের চেয়েও উত্তম ভাবুন। আমরা দীন-হীন ফকীর মানুষ, অসহায় দুর্বল। আমরা এই সম্পদ থেকে মাহরূম।

هنيئالارباب النعيم نعيمها

وللعاشق المسكين مايتجرع

داديم تراز گنج مقصود نشاں

گرمانه رسيديم تو شايد برسى -

এর কয়েক লাইন পরই লিখছেন,

"বিগত শাসনামলে দীনে মোস্তফা (ইসলাম)-এর সাথে যেই শত্রুতামূলক আচরণ চোখে পড়ত আজকের আমলে বাহ্যত ও দৃশ্যত সেই শত্রুতা নেই। আর যদি থাকেও তাহলে তা অজানা ও অজ্ঞতার কারণে। আশংকা হয়, না জানি এখানেও ব্যাপারটা সেরূপ শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

"جوبيد بر سر ايمان خيش مى لرزم"[১]

জাহাঙ্গীরের দরবারের অপর একজন উঁচু পদাধিকারী খান জাহানের[২] নামে এ ধরনেরই একটি বিষয় সংক্ষেপে লিখেছেন ঃ

"আপনি যেই খেদমত ও দায়িত্বে নিয়োজিত ও অধিষ্ঠিত যদি তা শরীয়তে মোস্তফার ওপর আমল করার সাথে একত্র করে নেন তাহলে আম্বিয়া, আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়াস সালাম-ওয়ালা কাজ করবেন (তাঁদের ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) এবং মজবুত দীনকে আলোকিত ও শোভিত করবেন। আমরা ফকীররা যদি বছরের পর বছরও প্রাণান্তকর পরিশ্রম করি তবু এই আমলের ক্ষেত্রে আপনাদের মত পুরুষ সিংহদের আশেপাশেও পৌঁছুতে পারব না।"

১. মকতূব নং ৬৫, ১ম দফতর।
২. আমীরে কবীর খান জাহান ইবন দৌলত খান লোদী। জাহাঙ্গীর তাঁকে বিশ্বাস করতেন এবং খুব ভালবাসতেন। খুবই ইল্‌ম দোস্ত ও উলামা-ই-কিরামের প্রতিপালনকারী ছিলেন। শাহজাহানের আমলে বিদ্রোহ করেন এবং ১০৪০ হিজরীতে তাঁকে হত্যা করা হয় (নুযহাতুল-খাওয়াতির)।

گوئے توفیق وسعادت درمیاں افگندہ اند ۔

کس بہ میداں درنمی اید سواراں راچہ شد ۳

অন্য এক বিস্তারিত পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

"সেই সম্পদ যেই সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে ধন্য করেছেন এবং লোকে তার মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত (এবং আমার আশংকা হয় যে, সম্ভবত আপনি নিজেও সে বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নন) তা এই যে, সমকালীন বাদশাহ সাত পুরুষ ধরে মুসলমান এবং তিনি আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের লোক, হানাফী মাযহাবের অনুসারী। যদিও কয়েক বছর থেকে এই যুগে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী এবং নবীযুগ থেকে দূরবর্তী হবার দরুন কিছু কিছু লোক যারা লেখাপড়া জানেন, লোভের বশবর্তী হয়ে যা ভেতরের গলদের পরিণতি বৈ নয়, শাসক ও রাজা-বাদশাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করে তাদের তোষামোদ ও চাটুকারিতায় (ইসলামের মত) মজবুত দীনের ভেতর সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সহজ সরল লোকগুলোকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। জাহাঙ্গীরের মত প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট যখন তাঁর কথা গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে শোনেন এবং তাঁকে মূল্য দেন তখন কেমন দুর্লভ সুযোগ যে, তিনি সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে হক-কথা (ইসলামের কথা) যা আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস মুতাবিক (আল্লাহ্ তার প্রয়াস কবুল করুন) সম্রাটের কাছে তুলে ধরবেন এবং যতটুকু অবকাশ হয় সত্য পথের পথিকদের কথা সামনে তুলে ধরতে থাকবেন বরং বরাবর এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন যাতে এমন কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়ে না যায় যে, মাযহাব ও মিল্লাতের কথা মাঝখানে এসে যায় যাতে করে ইসলামের সত্যতা এবং কুফরের মিথ্যা ও বাতিল হবার বিষয়টির প্রকাশের সুযোগ মেলে।"[১]

সাম্রাজ্যের ঐসব অমাত্য ও সভাসদ ছাড়াও তিনি আরেকজন উচ্চ পদাধিকারী লালা বেগকেও এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি পত্র লেখেন যিনি সম্রাট আকবর-পুত্র সুলতান মুরাদের বখ্‌শী ছিলেন এবং এক সময় বিহারের গভর্নরও ছিলেন। তিনি লিখছেন ঃ

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের, বিশেষভাবে আপনাদের ইসলামী মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি করে দিন। ইসলামের অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্য-দশার একশ' বছর হচ্ছে। এতদূর পর্যন্ত তা পৌছে গেছে যে, মুসলিম দেশগুলোতে কাফিররা কেবল কুফরী ও অনৈসলামী বিধান জারী করাতেই সন্তুষ্ট হয় না। তারা চায় যে, ইসলামের

---

১. মকতূব নং ৮১, ১ম দফতর।

হুকুম-আহকাম একেবারেই মিটে যাক এবং মুসলমান ও মুসলমানিত্বের কোন প্রভাব যেন অবশিষ্ট না থাকে। তারা ব্যাপারটাকে এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান কোন ইসলামী শি'আর (প্রতীকী চিহ্ন) যেমন গরু যবেহ্-এর প্রকাশ ঘটায় তাহলে তাকে এজন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রদান করা হয়"।[১]

সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেছেন ঃ

"রাজত্বের প্রথম দিকেই যদি মুসলমানিত্বের প্রচলন ঘটে এবং মুসলমানরা কিছুটা সম্মান অর্জনে সক্ষম হয় তবে তো খুবই ভালো। আর যদি আল্লাহ্ না করুন, তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা চাই, এ ব্যাপারে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণে গড়িমসি করা হয় তাহলে ব্যাপার মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্‌র পানাহ চাই, তাঁর দরবারে আশ্রয় ভিক্ষা চাই। দেখা যাক, কোন্ সৌভাগ্যবান এই মহা সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন এবং কোন্ শ্যেন পক্ষী এই সম্পদ লাভ করে।" "এ আল্লাহ্‌র এক মহা অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহই মহা অনুগ্রহকারী।"[২]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যের আরেকজন আমীর ছিলেন সদরজাহাঁ।[৩] তাঁকে এক পত্রে লিখেন ঃ

"আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, মুকতাদায়ে ইসলাম মহান নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কিরাম গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র দীনের উন্নতি ও শক্তিশালী করতে এবং এই সিরাতে মুস্তাকীম (সহজ সরল ও সোজা রাস্তা)-এর পরিপূর্ণতা সাধনে ব্যাপৃত আছেন, মশগুল আছেন। এই সহায়-সম্বলহীন এ ব্যাপারে আর কিইবা করতে পারে!"[৪]

অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না

শেষে সেই মুবারক মুহূর্তও এসে গেল যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং তিনি (তাঁর হুকূমত ও এন্তেজামের সাধারণ মৌলনীতি মুতাবিক) চাইলেন যে, উলামায়ে কিরামের একটি জামা'আত ধর্মীয় ব্যাপারগুলোতে তাঁকে পরামর্শ দেবেন এবং ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রাজদরবারে বর্তমান

---

১. মকতূব নং ৮১, ১ম দফতর।

২. মকতূব নং ৮১, ১ম দফতর;

৩. মুফতী সদর জাহাঁ পায়হানী (বর্তমানে হরদুঈ জেলা)-র অধিবাসী ছিলেন। আরবী ভাষায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিলেন। প্রথমে শাহী সেনাবাহিনীর মুফতী নিযুক্ত হন। অতঃপর সভাপতি পদে তিনি নির্বাচিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর থেকে চল্লিশ হাদীছ মুখস্ত করেছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে চার হাজারী মনসব ও বিশাল জায়গীর দান করেছিলেন। ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর হুশ-জ্ঞান স্বাভাবিক ছিল। ১০২৭ হিজরীতে তিনি ওফাত পান (নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড)।

৪. মকতূব নং ১৯৪, ১ম দফতর।

থাকবেন। তিনি সাম্রাজ্যের দীনদার ও ধর্মভীরু অমাত্যদের নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন চারজন দীনদার আলিম অনুসন্ধান করে দরবারে সবসময় উপস্থিত থাকতে তাদেরকে উৎসাহিত করেন যাঁরা শরঈ মসলার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন এবং তাঁদের থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে। হযরত মুজাদ্দিদ ছাহেবকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি ও উন্নত ধর্মীয় দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন এবং বিগত সাম্রাজ্যের বিপথ গমনের ইতিহাস ও এর কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে জেনেছিলেন। তিনি এখবর শুনতেই খুশী হবার পরিবর্তে গভীর ভাবনায় ডুবে যান ও পেরেশান হয়ে পড়েন, হয়ে পড়েন বিচলিত। তিনি একটি চিঠি শায়খ ফরীদকে এবং আরেকটি পত্র নওয়াব সদর জাঁহাকে লিখেন। তিনি পত্রে বলেন ঃ

"আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ ধরনের ভুল করবেন না। কয়েকজন জাহিরী আলিমের পরিবর্তে একজন মুখলিস ও নিঃস্বার্থপর আলিমে রব্বানী নির্বাচিত করুন।"

শায়খ ফরীদের নামে লিখিত পত্রে বলেন,

"আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সম্মানিত পূর্বপুরুষদের ওসীলায় আপনাকে দৃঢ়পদ রাখুন। শুনেছি যে, সম্রাট তাঁর উত্তম স্বভাব ও শান্ত প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে যা তাঁর স্বভাব-চরিত্রে রোপিত হয়েছে, আপনাকে চারজন দীনদার উলামায়ে কিরামের খেদমত হাসিলের জন্য বলেছেন যাঁরা শাহী দরবারে অবস্থান করবেন এবং শরঈ মসলা-মাসাইলের ব্যাপারে সম্রাটকে অবহিত করবেন যাতে করে সম্রাটের কোন নির্দেশ কিংবা কাজ শরীয়ত বিরোধী না হয়। আলহামদুলিল্লাহ 'আলা সুবহানাহু তা'আলা যালিকা। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে ভাল ও সুখবর এবং মাতম যাদাদের জন্য এর চেয়ে আনন্দদায়ক বার্তা আর কী হতে পারে? কিন্তু এই অধম প্রয়োজনের তাকীদে ও বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে কিছু পেশ করতে চায়। আশা করি এজন্য আমাকে মা'যূর মনে করা হবে। যেহেতু যার গরজ বেশী তাকে 'পাগল হিসেবে ক্ষমার্হ ভাবা যায়।

"আরয এই যে, এ ধরনের দীনদার আলিম প্রথম তো এমনিতেই কম যারা পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন এবং শরীয়তের প্রচলন ও মিল্লাতের সমর্থন-সাহায্য ব্যতিরেকে যাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি পদ ও পদমর্যাদা প্রীতির মোহে ঐ সব উলামা-ই-কিরামের কেউ একটা দিক অবলম্বন করেন এবং নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেন, ইখতিলাফী মাসআলা-মাসাইলগুলো মাঝখানে (অহেতুকভাবে) টেনে আনেন এবং এসবকে অবলম্বন করে সম্রাটের নৈকট্য ও তাঁর সান্নিধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা লাভ করতে চান তবে কোন সন্দেহ নেই যে, দীনের কাজ খারাপ হবে। পূর্বেকার যুগে উলামায়ে কিরামের মতভেদ ও মতানৈক্যই সমগ্র জগতকে মুসীবতের মাঝে

নিক্ষেপ করেছিল এবং এখন আবার সেই একই বিপদ সামনে। শরীয়তের প্রচলন, দীন-ধর্মের রেওয়াজ দানের কথা আর কী বলব, এই কাজটি দীনকে ধ্বংস করার কারণ হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে এ থেকে আশ্রয় চাই এবং উলামায়ে সূ'র ফেতনা থেকেও পানাহ্ চাই। তবে চারের পরিবর্তে যদি একজন আলিমকে এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে নির্বাচিত করা হয় তাহলে উত্তম হবে। যদি সেই আলিম পরজগতের মধ্য থেকে কেউ হন তাহলে আর কী বলব। তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য পরশ পাথর তুল্য বিবেচিত হবে। আর যদি পর জগতের আলিমদের মধ্য থেকে কাউকে না পাওয়া যায় তবে এই শ্রেণীর উলামায়ে কিরামের মধ্য থেকে যেন সর্বোত্তম লোকটিকেই নির্বাচিত করা হয়। مالا يدركه كله لايترك كله "নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল।"

এরপর তিনি লিখেছেন ঃ

"বুঝতে পারছি না কী লিখব, কী লেখা দরকার। যেমন সৃষ্টিকুলের মুক্তি ও নাজাত উলামায়ে কিরামের সঙ্গে সম্পর্কিত, সমগ্র জগতের ক্ষয়-ক্ষতিও তাঁদের সঙ্গেই জড়িত ও সম্পৃক্ত। উলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তাঁরা সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যেও সর্বোত্তম এবং তাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টিজগতের মধ্যেও তারাই নিকৃষ্টতম। হেদায়েত ও গোমরাহীকে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জনৈক বুযুর্গ অভিশপ্ত ইবলীসকে দেখতে পেল যে, সে নিষ্কর্ম ও বেকার বসে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে ইবলীস বলতে লাগল, এক্ষণে উলামায়ে কিরামই আমাদের কাজ করছেন, মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার কাজ করছেন।

عالم که کامرانی و تن پروری کند -

او خویشتن گم است کرا رہبری کند -

"মোটকথা, এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা নিয়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। যখন কোন ব্যাপার হাতছাড়া হয়ে যায় তখন আর কোন চিকিৎসাই কাজ দেয় না। আমার লজ্জা লাগে যে, এ ধরনের কথা দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান (যেমন আপনি) লোকদের সামনেই বলা উচিত। কিন্তু একে নিজের জন্য সৌভাগ্যের মাধ্যম জেনে আপনাকে কষ্ট দিলাম।"[১]

১. মকতুব ৫৩, ১ম দফতর, সদর জাহাঁর নামে পত্র ১৯৪, ১ম দফতরেও এই বিষয়টি সংক্ষেপে লেখা হয়েছে।

সাম্রাজ্যের ভক্ত-অনুরক্ত অমাত্যবর্গ এবং তাদের সাথে পত্র যোগাযোগ

ঐসব ব্যক্তি যাদেরকে উদ্দেশ্য করে পত্র লেখা হয়েছিল তাদের ছাড়াও যাদের নামের পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) ইসলামের দরিদ্রদশা, অসহায়ত্ব, ইসলামের বিধি-বিধান ও শি'আরসমূহের অসম্মান এবং মুসলমানদের অসহায় অবস্থার ওপর রক্তাশ্রু ঝরিয়েছেন এবং তাদেরকে আপন নৈকট্য ও আস্থা, মহান খেদমত, তাদের পদ ও পদমর্যাদার প্রভাব দ্বারা কাজ নিয়ে সম্রাটের অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন ও তাদের মৌরছী ও খান্দানী ইসলামী প্রেরণাকে উস্কে দেবার দিকে চেষ্টার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। কিছু বড় বড় আমীর-উমারা ও সাম্রাজ্যের অমাত্যের নামে তাঁর এক বিরাট সংখ্যক পত্র রয়েছে যেগুলো সংস্কার ও প্রশিক্ষণমূলক এবং যেসব পত্রে সুলূক ও তাসাওউফের কতক সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্য ও ইশারা-ইঙ্গিতের সমাধান করা হয়েছে। দুনিয়াদারীর প্রতি উদাসীনতা ও নিস্পৃহতা এবং পারলৌকিক নে'মতরাজি ও অভ্যন্তরীণ উন্নতি হাসিলের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এসব পত্র আমীরুল-উমারা আবদুর রহীম খানে খানাঁ (মৃ. ১০৩৬ হি.), কিলীজ খান আনদিজানী আকবরী (মৃ. ১০২৩ হি.), খাজা জাহাঁ (মৃ. ১০২৯ হি.), মির্যা দারাব ইব্ন খানে খানাঁ জাহাঙ্গীরি (মৃ. ১০৩৪ হি.) এবং শরফুদ্দীন হুসায়ন বাদাখশীর নামে লেখা হয়েছিল যেগুলো থেকে পরিমাপ করা যায় যে, ঐ সব মহান আমীর-উমারার হযরত আলফেছানীর সঙ্গে কত গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। এসব চিঠিপত্র ঠিক তেমনি যেমন একজন শায়খ তাঁর প্রশিক্ষণাধীন মুরীদবর্গকে লিখে থাকেন, তাদের পদস্খলন ও ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্ক ও হুশিয়ার করেন, তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত তথা সদুপদেশও প্রদান করে থাকেন এবং তাদের দীনি তরক্কী (ধর্মীয় উন্নতি) ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা, সামর্থ্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধের ওপর আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর থেকে পরিমাপ করা যেতে পারে যে, এই শক্তিশালী সম্পর্ক ও গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধার পর ঐসব বড় বড় আমীর-উমারা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সাম্রাজ্যের সংস্কারের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় মুতাবিক সম্রাটের সামনে হক-কথা বলা এবং ইসলামের কল্যাণ কামনা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আদৌ ত্রুটি করেন নি এবং তাঁরা একাজে আপন মখদূম শায়খ-এর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও সাম্রাজ্যের অপরাপর আমীর-উমারার সঙ্গে (যাঁদেরকে তিনি এই মহান লক্ষ্যের নিমিত্ত পত্র লিখেছিলেন) সহযোগিতা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

সংস্কার চেষ্টায় হযরত মুজাদ্দিদ-এর ব্যক্তিগত প্রভাব ও অবদান

এখন পর্যন্ত যা কিছু বিস্তারিত বলা হল এর সম্পর্ক হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সঙ্গে সরাসরি চেষ্টা-তদবীরের ছিল। অর্থাৎ তিনি বড় বড় আমীর ও

সাম্রাজ্যের অমাত্যদেরকে ইসলাম ধর্মের সাহায্য-সমর্থন, সম্রাটকে ইসলামের সম্মান ও শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অবস্থার সংস্কার-সংশোধনের ব্যাপারে লিখিত পত্র মারফত যেসব পত্রে ইসলামী মর্যাদাবোধের আলোক-রশ্মির ঝলক দৃষ্টিগোচর হয়, কিভাবে একের পর এক পত্র লিখেছেন এবং এসব পত্রের সাহায্যে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের পূর্ণতা সাধনে কিভাবে কাজ নিয়েছেন। এই চেষ্টা ও সাধনা যে ব্যর্থ হয় নি তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আর এসব পত্র যাদেরকে লেখা হয়েছিল, বিশেষ করে নওয়াব সাইয়েদ ফরীদ হুকূমতের গতিধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যের যিনি মূল শাসক জাহাঙ্গীরের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে সেই পরিবর্তন সৃষ্টি হয় নি যা এই বিরাট ও কঠিন কাজটি করবার জন্য দরকার ছিল। ব্যক্তি ও উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সাম্রাজ্যগুলোতে রাজা-বাদশাহ ও সম্রাটদের ব্যক্তিসত্তা সেই কেন্দ্রীয় বিন্দু হয় যার চারপাশে হুকূমতের গোটা ব্যবস্থাপনা আবর্তিত ও বিবর্তিত হতে থাকে। কোন বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা করা, তাঁর মস্তিষ্কের কোন ব্যাপারে কবুল করে নেয়া, আল্লাহর কোন মুখলিস ও নিঃস্বার্থপর বান্দার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে ভক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া এবং তাঁর নিঃস্বার্থপরতা ও নিষ্ঠার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন হাজার মাইলের দূরত্বকে ঘন্টা ও মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিয়ে দেয় এবং কোন কোন সময় বাহ্য দৃষ্টিতে অসম্ভব ব্যাপারকেও কেবল সম্ভবই নয় বরং বাস্তবতায় পরিণত করে। তখন পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর রূহানী তথা আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তিনি সেই সব বুযুর্গ শায়খ ও জ্ঞানী-পণ্ডিতদের দলের কেউ ছিলেন না যারা শাহী দরবারে যাতায়াত করতেন। এখন আর কোন্ সূরত ছিল যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সরাসরি মুখোমুখি তাঁর সাক্ষাত ঘটবে এবং সম্রাট তাঁর উঁচু মকাম তথা অবস্থানগত মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হবেন (আপন যোগ্যতা ও সামর্থ মুতাবিক)। আল্লাহ্র অপার হিকমত এরও এক অত্যাশ্চর্য ও বিরল এন্তেজাম করে দিলেন যা عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم (সম্ভবত তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ কর আর তা তোমাদের অনুকূলে ভাল হয়)-এর সর্বোত্তম তফসীর ও ব্যাখ্যা।

জাহাঙ্গীরের প্রভাব স্বীকারকরণ

তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী এবং শাহী সেনাবাহিনীতে নজরবন্দী হিসেবে মুজাদ্দিদ সাহেবের অবস্থানের কথা পড়েছেন। শাহী সেনাবাহিনীতে তিনি সাড়ে তিন বছর ছিলেন।[১] এ সময় তিনি সম্রাটের সাহচর্যে

১. ১০২৯ হিজরীর জুমাদা'ছ-ছানীতে তিনি গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুক্তি পান এবং শাহী সেনাবাহিনী থেকে বিদায় হন ১০৩২ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সে হিসাবে সর্বমোট সাড়ে তিন বছরই হয়।

অবস্থান করেন। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হত। সম্রাট হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর ধর্মীয় দৃঢ়তা ও মজবুতীর নমুনা সম্মানসূচক সিজদা ও শাহী আদব প্রদর্শন করতে অস্বীকৃতি, গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী থাকাকালে পূর্ণ আত্মমর্যাদা ও আত্ম-সম্মান রক্ষা করে থাকা ও ক্ষমা না চাওয়ার ভেতর দিয়ে দেখেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ-এর রূহানী ফয়েয ও বরকত এবং তাঁর সান্নিধ্যের প্রভাব শত শত অমুসলিমের ইসলাম কবুলের রূপে দেখেন। অতঃপর শাহী সেনাবাহিনীর দীর্ঘ সাহচর্যে তাঁর যুহ্‌দ তথা জগত সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও দৈনন্দিন আমলগুলোর নিয়মিত আদায়ও তিনি দেখেন। মজলিসী আলাপ-আলোচনায় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের অভিজ্ঞতাও লাভ করেন এবং নিশ্চিতই সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বভাবের অধিকারী তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও সতর্ক একজন শাসক হিসাবে যিনি আমীর-উমারা, উলামা-মাশায়েখ, দীনদার ও দুনিয়াদার লোকদের এক বিপুল সংখ্যকের অবস্থা তাঁর পিতার যুগ থেকে তখন পর্যন্ত দেখার ও পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর মধ্যে মানুষ চেনার সেই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যা সেই সব লোকের হাসিল হয় না যারা আসল-নকল, খাটি ও ভেজাল পরীক্ষা করার এত দীর্ঘ সুযোগ পান না। মুজাদ্দিদ সাহেব সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি সে সব লোক থেকে অনেক আলাদা যারা এখন পর্যন্ত দরবারের সৌন্দর্য ও খানকাহনশীন হিসাবে অবস্থান করছেন।

নিচে আমরা আমরা জাহাঙ্গীরের নিজের লেখা থেকে যা তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন এবং কতকটা কৃতজ্ঞতা ও গর্ব প্রকাশ করেই লিখেছেন, কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি যা থেকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সাহচর্য ও আবেগদীপ্ত প্রেরণার প্রভাব পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। জাহাঙ্গীরের সেই পদক্ষেপের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় যদি এই ঘটনা সামনে রাখা হয় যে, এই দুর্গ একজন অভিজ্ঞ মুসলিম সেনাপতির পরিবর্তে রাজা বিক্রমজিতের হাতে বিজিত হয়েছিল।

জাহাঙ্গীর লিখছেন ঃ

"আলোচ্য মাসের ২৪ তারিখে ১লা রবিউল আওয়াল, ১০৩১ হিজরীতে আমি কাংড়া দুর্গ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি নির্দেশ দিলাম যে, কাযী ও প্রধান বিচারপতি (মীর-ই 'আদল) এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম আমার সাথে যাবেন। যা ইসলামী শি'আর ও দীনে মুহাম্মদীর শর্তাবলী যুক্ত, তাঁরা সেগুলো আলোচ্য দুর্গে পালন করবেন। সংক্ষিপ্তভাবে এক ক্রোশ দূরত্ব অতিক্রম করে দুর্গের উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছুলাম। তৌফীকে ইলাহীতে আমার উপস্থিতিতে আযান দেওয়ালাম। খুতবা পাঠ করা হল। আমার সামনেই গরু যবেহ করলাম যা এই দুর্গ

নির্মাণের পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনো করা হয়নি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই পুরস্কার প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে যা কোন সম্রাটের কখনো এই সৌভাগ্য জোটে নি, সিজদায়ে শোকর আদায় করলাম। আমি হুকুম দিলাম দুর্গের ভেতর বিশালাকারের সুউচ্চ একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য।"

এই রূপ সরাসরি ওপরোক্ত প্রচেষ্টায় প্রথমত সাম্রাজ্যের গতিমুখ ইসলামের প্রতি উদাসীনতা বরং অজ্ঞতা (এর চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে বলা যায় বিরোধিতা) থেকে সরে এসে ইসলামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা, ইসলামী শি'আর (প্রতীক চিহ্ন)-এর সমুন্নতি এবং মুসলিম সম্রাটের ইসলামের প্রতি আকর্ষণের দিকে পাল্টে গেল যার ধারাবাহিকতা জাহাঙ্গীরের শাসনামলের শেষ যুগ থেকে শুরু হয়ে সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে গিয়ে স্থিতি লাভ করে।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের শাসনামল

সাহিবে কিরানে ছানী শাহজাহান বাদশাহ গাযী (হি. ১০০০-৭৫)-র শাসনামল ১০৩৬ হি. থেকে শুরু হয়ে বিরাট শান-শওকতের সঙ্গে ৩১ বছর স্থায়ী হয়। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর ইনতিকালের ২ বছর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়টি ছিল এক অননুভূত ক্রমিক সংস্কার ও তুলনামূলক ভাল যুগ। সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি হযরত মুজাদ্দিদ কিংবা তৎপুত্র খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর কাছে যথা নিয়মে বায়'আত হয়েছিলেন কিংবা পীর-মুরীদ সম্পর্কে রাখতেন কিনা। কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সম্রাটের হৃদয়ে সব সময় হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। অনন্তর হযরত মুজাদ্দিদ (র) যখন সম্রাটের তলব পেয়ে দরবারে আগমনে আগ্রহী হন এবং তিনি জানতেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ সিজদায়ে তা'জীমি ও দরবারী আদব কবুল করবেন না তখন শাহজাহান তদীয় মোসাহেব আফযাল খান ও মুফতী আবদুর রহমানকে কিছু ফিক্‌হ সংক্রান্ত বই-পুস্তক তাঁর খেদমতে এই বলে পাঠান যে, 'সম্রাটদের জন্য সিজদায়ে তা'জীমি জায়েয এবং ফকীহগণ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এর অনুমতি দিয়েছেন। আপনি যদি সাক্ষাতের সময় সম্রাটের জন্য এসব সম্মান ও আদব প্রদর্শন করেন তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না— এই মর্মে আমি যিম্মাদারী গ্রহণ করছি।' হযরত মুজাদ্দিদ (র) এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন যে, এটা রুখসত আর আযীমতের দাবি হল কোন অবস্থাতেই গায়রুল্লাহকে সিজদা না করা।[১]

সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত যে, তিনি একজন নেক দিল (সৎ অন্তকরণ বিশিষ্ট) বাদশাহ,শরীয়তের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণকারী,

১. বিস্তারিত জানতে দ্র. গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

বিশালাকৃতির মসজিদ নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী এবং ব্যক্তিগতভাবে শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন। আলিম-উলামা ও নেককার বুযুর্গদের নিজের কাছে রাখতেন এবং তাঁদের ওপর আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী জুমলাতুল মালিক সা'দুল্লাহ্ খান আল্লামী (মৃ. ১০৬৬ হি.) সে যুগের একজন বিশিষ্ট আলিম ও শিক্ষক ছিলেন।[১] এই ব্যক্তিগত দীনদারী ও আল্লাহ্-ভীতির সাথে সাথে (যা বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী একজন স্বাধীন সম্রাটের জীবনে দুর্লভ প্রাপ্তিই বলতে হবে) সম্রাট শাহজাহান পূর্ব আমল থেকে চলে আসা বেশ কিছু শরীয়ত বিরোধী প্রথা-পদ্ধতি ও আদব বন্ধ করে দেন। শামসুল উলামা' মৌলভী যাকাউল্লাহ্ ফার্সী সাহিত্যের সমসাময়িক ইতিহাস 'বাদশাহ্ নামা' প্রভৃতির বর্ণিত বিবরণের ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

"সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে আসীন হতেই মিল্লাতে মোস্তফা ও শরীয়তে মুহাম্মদীর সেই সব রসম-রেওয়াজ, যেগুলোর মধ্যে কিছুটা বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল যে, এর প্রতি এতটা সম্মান প্রদর্শন করেন যে, প্রথমেই তিনি নির্দেশ জারী করেন, সিজদা একমাত্র মা'বূদে হাকীকী আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য। এখন থেকে ভবিষ্যতে আর কখনো কেউ কাউকে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে না। মহাবত খানের কথায় তিনি আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করার প্রথা চালু করেন। কিন্তু এটাও সিজদাসদৃশ বিধায় তা বন্ধ করে সালামের প্রচলন করেন।"[২]

স্যার রিচার্ড বার্টন লিখেছেন ঃ (Sir Richard Barton)

"শাহ্জাহান ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস কঠোরভাবে পুনরায় চালু করতে চাইতেন। কিন্তু অপরাপর ধর্মের অনুসারীরা আপত্তি উত্থাপন করুক তাও তিনি চাইতেন না। তিনি খুব সত্বর সম্রাটকে সিজদা করার প্রথা দরবার থেকে তুলে দেন। সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত ইলাহী সন যা সরকারী কাগজ-পত্রে ও মুদ্রায় লিখিত হত, সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের ভেতর বিবাহ, যা পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে ব্যাপক প্রচলন ছিল, নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।"[৩]

মৌলভী যাকাউল্লাহ সাহেব লিখছেন ঃ

"শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানসমূহ এবং ইসলামী ইবাদতের তা'লীম প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি সরকারীভাবে কাযী ও শিক্ষক নিয়োগ করেন। শায়খ মাহমূদ গুজরাটিকে যেসব মুসলিম মহিলার হিন্দুদের সাথে বিয়ে হয়েছিল উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে সেসব মহিলাদের হিন্দুদের হাত থেকে উদ্ধার করার ভার অর্পণ করেন। হিন্দুদের দ্বারা দখলীকৃত দালান-কোঠা ও মসজিদকে আলাদা করার

১. দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড।
২. তারীখে হিন্দুস্তান, ৭ম খণ্ড, ৫৫-৫৬, সংক্ষেপিত।
৩. Cambridge History of India. vol. Iv. p. 217।

ভারও তাকে প্রদান করা হয়। তিনি এ আদেশ পালন করেন। হিন্দুদের হাত থেকে অনেক মসজিদ তিনি মুক্ত করেন এবং দখলদারদের থেকে জরিমানা আদায় করে সেসব মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন। যেসব হিন্দু কুরআন শরীফের সঙ্গে বেআদবী করেছিল প্রমাণ সাপেক্ষে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। এরপর সম্রাট নির্দেশ দেন যে, সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে যেসব জায়গায় এ ধরনের ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর শরঈ বিধান মাফিক তদন্ত করা হোক।"[১]

কিন্তু শরীয়তের প্রতি এই সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং দীনের ব্যাপারে মর্যাদাবোধের সাথে সাথে এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, সম্রাট শাহজাহান তাঁর শরীয়তের পাবন্দ, আলেম ও সুযোগ্য পুত্র আওরঙ্গযেবের মুকাবিলায় উদার ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতেন এবং তাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ও নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতে চাইতেন। আর এটাই রাজতন্ত্র ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য এবং ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ নীতির অনুসারী সাম্রাজ্যের শাসকদের সেই বৈশিষ্ট্য যেখানে তাদের ব্যক্তিগত দীনদারী রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদির ওপর প্রভাবশীল এবং কোন ভুল ও ক্ষতিকর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনে প্রতিবন্ধক হয় না।

শাহযাদা দারা শুকোহ

সম্রাট আলমগীরের আমলে যে সব ইতিহাস লিখিত হয়েছে কেবল সে সবের ওপর নির্ভর করে আমরা দারা শুকোহ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। এর ওপর নির্ভর করে তাঁকে চূড়ান্তভাবে বেদীন ও বদ-আকীদা পোষণকারীও বলতে পারি না এবং এও বলতে পারি না যে, সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভাইদের এই যুদ্ধ একান্তভাবেই দু'টো দর্শন, দু'টো চিন্তাধারা এবং ধর্ম ও ধর্মহীনতার যুদ্ধ ছিল। কিন্তু অমুসলিম ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের লিখিত বিবরণাদি থেকে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি তার পিতামহ সম্রাট আকবরের চিন্তা-চেতনার কাছাকাছি সব ধর্ম মিলিয়ে এক ধর্ম করার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত এবং শরীয়ত ও বেদান্তবাদী দর্শনের মধ্যে যোগ্যসূত্র রয়েছে তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। ফরাসী পর্যটক ডা. বার্নেয়ার বলেন যে, "ইউযী সাহেব পাদ্রী ফ্লেমিশের ধর্মীয় বক্তৃতাগুলো খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে একই ধর্মের পতাকাতলে আনতে চাইতেন।" দাইরায়ে মা'আরিফ-এ ইসলামিয়ার নিবন্ধকারের ভাষ্য মতে,

"তিনি তাসাওউফের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং হিন্দু দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মুসলিম সূফী ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক কায়েম করে নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে (মুসলিম সূফী ও আলিম-উলামার সঙ্গে)

১. তারীখে হিন্দুস্তান, ৭ম খণ্ড, ১৭৫-৭৬ পৃ. সংক্ষেপিত।

ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদী মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী সারমাদ, বাবা লাল দাস বৈরাগী ও কবীরের অনুসারীও ছিলেন।"

দারার শেষ দিককার কিছু কিছু রচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দু দর্শন ও প্রতিমা তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন যদ্দরুন তিনি এমন কতকগুলো ধর্মদ্রোহিতামূলক ধ্যান-ধারণার দিকে ঝুকে পড়েছিলেন যেগুলোর সুস্পষ্ট উদাহরণ হিন্দু দর্শনে পাওয়া যায়, ইসলামে যেসবের কোন অবকাশ নেই। দারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বেদান্ত দর্শন ও তাসাওউফ যেসবের মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করা দরকার। এ দু'টো পরস্পর বিরোধী নয়, পার্থক্য যা তা কেবল শব্দের। উপনিষদের অনুবাদে যাকে তিনি ঐক্যের উৎস হিসেবে বর্ণনা করতেন, দারা দুই বৃহৎ ধর্মের, ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু মতবাদের অনুসারীদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা চালান। অধিকন্তু তিনি এও চেয়েছিলেন যে, হিন্দুদের আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচিত করাবেন।"

দারার এসব চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা, প্রবণতা ও আবেগ-অনুভূতির ভিত্তি যা সে সময়কার ভারতীয় মুসলিম সমাজের অগোচরে ছিল না এবং যে সম্পর্কে সজাগ মস্তিষ্কের অধিকারী শাহযাদা আওরঙ্গযেব পরিপূর্ণ ফায়দা উঠিয়েছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ভারতবর্ষের ধর্মীয় মহল, দীনদার উলামায়ে কিরাম এবং শরীয়তের অনুসারী তরীকতপন্থী বুযুর্গানে দীন ও তাঁদের অনুসারীবৃন্দকে যাঁরা সম্রাট আকবরের শাসনামলে ইসলামের অসহায়ত্ব ও দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার দৃশ্য দেখেছিলেন কিংবা তাঁদের পিতা-পিতামহদের কাছ থেকে শুনেছিলেন, এই ভ্রাতৃ যুদ্ধে দারা শুকোহ্‌র মুকাবিলায় ইসলামের সমর্থক, দীন ও শরীয়তের পাবন্দ শাহযাদা আওরঙ্গযেবের-এর সাহায্য-সমর্থনে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং দোআ ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল।[১]

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের রেজাল্ট কী দাঁড়িয়েছিল তা সবার জানা আর তা এই যে, আওরঙ্গযেব দারা শুকোহ্‌র মুকাবিলায় জয়লাভ করেন এবং ১০৬৮ হিজরীতে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ও অর্ধ শতাব্দীকাল দোর্দণ্ড প্রতাপে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন।

মুহ্‌য়িউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ

আওরঙ্গযেব আলমগীর (হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর খান্দানের সঙ্গে যাঁর শ্রদ্ধাবিজড়িত সম্পর্ক এবং প্রথম থেকে দাওয়াত ও রূহানী সম্পর্কে যিনি সম্পর্কিত ছিলেন) হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর সঙ্গে বায়'আত ও পীর-মুরীদী সম্পর্ক

১. মকতূবাতে সায়ফিয়া, পত্র নং ৮৩, বনাম সূফী সা'দুল্লাহ আফগানী।

কায়েম করেছিলেন।[১] বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণে এ কথা প্রমাণিত যে, হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্ক কেবল গায়েবানা ও সাধারণ ভক্তি-বিজড়িত ছিল না বরং তিনি (সম্রাট) হযরত খাজার সঙ্গে যথারীতি ইসলাহী ও তরবিয়তী সম্পর্কও কায়েম করেছিলেন। আওরঙ্গযেব যখন শাহযাদা তখন থেকেই তাঁর ওপর হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং তিনি তাঁকে 'শাহযাদা দীনে পানাহ' (যা একটি সুস্পস্ট ভবিষ্যদ্বাণী ও সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবাহী বাক্য ছিল) অভিধায় স্মরণ করতেন। হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমকে এক পত্রে লিখছেন ঃ

"বাদশাহ দীনে পানাহ্‌র হযরতের সঙ্গে ইখলাস তথা নিষ্ঠাপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্ক অন্য ধরনের। তিনি এখন লাতাইফে সিত্তা (ছয় লতীফার যিক্‌র) ও সুলতানুল আযকার (ইসমে যাত তথা আল্লাহ, আল্লাহ্ যিক্‌র) অতিক্রম করে এখন নফী ও ইছবাত (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু যিক্‌র)-এর যিক্‌র-এর মনযিলে আছেন। তাঁর বর্ণনা এ রকম যে, কোন কোন সময় তাঁর (সম্রাটের) দিলে আদৌ ওয়াসওয়াসা আসে না এবং কখনো আসলেও তা স্থায়ী হয় না। তিনি এর হাত থেকে নিরাপদ। তিনি বলেন, এর আগে আমি ওয়াসওয়াসা ও বিপদ-আপদের ঝড়ো হাওয়ায় পেরেশান হয়ে যেতাম। তিনি এক্ষণে এই নে'মতের জন্য শুকরিয়া আদায় করেন।"[১]

খাজা সায়ফুদ্দীনের এই পত্রের জওযাব দিতে গিয়ে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম যেই পত্র লিখেছেন তাতে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন যিনি সম্রাটকে রূহানী মর্তবা দান করেছেন। এই পত্র থেকে এও ফুটে ওঠে যে, সম্রাটের 'ফানায়ে কল্‌বী'র মকাম হাসিল হয়েছিল যা সুলূক তথা আধ্যাত্মিক সাধনা পথের একটি বড় মকাম।[২]

আবুল ফাতাহ "আদাবে আলমগীরি" নামক গ্রন্থে বলেন, "আওরঙ্গযেবের সিংহাসনে আরোহণের পর পরই খাজা মুহাম্মদ মা'সূম ও তাঁর বুযুর্গ ভ্রাতা খাজা মুহাম্মদ সাঈদ শাহী দরবারে আগমন করেন। এসময় আওরঙ্গযেব তাঁদেরকে তিনশ' স্বর্ণমুদ্রা নযরানা হিসেবে প্রদান করেন।"[৩]

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসলাম "আওরঙ্গযেব কী তখতনশীনি মে উলামা ও মাশায়েখ কা কারদার" (আওরঙ্গযেবের সিংহাসনে আরোহণে উলামা'ও মাশায়েখে-ইজামের ভূমিকা) শীর্ষক নিবন্ধে "মারা'আতুল-আলম" ও ফুতূহাত-ই-আলমগীরি[৪] নামক দু'টি গ্রন্থের বরাতে কতকগুলো ঘটনা উদ্ধৃত

১. মকতূবাতে সায়ফিয়া, পত্র নং ২;
২. মকতূবাতে খাজা মুহাম্মদ মা'সূম, পত্র নং ২২০;
৩. আবুল ফাতাহ, আদবে আলমগীরি, ২খ, ৪৩১পৃ.;
৪. এ দু'টো বই লণ্ডনের অফিস লাইব্রেরী ও বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

করেছেন যা থেকে জানা যায় যে, সম্রাটের এই খান্দান এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সন্তানদের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ ছিল।[১] তাঁরা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন এবং বাদশাহ তাঁদের খেদমতে মূল্যবান তোহ্‌ফা ও উপহার-উপঢৌকন পেশ করতেন। দিল্লী থেকে লাহোর যাবার ও ফেরার পথে তিনি কয়েকবার সরহিন্দে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম এবং মুজাদ্দিদী খান্দানের অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন।

মুফতী গোলাম সরওয়ার সাহেব লিখিত 'খাযীনাতুল-আসফিয়া'র বর্ণনা মুতাবিক সম্রাট হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের খেদমতে অনুরোধ জানান যেন তিনি ঘরে ও বাইরে সফর অবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার উপদেশ মুতাবিক সম্রাটের সঙ্গে থাকা পছন্দ করেন নি এবং নিজের জায়গায় আপন পুত্র খাজা সায়ফুদ্দীনকে দিল্লী পাঠিয়ে দেন। মকতূবাতে মা'সূমিয়া'তে দু'টি পত্র, একটি ২২১ নং পত্র, অপরটি ২২৭ নং পত্র সম্রাটের নামে লিখিত। আলোচ্য পত্র দু'টি থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের সঙ্গে সম্রাটের পীর-মুরিদীর ও তরবিয়তের সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর ও সম্রাটের পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাঁর দ্বারা সম্রাটের প্রভাবিত হওয়া ও তাঁর হেদায়েত মুতাবিক আমল করার আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ে খাজা সায়ফুদ্দীনের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আসবে। খাজা সায়ফুদ্দীন সম্রাটের সঙ্গে থেকে শরীয়তের প্রচলন

---

১. সম্রাট আলমগীরকে লিখিত হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন-এর পত্রাবলী "মকতূবাতে সায়ফিয়া" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ভিন্ন দৃষ্টিতে পাঠ করলে অনুমান করা যায় যে, সম্রাটের সম্পর্ক হযরত খাজা সায়ফুদ্দীনের সঙ্গে বিশেষভাবে এবং মুজাদ্দিদী খান্দানের সঙ্গে সাধারণভাবে কেবল শ্রদ্ধা ও ভক্তির ছিল না যেমনটি দীনদার ও সুধারণা বিশিষ্ট সম্রাটগণ তাদের শাসনামল ও সাম্রাজ্যের আলিম-উলামা ও বুযুর্গদের সঙ্গে পোষণ করতেন বরং এ সম্পর্ক রীতিনীতি (যাবেতা)-র তুলনায় সম্বন্ধ (রাবেতা) এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার তুলনায় প্রশিক্ষণ ও উপকৃত হবার ছিল। হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন তাঁর পিতাকে লিখিত এক পত্রে বলেনঃ

"হযরত সালামত! এই দিনগুলোতে দীর্ঘ ও লম্বা সান্নিধ্য ও মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোন কোন সূক্ষ্মপত্রের আলোচনাও হয় এবং সম্রাট পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে তা শোনেন।" ১৪২ নং পত্রে যা শায়খ মুহাম্মদ বাকের লাহোরীর নামে লিখিত, তিনি বলেন,

"বাদশাহ দীনে পানাহ শনিবার রাত্রে যা এ মাসের তৃতীয় রাত্রি ছিল, গরীব খানায় আগমন করেন। যেই সাধারণ খাবার উপস্থিত ছিল তিনি তাই খেলেন। দীর্ঘ সময় সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। মাঝে তিনি নিশ্চুপ থাকেন, মজলিসও অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে এই যে, আশা করা যায় নিষ্ঠাবানদের অভিলাষ মাফিক তরীকায়ে আলিয়ার প্রচলন প্রকাশ পাবে।"

সম্পর্ক ও প্রভাবের এই সিলসিলা আলমগীরের ওফাতের পরও অব্যাহত থাকে। চিশতী নিজামী সিলসিলার মশহূর শায়খ যার মাধ্যমে এই তরীকা নব জীবন লাভ করে, শাহ কলীমুল্লাহ জাহানাবাদী (মৃ. ১১৪৩ হি.) তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওরঙ্গাবাদীকে লিখিত কোন কোন চিঠিতে নির্দেশ দেন যে, যেহেতু এই মুহূর্তে সম্রাটের সঙ্গে আওরঙ্গাবাদে মুজাদ্দিদী খান্দানের সাহেবযাদা আছেন সেজন্য সামা ও কাওয়ালীর মাহফিল অনুষ্ঠানে সতর্কতা অবলম্বন করা হোক যাতে করে তাঁর খারাপ না লাগে ও মনঃকষ্টের কারণ না হয়। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের অভিযানে এবং সেখানকার দীর্ঘ অবস্থানে এই খান্দানের উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গও সময় সময় সম্রাটের সান্নিধ্যে অংশগ্রহণ, দু'আ ও তাওয়াজ্জুহর মাধ্যমে সহযোগিতা করতেন।

ও সুন্নাহ্ পুনরুজ্জীবনের কাজে আগা-গোড়া সক্রিয় ও তৎপর থাকেন। তাঁর লিখিত পত্র সংকলন "মকতূবাতে সায়ফিয়া'তে সম্রাটের নামে ১৮টি পত্র[১] স্থান পেয়েছে যে সব পত্রে সম্রাটের মনোযোগ বিদ'আত উৎসাদন, সুন্নত পুনর্জীবন এবং আল্লাহ্র কলেমা ও বাণীকে বুলন্দ ও সমুন্নত করার দিকে টেনে আনা হয়েছে।

সাম্রাজ্যের কোন শাসক ও স্বশাসিত সম্রাটের গোটা কর্মকাণ্ড ও আখলাক-চরিত্র, তাঁর সিদ্ধান্ত ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যিম্মাদারী গ্রহণ করা কঠিন এবং সেগুলোকে ইসলামী শিক্ষামালা ও শরীয়তের আহকাম তথা বিধি-বিধান মুতাবিক প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এতো কেবল খুলাফায়ে রাশেদীন এবং এমন কতিপয় শাসক সম্পর্কে বলা যায় যাঁরা উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীয-এর ন্যায় খিলাফাত 'আলা মিনহাজু'ন-নবুওয়ার সমর্থক ছিলেন এবং সে মুতাবিক কাজও করেছেন। অতঃপর এই বিতর্কিত পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক ও এন্তেজামী কার্যকলাপসমূহ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে ও উপযোগিতাকে সামনে নিয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং ঐতিহাসিকবৃন্দ সে সবের যেই চিত্র অংকন করেছেন তাও বা কতটা জেনেশুনে করেছেন, অধিকন্তু দীর্ঘকাল গুজরে যাবার পর এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের অবর্তমানে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও রায় প্রদান করা সহজ নয়। এরপরও সম্রাট আলমগীর সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপকরণ বিদ্যমান বিধায় সেসবের ওপর ভিত্তি করে নির্দ্বিধায় ও পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে বলা যায় যে, সম্রাট হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন, সাম্রাজ্যকে "ইসলামের ধ্বংসকারী"র পরিবর্তে "ইসলামের সেবক ও খাদেম" বানাবার বিপ্লবাত্মক কিন্তু নীরব প্রয়াস এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিদের ও পরিবারের গভীর ও নিঃস্বার্থ রূহানিয়াত ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব দ্বারা পরিপূর্ণরূপে প্রভাবিত ছিলেন এবং তিনি হযরত মুজাদ্দিদের দাওয়াত ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সঙ্গে নিজকে একই সূত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যে নিয়ম-নীতি শৃঙ্খলা এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে সাহসী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি প্রথমবারের মত এমন কতকগুলো সংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন যদ্দরুন যদিও সরকারের ও রাষ্ট্রের অর্থনীতি প্রভাবিত হত, কিন্তু শরীয়তের কতকগুলো সুস্পষ্ট বিধানের কার্যকর বাস্তবায়ন হত।

আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে এই মুহূর্তে পেছনে ফেলে যে সম্পর্কে সমস্ত ঐতিহাসিক একমত যে, তিনি একজন শরীয়তের পাবন্দ, ধর্মের খাটি অনুসারী বরং তাঁর জীবন একজন মুত্তাকী পরহেযগার মুসলমানের জীবন ছিল এবং যার জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে গুটিকয়েক নমুনাই যথেষ্ট।

"রমযান মাস। লু হাওয়া বইছিল। দিনও ছিল বড়। বাদশাহ দিনের বেলা রোযা রাখতেন। ওজীফা পাঠ করতেন। কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন।

---

১. পত্র নং ২০, ২২, ২৩, ২৬, ৩৪, ৩৯, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৮০, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, মকতূবাতে সায়ফিয়া)।

লেখালেখি করতেন। কালাম পাক হিফজ করতেন এবং আপন আদালত ও সাম্রাজ্যের কাজগুলো নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিতেন। সন্ধ্যাবেলায় ইফতার করে মোতি মসজিদে সালাত আদায় করতেন, তারাবীহ ও নফলাদি আদায় করতেন। মাঝরাতে অল্প কিছু খেয়ে নিতেন। রাতের বেলা খুব কম ঘুমাতেন। অধিকাংশ সময়ই ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। কতকগুলো বরকতময় রাত্রে সারারাতই ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। আর এভাবেই গোটা মাস কেটে যেত।"[১]

ইনতিকালের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লিখেন ঃ "হিজরী ১১১৮; জ্বরের প্রকোপ খুব বেশি। চারদিন পর্যন্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণ তাকওয়া সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথেই আদায় করেন। মৃত্যুর আগেই ওসিয়তনামা তৈরি করেছিলেন। এতে তিনি দাফন-কাফন সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, সাড়ে চার টাকা যা আমি টুপি সেলাই করে জমিয়েছিলাম তা দিয়ে দাফন-কাফন করবে। আটশত পাঁচ টাকা যা আমি কুরআন নকল করে কামিয়েছিলাম তা ইয়াতীম-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। ২৮শে যী-কা'দাহ, জুমুআর দিন ১১১৭ হিজরী সম্রাট ফজরের সালাত আদায় অন্তে কলেমায়ে তওহীদের যিক্র শুরু করেন। বেলা এক প্রহর হতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে অনন্তের পথে প্রস্থান করেন।[২]

আমরা এখানে সম্রাট আলমগীরের কেবল সেসব নির্দেশ ও ফরমান সম্পর্কে আলোচনা করব যেগুলো ইসলামী শি'আর (অভ্যাস, রীতিনীতি ও প্রতীকি চিহ্ন)-এর সম্মান এবং শরীয়তের বিধানসমূহের প্রচলন ও প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

হিজরী ১০৬৯ সাল এবং সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বছরের ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে গিয়া ঐতিহাসিক লিখছেন ঃ

"জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর শাহের আমল থেকে দফতর ও জুলূসের বছর ও মাসের ভিত্তি গার্রাহ ফারওয়াদীর ওপর রাখা হয়েছিল। এই তারিখে সূর্য তারকা-গর্ভে প্রবেশ করে। বসন্তের মৌসুম। এই সম্রাটের জুলূসের তারিখও এই তারিখের কাছাকাছি ছিল। তো তিনি গোটা হিসাব ফারওয়াদী থেকে নিয়ে ইস্কানদার[৩] মাস পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিলেন এবং মাসের নাম 'মাহে ইলাহী' রেখেছিলেন। যেহেতু এই পন্থা-পদ্ধতি অগ্নিপূজক বাদশাহ ও অগ্নি উপাসকদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ সেজন্য সম্রাট শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জুলূস, জশ্ন ও দফতরের হিসাবের জন্য বছর ও মাস আরবী চন্দ্র বর্ষের হিসাবে নির্ধারণ করেন এবং হুকুম দেন যে, সৌর বছরের ওপর আরবী বছর ও মাসের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নওরোযের উৎসব এখন থেকে একেবারে রহিত করা হল।

১. তারীখে হিন্দুস্তান, ৮ম খণ্ড, শামসুল উলামা যাকাউল্লাহ দেহলভীকৃত, ২১৪ পৃ.।
২. তারীখে হিন্দুস্তান, ৮ম খণ্ড, ৪৬৫ পৃ.।
৩. ফারওয়াদী ও ইস্কান্দার প্রাচীন ইরানী বর্ষপঞ্জীর মাস।

"সকলেই জানে যে, সব সময় মৌসুমগুলোতে চন্দ্র মাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। চন্দ্র বছর ও মাসের হিসাব রাখতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু এই ধার্মিক সম্রাট হিসাবের সহজের দিকে তাকান নি। শুধু অগ্নি উপাসক ও মজূসীদের সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে নওরোযের উৎসব রহিত করেন এবং ২য় জুলূসের তারিখ গার্রাহ রমযান নির্ধারণ করে তিনি জুলূসের নতুন বছর নির্ধারণ করেন এবং নওরোয উৎসবের জায়গায় ঈদুল ফিতরের উৎসব নির্ধারণ করেন"।[১]

সরকারী আয়-আমদানীর এক বিরাট উৎস যা শরীয়তসম্মত ছিল না তা রহিতকরণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লিখছেন ঃ

"সম্রাট রাহদারী মাফ করে দেন। এই রাহদারী (পথকর) সকল পথের মোড়ে ও মাথায় নির্দিষ্ট সীমান্তে আদায় করা হত। এ থেকে লব্ধ ও অর্জিত সকল অর্থ রাজভাণ্ডারে জমা হত। পান্দরী তাঁকে তহবাজারী বলে, এ থেকেও যে লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব হিসেবে আদায় হত তাও রাজকোষে জমা হত এবং শরীয়ত-সম্মত ও শরীয়ত বিরোধী আরও বহু কর, নেশাকর বস্তুর ওপর ধার্যকৃত কর, ক্রীড়া-কৌতুকের ওপর থেকে আদায়কৃত কর, বিবিধ প্রকার জরিমানা থেকে আদায়কৃত কর, শোকরানা কর প্রভৃতি বাবদ যেই কোটি কোটি টাকা সরকারী রাজকোষে আসত তা সবই এই সম্রাট ভারতবর্ষ থেকে মাফ ও মওকূফ করে দেন।"[২]

মুহতাসিব বা ন্যায়পালের পদ শরঈ হুকূমতের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং ইসলামী খেলাফতের একটি প্রতীক চিহ্ন ছিল। বহু আলিম-উলামা এই পদের ধরন ও প্রকৃতি, এর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর الحسبة في الاسلام নামে কিতাবও লিখেছেন। ভারতবর্ষের মুসলিম রাজ্যগুলোতে বহু কাল থেকে এই পদ স্থগিত ও এই কাজ বন্ধ ছিল। সম্রাট এই সুন্নতটি জীবিত করেন। ঐতিহাসিক লিখছেন,

"সম্রাট একজন প্রভাবশালী আলিমকে মুহতাসিব (ন্যায়পাল) নিযুক্ত করেন। তার ওপর নির্দেশ ছিল, তিনি মানুষকে নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে বিশেষত মদ পান, ভাং, চাউল, বার্লি প্রভৃতি থেকে তৈরি উত্তেজক মদ, সর্বপ্রকার নেশা জাতীয় বস্তু ও অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করবেন ও বিরত রাখবেন এবং যথাসাধ্য খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবেন।"[৩]

ইয়াযদহম বর্ষ ও হিজরী ১০৭৮-এর ১ম তারিখের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লিখছেন ঃ

"প্রতিদিনই শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচলন এবং ঐশী আদেশ-নিষেধ-এর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের ব্যাপারে সম্রাটের বাধ্য-বাধকতা বৃদ্ধি পেত। বিস্তারিত

১. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, ৮৩-৮৪ পৃ.
২. প্রাগুক্ত, ৯০ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত, ৯২ পৃ.।

বিধানসমূহ জারী হত যে, পথকর ও পান্ত্রী প্রভৃতি মওকূফ করা হোক যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব প্রতি বছর সরকারী রাজকোষে জমা হত। তিনি নেশা জাতীয় বস্তুর প্রচলন ও শয়তানের আড্ডা বন্ধ করতেন"।[১]

সামনে অগ্রসর হয়ে লিখছেন ঃ

"সম্রাট গান-বাজনা ও নৃত্যকে নিষেধ করে নির্দেশ জারী করেন। ঝরোকা দর্শনকে শরীয়ত বিরোধী জেনে ঝরোকায় নিজে বসা এবং ঝরোকার নিচে মানুষের জমায়েত হওয়াকে নিষিদ্ধ করে দেন"।[২]

ভারতীয়দের প্রাচীন নিয়ম ও বিশ্বাস মুতাবিক মুসলমান রাজা-বাদশাহগণও জ্যোতিষ শাস্ত্র ও জ্যোতিষীদের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করতেন এবং তাদের দেওয়া হিসাব ও ফয়সালা মাফিক বিভিন্ন কাজ-কর্মের দিন তারিখ ধার্য করতেন। আলমগীর এটাও বন্ধ করে দেন। সবচে' বড় কথা হল, আদালতী ফয়সালাগুলোর গোটাটাই আমীর-উমারার ও শাসকদের আদালত এবং তাদের ফয়সালার ওপর নির্ভরশীল ছিল। আলমগীর শরীয়তের কাযী নিযুক্ত করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ এখতিয়ার (ক্ষমতা) প্রদান করেন।

"কবি ও জ্যোতিষী যারা খুব এখতিয়ারসম্পন্ন ছিলেন, বিশেষত সম্রাট শাহজাহানের আমলে, তাদের এখতিয়ার রহিত করেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি ও ছোট-বড় মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কাযী নিযুক্ত করা হয় এবং এ নিযুক্তি এমন স্থায়ী ছিল যে, সর্বোচ্চ পদাধিকারী আমীরগণ তাদেরকে ঈর্ষা করতেন, হিংসা করতেন।"[৩]

সমগ্র সাম্রাজ্যে শরঈ আইন-কানূন জারীর ও বিচারকদের বিচারকার্য সহজতর করার জন্য ফিক্‌হী মসলা-মাসাইল প্রণয়ন ও বিন্যস্তকরণের বিরাট বোঝা কাঁধে তুলে নেন এভং নির্ভরযোগ্য আলিম-উলামার একটি দলকে এ উদ্দেশ্যে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা সহজ সরল ভাষায় ও বাক্যে খুঁটিনাটি মসলাগুলোকে এক জায়গায় জমা করবেন এবং যে যেখান থেকে নেবেন তার বরাত বা সূত্র উল্লেখ করবেন। এজন্য রাজত্বের প্রথম থেকেই মাওলানা নিজামুদ্দীন বুরহানপূরীকে এর দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি সে সব আলিম থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন যাঁরা হানাফী ফিক্‌হে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিলেন।[৪] এ কাজ ৬ খণ্ডে সমাপ্ত হয় এবং

---

১. নুযহাতুল খাওয়াতির প্রণেতা ফারসী ইতিহাসের সূত্রে লিখেছেন, আলমগীর ১০৬৯ হি. তে ৮০ প্রকার অবৈধ ট্যাক্স মওকুফ করেছিলেন যার মোট আয় ছিল ৩০ লক্ষ বার্ষিক।

২. প্রাগুক্ত,২৭৫-৭৬ সংক্ষেপে।

৩. প্রাগুক্ত,২৭৭ পৃ. আরও দ্র. জহীরুদ্দীন ফারূকীর "আওরঙ্গযেব" নামক গ্রন্থের ৫৫৯-৬২ পৃ. A Reformer নামক অধ্যায়।

৪. হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই তাঁর الثقافة الاسلامية فى الهند নামক গ্রন্থে অনেক অনুসন্ধানের পর সেসব আলিমের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন যারা উক্ত বোর্ডে ছিলেন। তিনি এমন বিশজনের নাম লিখেছেন যারা গোটা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী মহলের প্রতিনিধিত্ব করতেন। দামিশ্‌ক একাডেমী থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১১০-১১১।

রাজকোষ থেকে এ বাবদ দু'লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয় (যা সে যুগের হিসাবে অবশ্যই বিরাট অংকের অর্থ ছিল)। এটি ভারতবর্ষে "ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি" নামে এবং মিসর, সিরিয়া ও তুরস্কে "আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা" নামে মশহূর এবং কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের দরুন এটি বিরাট গুরুত্ব অর্জন করেছে।

এর চেয়েও অধিক সাহসী পদক্ষেপ ছিল এই যে, সম্রাট তাঁর বিরুদ্ধেও প্রজা-সাধারণকে বিচার চাইবার ও শরীয়ত মুতাবিক ফয়সালা করাবার অনুমতি প্রদান করেন এবং এ কাজের জন্য শর'ঈ উকীল নিযুক্ত করেন। ভারতীয় ঐতিহাসিক লিখেন ঃ

"হি. ১০৮২ সালে সম্রাট নির্দেশ দেন যে, শহরে বন্দরে সর্বত্র ঘোষণা দিন, যদি সম্রাটের বিরুদ্ধে কারো কোন শর'ঈ দাবি থাকে তাহলে সে যেন বাদশাহ্‌র উকীলের কাছে মামলা রুজূ' করে এবং প্রমাণ সাপেক্ষে তার হক নিয়ে নেয় এবং এও নির্দেশ দেন, বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে শর'ঈ উকীল কাছে এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শহরগুলোতে নিযুক্ত হবেন যাতে করে যারা সম্রাট সমীপে হাজির হবার সাহস রাখে না তারা তার মাধ্যমে তাদের হক যেন দাবি করতে পারেন।[১]

মোগল দরবারে এবং মোগল সম্রাটদের জন্য সাধারণভাবে কুর্নিশ ও শাহী আদব প্রদর্শনের নিয়ম প্রচলিত ছিল যেগুলোতে বাড়াবাড়িমূলক সম্মান ও শরীয়ত বিরোধী আমল অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুন্নত মুতাবিক সালাম প্রদানের রেওয়াজ শাহী দরবারে তো দূরের কথা, আমীর-উমারা ও রঈস বরং বহু উলামা' ও মাশায়েখ-এর মজলিসেও ছিল না। সম্রাট এক্ষেত্রেও সংস্কার সাধন করেন এবং সুন্নত মুতাবিক সালাম প্রদানকেই যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে তাকীদ দেন। ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ

"ঐ দিনগুলোতেই হুকুম হল, মুসলমানরা যখন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন শরীয়ত যেভাবে সালাম দিতে বলেছে অর্থাৎ আস-সালামু আলায়কুম বলে সালাম দেবে এবং একেই যথেষ্ট ভাববে। কাফিরদের মত মাথার ওপর হাত রাখবে না। কর্মকর্তারাও সাধারণ ও বিশিষ্ট সবার সাথে একই তরীকাই এখতিয়ার করবেন।"[২]

ঐ সব আবেগদীপ্ত প্রেরণা ও পদক্ষেপের ফলে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও দীনি মহল বাদশাহ্ আলমগীরকে "মুহ্‌য়িদ্দীন" অর্থাৎ "ধর্মের পুনর্জীবন দানকারী" উপাধি প্রদান করেন। আল্লামা ইকবালের মতেও (যিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ঝোঁক-প্রবণতা ও দর্শন, বেদান্ত দর্শন ও শরীয়তের মুখোমুখি হওয়া এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যত ছবির ভাগ্য পরীক্ষার ওপর গভীর দৃষ্টি ছিল।) আলমগীর ঐ

১. প্রাগুক্ত, ৩০০ পৃ.।

২. আলমগীরের প্রকাশ্য ধর্মীয় প্রবণতা এবং সাম্রাজ্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে যদুনাথ সরকারের History of Aurangzib, vol-III, p-90. এবং lanepool-এর Aurangzib দ্র.।

সব কতিপয় ব্যক্তির অন্তর্গত ছিলেন যাঁদের মাথার ওপর এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করছিল। স্বয়ং গ্রন্থকারও তাঁর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, যা ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সালে লাহোরে কবির নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সম্পর্কে লিখতে গিয়ে "আরিফ হিন্দী কী খেদমত মে চন্দ ঘন্টে" নামক এক নিবন্ধে বলেছিলেন,

"ভারতবর্ষে ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে কথা উঠলে আল্লামা (ইকবাল) মুজাদ্দিদ আলফেছানী, হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী, হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভী এবং সুলতান মুহ্য়িদ্দীন আলমগীরের খুবই প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আমি সব সময় বলি, যদি তাঁদের অস্তিত্ব ও চেষ্টা-সাধনা এর পেছনে না থাকত তাহলে হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শন ইসলামকে নিজের ভেতর হজম করে নিত।"

তিনি (আল্লামা ইকবাল) তাঁর এই নিশ্চিত বিশ্বাস ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই আলমগীরের শানে নিম্নের আবেগদীপ্ত ও চিন্তা-উদ্দীপক কবিতাটি রচনা করেছিলেন ঃ

شاه عالمگیر گردوں استاں - اعتبار دود مان گور گاں

پایه اسلامیاں بر ترازو - احترام شرع پیغمبر ازو

در میان کار زار کفرو دین - ترکش مارا خدنگ آخریں

تخم الحادے که اکبر پرور ید - بازاندر فطرت دار ادمید

شمع دل در سینه باروشن نبود - ملت ما ازفسادایمن نبود

حق گزید از ہند عالمگیر را - آںفقیر صاحب شمشیررا

از پئے احیا ئے دین مامور کرد - بہر تجدید یقین مامور کرد

برق تیغش خد من الحاد سوخت - شمع دین در محفل ما برفروخت

کور ذوقان داستانها ساختند - وسعت ادراك او نشناختند

شعله توحیدرا پروانه بود - چوں براهیم اندریں بتخانه بود

درصف شا ہنشہاں یکتا ستے

فقراو از تربتش پیدا ستے

শেষ পর্যন্ত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর দু'জন মর্যাদাবান খলীফা ও প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম ও হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী এবং

তাঁদের একনিষ্ঠ ও মর্যাদাবান খলীফা ও স্থলাভিষিক্তদের চেষ্টা-সাধনা এদেশে ফলপ্রসূ হয় এবং হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রমান্বয়ে এদেশ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের (যার ওপর চিন্তাগত ও জ্ঞানগত জড়তার মেঘ ছেয়ে ছিল) আধ্যাত্মিক ও ইলমী মারকাযে পরিণত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের দূরদরায এলাকা থেকে লোকেরা এখানে তাদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত পিপাসা নিবারণের, তাযকিয়া ও ইহ্সানের মনযিল অতিক্রম এবং হাদীছের দরস গ্রহণের নিমিত্ত আসতে থাকে। এখানকার জায়গায় জায়গায় মুজাদ্দিদী খানকাহ্, কুরআন ও সুন্নাহ্র তা'লীম ও দরসে হাদীছের কেন্দ্র কায়েম হয়ে যায় এবং এক বিশাল জগত সেসব থেকে উপকৃত হয়।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরোধিতা ও তাঁর প্রতি পথভ্রষ্টতার অভিযোগ এবং এ অভিযোগের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দ

এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকবে এবং পাঠকের সামনে কেবল একটি দিকই আসবে (যা যদিও খুবই উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল ও আলোকিত এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের সীরাত তথা জীবন-চরিত ও ইতিহাসে এদিকটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে), যদি আমরা এই বিরোধিতামূলক আন্দোলন ও অভিযানের আলোচনা না করি যা মুজাদ্দিদ সাহেবের জীবনের শেষ পাদেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যা ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা অতিক্রম করে হারামায়ন শারীফায়ন (মক্কা মু'আজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যার বুনিয়াদ মুজাদ্দিদ সাহেবের কোন কোন লেখা ও পত্রের কিছু কিছু এবারত ও বিষয়বস্তুর ওপর ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীকে তাঁর জীবনেই সেই সাধারণ জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন এবং মানুষ যেভাবে তাঁর দিকে ঝুঁকে ছিল এবং সূফী-বুযুর্গ ও আলিম-উলামা থেকে শুরু করে সরকারী প্রশাসনের লোকদের ওপর তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব পড়েছিল এবং কয়েক বছরের মধ্যে নক্শবান্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলা ভারত ও ভারতবর্ষের বাইরে যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, অধিকন্তু তিনি যেসব নতুন ইল্ম ও জ্ঞান-গবেষণা তাঁর মকতূবাত ও মজলিসের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিলেন যার অনেকগুলোই, সাধারণের কথা নাইবা বললাম, বহু বিশিষ্ট লোকের কাছেই অপরিচিত এবং একটি সীমা পর্যন্ত (যদিও ভীতিকর নাও হয়) বিস্ময়কর তো অবশ্যই ছিল এবং সেসবের মধ্যে অনেকগুলোই সেই সব কেন্দ্রের স্বীকৃত ও মান্য বিষয়-বস্তুর বিরোধী ছিল যা বংশ ও প্রজন্ম-পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছিল এবং এই ব্যাপারটি অধিকাংশ সময় সেই সব ক্ষণজন্মা পুরুষদের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছে যাঁরা কোন ইল্ম ও বিষয় শাস্ত্রের মুজতাহিদ, কোন সিলসিলা ও তরীকার প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বীয় যুগের সাধারণ জ্ঞানগত, মেধাগত ও অপ্রকাশ্য

মাপের চেয়ে উন্নত হন এবং যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা 'ইলম ও আল্লাহ্ প্রদত্ত কামালিয়াত দ্বারা ধন্য ও ভূষিত করে থাকেন এবং যাঁরা সাধারণ পরিভাষা ও প্রাচীন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বৃত্ত থেকে বাইরে পা রাখেন। অতঃপর তিনি বিদ'আতে হাসানার বিরুদ্ধে যেই কলমী জিহাদ শুরু করেন, পীর-বুযুর্গদের জন্য সিজদায়ে তা'জীমি বা সম্মানসূচক সিজদা, নৃত্য ও সামা, শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে সালাতের নিয়ত করা, জামা'আতের সাথে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা ও মীলাদ মাহফিলের বিরোধিতা করেন কিংবা কাশ্ফ শরীয়তের দলীল নয়, তরীকতের মাশায়েখ ও আওলিয়ায়ে কিরামের পরিবর্তে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কথা শরীয়তের দলীল বলে তিনি প্রমাণ করেন এবং কাশ্ফের বিশুদ্ধতা ও অভ্রান্ততা নিয়ে তিনি কথা বলেন ও স্বীয় যুগ ও দেশের বহু সিলসিলা ও খানকাহ্র প্রচলিত ও পরিচিত মা'মূলাতগুলো সুন্নাহ বিরোধী হওয়া জাহির করেন। অতঃপর এসবগুলোর থেকেও বেশি ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ থেকে (যাকে এক অকাট্য সত্য এবং মুহাক্কিক সূফীদের একটি সম্মিলিত মসলা মনে করা হত) এবং শায়খ-এ আকবর (মুহ্য়িদ্দীন ইব্ন আরাবী)-এর জ্ঞান ও গবেষণা থেকে, যাকে ইল্ম ও মা'রিফতের সিদরাতুল মুনতাহা (সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ধাপ) অভিহিত করা হয়েছিল, সামনে পা বাড়ান, অগ্রসর হন এবং এর সমান্তরাল "ওয়াহ্দাতু'শ-শুহূদ"-এর দর্শন পেশ করেন। এরপর তাঁর সম্পর্কে মুখে ও কলমে একেবারে চুপ থাকা এবং কোনরূপ বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যানমূলক বরং পথভ্রষ্টতামূলক আন্দোলন ও অভিযান তাঁর শেষ-যমানায় কিংবা তাঁর তিরোধানের পর পরই সৃষ্টি না হওয়া কেবল সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাসে নয় বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সংকলনের ইতিহাসেও একটি দুর্লভ ঘটনা হত।

এসব মতভেদ ও বিরোধিতাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি সেই সব বিরোধিতা যা বিরোধিতাকারীদের কোন ভুল বর্ণনার ভিত্তিতে কিংবা কোন ভুল বোঝাবুঝির ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই ভুল বর্ণনা ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হওয়া কিংবা সেই ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যাবার পর নিরসন ঘটেছে। দ্বিতীয় সেই সব বিরোধিতা যা আকীদা-বিশ্বাস ও মতের ভিন্নতা অথবা কোন প্রকার গোত্রপ্রীতি কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

প্রথম প্রকারের মধ্যে আমরা হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (মৃ. ১০৫২ হি.)-র মতভেদকে ধরছি যাঁর জ্ঞানগত ও ধর্মীয় মর্যাদাগত অবস্থান, ইখলাস তথা নিষ্ঠা ও লিল্লাহিয়্যাত ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ স্বীকৃত বিষয় এবং যিনি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর পীর ভাইও ছিলেন। সেই সাথে আপন পীরের খলীফা ও এজাযতপ্রাপ্তও বটেন। তিনি হযরত মুজাদ্দিদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন,

তাঁর কোন কোন কথা ও গবেষণার ব্যাপারে বিস্ময় ও ভীতি প্রকাশ করেছেন এবং একপত্রে যা তিনি হযরত মুজাদ্দিদের নামে লিখেছেন, এর খোলাখুলি প্রকাশ করে দিয়েছেন।[১] হযরত শায়খ আবদুল হকের এই দীর্ঘ পত্রে হযরত মুজাদ্দিদের যেসব কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে সে সব সম্পর্কে মুজাদ্দিদী সিলসিলার বহু জ্ঞানী-গুণী আলিম ও সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের সুচিন্তিত ও গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হল, এটি একটি ব্যক্তিগত পত্র ছিল। হযরত শায়খ একে তাঁর "আল-মাকাতীব ওয়া'র-রাসাইল"-এ লেখেন নি। হযরত মিরযা মাজহার জানে-জানাঁর এরশাদ মুতাবিক শায়খ তাঁর এ পত্রটিকে নষ্ট করে ফেলার জন্য বলেছিলেন। এই পত্র লেখার ক্ষেত্রে মূলত যেই প্রেরণা ও আবেগ-অনুভূতি কাজ করেছে (এবং যা আসলেই প্রশংসনীয়) তা শায়খ-এরই ধারণা যে, মুজাদ্দিদ সাহেবের কোন কোন কথা ও গবেষণা দ্বারা কতিপয় এমন বুযুর্গের খাটোকরণ ও ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে যাঁদের উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে উম্মত একমত। কিন্তু তাঁর মকতূবাত (পত্র সংকলন)-এর ডুবুরী ও ব্যাখ্যাকার এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল তারা বহুবার বহুভাবে এর জওয়াব দিয়েছেন এবং স্বয়ং মকতূবাতের অধ্যয়ন ও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবন এসব অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করে। এসব মকতূব-এর একটি বড় আন্দোলক হযরত শায়খ-এর সায়্যিদুনা 'আবদুল কাদির জিলানীর সঙ্গে সেই ঐকান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধাও যা ইশ্‌ক ও আত্মবিলোপের দর্জা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং সর্বপ্রকারে তা কেবল প্রশংসাযোগ্যই নয় ঈর্ষাযোগ্যও বটে এবং এতে উম্মতের একটি বিরাট শ্রেণী সব যুগে ও সব দেশে শরীক। হযরত শায়খ-এর ধারণা যে, হযরত মুজাদ্দিদের কথা থেকে তাঁর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। এরও পাল্টা উত্তর হিসাবে লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধে সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এখানে সেই পত্রের বিভিন্ন অংশের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির বিস্তারিত পর্যালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। এজন্য আমাদের সেই সব রিসালার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে যেসবের উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। উক্ত পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দিকে এমন সব কথা নিসবত (সম্পৃক্ত) করা হয়েছে যা সুস্পষ্ট ভিত্তিহীন এবং শত্রুদের দেওয়া অপবাদ। আশ্চর্য লাগে যে, হযরত শায়খ সেগুলো কিভাবে বিশ্বাস করলেন এবং সে সব পত্রে লিখলেন। হযরত শাহ

---

১. এই পত্রের ওপর অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী "হায়াতে শায়খ আবদুল হক" নামক পুস্তকের শেষাংশে-পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ আছে। দেখুন ৩১২-৪৪ পৃ. এই পত্রের উত্তরে বহু পুস্তিকা লেখা হয়েছে যার ভেতর শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দী, শায়খ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (মুজাদ্দিদ সাহেবের কনিষ্ঠপুত্র) শায়খ মুহাম্মদ ফররুখ, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী এবং হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী (র)-র নাম নেওয়া যায়। মাওলানা ওয়াকীল আহমদ সিকান্দরপুরী "হাদিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া" নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা এরই উত্তরে লিখেছেন। পুস্তকটি ৩৩৬ পৃষ্ঠার।

গোলাম আলী দেহলভীর কলম, যা ছিল ধৈর্য ও সৌম্য-শান্তির প্রতীক, এ ধরনের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে সেই কলম থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে যায় ঃ

العياذ بالله این چه خلاف نویسی است وایں چه بے تحقیق گوئی است درہیچ مکتوب ایشاں ایں چنیں عبارت نیست یاشیخ عفا الله عنك ـ

"আল-'আয়ায বিল্লাহ! আল্লাহ্র পানাহ চাই! এ কী ধরনের ভিত্তিহীন ও অসত্য কথা যার কোন সনদ নেই। হযরত মুজাদ্দিদের কোন পত্রেই এ ধরনের কথা নেই। হযরত শায়খ! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

যেহেতু হযরত শায়খ মুখলিস ছিলেন, নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং তাঁর কলম থেকে সেসব কথা ও বর্ণনা-বিবৃতির ব্যাপারে যেগুলো হযরত মুজাদ্দিদের দিকে নিসবত করা হয়েছিল, যেই বিস্ময় ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে-এর আন্দোলক ছিল তাঁর ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও ইলমী মকাম। এজন্য যখন তিনি তাঁর ভুল বিবৃতি সম্পর্কে জানতে পারলেন, হযরত মুজাদ্দিদ সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা দূর হল ও তাঁর উচ্চ মর্যাদা তাঁর সামনে প্রকাশিত হল অমনি তিনি এর ক্ষতিপূরণের জন্য এতটুকু বিলম্ব করেন নি এবং উচ্চ কণ্ঠে হযরত মুজাদ্দিদ-এর সঙ্গে তাঁর খুলূস (অকপটতা ও অকৃত্রিমতা) ও ভালবাসা প্রকাশ করেন যা তাঁর মত একজন আলেমে রব্বানীরই শান উপযোগী। তিনি খান হুসসামুদ্দীন আহমদ দেহলভীকে লিখিত এক পত্রে বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নিরাপদ শান্তিতে রাখুন এবং যাচঞাকারী নিষ্ঠাবান প্রার্থীদের মাথার ওপর তাকে স্থায়ী রাখুন। এই দুই তিন সময়পর্বে আমি আপনার অবস্থা সম্পর্কে না জানার কারণ হয়তো হতে পারে সেই অলসতা যা মানব স্বভাবের মধ্যেই রয়ে গেছে অথবা সেই অভিপ্রায় হতে পারে যে, আপনি যেন পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন এবং খুশীর খবর শুনতে পারি। আশা করি, আপনি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবেন।

"বন্দেগী হযরত মিঞা শায়খ আহমদ এর সুসংবাদ জ্ঞাপক খবরের ব্যাপারে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি। আশা করি, যাচঞাকারীদের দোআ কবুল হবে। খুবই প্রভাব সৃষ্টি করবে। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে অধমের আন্তরিক সম্পর্ক অত্যন্ত বেশী। মনুষ্য স্বভাবের কোন পর্দা কিংবা বিষণ্ন প্রকৃতির কোন প্রভাব আদৌ প্রতিবন্ধক হয় নি। আমি নিজে জানি না এর কারণ কি? এর থেকে চোখ সরিয়ে ও দৃষ্টি এড়িয়ে ন্যায় ও সুবিচারের পন্থার প্রতি রেআয়েত এবং বুদ্ধির নির্দেশে চাহিদা ও দাবি এই যে, এ ধরনের প্রিয়ভাজন বুযুর্গদের প্রতি কু-ধারণা না হওয়াই সমীচীন।

আমার অন্তরে যওক ও আত্যন্তিক প্রেম (وجدان) এবং প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এমন কিছু অবস্থা ও কাইফিয়ত সৃষ্টি হয়ে গেছে যা বর্ণনা করতে আমার যবান অক্ষম। পাক পবিত্র আল্লাহ্ যিনি মানুষের দিল্ পাল্টানেওয়ালা ও অবস্থা পরিবর্তনকারী, স্থূল দর্শনধারীরা একথা বিশ্বাস করতে চাইবে না। আমি নিজেও জানতাম না আসলে অবস্থাটা কি এবং কেন। বেশি আর কি বলব এবং কি লিখব। প্রকৃত অবস্থার পুরো জ্ঞান তো আল্লাহ্রই আছে।"[১]

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্য থেকে আমরা সর্বপ্রথম হি. দ্বাদশ শতাব্দীর একজন হেজাযী আলেম শায়খ হাসান আজমী, অতঃপর মক্কী (যিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হাদীছের দরস দিতেন ও সে যুগের মশহূর হানাফী আলেম ছিলেন এবং হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ্ সাহেবের উস্তাযুল হাদীছ শায়খ আবূ তাহির কুর্দীর উস্তাদ ছিলেন)[২] -এর কিতাব الصارم الهندى فى جواب سوال عن كلمة السرهندى[৩] -এর ওপর চোখ বুলাচ্ছি। কিতাবের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ থেকে হারামায়ন শারীফায়নে ১০৯৩ হিজরীতে শায়খ আহমদ সরহিন্দী এবং তাঁর কতকগুলো অনভিপ্রেত কথাবার্তা সম্পর্কে যা তাঁর পত্র সংকলন (মকতূবাত) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, একটি প্রশ্ন এসেছে এবং হারামায়ন শারীফায়ন (মক্কা মু'আজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারা)-এর উলামায়ে কিরামের কাছে ফতওয়া চাওয়া হয়েছে যে, যিনি এ ধরনের কথা নিজের মুখ দিয়ে বের করবেন অথবা যিনি এ

---

১. বাশারাতে মাজহারিয়্যা, শাহ নঈমুল্লাহ বাহরাইচী, কুতুবখানা নদওয়াতুল উলামায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, ১২৮১ হি.।

২. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ ছাহেব তদীয় "আনফাসুল আরিফীন" নামক গ্রন্থে তাঁর কথা আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তিনি হাদীছে শায়খ-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে পাণ্ডিত্য রাখতেন। তিনি সুস্পষ্টভাষী (فصيح اللسان) ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি অধিকাংশ সময় শায়খ ঈসা মাগরিবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন। শায়খ আহমদ কাশশাশী, শায়খ মুহাম্মদ ইবনু'ল-আলা বাবেলী এবং শাফি'ঈ মাযহাবের মুফতী শায়খ যয়নুল 'আবেদীন ইবন আবদিল কাদির তাবারীর সাহচর্যও তিনি লাভ করেছেন। শাহ নি'মাতুল্লাহ কাদেরীর মত তরীকতপন্থী বুযুর্গের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাত করেছিলেন এবং দাওয়াতে আসমা'রও চর্চা করতেন। তাঁর দরসে হাদীছে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ ছাহেবের উস্তাদ শায়খ আবু তাহির কুর্দী মাদানী সাধারণত হাদীছের মতন পাঠ করতেন। শেষ বয়সে মক্কায় অবস্থান ছেড়ে দিয়ে তায়েফে এককোণে নির্জন বাস শুরু করেন এবং ১১১৩ হিজরীতে সেখানেই ইনতিকাল করেন এবং সায়্যিদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর পাশে চির বিশ্রাম লাভ করেন (আনফাসুল 'আরিফীন-১৮৬-৮৭ পৃ.)। খায়রুদ্দীন যিরিকলী তাঁর "আল-আ'লাম" নামক গ্রন্থে তাঁকে 'আল-উজায়মী লিখেছেন। পিতার নাম ছিল আলী ইব্ন ইয়াহইয়া। ডাক নাম ছিল আবুল বাকা'। পূর্বপুরুষগণ য়ামানী ছিলেন। হিজরী ১০৪৯ সালে জন্ম (২য় খণ্ড, ২২৩ পৃ.)

৩. আরবী পাণ্ডুলিপি পাটনার খোদা বখশ লাইব্রেরীতে বর্তমান ২৭৫৩ নং। ১০৯৪ হিজরীতে এ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এটি কুতুবখানা আসিফিয়ার পাণ্ডুলিপির মধ্যেও বর্তমান। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় ওপরে কেবল العصب الهندى লেখা আছে। লেখকের নিজের লেখায় কোথাও কিতাবের নাম নেই। উল্লিখিত কুতুবখানায় এ বিষয়ে আরও দু'টি বই বর্তমান।

ধরনের কথার ওপর বিশ্বাস পোষণ করেন কিংবা যিনি এসবের প্রচলন ও প্রচারে অংশ নেন তার ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কি? এরপর গ্রন্থের সংকলক লিখেছেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ও শায়খ মাওলানা শায়খ মোল্লা ইবরাহীম ইবন হাসান কোরানী আমাকে নির্দেশ প্রদান করলেন এর জওয়াব দিতে এবং হারামায়ন শারীফায়ন-এর উলামায়ে কিরামের এতদসম্পর্কিত রায় ও ফতওয়া উদ্ধৃত করতে। গ্রন্থের লেখক এই সংকলনে দু'জন আলেম-এর যাঁর মধ্যে একজন পূর্বোক্ত মোল্লা ইবরাহীম কোরানী মাদানী, দ্বিতীয় জন আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাসূল আল-বারযানজীর ফতওয়া উদ্ধৃত করেছেন। সর্বপ্রথম এই ফতওয়া যাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল সেই দু'জন যথাক্রমে মোল্লা ইবরাহীম কোরানী মাদানী এবং জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রসূল আল-বারযানজী সম্পর্কে ব্যক্তিগত পরিচয় লাভ জরুরী। প্রথমোক্ত ব্যক্তির আলোচনা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী "আনফাসুল আরেফীন" নামক গ্রন্থে (পৃ. ১৮৪-৮৬) করেছেন। ইনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর হাদীছের মূল উস্তাদ শায়খ আবু তাহির কুর্দীর পিতা এবং শায়খ। সে যুগের একজন শায়খ ও বুযুর্গ শায়খ ইয়াহ্ইয়া শাবী সম্পর্কে তাঁর সেই অভিমত থেকে, যা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী উল্লেখ করেছেন এবং যেখানে শায়খ তাঁর ওপর তাজসীম-এর ফতওয়া প্রদান করেন যার জন্য তুরস্কের উযীরে সালতানাত যিনি তাঁর ভক্ত ছিলেন তাকে অবমাননার সাথে মজলিস থেকে বের করে দেন, একথা প্রকাশ পায় যে, তার মেযাজ কতটা খোশবক্ত এবং রায় কায়েমের ক্ষেত্রে ত্বরাপ্রিয় ছিল। সাইয়েদ মুহাম্মদ বারযানজী[১] যিনি এই ফতওয়ার দ্বিতীয় মুফতী-এর আলোচনা করতে গিয়ে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব লিখেছেন, তাঁর মেযাজ কতকটা রুক্ষ ও শুষ্ক ছিল (১৮৪ পৃ.)।

এসবের পর ফতওয়া ও উলামায়ে কিরামের অভিমত (রায়) এবং শরীয়তের হুকুম বয়ান ও ঘোষণার ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, উলামায়ে কিরাম ও মুফতীদের সামনে ঘটনার যেমন সূরত বর্ণনা করা হয় এবং যেভাবে সংঘটিত ঘটনা বিবৃত ও উদ্ধৃত করা হয় সেগুলোকে সামনে রেখেই এবং সেসবের আলোকেই ফতওয়া প্রদান করা হয়ে থাকে ও শরীয়তের হুকুম বর্ণনা করা হয়। বিখ্যাত প্রবচন ঃ

---

১. সাইয়েদ মুহাম্মদ বারযানজীর পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাসূল ইবন আবদুস সাইয়িদ আল-হাসানী আল-বারযানজী। হি. ১০৪০ সালে জন্ম এবং ১১০৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। জন্মস্থান শাহরে যূর। শেষ বয়সে মদীনা শরীফে অবস্থান করেন। তাঁর "হাল্লু মুশকিলাতু ইবনুল আরাবী" নামে একটি পুস্তক আছে। তিনি সেই বারযানজী নন দিয়ারে আরব যার জন্মস্থান (আল-আ'লাম, যিরিকলী, ৭ম খণ্ড, ৭৫ পৃ.)। মুজাদ্দিদ সাহেবের প্রত্যাখ্যানে তাঁর قدح الزند নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রয়েছে। বিস্তারিত জানতে শায়খ আবদুল্লাহ্ মুরদাদ আবুল খায়রকৃত, ১ম খণ্ড, المختصر من كتاب نشر النور والزهر।

تنہا پیش قاضی روی راضی بیائی -

"একাকী সোজা কাযীর কাছে চলে যাও এবং আপন চাহিদা মাফিক ফতওয়া লিখে নিয়ে এস।"

এই সব উলামায়ে কিরাম ও মুফতী যাঁদের কাছে ফতওয়া চেয়ে পাঠানো হয় তারা এজন্য দায়ী থাকেন না। আর তাদের কাছে এত সময়ও থাকে না যে, তারা ফতওয়া প্রার্থীদের কথা ও বর্ণনা-বিবৃতির পূর্বাপর ঘটনা দেখবেন, বিচার-বিশ্লেষণ করবেন, সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করবেন এবং সেগুলোকে পূর্বেকার সব কিছু থেকে আলাদা করে لاتقربوا الصلوة (তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না)-এর মত বিখ্যাত সাধারণ প্রবচনের মত নিজের সমর্থনে পেশ করা হয়নি। একথার পূর্ণ কার্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান যে, ফতওয়ার উত্তরদাতা হযরতগণ মুজাদ্দিদ আলফেছানীর "মকতূবাত" সম্ভবত সরাসরি পড়েন নি অথবা তাদের দরূস ও ফতওয়া প্রদানের পর এতটা ফুরসত মিলত যাতে করে তারা এর আরও তাহকীক তথা বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। অধিকন্তু সে সময় হারামায়ন শারীফায়ন-এ এই সিলসিলার এমন আলিম-উলামাও সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন না যাঁরা তাঁদেরকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারতেন।

ফতওয়া প্রার্থীর জ্ঞান-গরিমা, উপলব্ধি, আমানতদারী ও যিম্মাদারির অনুভূতির সম্পর্ক যতদূর তার জন্য কেবল একটি উদাহরণই যথেষ্ট যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) কা'বার হাকীকত সম্পর্কে যেই সূক্ষ্ম আরিফসুলভ আলোচনা করেছেন, মতামত ব্যক্ত করেছেন তাকে এ কথার ওপর আরোপ করা হয়েছে যে, তিনি একথার সমর্থক যে, বর্তমানে পরিচিত ইমারত কা'বা নয়, আর একথা সুস্পষ্ট কুফরীকে অবধারিত করে তোলে। লেখক বলেন,

"সেই সব কুফুরীর মধ্যে এও যে, তিনি অস্বীকার করেছেন যে, কা'বা বর্তমানে পরিচিত ইমারতের নাম।"

এখন এর বিপরীতে সেই পত্রটিও পাঠ করুন যা শায়খ তাজুদ্দীন সম্ভলীর নামে লিখিত যিনি তখন কেবলই বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ সমাপন শেষে ফিরেছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব বায়তুল্লাহ শরীফের হালত শোনার আগ্রহ ও অস্থিরতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"অধমের কাছে যেভাবে কা'বার সূরত রব্বানী সৃষ্টিসমূহের সুরত ও অবয়বের (চাই সে মানুষ হোক অথবা ফেরেশতা) সিজদাস্থল, এর হাকীকত এসব সূরত ও অবয়বের হাকীকতের সিজদাস্থল। আর এভাবেই এ হাকীকত সমস্ত হাকীকতের ওপর এবং এর সঙ্গে যে সব কামালিয়ত সম্পর্কিত সে সমস্ত কামালিয়াতের ওপর

যা অপরাপর হাকীকতের সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, যেন এই হাকীকত জাগতিক হাকীকত ও হাকীকতে ইলাহীর মাঝে বরযখ তথা অন্তরাল।"[১]

এই একটি উদাহরণ থেকে সেই সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কুফরী ফতওয়ার হাকীকত ও মাহিয়ত-এর পরিমাপ করা যেতে পারে যা সে সব বর্ণনা ও উদ্ধৃতির ওপর জারি করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও লেখক শেষে এই সতর্কতা অবলম্বন করে লিখেছেন ঃ

"এও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব কথার বিশ্বাসী কথক এবং সেসব লেখা যিনি লিখেছেন, তার ওপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং তার শেষ পরিণতি ভাল হয়েছে। যেমনটি তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে আচরণ করে আসছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতার শান বরাবর প্রকাশ পেয়েছে। আর এরও একটা কারণ ও পন্থা যে, তাঁর ঔরসজাত সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যখন হারামায়ন শারীফায়নে হাজির হয়েছেন তখন তাঁরা হাদীছের সনদ নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের তরীকার বুনিয়াদ সুন্নতে মুহাম্মদীর পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং নবী করীম (সা)-এর পদাংক অনুসরণ করে চলার ওপর। তাঁরা হাদীছের মাশায়েখ-যেমন ইমাম যয়নুল আবেদীন তাবারী থেকে হাদীছের সনদ নিয়েছেন এবং আমাদের শায়খ ঈসা মুহাম্মদ ইবনুল মাগরিবী জা'ফরীকে এমনভাবে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করেছেন যে, তিনি শায়খ মুহাম্মদ মা'সূম থেকে নকশবান্দিয়া তরীকা হাসিল করেছেন যাতে করে তিনি তাঁর মহান ও মর্যাদার অধিকারী মাশায়েখ-এর বরকত হাসিল করতে পারেন।"[২]

লেখকের এই বর্ণনা থেকে যা তিনি অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এই সব ফতওয়া কেবল ঐসব বিবরণের ওপর বিশ্বাস করে লিখা হয়েছিল যা তাঁদের সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং মুফতী সাহেবান নিজেরা তাঁর (মুজাদ্দিদ সাহেবের) ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। মুজাদ্দিদী খান্দানের সম্মান ও মর্যাদাবান লোকদের হারামায়ন শারীফায়ন উপস্থিতি, বিশেষ করে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (র)-এর সীরাত, আখলাক ও মর্যাদা-মণ্ডিত অবস্থা দেখার পর এই ভ্রান্ত ধারণা কেবল দূর হয়েই যায়নি বরং স্বয়ং লেখকের একজন জলীলুল কদর শায়খ ঈসা আল-মাগরিবী হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর হাতে বায়'আত হয়েছেন এবং নকশবান্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকার নিসবত পয়দা করেছেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী "আনফাসুল আরেফীন" নামক গ্রন্থে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং লিখেছেন ঃ

---

১. মকতূব নং ২৬৩, ১ম দফতর;
২. আস-সারিম আল-হিন্দী, (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ২।

بالجملہ یکےاز علمائے متقنین بود ووے استاد جمہور اہل حرمین است ویکے ازادعیئہ حدیث وقرأت سیدعمرباحسن یہ حق وے گفتی من اراد ان ینظرالی شخص لا یشك فی ولایتہ فلینظرالی ھذا۔

তুর্কিস্তানের একজন মুজাদ্দিদী বুযুর্গ মুহাম্মদ বেগ আল-উযবেকী এই সব ফতওয়ার পর হেজায আগমন করেন। তিনি তাঁর কিতাব عطية الوهاب الفاصلة بين الخطاء والصواب লিখে এটা প্রমাণ করেছেন যে, এই সব ফতওয়া মকতূবাতের বাক্যাংশের ভুল অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে এবং জ্ঞাতসারে এ ধরনের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। তিনি ভুল অনুবাদের অনেকগুলো উদাহরণও পেশ করেছেন। এই বিশ্লেষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু উলামায়ে কিরাম তাঁদের পূর্বের অভিমত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেউ কেউ ইমাম রব্বানী (মুজাদ্দিদ আলফেছানীর)-র সমর্থন ও প্রতিরক্ষায় কিতাবও লিখেছেন। এঁদের মধ্যে হাসান ইবন মুহাম্মদ মুরাদুল্লাহ আত-তিউনিসী আল-মাক্কীও আছেন যিনি العرف الندى فى نصرة الشيخ احمد السرهندى নামক কিতাব লিখেছেন যেখানে তিনি লিখেছেন ও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মুজাদ্দিদের বিরুদ্ধে যেই অভিযান শুরু করা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল ভুল ও বিকৃত অনুবাদের ওপর। দ্বিতীয় জন ছিলেন আহমদ আল-য়াশীশী আল-মিসরী আশ-শাফি'ঈ আল-আযহারী। তিনি একথা খুব পরিচ্ছন্ন ও সাফাঈ সহকারে প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া প্রদান স্রেফ তাসাওউফের পরিভাষা ও দৃষ্টিকোণ সঠিকভাবে বুঝতে না পারা কিংবা ভুল বোঝার কারণে হতে পারে যে সব পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন। মুহাম্মদ বেগ হেজাযের উলামায়ে কিরামের সাথে এ বিষয়ে বাহাছ-মুবাহাছা ও বিতর্ক করেছেন এবং সামনাসামনি আলাপ-আলোচনাও করেছেন যে জন্য আল-বারযানজীকে الناشرة الناجرة নামক কিতাব লিখতে হয় যেখানে তিনি মুহাম্মদ বেগকে খুবই অবজ্ঞাপূর্ণভাবে ও তাচ্ছিল্য সহকারে আলোচনা করেছেন।

ভারতবর্ষে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরোধিতা এবং তাঁর ওপর আপত্তি উত্থাপনের একটি লক্ষ্য-যোগ্য ঐতিহাসিক দস্তাবীয যা বিরোধিতাকারী ও আপত্তি উত্থাপকদের মানসিকতা ও চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই দলের কতকটা মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে তা হল শায়খ আবদুল্লাহ খেশগী কাসূরী (১০৪৩-১১০৬ হি.)-র معارج الولاية নামক বিরাট ভলিউম আকারের

১. আনফাসুল আরেফীন, পৃ. ১৮৩।

কিতাব।[১] আবদুল্লাহ খেশগী (যাঁকে সংক্ষেপে 'আবদী নামেও স্মরণ করা হয়ে থাকে)-র অবস্থা থেকে মনে হয় যে, তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা বুযুর্গ ছিলেন।[২] স্বীয় যুগের প্রচলিত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অধিকার ছিল। তাসাওউফের ক্ষেত্রে তিনি চিশতিয়া তরীকার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং চিন্তা-চেতনা ও মতবাদের দিক দিয়ে ছিলেন ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদে বিশ্বাসী বরং মনে হয় তিনি এক্ষেত্রে চরমপন্থী ছিলেন। তাঁর উস্তাদবৃন্দ ও ভক্তিভাজন ব্যক্তিদের অধিকাংশই হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরোধী এবং ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদে বিশ্বাসী সূফী ছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ (যেমন শায়খ নে'মত লাহোরী, কাযী নুরুদ্দীন, কাযী কাসূর) মুজাদ্দিদ সাহেবের কুফুরী ফতওয়ার ওপর দস্তখতও করেছিলেন। মনে হয় যে, তিনি সাইয়েদ মুহাম্মদ বারযানজী (قدح الزند-এর লেখক)-র সঙ্গে সম্পর্কিতদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন যারা আওরঙ্গাবাদে বাস করতেন[২] যেখানে বসে হি. ১০৯৬ সালে জনাব খেশগী উক্ত কিতাব সমাপ্ত করেছিলেন। আলোচ্য কিতাবের একটি উৎস সে যুগের আরেকটি কিতাব كاسر المخالفين যিনি হযরত মুজাদ্দিদ ও তাঁর অনুসারীদের রদ করতে গিয়ে এ কিতাবটি লিখেছিলেন।

কাসূরীর চিন্তাধারা ও তাঁর সাকূল্য বিদ্যার দৌড় কতটুকু তা এ থেকে পরিমাপ করা যাবে যে, তিনি মুজাদ্দিদ আলফেছানীর আপত্তিযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সালাতে মুখে নিয়ত না করাকেও গণ্য করেছেন। তিনি লিখছেন ঃ

"তিনি যখন সালাতের জন্য খাড়া হতেন অধিকাংশ সময় মনে মনে নিয়্যত করতেন, মুখ নড়াতেন না (অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করতেন না) এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর এটাই নিয়মিত অভ্যাস ছিল। কেননা নিয়্যত দিলের ব্যাপার, মুখের নয়।"

খেশগী "মকতূবাত"-এর অধ্যয়ন কি ভিন্ন দৃষ্টিতে করেছিলেন এবং তার ভেতর কী পরিমাণ দায়িত্বানুভূতি ও কারুর দিকে কোন কথা ও ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধ করতে কতটা সতর্কতা ছিল-তার পরিমাপ নিম্নোক্ত বাক্যাংশ থেকে করা যাবে।

"প্রথম যুগের মাশায়েখগণ (মাশায়েখ-ই মুতাকাদ্দিমীন)-এর মধ্য থেকে যারা ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদের সমর্থক ছিলেন, যেমন হুসায়ন মনসূর হাল্লাজ ও শায়খ মুহয়িদ্দীন আরাবী প্রমুখ, (শায়খ আহমদ সরহিন্দী) তাঁদেরকে মুলহিদ ও যিন্দীক

---

১. এই গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বর্তমান লেখক প্রফেসর খালীক আহমদ নিজামীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পাঠ করেছেন। জানতে পেরেছি এর একটি কপি লাহোরেও আছে।

২. বিস্তারিত দ্র. احوال واثار عبد الله خويشگى قصورى মুহাম্মদ ইকবাল মুজাদ্দিদী, দারুল মুওয়াররিখীন লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত।

৩. মনে হয় হি. একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আওরঙ্গাবাদ এই বিরোধী আন্দোলনের বিরাট বড় কেন্দ্র ছিল এবং সেখান থেকে এ বিষয়টি হেজায ভূমিতে গিয়েছিল।

বলতেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত মকতূবাতের অধিকাংশ স্থানে শায়খ মুহয়িদ্দীন আরাবীকে তিনি কাফির বলেছেন এবং কোন কোন জায়গায় তাঁকে মু'তাযিলা হিসাবে অভিযুক্ত করেছেন। এতই সব সত্ত্বেও তিনি তাঁকে আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাদের মধ্যে গণ্য করেছেন।"

ঐ সব আপত্তির সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রশংসাও করেছেন। তিনি বলেন, "(হ্যরত খাজা বাকীবিল্লাহ) তাঁকে সত্যপথের যারা প্রার্থী তাদেরকে দাওয়াত প্রদানের এজাযত দেন। অনন্তর তিনি সত্য পথের প্রার্থীদেরকে হেদায়েত তথা পথ-নির্দেশনা দিতেন। আল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শন করতেন। শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম অনুসরণের জন্য তাকীদ করতেন। যারা শরীয়তের বিধি-বিধান পরিত্যাগ করত তাদেরকে তিনি ধমক দিতেন। যারা শরীয়তের ওপর আমল করত তাদের প্রতি খুশী হতেন।"

মুজাদ্দিদ সাহেবের পক্ষ থেকে তিনি তা'বীল (ভিন্নতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) ও করে থাকেন এবং তাঁর সম্পর্কে সুধারণাও প্রকাশ করেছেন। বিরোধীরা যে সব বাক্যাংশ ও শব্দসমষ্টির ওপর আপত্তি তুলেছে সেগুলো কপি করার পর লিখেছেন ঃ

"কিন্তু এটা জরুরী যে, ঐসব শব্দসমষ্টি দ্বারা জাহিরী তথা প্রকাশ্য অর্থই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যদি তা দ্বারা বাতেনী তথা গুঢ় অর্থ বোঝায় যেমনটি উপরে গুজরে গেছে....এ থেকে কোন কুফরী ফতওয়া দেওয়া কিংবা নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে না।"

কিন্তু এরপর সেই ধারণা যা সাহচর্য ও পরিবেশের প্রভাব ও লোক মুখে প্রচারিত গুজবের আধিক্য থেকে তাঁর মস্তিষ্কে গেড়ে গিয়েছিল—চেপে বসে। তিনি লিখেছেন ঃ

"কিন্তু সত্য হল এই যে, এমন কথা বলা যদ্দারা দরবারে নববী (সা)-এর প্রতি ক্ষুদ্রত্বের (تنقيص) ধারণা সৃষ্টি হয় তা ত্রুটি ও অপরাধ থেকে মুক্ত নয়।"

এই গ্রন্থের বেশির ভাগ গুরুত্ব ও খ্যাতি এজন্যই পেয়েছিল যে, এতে কাযী শায়খুল-ইসলাম[১] -এর সেসব পত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা তিনি আওরঙ্গাবাদের কাযী কাযী হেদায়েতুল্লাহ্‌র নামে পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণনা যে, তা মুসলিম বাদশাহ (আওরঙ্গযেব আলমগীর)-এর নির্দেশে জারী করা হয় এবং এর

১. কাযী শায়খুল ইসলাম কাযীউল কুযাত আবদুল ওয়াহ্‌হাব গুজরাটির পুত্র এবং সম্রাট আলমগীরের আমলের অন্যতম খ্যাতনামা কাযী ছিলেন। হি. ১০৮৬ সালে আলমগীর তাঁকে সর্বপ্রধান কাযী তথা বিচারপতি পদে নিযুক্তি দেন। ১০৯৪ হিজরীতে তিনি এই পদ থেকে ইস্তিফা দেন এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সম্রাটের বারবার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি পুনরায় আর এই পদ গ্রহণ করেন নি। 'ইয়াদে আয়্যাম' নামক গ্রন্থ, মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাইকৃত, পৃ. ৭৮-৭৯; মাআছিরুল উমারা।

ওপর কাযী শায়খুল ইসলামের সীল মোহর ছিল। গ্রন্থকারের বর্ণনা মুতাবিক এর ওপর ২৭ শে শওয়াল, ১০৯০ হিজরীর তারিখ লিপিবদ্ধ। এই পত্র বা ফরমান গ্রন্থকার كاسر المخالفين [১] থেকে নকল করেছেন এবং এখানে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"হি. ১০৯০ সালের শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ। কাযী হেদায়েতুল্লাহ জানুন যে, এ যুগে আমার কান পর্যন্ত একথা পৌঁছে গেছে আর আমি একথা শুনতে পেয়েছি যে, মকতূবাতে শায়খ আহমদ সরহিন্দীর কোন কোন মাকামাত দৃশ্যত আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের আকীদা বিরোধী। আলোচ্য শায়খ-এর যেসব ভক্ত আওরঙ্গাবাদে আছেন সেগুলো প্রচার করেন, সে সবের দরস প্রদান করেন এবং ঐ সব উল্লিখিত ভ্রান্ত ও বাতিল আকীদার সত্যতার ওপর বিশ্বাস রাখেন। সম্রাট আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন এই খাদেম শরীয়তের কাযীকে লিখেন যে, তাদেরকে রুশ্‌দ (?) ও ঐসব বিষয়ের দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যার সম্পর্কে জানা যাবে যে, সে ঐ সব ভ্রান্ত ও বাতিল আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে তাদেরকে শরীয়তের বিধান মুতাবিক শাস্তি দেওয়া হবে। এজন্য তা লিপিবদ্ধ করা হল। এখন এ হুকুম অবশ্য পালনীয় বিধান হিসাবে কার্যকর করতে হবে এবং হাকীকত তথা প্রকৃত বাস্তবতা লিখতে হবে।"[৩]

এই শাহী ফরমানকে বর্তমান কালের কিছু কিছু গ্রন্থে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেন এটি এক মহা ঐতিহাসিক আবিষ্কার যা সম্রাট আলমগীর-এর মুজাদ্দিদী আন্দোলনের প্রভাব স্বীকার এবং হযরত মুজাদ্দিদ ও তাঁর খান্দানের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বিজড়িত সম্পর্ক ও যোগাযোগের গোটা প্রাসাদকে গুড়িয়ে দেয়।

কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে তা এতটা গুরুত্ববহ ও আত্মহারা হবার মত ঘটনা নয় যতটা মনে করা হয়েছে। প্রথম কথা হল এই যে, এতে যেখানে মকতূবাতের আলোচনা করা হয়েছে সেখানে ظاهر در مخالفت عقائد اهل سنت والجماعة বলা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল, যে কথার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে তা সে সব নিবন্ধের প্রচলন ও পাঠন এবং যে সব বিষয়ে থেকে বিরত রাখা হয়েছে তা এরই সাধারণ প্রচার ও পঠন-পাঠন। প্রকাশ থাকে যে, এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও রহস্যপূর্ণ বিষয়াদির (যেসবের উপলব্ধি তত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ-এর পরিভাষা সম্পর্কে অবহিতি এবং আধ্যাত্মিক পথ (সুলূক) ও তাসাওউফ-এর কার্যকর ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সংস্পর্শের ওপর নির্ভরশীল) সাধারণ্যে প্রচার এবং তা সাধারণ মাহফিলে দরস প্রদান যেখানে আম-খাস তথা বিশিষ্ট সাধারণ সবাই শরীক হয়-বিক্ষিপ্ত ধ্যান-ধারণার কারণ ও মতানৈক্য সৃষ্টির উপলক্ষ্য হতে পারে এবং

১. আফসোস যে, এর গ্রন্থকার সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি।
২. মাআরিজুল বিলায়া, ৭০৮ পৃ.।

একজন শরীয়ত সমর্থক ও এর প্রতি সংবেদনশীল সম্রাটের যার একমাত্র লক্ষ্যই থাকে আপন দেশের সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা এবং বুযুর্গদের সম্পর্কে লাগামহীন উক্তি ও সমালোচনার বাক্যবান থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং যাঁর নিজের এই দাওয়াত ও এই খান্দানওয়ালা শানের সঙ্গে হার্দ্যিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্বন্ধের ওপর আস্থা আছে এবং যিনি আপন প্রভাব ও ক্ষমতা দ্বারা একে সফল ও সার্থক বানাবার ব্যাপারে খুবই সক্রিয় ও জোর তৎপর, ব্যবস্থাপনাগতভাবে এ ধরনের বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। যদি ঐ ফরমানকে সম্রাট আলমগীরের ব্যক্তিগত জীবন-যিন্দেগী, তাঁর প্রকৃত ও সত্যিকার প্রবণতা ও আবেগ এবং এই খান্দানের সাথে তাঁর সেই সব যোগাযোগ ও সম্পর্কের (যার বিস্তারিত বিবরণ পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠক ইতোমধ্যেই পাঠ করেছেন) আলোকে দেখা হয় তাহলে এই কয়টি বাক্যের ভেতর সেই গোটা ইতিহাস এবং সম্রাট আলমগীরের সেই কর্মপন্থা প্রত্যাখ্যানের কোন উপকরণ নেই যিনি শেষাবধি মোগল সাম্রাজ্যের গতিধারা ভারতবর্ষ থেকে ইসলামী প্রভাব মিটিয়ে দেবার থেকে ইসলামী শরী'আতের প্রয়োগ ও প্রচলন এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি চালু করার পেছনে নিয়োজিত করেন এবং যেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী, তাঁর খান্দান, খলীফা ও অনুসারীদের মৌলিক অংশ রয়েছে।

তা ঘটনা যাই হোক, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে হযরত মুজাদ্দিদ -এর ওফাতের পর তাঁর মকতূবাত এবং তাঁর কিছু কিছু আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বিরোধিতা ও পথভ্রষ্টতার অভিযোগের যেই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল যেই অভিযানে উলামায়ে কিরাম ও মুফতীদের একটি সংখ্যা শরীক হয়ে গিয়েছিলেন তা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম এক-চতুর্থাংশ পাদেই মুখ থুবড়ে পড়ে এবং এর যবনিকাপাত ঘটে। এখন তা কেবল ইতিহাসের (আর তাও কতকগুলো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে) পাতায় সমাধিস্থ হয়ে গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধভাগেই ভারতবর্ষ থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত মুজাদ্দিদী খানকাহ, হেদায়েত ও ধর্মীয় দিক-নির্দেশনার মারকায তথা কেন্দ্র কায়েম হয়ে গিয়েছিল। মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলার বুযুর্গ মাশায়েখ ও উলামায়ে কিরাম মকতূবাতের নির্ভরযোগ্য আরবী অনুবাদ পূর্বক অধিকাংশ মুসলিম দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শায়খ মুহাম্মদ মুরাদ মক্কী কাযীখানী হযরত মুজাদ্দিদ, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও অধঃস্তন পুরুষ, সিলসিলার আরব ও তুর্ক মাশায়েখদের আরবী ভাষায় পরিচয় করিয়ে দেন যা "যায়লুর রাশাহাত" নামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মকতূবাতের

অনুবাদও করেন যা "আদ-দুরারু'ল-মাকনূনাত আন-নাফীসাহ" নামে প্রকাশিত হয়। শায়খ মুহাম্মদ নূরুদ্দীন বেগ আল-উযবেকী'র আরবী পুস্তিকা "আতিয়্যাতু'ল-ওয়াহ্হাব আল-ফাসিলা বায়না'ল-খাতা ওয়া'স-সওয়াব"ও প্রকাশিত হয় এবং মকতূবাত-এর আরব দেশগুলোতে ও তুরস্কে এমনভাবে প্রচারিত হয় যে, যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ঘটে।[১] বিখ্যাত আলিম আল্লামা শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আলূসী বাগদাদী (মৃ. ১২৭০ হি.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "রূহুল-মা'আনী"তে মুজাদ্দিদ সাহেবের নাম খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছেন এবং প্রচুর স্থানে মকতূবাতের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। বর্তমানে আর কোথাও উলামায়ে কিরামের বিরোধিতা ও পথভ্রষ্টতার অভিযোগ ও অভিযানের নাম-গন্ধও নেই।

فاما الزبد فيذهب جفاء - واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض - كذالك يضرب الله الامثال -

আল্লাহ্র হেকমতের এ এক আশ্চর্য শান যে, বিরোধিতা ও পথভ্রষ্টতার অভিযোগের অভিযানের সবচে' বড় অংশ নিয়েছিল হেজাযের সেই সব উলামায়ে কিরাম যারা ছিলেন জাতিগতভাবে কুর্দী। শায়খ ইবরাহীম আল-কূরানী কুর্দী ছিলেন এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ বারযানজীও শাহরে যূর-এ জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সিলসিলা নক্শবান্দিয়া মুজাদ্দিদিয়ার প্রচার-প্রসারের জন্য একজন কুর্দী আলিম মাওলানা খালিদ শাহরে-যূরীকেই নির্বাচিত করেন যাঁর প্রশংসনীয় চেষ্টা-তদবীর ও কুওতে নিসবত দ্বারা এই সিলসিলা ইরাক, শাম, কুর্দিস্তান ও তুরস্কে এভাবে বিস্তার লাভ করে যার নজীর মেলা ভার।[২] "আল্লাহ্র সেনাবাহিনী আসমান যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।"

---

১. যেসব বুযুর্গ তাঁদের পূর্ববর্তী মত থেকে ফিরে এসেছিলেন কিংবা হযরত মুজাদ্দিদ ও তাঁর সিলসিলার অনুকূলে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁদের নাম নুযহাতু'ল-খাওয়াতিরের ৫ম খণ্ডে দেখুন।
২. বিস্তারিত ৮ম অধ্যায়ে দেখুন।

অষ্টম অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দু'জন বড় খলীফা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিতদের মাধ্যমে তাঁর তাজদীদি কর্মের বিস্তৃতি ও পূর্ণতা সাধন

মশহূর খলীফাবৃন্দ

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মহান খলীফাবৃন্দের নাম ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের পরিমাপ করা কেবল কঠিনই নয় বরং তা প্রায় অসম্ভবও বটে। কেননা তাঁদের সংখ্যা কয়েক হাজার বলা হয়ে থাকে এবং তাঁরা সারা দুনিয়ায় বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন এবং তাঁরা খুবই কর্মতৎপর ছিলেন। খলীফাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম যাঁদেরকে তিনি কতকগুলো বাইরের দেশে ইসলাহ তথা চরিত্র সংশোধন ও প্রশিক্ষণমূলক কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন কিংবা ভারতবর্ষের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই খেদমতের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে গুজরে গেছে। এখানে আমরা বর্ণানুক্রমিক হিসাবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিখ্যাত তাঁদের তালিকাই তুলে ধরছি। এরপর দু'জন গুরুত্বপূর্ণ খলীফা (হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম এবং হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী)-র আলোচনা কিছুটা বিস্তারিত পেশ করা হবে। এরপর তাঁদের খলীফাবৃন্দ ও তাঁদের সিলসিলার প্রচার এবং যাঁদের মাধ্যমে সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণমূলক কেন্দ্রের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই যেভাবে উপকৃত হয়েছে তাঁরাও সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনায় আসবেন। এর থেকে পরিমাপ করা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র সিলসিলাকে কিভাবে সাধারণ্যে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করেছেন এবং তাঁর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক চেষ্টা-সাধনাকে কিভাবে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করেছেন। আর এসব আল্লাহ্‌র মর্জি ও অভিপ্রায়, কুদরতের অদৃশ্য সাহায্য-সমর্থন, আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্যতা, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইখলাস এবং সুন্নতে রসূল (সা)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ ব্যতিরেকে হতে পারে না।

این سعادت بازور بازو نیست

تانه بخشد خدائے بخشنده

(১) হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী; (২) মাওলানা আহমদ বারকী; (৩) মাওলানা আহমদ দীবানী; (৪) মাওলানা আমানুল্লাহ লাহোরী; (৫) মাওলানা

বদরুদ্দীন সরহিন্দী; (৬) শায়খ বদীউদ্দীন সাহারন পূরী; (৭) শায়খ হাসান বারকী; (৮) শায়খ হামীদ বাঙ্গালী; (৯) হাজী খিযির খান আফগানী; (১০) মীর সগীর আহমদ রূমী; (১১) শায়খ তাহির বাদাখশী; (১২) শায়খ তাহির লাহোরী; (১৩) খাজা উবায়দুল্লাহ্ ওরফে খাজা কিলাঁ; (১৪) খাজা আবদুল্লাহ্ ওরফে খাজা খোর্দ; (১৫) শায়খ আবদুল হাই হিসারী; (১৬) মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ লাহোরী; (১৭) শায়খ আবদুল হাদী ফারূকী বদাউনী; (১৮) মাওলানা ফররুখ হুসায়ন হারাবী; (১৯) মাওলানা কাসিম আলী; (২০) শায়খ করীমুদ্দীন বাবা হাসান আবদালী; (২১) সাইয়েদ মুহিব্বুল্লাহ্ মানিকপূরী; (২২) শায়খ মুহাম্মদ সাদেক কাবুলী; (২৩) মাওলানা মুহাম্মদ সালেহ্ কূলাবী; (২৪) মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক কাশমী; (২৫) শায়খ মুযযাম্মিল; (২৬) হাফিজ মাহমূদ লাহোরী; (২৭) শায়খ নূর মুহাম্মদ পাটনী; (২৮) মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ জাদীদ বাদাখশী তালেকানী; (২৯) মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ কাদীম; (৩০) শায়খ ইউসুফ বারকী; (৩১) মাওলানা ইউসুফ সামারকান্দী।

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম[১]

শায়খে তরীকত, ইমামে ওয়াক্ত মহান বুযুর্গ হযরত মা'সূম ইবন আহমদ ইবন 'আবদুল আহাদ আল-আদাবী আল-উমারী অর্থাৎ খাজা মুহাম্মদ মা'সূম নকশবান্দী সরহিন্দী স্বীয় পিতার প্রিয় সন্তান। আকারে- প্রকারে, স্বভাবে- প্রকৃতিতে ও অর্থগত তথা পারিভাষিক অর্থে পিতার নিকটতর, আনুগত্যে ও অনুসরণে অগ্রগতি, পিতার ইলমের বিশেষ ধারক, মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-র পুত্রদের মধ্যে সবচে' মশহূর এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক বরকতময় সত্তার অধিকারী।২

হিজরী ১০০৭-৯-এর ১১ই শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কিছু কিছু পাঠ্য পুস্তক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাজা মুহাম্মদ সাদেক থেকে এবং বেশীর ভাগ কিতাব শ্রদ্ধেয় পিতা ও শায়খ মুহাম্মদ তাহির থেকে পাঠ করেন। শ্রদ্ধেয় পিতার খেদমতে থেকে তরীকতের তা'লীম হাসিল করেন এবং মাত্র তিন মাসে কুরআন মজীদ হিফজ করেন। পিতার নিসবত হাসিল করার ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা ছিল শরহে বেকায়া প্রণেতা সদরু'শ-শারী'আর মতই যিনি তাঁর পিতামহের লেখাকে লেখার সাথে সাথেই হিফ্জ করে ফেলতেন। এজন্যই তিনি সেই মর্যাদায় উপনীত হন যা তাঁর

---

১. খাজা মুহাম্মদ মা'সূম সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড থেকে গৃহীত।

২. বর্ণনানুক্রম হিসাবে এই তালিকা মাওলানা সাইয়েদ যেওয়ার হুসায়ন লিখিত "হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী" (করাচীর ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া প্রকাশিত) থেকে গৃহীত। তাঁদের অবস্থা জানতে উল্লিখিত গ্রন্থের ৭২৪-৮০০ পৃ. দ্র. "তাযকিরায়ে ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানী" মাওলানা মনযূর নু'মানীকৃত নিবন্ধ, "তাযকিরায়ে খুলাফায়ে মুজাদ্দিদ আলফে ছানী" মাওলানা নাসীম আহমদ-ফরিদীকৃত, ৩১০-৩৫১ পৃ. দ্র.।

পিতার সাথীদের মধ্যে আর কেউ পারেন নি। অনন্তর তাঁর পিতা তাঁকে "কাইয়ূমিয়াত" -প্রভৃতির মত উঁচু মকামের সুসংবাদ প্রদান করেন। পিতার ইনতিকালের পর তিনিই তাঁর আসনে সমাসীন হন এবং হারামায়ন শারীফায়ন সফর করত হজ্জ ও যিয়ারত দ্বারা ধন্য হন। তিনি একটা উল্লেখযোগ্য সময় মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করে হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাঠদান ও মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে ব্যয় করেন। তফসীরে বায়যাবী, মিশকাত, হেদায়া, আদুদী ও তালবীহ্র মত কিতাবাদি তিনি অধিকাংশ সময় পড়াতেন।

শায়খ মুরাদ ইবন আবদুল্লাহ্ কাযযানী "যায়লু'র-রাশাহাত" নামক গ্রন্থে লিখেন, "তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার মতই আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন ছিলেন। তিনি দুনিয়াকে আলোকিত করেন এবং আপন তাওয়াজ্জুহ ও বুলন্দ হালতের বরকত দ্বারা মূর্খতা ও বিদ'আতের অন্ধকার রাশি দূরীভূত করে দেন। হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা খোদায়ী রহস্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং তাঁর মুবারক সাহচর্য দ্বারা উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে যে, নয় লক্ষ মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত হয়। তন্মধ্যে তাঁর খলীফাবৃন্দের সংখ্যা ছিল সাত হাজার। এই সব খলীফার মধ্যে শায়খ হাবীবুল্লাহ্ বুখারীও ছিলেন যিনি তাঁর যুগে খুরাসান ও মা-ওয়ারাউন-নাহ্র-এর সবচে' বড় বুযুর্গ শায়খ ছিলেন। তাঁর বরকতময় সত্তার বদৌলতে বুখারার পরিবেশ বিদ'আতের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে সুন্নতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর চার হাজার মুরীদকে কামালিয়াতসম্পন্ন বানিয়ে তাদেরকে খিলাফত ও এজাযত দিয়ে ধন্য করেন।"

শায়খ মুহাম্মদ মা'সূম (র) লিখিত "মকতূবাত" (পত্রাবলী) তিন খণ্ডে সংকলিত এবং শ্রদ্ধেয় পিতা (হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী র)-র মকতূবাতের মতই শরীয়ত ও মা'রিফতের গূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি ও ইশারা-ইঙ্গিত সম্বলিত এবং অধিকাংশই মুজাদ্দিদ সাহেবের সূক্ষ্ম 'ইল্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মর্যাদা রাখে।

১০৭৯ হিজরীর ৯ই রবিউল আওয়াল সরহিন্দ শহরেই ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। কবর মুবারক বিখ্যাত এবং সকলের যিয়ারত-গাহ্ হিসাবে মশহূর।

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নূরী[১]

শায়খে আরিফ ও ওয়ালী-এ কবীর হযরত আদম ইবন ইসমাঈল ইবন বাহওয়াহ ইবন ইউসুফ ইবন ইয়া'কূব ইবন হুসায়ন হুসায়নী কাসেমী বান্নূরী, নক্শবান্দিয়া সিলসিলার বিখ্যাত বুযুর্গ। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা স্বপ্নে তাঁর জন্মের

১. হযরত শায়খ আদম বান্নূরীর আলোচনা নুযহাতুল খাওয়াতির-এর ৫ম খণ্ড থেকে গৃহীত যা এখানে অল্পই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

সুসংবাদ স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের যবান মুবারক থেকে পেয়েছিলেন। সরহিন্দের একটি গ্রাম বান্নুর-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন।

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের একজন মুরীদ হাজী খিযির রূগানী থেকে মূলতানে আধ্যাত্মিকতার সবক হাসিল করেন এবং দু'মাস তাঁর খেদমতে থেকে শায়খ-এর হুকুমে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব (র)-এর খেদমতে হাজির হন এবং সেখানে দীর্ঘকাল তাঁর খেদমতে অবস্থান পূর্বক তরীকতের ইল্‌ম হাসিল করেন। 'খুলাসাতুল মা'আরিফ' নামক গ্রন্থে আছে, শায়খ মুহাম্মদ তাহির লাহোরীর খেদমতে তিনি রব্বানী আকর্ষণ লাভ করেন যা তিনি তাঁর শায়খ ইস্কান্দার থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা শায়খ কামালুদ্দীন ক্যাথলী থেকে হাসিল করে ছিলেন। মোটের ওপর তিনি মর্যাদার সেই আসনে উপনীত হয়ে ছিলেন যা তাঁর সমকালে অনেক বুযুর্গই পৌঁছুতে পারেন নি। তাঁর তরীকা ছিল শরীয়তে মুহাম্মাদিয়্যা ও সুন্নতে নাবাবিয়্যার আনুগত্য ও অনুসরণ যা থেকে তিনি কথায় ও কাজে এক চুল এদিক ওদিক করতেন না।

তাঁর থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়। কথিত আছে যে, চার লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে বায়'আত হয় এবং তাঁদের মধ্য থেকে এক হাজার জন প্রচুর ইল্‌ম ও মা'রিফাত হাসিল করেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁর খানকাহয় কোন দিন কখনো এক হাজারের কম লোক থাকত না। সকলেই তাঁর মেহমান হত এবং তাঁর সান্নিধ্য থেকে আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করত। "তাযকিরায়ে আদমিয়া" নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী যখন হিজরী ১০৫২ সালে লাহোর গিয়েছিলেন তখন তাঁর সাথে দশ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি, উলামা, মাশায়েখ সহ সকল শ্রেণীর লোক ছিল। সম্রাট শাহজাহান সে সময় লাহোরেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তায় সম্রাট দুশ্চিন্তায় পড়েন। তিনি তাঁর উযীর সা'দুল্লাহ খানকে শায়খ-এর খেদমতে পাঠান। কিন্তু আলাপ সুখকর না হওয়ায় উযীর শায়খ-এর বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে অভিযোগ করেন। ফলে সম্রাট তাঁকে হারামায়ন শারীফায়ন সফরের নির্দেশ প্রদান করেন। অনন্তর তিনি আপন সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-স্বজনসহ হেজাযের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান এবং হজ্জ সমাপন শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান গ্রহণ করেন ও সেখানেই ইনতিকাল করেন।

ইল্‌মে হাকীকত ও ইলমে মা'রিফত বিষয়ে তাঁর কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে যার ভেতর ফারসীতে লেখা দু'খণ্ডে সমাপ্ত "খুলাসাতু'ল-মা'আরিফ" নামক একটি কিতাবও রয়েছে যা এভাবে শুরু করা হয়েছে ঃ

الحمد لله رب العلمين حمدا كثيرا بقدر كمالات اسمائه والائه الخ -[১]

তাঁর পুস্তকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি স্থান পেয়েছে।

শায়খ আদম বান্নুরী (র) নিরক্ষর ছিলেন। তিনি কারুর থেকে ইল্‌ম হাসিল করেন নি। হিজরী ১০৫৩ সালের ২৩শে শাওয়াল তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতিকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকী'র সায়্যিদুনা হযরত উছমান (রা)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুজাদ্দিদিয়া মা'সূমিয়্যা সিলসিলা এবং এর মহান বুযুর্গবৃন্দ

আমরা প্রথমে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (র)-এর সিলসিলার মহান বুযুর্গবৃন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি যদ্দারা তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁর প্রতি ধাবমান জনস্রোত, তাঁর থেকে উপকার লাভের বৃত্তের বিস্তৃতি, মানুষ কি বিপুল সংখ্যায় তাঁর দিকে ঝুঁকেছিল এবং কিভাবে পতঙ্গের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়েছিল, তাঁর সান্নিধ্যে বিপুল জনসমাগমের উপস্থিতি এবং সে সময়কার মুসলিম সমাজ ও মুসলমানদের জীবন-যিন্দেগীর ওপর তাঁর বিশাল ও গভীর-প্রভাবের কিছুটা পরিমাপ করা যাবে। তাঁদের বিস্তারিত হালত ও জীবন-চরিত সম্পর্কে জানতে হলে সে সমস্ত বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা আবশ্যক যা তাঁদের সম্পর্কে পৃথকভাবে লেখা হয়েছে কিংবা সে সব গ্রন্থ ও সংকলনের দ্বারস্থ হতে হবে যেখানে তাঁদের মোটামুটি আলোচনা এসেছে। ভারতবর্ষের বুযুর্গদের সম্পর্কে জানতে হলে মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ "নুযহাতু'ল-খাওয়াতির"-এর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডের অধ্যয়ন যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

হযরত খাওয়াজা সায়ফুদ্দীন সরহিন্দী

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (র)-এর তরীকার প্রচার-প্রসার এবং এ সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-র উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের পূর্ণতা সাধন (যার ভেতর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কে নবায়ন, সুন্নাহ অনুসরণের রেওয়াজ এবং গর্হিত বিষয়াদি ও বিদআতের উৎখাত বিশেষ গুরুত্ববহ) হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর উপযুক্ত সন্তান ও খলীফা হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন সরহিন্দী (হি. ১০৪৯-১০৯৬)-র মাধ্যমে হয় যিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নির্দেশে রাজধানী দিল্লীতে অবস্থান গ্রহণ করেন।

তাঁর হাতে সেই খানকাহ্‌র ভিত্তি স্থাপিত হয় যা পরবর্তী কালে হযরত মির্যা মাজহার জানে-জানাঁ ও হযরত শাহ গুলাম আলী দেহলভী আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের

১. এটি গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত পাঠাগারে বিদ্যমান।

বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রে পরিণত করেন যার আলোয় একদিকে আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তান, অপর দিকে ইরাক, শাম ও তুরস্ক আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং কবির এ কথা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়,

چراغ ہفت کشور خواجہ معصوم

منور از فروغش ہند تا روم

সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গযেব (যেমনটি ওপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর হাতে বায়'আত হয়েছিলেন) হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন (র) থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। হযরত খাজার শাহী মহলে গমন ও দেওয়ালে আঁকা ছবির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন এবং সম্রাট কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করার নির্দেশ দানের কথা ইতিহাসে এসেছে। খাজা সায়ফুদ্দীন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (সম্রাটকে লিখিত একপত্রে) এতে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি লিখছেন ঃ

"এ কেমনতরো বড় নি'মত যে, শাহী শান-শওকত ও বাদশাহী দবদবা ও আড়ম্বর সত্ত্বেও কলেমায়ে হক কবুল করা এবং একজন নাচিজের কথার প্রভাব মেনে নেয়া!"

খাজা সায়ফুদ্দীন সম্রাটের মধ্যে যিকরের আছর জাহির হওয়া এবং সম্রাটের সুলূকের কতকগুলো মনযিল অতিক্রম করা সম্পর্কেও পিতাকে অবহিত করেন এবং খাজা মুহাম্মদ মা'সূম এতেও তাঁর আনন্দ ও তৃপ্তির কথা প্রকাশ করেন। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"বাদশাহ দীনে পানাহর যেই হালতের কথা তুমি উল্লেখ করেছ, যেমন লতীফাগুলোর মধ্যে যিক্র প্রবাহিত হওয়া, সুলতানু'য-যিক্র ও রাবিতা হাসিল হওয়া, বিপদের কমতি, কলেমায়ে হক কবুল করা, কোন কোন গর্হিত কাজ-এর উৎসাদন ও আবশ্যকীয় বিষয়াদির চাহিদা মিটে যাওয়া সবই বিস্তৃত ভাবে জানতে পারলাম। আল্লাহ তা'আলার শোকর জ্ঞাপন করা দরকার। বাদশাহদের কাতারে এমনটি দুর্লভই বলতে হবে।"[১]

সম্রাট তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। "মা'আছিরে আলমগীরি'র লেখক মুহাম্মদ সাকী মুস্তাঈদ খান হি. ১০৮০ সালের (১৩ই মুহার্রাম) ঘটনাবলী লিখতে গিয়ে সম্রাটের রাতের প্রথম প্রহরের পর হায়াত বখ্শ বাগান থেকে হযরত খাজার আবাসগৃহে গমন, সেখানে এক প্রহর বসে তাঁর বরকতময়

১. মকতূব হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম, ৩য় খণ্ড, পত্র নং ২২০;

সাহচর্যে অবস্থানপূর্বক হযরত খাজার পবিত্র বাণী থেকে উপকৃত হওয়া, অতঃপর তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর শাহী প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

হযরত খাজার বিশেষ আকর্ষণ ও রুচি ছিল আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ-এর প্রতি। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিলেন। "যায়লু'র-রাশাহাত"-এর গ্রন্থকার শায়খ মুরাদ ইবন আবদুল্লাহ্ আল-কাযযানীর বর্ণনা মুতাবিক তাঁর এই প্রচেষ্টার ফল হয়েছিল এই যে, মনে হচ্ছিল ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিদ'আত উৎখাত হয়ে যাবে। এরই ওপর ভিত্তি করে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁকে "মুহতাসিবু'ল-উম্মাহ" (উম্মাহর তত্ত্বাবধায়ক, ন্যায়পাল)-উপাধি দিয়েছিলেন। খুবই শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টিকারী আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। মানুষ তাঁর খানকাহ্য় পাগলের ন্যায় উন্মত্ত প্রায় অবস্থায় পড়ে থাকত। এরই সাথে তিনি বড় আড়ম্বর ও জাঁকজমকের অধিকারী শায়খ ছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের সুলতান ও আমীর-উমারা তাঁর মজলিসে আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকত। তাঁর সামনে তাঁদের বসার সাহস হত না। তাঁর দিকে জনস্রোতের অবস্থা ছিল এই যে, দৈনিক চৌদ্দ'শ মানুষ দু'বেলা পেট পুরে আপন ইচ্ছা ও অভিপ্রায় মুতাবিক তাঁর খানকাহ্ থেকে খাবার পেত।[২]

খাজা সায়ফুদ্দীনের পর তাঁর খলীফা সাইয়েদ নূর মুহাম্মদ বদায়ূনী (মৃ. ১১৩৫ হি.) তদস্থলে সমাসীন হন এবং তাঁর খানকাহ মুহাম্মদী আলোয় আলোকিত রাখেন। তারপর হযরত মির্যা মাজহার জানে-জানাঁ তাঁর আসনে সমাসীন হন। তাঁর আলোচনা একটু পরেই আসবে।[৩]

হযরত খাজা মুহাম্মদ যুবায়র থেকে
মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী পর্যন্ত

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন হযরত খাজা মুহাম্মদ নক্শবন্দ (১০৩৪-১১১৪ হি.)। তিনি হুজ্জাতুল্লাহ্ নক্শবন্দ নামে মশহুর। হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা বানিয়েছিলেন। পিতার ইনতিকালের পর তিনি সার্বক্ষণিকভাবে জনগণের হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা দানের কাজে মগ্ন হয়ে পড়েন।

---

১. মাআছিরে আলমগীরি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭১, পৃ. ৮৪।
২. যায়লুর রাশাহাত, পৃ. ৪৮-৪৯।
৩. চিতলী কবরের বর্তমান খানকাহ মূলত হযরত শাহ গুলাম আলীর যুগে প্রতিষ্ঠিত হয় যিনি এই গৃহকে যেখানে হযরত মির্যা সাহেবকে দাফন করা হয়েছিল খরিদ করে মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর খলীফাদের মধ্যে ছিলেন খাজা মুহাম্মদ যুবায়র (ইবন আবি'ল-'আলা ইবন খাজা মুহাম্মদ মা'সূম, মৃ. ১১৫১ হি.)। তাঁর দিকে সত্য পথের পথিকরা এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যা সেই যুগে অপর কারুর প্রতি তেমনটি দেখা যায় নি। যখন তিনি ঘর থেকে মসজিদে তশরীফ নিতেন অমনি আমীর-উমারা তাদের দোশালা ও পাগড়ী ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত তাঁর গমন পথের ওপর বিছিয়ে দিতেন যাতে তাঁর পা মাটিতে না পড়ে। যদি কোন সময় কোন রোগী দেখতে যেতেন কিংবা কারুর দাওয়াতে গমন করতেন তখন তাঁর সঙ্গে এত পরিমাণ লোক সওয়ার হয়ে যেত যেমনটি সাধারণত রাজা-বাদশাহদের বেলায় দেখা যায়।

হযরত খাজা মুহাম্মদ যুবায়র অনেক বড় বড় খলীফা রেখে যান যাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন খুবই বিখ্যাত। একজন ছিলেন হযরত শাহ যিয়াউল্লাহ যাঁর খলীফাদের মধ্যে হযরত শাহ মুহাম্মদ আফাক অন্যতম। দ্বিতীয়জন হযরত খাজা মুহাম্মদ নাসির আনদালীব যাঁর পুত্র ও খলীফা হলেন খাজা মীর দর্দ দেহলভী। তৃতীয় জন হলেন হযরত খাজা আবদুল আদল যাঁর খলীফা হলেন হযরত শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভীর পুত্র কুরআনুল করীমের অনুবাদক হযরত শাহ্ আবদুল কাদির দেহলভী (র)।

হযরত খাজা যিয়াউল্লাহ্ একজন বড় দরের শায়খে তরীকত ও ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ ছিলেন। হযরত শাহ গুলাম আলী বলতেন, যিনি অবয়বধারী নিসবতে মুজাদ্দিদী দেখেন নি তিনি হযরত খাজা যিয়াউল্লাহকে যেন দেখে নেন।২

তাঁর খলীফা হযরত শাহ্ মুহাম্মদ আফাক (হিজরী ১১৬০-১২৫১) কে আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন এবং খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত করে ছিলেন। দিল্লী থেকে কাবুল পর্যন্ত মানুষ তাঁর থেকে ফয়েয হাসিল করে। কাবুল গেলে আফগান বাদশাহ যমান শাহ্ তাঁর হাতে বায়'আত হন।

হযরত শাহ্ মুহাম্মদ আফাক-এর খলীফা ছিলেন সে যুগের উওয়ায়স হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র) (১২০৮-১৩১৩ হি.) যাঁর শক্তিশালী আকর্ষণ ক্ষমতা, গরম নফস, যুহদ ও তাজরীদ, শরীয়তের অনুসরণ, সুন্নাহ ও হাদীছের ইলম তথা জ্ঞান, ইশ্‌কে ইলাহী ও নবী করীম (সা)-এর প্রতি ভালবাসা অর্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল ভারতবর্ষের (বিশেষ করে উত্তর ভারতের) গোটা পরিবেশকে উত্তপ্ত ও আলোকিত রেখেছিল এবং স্বয়ং তাঁর ভাষায় ঃ ইশকের দোকানের বাজার উত্তপ্ত থাকে।৩

---

১. প্রাগুক্ত, ১৬ পৃ.।

২. দুরুল মা'আরিফ, মলফুযাতে হযরত শাহ্ গুলাম আলী।

৩. দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা ও নাযেম হযরত মাওলানার মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। যেমন মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী, নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম নাযেম,

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্র.)

ভারতবর্ষের দূরদর্শী ও সতর্ক ঐতিহাসিক এবং খ্যাতনামা জীবন-চরিতকার মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই (নুযহাতু'ল খাওয়াতির-এর লেখক)-এর ভাষায় ঃ

"ভক্ত ও অনুরক্তেরা পতঙ্গের ন্যায় তাঁর চারপাশে ভীড় জমায় এবং হাদিয়া তোহফার বৃষ্টি বর্ষিত হয়। বড় বড় আমীর-উমারা ও রঈস দূরদরাজ ও দূরতিক্রম্য এলাকা থেকে ভক্তের ন্যায় এসে হাজির হয় এবং তাঁকে কেন্দ্র করে জনস্রোত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা এতই বৃদ্ধি পায় যা সে যুগে আর কোন শায়খে তরীকতের ছিল না।

"কাশ্‌ফ ও কারামতের ঘটনা তাঁর থেকে এত প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে যা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এ ব্যাপারে প্রথম যুগের আওলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল কাদির জিলানী ব্যতিরেকে এর আর কোন নযীর মেলে না।"[১]

তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে বর্তমান লেখকের " তাযকিরায়ে হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদবাদী" নামক পুস্তক দেখুন।

মির্যা মাজহার জানে জানাঁ এবং হযরত শাহ গুলাম আলী

হযরত সাইয়েদ নূর মুহাম্মদ বদাউনীর খলীফা হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁ শহীদ[২] (হি.১১১১৩) / ১১৯৫ হি) যিনি পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁর পবিত্র সত্তা দ্বারা মানুষের অন্তর রাজ্যকে উষ্ণ ও উত্তপ্ত রাখেন, রাখেন আলোকিত এবং রাজধানী দিল্লীতে প্রেমের বাজারকে উচ্চতার শীর্ষে নিয়ে পৌছান। হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর মত দূরদর্শী সমকালীন বুযুর্গ তাঁর সম্পর্কে নিম্নরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ

"ভারতবর্ষের লোকদের অবস্থা আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন নয়। কেননা আমাদের জন্ম এখানেই এবং এখানেই আমরা জীবন কাটিয়েছি। আরব দেশ আমি নিজে

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

মাওলানা মসীহুযযামান খান শাহজাহানপুরী (হায়দারবাদের নিজাম হযরত মাহবুব আলী খানের উস্তাদে আ'লা), মাওলানা সাইয়েদ জহূরুল ইসলাম ফতেহপুরী, মাওলানা সাইয়েদ তাজাম্মুল হুসায়ন বিহারী, মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই, নাযেম, নদওয়াতুল উলামা, নওয়াব সদর ইয়ার জঙ্গ, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী (সদরুস সুদূর, ধর্মীয় বিষয়াদি, হায়দরাবাদ), হুসসামুল মুল্‌ক সাফিয়্যুদ্দৌলা নওয়াব সাইয়েদ আলী হাসান খান, নদওয়ার নাজেম। মাওলানার সিলসিলার ব্যাপক প্রচার-প্রসার প্রথমোক্ত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরীর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সাধিত হয়।

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৮ম খণ্ড;

২. আসল নাম শামসুদ্দীন হাবীবুল্লাহ, মাজহার তাখাল্লুস, পিতার নাম মির্যা জান। সেই সূত্রে আলমগীর মরহুম জানে জানাঁ নাম রাখেন। কেননা সন্তান পিতার জান তুল্য হয়ে থাকে। ফলে সকলের মুখে মুখে এই নামই প্রচারিত হয়ে যায়।

দেখেছি এবং ব্যাপকভাবে সফরও করেছি। আফগানিস্তান ও ইরানের লোকদের অবস্থা সেখানকার বিশ্বস্ত লোকদের মুখে শুনেছি। এসব কিছুর পর এই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছি যে, এমন কোন বুযুর্গ যিনি শরীয়ত ও তরীকতের সংকীর্ণ রাস্তা এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে তাঁর মত সোজা সরল ও দৃঢ়পদ এবং ছাত্রদের নেতৃত্ব দান ও দিক-নির্দেশনা দানে তাঁর অবস্থানগত মর্যাদা এত সমুন্নত ও তাঁর তাওয়াজ্জুহ এত শক্তিশালী যে, আমাদের কালে এসব দেশের মধ্যে কোন দেশে ওপরে যার আমরা আলোচনা করেছি, পাওয়া যায় না। অতীত যুগে এবং প্রাচীন বুযুর্গদের মধ্যে অবশ্য হতে পারে। কিন্তু সত্য বলতে গেলে প্রত্যেক যুগে এমন সব বুযুর্গ অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় না, সেখানে এমন যুগে যেখানে ফেৎনা-ফাসাদ পরিপূর্ণ তেমনটি পাওয়া তো আরও অসম্ভব।"[১]

হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁর খলীফাদের মধ্যে মা'মূলাতে মাজহারিয়ার লেখক হযরত মাওলানা নঈমুল্লাহ বাহরাইচী (মৃ. ১১৫৩-১২১৮ হি.), এবং সে যুগের ইমামে বায়হাকী "মালা'বুদ-দামিনহু" ও তফসীরে মাজহারীর লেখক হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানীপথী (মৃ. ১২২৫ হি.) এবং মাওলানা গুলাম ইয়াহইয়া বিহারী (মৃ. ১১৮০ হি.)-র মত খ্যাতনামা উলামা ও মাশায়েখ ছিলেন।[২] কিন্তু মির্যা সাহেবের সিলসিলা বরং মুজাদ্দিদিয়া তরীকার বিশ্বব্যাপী প্রচার তাঁরই উপযুক্ত খলীফা হযরত শাহ গুলাম আলী বাটালভী[৩] (১১৫৬-১২৪০ হি.)-র ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল। তাঁকে মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলার মুজাদ্দিদ বরং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুলূক ইলাল্লাহ, তাযকিয়া ও ইহসান তথা আত্মশুদ্ধি (যার পরিচিত নাম তাসাওউফ)-র মুজাদ্দিদ বলা যথার্থ হবে যার ওপর আরব-অনারব সকল পিপাসার্ত মানুষ আত্মিক পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে ঝাপিয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তাঁর কোন খলীফা ছিলেন না। কেবল এক আম্বালা শহরেই তাঁর পঞ্চাশজন খলীফা ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান তদীয় "আছারু'স-সানাদীদ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আমি হযরতের খানকায় নিজের চোখে রোম, শাম, বাগদাদ, মিসর, চীন ও ইথিওপিয়ার লোকদের দেখেছি যে, তারা উপস্থিত হয়ে বায়'আত করছে এবং খানকাহ্র খেদমত করাকে চিরন্তন সৌভাগ্য ভাবছে এবং কাছাকাছি শহরগুলোর লোকেরা যেমন হিন্দুস্তান, পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের কথা না বলাই ভাল, টিড্ডির

১. কলেমাতে তায়্যিবাত, পৃ. ১৬৪-৬৫;

২. খলীফা ও বড় বড় মুরীদদের তালিকা চাইলে দ্র. মাকামাতে মাজহারী-এর ৬৪ পৃষ্ঠায় যেসব খলীফার নাম দেওয়া হয়েছে তাঁদের সংখ্যা ৪৩ জন।

৩. তাঁর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ; শাহ গুলাম আলী নামেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

ঝাকের মত লাফিয়ে পড়ছে। হযরতের খানকাহতে পাঁচশ'র কম নয়—ফকীর মিসকীন অবস্থান করত এবং সবার রুটি-কাঁপড় তাঁর যিম্মায় ছিল।"[১]

শাহ্ রউফ আহমদ মুজাদ্দিদী "দুররু'ল-মা'আরিফ" নামক গ্রন্থে কেবল একদিনের শিক্ষার্থীদের জন্মভূমির তালিকা সূচী লিখেছেন যারা ২৮শে জুমাদাল ঊলা, ১২৩১ হি. দিল্লীর সেই খানকাহ্য় তাঁর থেকে উপকার লাভের মানসে হাজির ছিল।

"সমরকন্দ, বুখারা, গযনী, তাশকন্দ, হিসার, কান্দাহার, কাবুল, পেশাওয়ার, কাশ্মীর, মুলতান, লাহোর, সরহিন্দ, আমরোহা, সম্ভল, রামপুর, বারেলী, লাখনৌ, জায়েস, বাহরাইচ, গোরখপুর, আজীমাবাদ, ঢাকা, হায়দরাবাদ, পূনা প্রভৃতি।"[২]

তাঁর এই ব্যাপক ফয়েয দৃষ্টে তাঁর উপযুক্ত শাগরিদ মাওলানা খালিদ রূমী (কুর্দী)-র ফারসী এই কবিতা ঘটনার সঠিক ও হুবহু চিত্র মনে হয়।

خبراز من دہید آں شاہ خوباں را بہ پنہانی [৩]

کہ عالم زندہ شد بار دگراز ابر نیسانی

হযরত শাহ্ গুলাম আলীর বড় বড় জলীলু'ল কদর খলীফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত শাহ্ সা'দুল্লাহ্, তাঁর খলীফা শাহ্ মুহাম্মদ নঈম (মিসকীন শাহ্ নামে খ্যাত) (মৃ ১২৬৪ হি.) ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হায়দরাবাদে আগমন করেন এবং লম্বা সময় সেখানে অবস্থান করেন। আসিফ জাহ্ ৬ষ্ঠ আ'লা হযরত মীর মাহবূব আলী খান তাঁর মুরীদ ছিলেন।[৪] শাহ্ সা'দুল্লাহর দ্বিতীয় খলীফা সাইয়েদ মুহাম্মদ পাদশাহ্ বুখারী (মৃ. ১৩২৮ হি.)।[৫] হযরত শাহ্ গুলাম আলীর একজন খলীফা হযরত শাহ্ রউফ আহমদ ছাহেব মুজাদ্দিদী (১২০১-১২৬৬ হি.) ভূপালে মুজাদ্দিদিয়া খানকাহ্র ভিত্তি স্থাপন করেন।[৬] বাহরাইচে মাওলানা শাহ্ বাশারত উল্লাহ্ বাহরাইচী (মৃ. ১২৫৪ হি.) মুজাদ্দিদিয়া নক্শবান্দিয়া সিলসিলার প্রচার করেন। বুখারায় শায়খ গুল মুহাম্মদ সর্বস্তরের মানুষের শায়খ হিসাবে সকলের মধ্যমণি হন এবং তিনি সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদিয়ার ফয়েয সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন।[৭] শায়খ আহমদ বাগদাদী কাদিরী বাগদাদ থেকে এসে বায়'আত ও এজাযত হাসিল করেন।[৮]

---

১. আছারু'স-সানাদীদ, ৪র্থ অধ্যায়। ২. দুররু'ল-মা'আরিফ, পৃ. ১০৬।
৩. ৫৯ পংক্তির কবিতা যা শাহ্ আবদুল গনী মুহাদ্দিছ দেহলভী গোটাটাই উদ্ধৃত করেছেন।
৪. মাখবার-এ দাকান, মাদ্রাজ; ২রা জানুয়ারী, ১৮৯৬ খ্রি.।
৫. যাঁর খলীফা সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (মৃ. ১৩৮৪ হি.) যুজাযাতু'ল-মাসাবীহ্র লেখক, দীর্ঘকাল ধরে হায়দারাবাদে আপন মিশনে কর্মতৎপর থাকেন।
৬. যা পীর আবু আহমদ সাহেব এবং তাঁর ভাগ্যবান পুত্র মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব স্ব-স্ব যুগে আবাদ করেছেন।
৭. দুররু'ল-মা'আরিফ, ১২৫ পৃ.।
৮. প্রাগুক্ত, ১৪৪ পৃ.।

মাওলানা খালিদ রূমী (কুর্দী)

ইরাক, শাম ও তুরস্কে হযরত শাহ্ গুলাম আলী সাহেবের সিলসিলার প্রচার-প্রসারের কাজ আল্লাহ্ তা'আলা একজন কুর্দী মনীষী বুযুর্গ দ্বারা নেন যার নাম মাওলানা খালেদ রূমী যিনি তাঁর দেশে হযরতের ফয়েয ও ইরশাদের আওয়াজ শুনে সার্বক্ষণিক উৎসাহ, আগ্রহ ও অস্থিরতা নিয়ে মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে এক বছরে দিল্লীতে এসে উপনীত হন এবং আস্তানায় এসে এমন ভাবে হুমড়ী খেয়ে পড়েন যে, সুলূকের পূর্ণ মনযিলগুলো অতিক্রম করে এজাযত ও খেলাফত লাভে ধন্য হন। এ সময় তাঁর ধ্যানমগ্নতা ও একাগ্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, দিল্লীর উলামা ও মাশায়েখ যাঁরা তাঁর ফযীলতপূর্ণ মর্যাদা ও কামালিয়াতের খ্যাতির কথা বছর খানেক ধরে শুনে আসছিলেন, সাক্ষাতের জন্য এলে তিনি বলে দিতেন, ফকীর যেই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তা অর্জন করা ব্যতিরেকে কোন দিকে মনোনিবেশ করতে পারে না। সে যুগের সমাসীন বিখ্যাত বুযুর্গ সিরাজু'ল হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (মুহাদ্দিছ দেহলভী) এসেছেন। শাহ্ আবু সাঈদ ছাহেব ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র। তিনি গিয়ে আরয নিবেদন করেন যে, উস্তাযু'ল হিন্দ আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য এসেছেন। তিনি তখন বলেন, "তাঁকে আমার সালাম বল গিয়ে এবং এও বল যে, উদ্দেশ্য হাসিলের পর আমি নিজেই গিয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হব।"

দেশে ফিরতেই আল্লাহ্প্রার্থীরা পতঙ্গের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ল এবং মানুষ এমনভাবে তাঁর দিকে ঝুকল যে, মাওলানা শাহ্ রউফ আহমদ সাহেব মুজাদ্দিদী তদীয় "দুররু'ল-মা'আরিফ" নামক গ্রন্থে ১২৩১ হিজরীর ২৪ শে রজব জুমুআর দিনের রোয়েদাদ লিখতে গিয়ে বলেন, "পশ্চিম আফ্রিকার একজন বুযুর্গ তাঁর মুবারক নাম শুনে মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে বাগদাদে মাওলানা খালিদ রূমীর সঙ্গে মিলিত হতে হাজির হন। তিনি মাওলানার জনপ্রিয়তা এবং কিভাবে মানুষ তাঁর দিকে ধাবিত হচ্ছে সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রায় এক লক্ষ মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত হয়েছে এবং তাঁর মুরীদভুক্ত হয়েছে। এক হাজার গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন আলিম তাঁর তরীকায় দাখিল হয়ে মাওলানার সামনে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে।"[১]

স্বয়ং মাওলানা খালিদ হযরত শাহ্ আবু সাঈদের নামে যেই পত্র লিখেছেন তাতে নি'মতের শুকরিয়া হিসাবে লিখেছেন ঃ

"সমগ্র রোম (তুরস্ক), আরব, হেজায, ইরাক ও কোন কোন অনারব দেশ এবং গোটা কুর্দিস্তান তরীকায়ে আলিয়া নক্শবান্দিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও জযবা দ্বারা

১. দুররু'ল মা'আরিফ, ১৭০ পৃ.।

মাতাল বিহ্বল এবং রাত-দিন সমগ্র মাহফিল ও মজলিস, মসজিদ ও মাদরাসায় হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ ও মুনাওয়ার আলফেছানীর সৌন্দর্য ও প্রশংসাগীত ছোট-বড় সকলের মুখে এভাবে লেগে রয়েছে যে, কল্পনাও করা যায় না কখনো কোন দেশ ও কোন সময় যুগের কান এমন সঙ্গীতের সুর লহরী শুনতে পেয়েছে অথবা আসমান তার চোখ দিয়ে এমন আবেগ-ঘন দৃশ্য ও এমন সমাবেশ দেখেছে। ... যদিও এ ধরনের বিষয় আলোচনা এক ধরনের ধৃষ্টতা ও আত্ম-প্রশংসার শামিল, এই অধম ফকীর এজন্য লজ্জিতও বটে, তবুও কেবল বন্ধুদের হককে অগ্রগণ্য জেনে সে এই বেয়াদবী করতে সাহসী হয়েছে।"[১]

আল্লামা ইবনে আবেদীন, আল্লামা শামী নামে মশহূর, দুর্রুল মুখতার -এর শরাহ রদ্দুল মুহতার-এর প্রণেতা, মাওলানা খালিদ রূমীর প্রশংসায় "সাল্লু'ল-হিসাম আল-হিন্দী লে-নুসরাতি মাওলানা খালিদ আন-নাকশবান্দী" নামে একটি গ্রন্থই লিখে ফেলেন।[২] আসলে এ বইটি আরেকটি বইকে রদ করতে গিয়ে লেখা হয়েছিল যেটি মাওলানা খালিদ রূমীর বিরোধিতা করতে গিয়ে এবং তাঁকে পথভ্রষ্ট প্রমাণ করতে গিয়ে কতকগুলো ঈর্ষাকাতর ও হিংসুটে স্বভাবের লোক লিখেছিল।

গ্রন্থের শেষে সংক্ষিপ্ত জীবনীও লেখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মাওলানা খালিদ রূমী সুলায়মানিয়ার নিকটবর্তী কুরাহদাগ নামক কসবা (পল্লী)-য় জন্মগ্রহণ করেন হিজরী ১১৯০ সনে। সে যুগের বিখ্যাত উস্তাদদের কাছে লেখা-পড়া করেন এবং প্রচলিত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তালিম হাসিল করেন। যুক্তি বিদ্যা, দর্শন গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি শাখায়ও পূর্ণতা লাভ করেন। এরপর সুলায়মানিয়াতে ফিরে এসে হেকমত, ইলমে কালাম ও বালাগাত শাস্ত্রের উচ্চ মাপের কিতাবাদি পড়াতে থাকেন। ১২২০ হিজরীতে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ ও যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন। মক্কা মুআজ্জমায় থাকতেই তিনি দিল্লী যাবার গায়বী ইশারা প্রাপ্ত হন। প্রথমে সিরিয়ায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে জনৈক ভারতীয়ের কাছে হযরত শাহ গুলাম আলীর কথা শুনতে পান। তার ওপর ভিত্তি করে তিনি ১২২৪ হিজরীতে ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে এবং সর্বত্র তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি আদায় করে লাহোরের পথে পুরো এক বছরে দিল্লীতে এসে উপনীত হন। দিল্লী পৌঁছে তিনি কাসীদায়ে শাওকিয়া লিখেন যার পংক্তিমালা ছিল নিম্নরূপ ঃ

كملت مسافة كعبة الامال

حمدالمن قد من بالاكمال

---

১. মাওলানা আবদুস শাকুর লিখিত مشموله تذكره امام ربانى مجدد الف ثانى নামক নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

২. মাজমূ'আ রাসাইল ইবনে আবিদীন, নতুন সংস্করণ, সোহেল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান।

এক বছরও পুরো হয় নি, তিনি পাঁচ তরীকায় এজাযত ও খেলাফত লাভে ধন্য হন। এরপর স্বীয় পীর ও মুরশিদের হুকুমে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাগদাদ পৌঁছে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও জনগণের পথ প্রদর্শনের কাজ ধারাবাহিকভাবে শুরু করেন। পাঁচ মাস সেখানে অবস্থান করে দেশে ফিরে আসেন। ১২২৮ হিজরীতে তিনি পুনরায় বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তাঁর অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা ও তাঁর প্রতি মানুষের প্রচণ্ড স্রোত লক্ষ করে একদল লোক হিংসাকাতর হয়ে পড়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে এক ফেতনা খাড়া করা হয়। বাগদাদের শাসনকর্তা সাঈদ পাশার ইঙ্গিতে কতক উলামায়ে কিরাম তা রদ করার উদ্দেশ্যে মোহরাংকিত অভিমত প্রদানপূর্বক তাঁকে এ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন এবং তাঁর উচ্চ মরতবার অনুকূলে ফতওয়া প্রদান করেন। কুর্দিস্তান ও কিরকূকের লোকেরা, ইরবিল, মাওসিল, ইমাদিয়া, গায়তার, হলব (আলেপো), শাম, মদীনা মুনাওয়ারা, মক্কা মুআজ্জমা ও বাগদাদের হাজার হাজার লোক তাঁর থেকে উপকৃত হয়।

লেখক এরপর তাঁর মহান চরিত্র আলোচনা করেছেন এবং তৎ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের তালিকা পেশ করেছেন। তিনি তাঁর যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি শায়খ উছমান সনদেরও একটি লেখার কথা উল্লেখ করেছেন যা মাওলানা খালিদ-এর জীবনী বিষয়ে লেখা হয়েছে। লেখাটির নাম اصفى الموارد فى ترجمة سيدنا خالد শেষে তিনি সিরিয়াকেই স্থায়ী আবাস হিসাবে গ্রহণ করেন। ১২৩৮ হিজরীতে তিনি আপন খলীফা ও মুরীদদের বিরাট একটি দল নিয়ে সিরিয়া সফর করেন।

অতঃপর গোটা সিরিয়া যেন তাঁর ওপর ভেঙে পড়ে। জনগণের হেদায়েত ও আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশনার সাথে সাথে তিনি ইলমে শরী'আতের প্রচার-প্রসার এবং মসজিদগুলোর পুনরায় আবাদ করার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। অবশেষে ১২৪২ হিজরীর ১৪ই যী-কা'দাহ তারিখে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে শাহাদত লাভ করেন এবং কাসিয়ূন-এর পাদদেশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা বংশগতভাবে ছিলেন উছমানী অর্থাৎ হযরত উছমান (রা)-এর বংশধর। উল্লিখিত গ্রন্থের লেখক তাঁর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন যে, আমি দেখলাম, সায়্যিদুনা হযরত উছমান (রা) ইবনে আফফানের ইনতিকাল হয়ে গেছে আর আমি তাঁর জানাযা পড়াচ্ছি। স্বপ্নের কথা শুনে তিনি বললেন, এটি আমার চির বিদায়ের ইঙ্গিত। আমি তাঁর সন্তান (বংশধর)। এই স্বপ্ন তিনি মাগরিবের সময় বর্ণনা করেছিলেন এবং মাওলানা খালিদ এশার সালাত আদায় অন্তে ওসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) করেন ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি ঘরে যান এবং সেই রাতেই-প্লেগে আক্রান্ত হন ও ইনতিকাল করেন।[১]

১. সাল্লু'ল-হুসামু'ল হিন্দী, পৃ. ৩১৮-২৫; মাওলানার সিলসিলা সিরিয়া ও তুরস্কে এখনও বর্তমান। আমি দামিশ্‌ক, হলব ও তুরস্কে এই সিলসিলার অনেক মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি।

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ ও তাঁর খলীফাবৃন্দ

হযরত শাহ্ গুলাম আলী (র)-র মূল স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁর সিলসিলাকে সমগ্র বিশ্বে যিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি হলেন তাঁর হাতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাদ্দিদী খান্দানের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য-মণি হযরত শাহ আহমদ সাঈদ ইব্‌ন শাহ্ আবু সাঈদ[১] (১২১৭-১২৭৭ হি.) যিনি তাঁর পিতা হযরত শাহ্ আবু সাঈদ-এর ওফাতের পর ১২৫০ হিজরীতে হযরত শাহ্ গুলাম আলী ও হযরত মির্যা মাজহার জানে-জানাঁর আসনকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলেন এবং পূর্ণ ২৩ বছর (১২৫০-১২৭৩ হি.) পর্যন্ত অত্যন্ত জোরে-শোরে মুজাদ্দিদী সিলসিলার প্রচার-প্রসারে তৎপর থাকেন এবং ঐ বছরই (১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিপ্লবের বছর) বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষের পিতা-পিতামহদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহকে বিদায় জানান। অতঃপর ১২৭৪ হিজরীর মুহার্রাম মাসে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে ৭৪-এর শাওয়াল মাসে মক্কা মুকার্রামায় পৌঁছেন। এরপর মদীনা তায়্যিবায় স্থায়ী আবাস গ্রহণ করেন এবং দু'বছর জীবিত থেকে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হন। দু' বছরের এই স্বল্প সময়ে শত শত তুর্কী ও আরব তাঁর হাতে বায়'আত হয়। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণণা মুতাবিক, "যদি তাঁর হায়াত তাঁকে আরও কিছু দিন অবকাশ দিত এবং এই সিলসিলা জারী থাকত তাহলে তাঁর মুরীদের সংখ্যা লাখের অংকে গিয়ে পৌঁছুত।"[২]

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ (র)-এর খলীফার সংখ্যা নিরূপণ করা দুষ্কর। "মানাকিবে আহমাদিয়্যা"[৩] তে আশি জনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ভারতবর্ষে তাঁর সিলসিলার প্রচার একদিকে শায়খ দোস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারীর মাধ্যমে হয় যাঁর শ্রেষ্ঠতম খলীফা ছিলেন খাজা উছমান দামানী (মৃ. ১৩১৪ হি.) যিনি ডেরা ইসমাঈল খানের মূসা-যাঈ কসবাতে বসে সেখানকার পরিবেশকে প্রেমের উষ্ণতা ও নক্‌শবান্দিয়া নিসবতের প্রশান্তি দ্বারা উত্তাল করে তোলেন। তাঁরই শ্রেষ্ঠতম খলীফা খাজা সিরাজুদ্দীন (মৃ. ১৩৩৩ হি.) এই সিলসিলাকে দূর থেকে দূরতম এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিরাট প্রভাব দান করেছিলেন এবং তিনি খোদায়ী পথ-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ, অটুট ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তা এবং হাদীছে পাকের প্রতি মগ্ন থেকে সঙ্গে আপন পূর্বপুরুষদের মর্যাদামণ্ডিত আসনকে ধরে রাখেন ও আবাদ করেন। খাজা সিরাজুদ্দীনের খলীফা হন মুফাসসিরে কুরআন ও তাওহীদের দাঈ ওয়াঁ বিছরার[৪] মাওলানা হুসায়ন আলী শাহ (১২৮৩-১৩৬৩ হি.)।

---

১. বিস্তারিত জানতে হলে দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৭ম খণ্ড; মকামাতে খায়র, মাওলানা শাহ আবুল হাসান যায়দ ফারূকী কৃত।

২. মকতূবাতে শাহ্ মুহাম্মদ ওমর ইব্‌ন শাহ্ আহমদ সাঈদ বনাম মাওলানা সাইয়েদ আবদুস সালাম হাসুবী (র.)।

৩. শাহ মুহাম্মদ মাজহার লিখিত।

৪. পশ্চিমা পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালী জেলায়।

তাঁর মাধ্যমে বিরাট আকারে আকীদা-বিশ্বাসের সংস্কার সাধিত হয় এবং নির্ভেজাল তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ ও সমুন্নত হয় যার নজীর এ যুগে মেলা ভার।

ঐ যুগেই মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলার একজন বড় শায়খ ছিলেন শাহ্ ইমাম আলী (১২১২-১২৮২ হি.) মকানবী[১] যাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের ধাবমান স্রোত ও জনপ্রিয়তার অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর বাবুর্চি খানায় দৈনিক তিনশ' বকরী যবাহ্ হত।[৩] তাঁর সিলসিলা হযরত আবদুল আহাদ ওয়াহদাত ওরফে শাহ্ গুল-এর মাধ্যমে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী পর্যন্ত পৌঁছে।

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ-এর একজন জলীলু'ল-কদর খলীফা মাওলানা সাইয়েদ আবদুস সালাম ওয়াসেতী হাসুভী (১২৩৪-১২৯৯ হি.) যিনি খুবই উচ্চ নিসবত ও ছাহেবে ইস্তেকামাত শায়খ ছিলেন যাঁর মাধ্যমে যুক্ত প্রদেশে এই তরীকার প্রচার-প্রসার ঘটে।[৪]

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদের পুত্র হযরত শাহ্ আবদুর রশীদ (১২৩৭-১২৮৭ হি.) (যাঁর থেক নওয়াব কালবে আলী খান, রামপুরের শাসক, অধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন) আপন পিতার পর মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অবশেষে মক্কা মুকার্রামায় এসে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দানে লিপ্ত থেকে ইহলোক ত্যাগ করেন। জান্নাতুল মুআল্লাতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁরই পুত্র শাহ্ মুহাম্মদ মা'সূম (১২৬৩-১৩৪১ হি.) রামপুর রাজ্যে মা'সূমী খানকাহ্র বুনিয়াদ রাখেন। ৩২ বছর রামপুরে অবস্থান করেন এবং ১৩৪১ হিজরীতে মক্কা মুআজ্জমায় ইনতিকাল করেন। তৎপুত্র মাওলানা আবু সাঈদ এখনও জীবিত আছেন।[৫]

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ মুহাম্মদ মাজহার (১২৪৮-১৩০১ হি.) অত্যন্ত শক্তিশালী নিসবতসম্পন্ন ও কাছীরু'ল-ইরশাদ বুযুর্গ ছিলেন। সমরকন্দ, বুখারা, কাযযান, এরযে রোম, আফগানিস্তান, ইরান, জাযীরাতু'ল-আরব (আরব উপদ্বীপ) ও সিরিয়ার শত শত আল্লাহ্র পথের পথিক তাঁর ফয়েয লাভে ধন্য হন। ১২৯০ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় খুবই উন্নতমানের তিনতলা খানকাহ্ নির্মাণ করেন যা রিবাতে মাজহারী নামে মশহূর। এটি মসজিদে নববীর বাবু'ন-নিসা ও জান্নাতুল বাকী'র মাঝে অবস্থিত (মসজিদে নববীর সাম্প্রতিক সম্প্রসারণের পর এর অস্তিত্ব সম্ভবত নেই।-অনুবাদক)।

---

১. মকান শরীফ গুরুদাসপুর জেলার একটি কসবা যার পুরনো নাম রত্তর ছত্তর।
২. বিস্তারিত জানতে দ্র. তাযকিরায়ে বেমিছল রাজগানে রাজোর, মির্যা জাফরুল্লাহ খান, পৃ. ৫০৮-২১।
৩. বিস্তারিত জানতে হলে দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৭ম খণ্ড।
৪. মূল পুস্তকটির ১৯৮০ সালে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে অনূদিত বিধায় লেখক গ্রন্থকার তাঁর বেঁচে থাকার তথ্য দিয়েছিলেন। বর্তমান খবর অজ্ঞাত।—অনুবাদক।

তৃতীয় পুত্র শাখ মুহাম্মদ ওমর (১২৪৪-৯৮)। হযরত শাহ্ আবুল খায়র মুজাদ্দিদী তাঁর পুত্র।

হযরত শাহ্ আবদুল গনী

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ-এর উচ্চ মর্তবাসম্পন্ন ভ্রাতা বিখ্যাত মুহাদ্দিছ হযরত শাহ আবদুল গনী (১২৩৫-৯৬ হি.) যিনি দরসে হাদীছ, সুলূক ও তাসাওউফকে এভাবে একত্র করেন যার নজীর হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভীকে বাদ দিলে আর কোথাও মেলা ভার। বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক সম্পদ ও মুজাদ্দিদী নিসবতের ধারক-বাহক এবং শায়খ-ই কামিল হবার সাথে সাথে তিনি হাদীছের উস্তাদুল হিন্দ ও শায়খ-এ ওয়াক্ত ছিলেন যাঁর হলকায়ে দরসে মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহীর মত বিখ্যাত সব আলিম ছিলেন এবং হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অনন্য স্থানের অধিকারী হয়। দেওবন্দ ও সাহারনপুরের মাজাহিরুল উলূম-এর মত বিরাট বিরাট মাদরাসা হাদীছ চর্চার কেন্দ্র হিসাবে অভিহিত হয়। ১৮৫৭ সালের (সিপাহী) বিপ্লবের পর তিনিও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করেন এবং মদীনায়ে তায়্যিবায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অতঃপর তিনি "কানযু'ল উম্মাল"-এর লেখক আল্লামা শায়খ আলী মুত্তাকীর সুন্নত জীবিত করত হারামায়ন শারীফায়ন-এ দীর্ঘকাল হাদীছের খেদমতে মশগুল থাকেন এবং আরব-অনারব দেশগুলোতে ফয়েয পৌঁছানোর পর বর্তমানে জান্নাতুল বাকীতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।[১]

শাহ আবদুল গনী (র)-র তিনজন নামকরা খলীফা ছিলেন যাঁদের অন্যতম হলেন মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী মুহাজিরে মাক্কী যিনি সাহিবু'দ-দালাইল বা দালাইল প্রণেতা হিসাবে মশহূর (মৃ. ১৩৩৩ হি.)। দ্বিতীয় জন হলেন শাহ আবু আহমদ মুজাদ্দিদী ভূপালী (মৃ. ১৩৪২ হি.) এবং তৃতীয়জন হলেন হযরত শাহ রফীউদ্দীন দেওবন্দী, মুহতামিম আওয়াল, দারুল উলূম দেওবন্দ (মৃ. ১৩০৮ হি.) যাঁর থেকে হযরত মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব দেওবন্দী (মৃ. ১৩৪৭ হি.) খেলাফত পেয়েছিলেন, তাঁরই খলীফা ও মুজায ছিলেন। হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ এবং হযরত শাহ্ আবদুল গনী (র) ভারতবর্ষ থেকে হিজরত করে যাবার পর এই খানকাহওয়ালা শান যা অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে আবাদ ছিল, ছিল জনসমাগমপূর্ণ, তা খালি হয়ে যায়।[২] অবশেষে উক্ত খান্দানেরই নয়নমণি ও

১. তাঁরই শাগরিদ শায়খ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ত্রিহুতী তাঁর ও তাঁর মাশায়েখদের জীবন কাহিনী নিয়ে আরবীতে স্বতন্ত্র একটি পুস্তক লিখেছেন যার নাম اليانع الجنى فى اسانيدالشيخ عبد الغنى। এটি একজন ভারতীয় লেখকের আরবী ভাষাজ্ঞান ও রচনাশৈলীর সর্বোত্তম নমুনা।

২. গ্রন্থকার মাওলানা সাইয়েদ আবদুস সালাম হাসুভীর একটি পত্র দেখতে পেয়েছেন যিনি এমন একজনের পত্রের জওয়াবে তা লিখেছিলেন যিনি উল্লিখিত বুযুর্গদ্বয়ের হিজরতের পর খানকাহ বিরান হবার অভিযোগ করেছিলেন। হযরত শাহ আবদুল গনী মদীনা তায়্যিবা থেকে জওয়াব দেন যে, মাওলানা আবদুস সালামকে নিয়ে যাও এবং আমাদের জায়গায় বসিয়ে দাও। এক্ষণে এ জায়গায় বসার সেই সর্বাধিক উপযুক্ত।

আশা-আকাংক্ষার কেন্দ্র বিন্দু এবং উক্ত খান্দানেরই একজন জলীলু'ল কদর শায়খ হযরত শাহ আবুল খায়র মুজাদ্দিদী (১২৭২- ১৩৪১ হি.), যিনি ছিলেন শাহ আহমদ সাঈদ সাহেবের ছাহেবে নিসবত ও কামালিয়াতসম্পন্ন পৌত্র, একে আবাদ করেন এবং সত্ত্বরই এ খানকাহ জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে ওঠে।[১]

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খান্দান অধঃস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষের পর সরহিন্দ থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পূর্বপুরুষদের কবরের সেবায়েত-গিরি থেকে হেফাজত করা ছাড়াও (যার বহু দুঃখজনক খারাবী অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে) হযরত মুজাদ্দিদের তরীকার প্রচার-প্রসার এবং দাওয়াত ও তাবলীগের বহুবিধ কল্যাণ লুক্কায়িত ছিল। অনন্তর একটি শাখা কাবুলে (যার শেষ কেন্দ্র বা মারকায ছিল জাওয়াদ)[২] সম্মান ও মর্যাদা, কল্যাণ ও জনগণের পথ প্রদর্শনের কাজের সঙ্গে অবস্থান করে। হযরত নূরুল মাশায়েখ শায়খ ফযলে ওমর মুজাদ্দিদী ওরফে শের আগা ঐ শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন যাদের মুরীদদের সংখ্যা শত শতের উর্ধ্বে ছিল এবং পাক-ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।[৩] তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ মুহাম্মদ সাদেক মুজাদ্দিদী মধ্য প্রাচ্যে আফগানিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আপন ইল্‌ম, কল্যাণকামিতা, তাকওয়া এবং মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা-সংকটের ব্যাপারে গভীর আগ্রহের কারণে তাঁকে আরব দেশগুলোতে সম্মানের চোখে দেখা হতো। জনগণের এই আন্দোলনে এই দুই ভাই কেন্দ্রীয় ও নেতৃসুলভ ভূমিকা পালন করেছিলেন যার পরিণতিতে আমীর আমানুল্লাহ খানকে সিংহাসন থেকে পদত্যাগ করতে হয় এবং নাদির শাহ সিংহাসন আসীন হন।[৪]

সিন্ধুতেও এই খান্দানের একটি অভিজাত শাখা কসবা টেণ্ডু সায়েদাদ, হায়দরাবাদ ও সিন্ধুতে বসবাস করে আসছিল। উক্ত শাখায় খাজা মুহাম্মদ হাসান মুজাদ্দিদী ও তাঁর পুত্র হাফিজ মুহাম্মদ হাশেম জান মুজাদ্দিদী ছিলেন খুবই বিখ্যাত ও বিশিষ্ট। মদীনা তায়্যিবায় ও মক্কা মুকার্রামায়ও মুজাদ্দিদী খান্দানের শাখা বর্তমান। তাঁরা বেশভূষা ও আচার-আচরণে এবং খান্দানী ঐতিহ্য রক্ষার সাথে সাথে জীবিকা

---

১. বিস্তারিত জানতে দ্র. মাকামাতে খায়র, মাওলানা শাহ আবুল হাসান যায়দ ফারূকী, সাজ্জাদানশীন, খানকাহ হযরত শাহ আবুল খায়র (র)।

২. নিতান্তই আফসোস যে, রাশিয়ান ফৌজের আক্রমণ এবং সমাজতন্ত্রী আফগান সরকারের হস্তক্ষেপে এই কেন্দ্রটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং এটি যারা আবাদ রাখতেন সেই সব উলামায়ে কিরাম আজ নির্বাসিত। লেখক ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তান ও ইরান সফর কালে কেন্দ্রটি জন-সমাগমে পূর্ণ দেখেছিল এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম নূরুল মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিল।

৩. ২৫ শে মুহার্‌রাম, ১৩৭৬ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। লেখকের মক্কা মুআজ্জমা ও লাহোরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল।

৪. দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমূক তক, লেখককৃত ৪২-৪৩ পৃ.।

অর্জন ও পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনার সৌজন্যমূলক পেশায় নিয়োজিত আছেন ও সুনামের সঙ্গেই আছেন।

আহ্সানিয়া সিলসিলা ও তাঁর শ্রেষ্ঠ মাশায়েখবৃন্দ

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী (র) যদিও হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর মহান তরীকার ছানা বিশেষ এবং তাঁরই কোলে তিনি লালিত-পালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কিন্তু আপন উন্নত সামর্থ্য ও ভাগ্যবান প্রকৃতি বা স্বভাবের কারণে সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদিয়া নক্‌শবান্দিয়ার মধ্যেও এক বিশেষ রঙের ধারক-বাহক এবং একটি তরীকার প্রতিষ্ঠাতাও বটেন যা বহু মুজতাহিদসুলভ বিশিষ্টতার কারণে "তরীকায়ে আহসানিয়া" নামে নামকরণ হয়। হিকমতে ইলাহীর অপার নিদর্শনই বলতে হবে যে, যেই শাখার বুনিয়াদ একজন নিরক্ষর লোকের হাতে পড়ল তারই ভাগে ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম উলামায়ে কিরাম, মুহাদ্দিছীন, সমকালীন আসাতেযায়ে কিরাম, বই-পুস্তক ও কিতাব সুন্নাহর প্রকাশক, দাঈ ইলাল্লাহ্ ও সংস্কারক বিখ্যাত দীনি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং লেখক ও গবেষক পড়ল এবং তিনি এ ব্যাপারেও তাঁর মহান পূর্বপুরুষের সুন্নাহ্‌র অনুসারী এবং তাঁর উত্তরাধিকারী। হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র), সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ আবদুল আযীয, দা'ঈ ইলাল্লাহ্ ও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ্ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) ও মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, মুসনাদুল হিন্দ হযরত শাহ্ ইসহাক দেহলভী, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, আলিমে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (র) এই আহসানিয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ ও শায়খদের মাধ্যমে মুজাদ্দিদিয়া নক্‌শবান্দিয়ায় দাখিল ও এজাযত ও খেলাফত লাভ করেন।

হযরত শাহ্‌ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর মত তাসাওউফের তরীকাসমূহের চক্ষুষ্মান পর্যবেক্ষক ও বিভিন্ন নিসবতের সূক্ষ্ম রহস্যবিদ হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী সম্পর্কে খুবই সমুন্নত ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং তাঁকে সুলূক ও ইহ্‌সান শাস্ত্রের তথা ইলমে তাসাওউফের মুজতাহিদ ও স্বতন্ত্র সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করেন।

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী (র)-র খলীফাদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল এবং তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করা এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে বেশ কঠিন।

৩. লেখক ১৯৪৪ সালে হযরত শাহ্ মুহাম্মদ হাসান মুজাদ্দিদীর সঙ্গে তাঁর কসবা ও খানকাহ্‌য় সাক্ষাত করেন। তিনি বিজ্ঞ আলেম ও গ্রন্থকার ছিলেন, বুযুর্গ ছিলেন। মাওলানা হাফিয হাশিম জান-এর দিল্লীর নিজামুদ্দীনে আসা-যাওয়া ছিল এবং লেখকের জন্মভূমি দায়েরাহ্ শাহ্ আলামুল্লাহ্ রায়বেরেলীতেও তিনি একবার তাশরীফ এনেছিলেন। কাবুল ও টেন্ডু সায়েদাদ-এর দুই মুজাদ্দিদী শাখা হযরত শায়খ গুলাম মুহাম্মদ মা'সূম (মা'সূম ছানী বা ২য় মা'সূম নামে মশহূর)-এ গিয়ে মিলে যায় যিনি হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর পৌত্র ছিলেন।

নুযহাতু'ল-খাওয়াতির" নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত নামগুলো এসেছে যাঁদের হযরত সাইয়েদ বান্নুরী (র) থেকে নিসবত প্রাপ্তি ও মুরীদ হওয়া এবং কারুর কারুর এজাযত ও খেলাফত প্রাপ্তি ঘটেছে। নামগুলো নিম্নরূপ ঃ

দেওয়ান খাজা আহমদ নাসীরাবাদী (মৃ. ১০৮৮ হি.), শায়খ বায়েযীদ কাসূরী (মৃ. ১০৯০ হি.), শাহ ফতহুল্লাহ সাহারন পূরী (মৃ. ১১০০ হি.) ও শায়খ সা'দুল্লাহ বিলখারী লাহোরী (মৃ. ১১০৮ হি.)। কিন্তু তাঁর সিলসিলার প্রচার-প্রসার নিম্নোক্ত, চার জন্য খলীফার দ্বারা হয় যা তাঁর মুজতাহিদসুলভ তা'লীম ও তরবিয়তের নমুনা ও স্মৃতিস্বরূপ ঃ (১) হযরত সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ্ হাসানী (মৃ. ১০৩৩ হি.), (২) হযরত শায়খ সুলতান বালয়াবী, (৩) হযরত হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী ও (৪) শায়খ মুহাম্মদ শরীফ শাহ আবাদী।[১]

হযরত সাইয়েদ শাহ্ আলামুল্লাহ্ ও তাঁর খান্দান

হযরত সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ[২] সম্পর্কে হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী হিজরতের সময় বলেছিলেন, "সাইয়েদ! সম্পর্ক মযবুত করে যাও এবং আপন জায়গায় বসে যাও। তোমার মাশায়েখের নিসবত অযোধ্যায় এমন হবে যেমনটি তারকারাজির মাঝে প্রদীপ্ত সূর্যের"। খাজা মুহাম্মদ আমীন বাদাখশী, যিনি হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরীর মুজায ও নিকটজন ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, "দুনিয়ার গন্ধও তাঁর পাশে ঘেষতে দিতেন না। ভারতবর্ষ এবং আরবেও তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী ও দীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ছিল প্রবাদ বাক্যের মত যা সবার মুখে মুখে ফিরত। অধিকাংশ লোক তাঁকে দেখে বলত, সম্ভবত সাহাবায়ে কিরাম (রা) এমনটিই হয়ে থাকবেন"।[৩] "বাহরে যুখার" প্রণেতা তাঁর তাযকিরায় এই কথা লিখেছেন,

مجاهدا يتكه ازاں يگانه زمانه درباب نفرت دنيا باتباع
طريقه نبويه بظهور آمده بعداز صحابه كرام در ديگراولياء امت
متاخرين كم تريافته موشود -

---

১. তাঁর একজন বড় খলীফা আবদুন নবী (শাম জূরাসী, জেলা জলন্ধর) যিনি তাঁর যুগে একজন ওলী আরিফ, শক্তিশালী নিসবতসম্পন্ন শায়খ ছিলেন এবং যাঁর বেলায়েত ও মহান শানের ব্যাপারে সে যুগের লোকেরা একমত ছিল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ "ইনতিবাহু ফী সালাসিলি আওলিয়াল্লাহ" নামক গ্রন্থে তাঁর একটি সূক্ষ্ম পত্র উদ্ধৃত করেছেন। বিস্তারিত দ্র. নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

২. বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন মাওলানা গোলাম রসূল মেহের কৃত "সাইয়েদ আহমদ শহীদ," ১ম খণ্ড, বর্তমান লেখককৃত "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ" ১ম খণ্ড, "তাযকিরায়ে শাহ আলামুল্লাহ" মওলবী মুহাম্মদ আল-হাসানী মরহুম কৃত এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর "আনফাসু'ল-আরিফীন" নামক গ্রন্থেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দেখুন ১২ পৃ.।

৩. নাতাইজু'ল-হারামায়ন, শায়খ আবদুল হাকীমের বরাতে:

"তাঁর বক্তব্য হল, (যখন তিনি হজ্জ সফর করেন তখন) মক্কা মুআজজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার লোকেরা তাঁর এই কর্মশক্তি, সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ, অটুট ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় সংকল্প দৃষ্টে বলতেন, هذا كابى ذر অর্থাৎ শাহ আলামুল্লাহ এ যুগে আবু যর গিফারী (রা)-এর আদর্শ নমুনা এবং এই উক্তি হারামায়ন শারীফায়ন-এ সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। সুন্নতে নববীর এই পরিপূর্ণ অনুসরণেরই পরিণতি ছিল যে, যে রাত্রে তিনি ইনতিকালে করেন সেই রাত্রে সম্রাট আলমগীর (র) স্বপ্ন দেখেন, আজ রাত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইনতিকাল করেছেন। এরূপ স্বপ্নদৃষ্টে সম্রাট খুবই দুশ্চিন্তাযুক্ত হন। উলামায়ে কিরামের কাছে স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, এই রাত্রে সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ্র ইনতিকাল হয়ে থাকবে। তিনি সুন্নত অনুসরণের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ পদাংক অনুসারী। সরকারী সুত্রে পরে জানা গিয়েছিল যে, ঐ রাত্রেই তিনি ইনতিকাল করেন"।[১]

তাঁর খান্দানে আহসানিয়া সিলসিলা অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে যাঁর মধ্যে তাঁর ৪র্থ সন্তান হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ (মৃ. ১১৫৬ হি.), তাঁর পুত্র হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ আদল ওরফে শাহ লাল (১৯৯২), সাবের ইবন সাইয়েদ আয়াতুল্লাহ ইবন শাহ আলামুল্লাহ (মৃ. ১১৬৩ হি.), হযরত শাহ আবু সাঈদ ইব্ন সাইয়েদ মুহাম্মদ যিয়া ইবন সাইয়েদ আয়াতুল্লাহ ইবন শাহ আলামুল্লাহ (মৃ. ১১৯৩ হি.), হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ ওয়াযেহ[২] ইবন সাইয়েদ মুহাম্মদ সাবের, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ জাহির হাসানী (মৃ. ১২৭৮ হি), মাওলানা সাইয়েদ খাজা আহমদ ইবন ইয়াসীন নাসীরাবাদী (মৃ. ১২৮৯ হি.) এবং হযরত শাহ যিয়াউন নবী (মৃ. ১৩২৬ হি.) বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন, শায়খ ছিলেন যাঁদের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের ঈমান ও ইহসানের মূল্যবান সম্পদ, শরীয়তের ওপর আমল ও সুন্নতের অনুসরণ করার তৌফিক লাভ হয়েছিল।[৩]

শায়খ সুলতান বালিয়াবী

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরীর দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন হযরত শায়খ সুলতান বালিয়াবী।[৪] "নাতাইজু'ল-হারামায়ন" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি হযরত

১. বাহরে যুখার (শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন আশরাফকৃত) এ বিস্তারিত এবং "দুররু'ল-মা'আরিফে" (হযরত শাহ গুলাম আলী (র)-এ বাণী সংকলন (মলফুযাত); হযরত শাহ রঊফ আহমদ মুজাদ্দিদী সংকলিত, পৃ. ৪৬ সংক্ষেপে স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. তাঁর ওফাত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে।

৩. দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড;।

৩. বালিয়া বিহার প্রদেশের গঙ্গা নদীর ধারে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে জায়গাটি লাখমিনা (জেলা বেগো সরাঈ) নামে মশহুর। মুঙ্গের-এর সামনাসামনি নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত।

সাইয়েদ আদম-এর বড় খলীফাদের মধ্যে ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর নাম হযরত সাইয়েদ শাহ 'আলামুল্লাহ (র)-র সঙ্গে উচ্চারিত হয়।[১]

হযরত হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী এবং ওয়ালীউল্লাহ্ সিলসিলা

হযরত সাইয়েদ আদম বানুরীর তৃতীয় খলীফা হলেন হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী যাঁর মাধ্যমে তাঁর সিলসিলার সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার ঘটে। হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর পিতা হযরত শাহ্ আবদুর রহীম ফারূকী (মৃ. ১১৩১ হি.) তাঁরই খলীফা এবং তৎকর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন।[২] হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং শাহ্ আবদুল আযীয-এর সিলসিলা যার ভেতর হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র), এরপর তাঁর মাধ্যমে হযরত হাজী আবদুর রহীম শহীদ বেলায়েতী, মিঞাজী নূর মুহাম্মদ ঝিনঝিনাভী এবং তাঁর মাধ্যমে শায়খুল আরব ওয়া'ল-আজম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী এবং তাঁর খলীফা মাওলানা কাসেম নানুতবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহী, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, অতঃপর মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহীর মাধ্যমে হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, হযরত শাহ্ আবদুর রহীম রায়পূরী, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরী ও মাওলানা সাইয়েদ হুসায়ন আহমদ মাদানী; হযরত শাহ্ আবদুর রহীম রায়পূরীর খলীফাদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পূরী এবং মাওলানা খলীল আহমদ সাহারন পূরীর খলীফাদের মধ্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কানদেহলভী, তাবলীগি সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা এবং হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব মুজাদ্দিদিয়া আহসানিয়া সিলসিলার সঙ্গে নিসবতযুক্ত এবং তাঁরা সকলেই এই তরীকায় এজাযতপ্রাপ্ত ও ছাহেবে ইরশাদ ছিলেন।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী সম্পর্কে এই অধ্যায়ে কিছু লেখা সম্ভব নয়। কেননা "এই উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করতে হলে বিশালাকার জাহাজ দরকার।"

---

১. আফসোস যে, তাঁর জীবন-কাহিনী ও মলফূযাত সংরক্ষিত নয়। এখন এই কসবায় তাঁর খান্দান বসবাস করছে।

২. হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদীর মর্যাদা ও প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে জানতে হলে দ্র. আনফাসু'ল-আরিফীন" পৃ. ৬-১৫। হযরত শাহ আবদুর রহীম-এর জীবন-কাহিনী ও কামালিয়াত সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ' আনফাসু'ল-আরেফীন" লিখেছিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁর ও তাঁর খান্দান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি ১৩৩৫ হিজরীতে মুজতাবাঈ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। দেখুন ১৫-৮৭ পৃ.।

তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে এই সিরিজের একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র খণ্ড আবশ্যক যা সম্ভবত এই সিরিজের পঞ্চম খণ্ড হবে। হযরত মির্যা মাজহার জানে-জানাঁ সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর সাক্ষ্য ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সম্পর্কে হযরত শাহ গুলাম আলী "মকামাতে মাজহারী" তে মির্যা সাহেবের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

"শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এক নতুন তরীকা স্পষ্ট করে বিবৃত করেছেন। হাকীকত ও মা'রিফাতের গুঢ় রহস্যসমূহ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ও গুপ্তভেদ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। উলামায়ে কিরামের মধ্যে তিনি "রব্বানী" (স্বর্গীয়) উপাধি পাবার হকদার। সেই সব তত্ত্বজ্ঞ সূফীদের মধ্যেও যাঁরা জাহিরী ও বাতেনী ইলমের সমন্বয়ক ছিলেন, এ ধরনের লোক হাতে গোনার যোগ্য যাঁরা তাঁর মত নতুন ইল্‌ম ও বিষয় সম্পর্কে মুখ খুলেছেন"।[১]

ইমামে মা'কূলাত তথা বোধগম্য বস্তুনিচয়সমূহের ইল্‌মের ইমাম আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী যখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী লিখিত "ইযালাতু'ল-খাফা" দেখলেন তখন তিনি তাঁর ছাত্রদের সামনে প্রকাশ্যে বললেন, "এই গ্রন্থের লেখক এক গভীর সমুদ্র যার কুল-কিনারা চোখে পড়ে না।" বিখ্যাত আলিম মুফতী এনায়েত আহমদ কাকূরভী বলেন, "শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের উপমা 'তূবা' বৃক্ষের ন্যায় যার শেকড় তাঁর ঘরে এবং এর শাখা-প্রশাখা প্রতিটি মুসলমানের ঘরে বিস্তৃত।"[২]

হযরত শাহ আবদুল আযীয সাহেব সম্পর্কে যতটুকু বলা যায় তাহল এই যে, তাঁর সামগ্রিকতা, যুক্তি ও দর্শনশাস্ত্রীয় বিষয়, কুরআন-হাদীছ সম্পর্কিত বিষয়াদি ও সাহিত্য বিষয়ে একই রূপ দক্ষতা, পাঠদান শক্তি, ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসার, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ, রচনাশক্তি, কথার মিষ্টতা, উদার চরিত্র, ভারতবর্ষের মুসলিম মিল্লাতের জন্য দিলের ব্যথা ও অন্তর্জ্বালা ও ব্যাপক অবদানের ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।[৩]

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর জামা'আত

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ সম্পর্কে যা বলা যায় তাহল, তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল মুজাদ্দিদিয়া আহসানিয়া সিলসিলার সঙ্গে। তাঁর জীবন-কাহিনী নিয়ে বিরাট ভলিউম আকারের গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে মাওলানা গোলাম রসূল মেহের লিখিত ৪ খণ্ডে সমাপ্ত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) এবং বর্তমান লেখক

১. মকামাতে মাজহারী, মাতবায়ে আহমদী সং. ৬০-৬১ পৃ.।
২. বিস্তারিত দ্র. নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৬ষ্ঠ খণ্ড;
৩. কিছুটা বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৭ম খণ্ড;

কর্তৃক লিখিত ২খণ্ডে সমাপ্ত "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ" (র) অধ্যয়ন যথেষ্ট বিবেচিত হবে।[১] সে যুগেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের ওপর যেই গভীর প্রভাব পড়ে এবং তাঁর থেকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের হেদায়েত তথা পথ-প্রদর্শন, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের যেই বিশাল কাজ নিয়েছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট মনে করছি।

সে যুগের একজন দৃষ্টিসম্পন্ন আলিম মওলভী আবদুল আহাদ সাহেব লিখেছেন ঃ

"হযরত সাইয়েদ সাহেবের হাতের ওপর চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু ও অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন এবং তিরিশ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে বায়আত হয় এবং বায়আতের যেই সিলসিলা তাঁর খলীফা ও খলীফাদের খলীফাগণের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে অব্যাহতভাবে চলছে সেই সিলসিলায় কোটি কোটি মানুষ তাঁর বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

মশহুর আলিমে রব্বানী আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী (মৃ. ১২৬৯ হি.) বলেন,

"হাজার হাজার মানুষ নিজেদের ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং হাজার হাজার মানুষ বাতিল মাযহাব তথা মিথ্যা ধর্ম ত্যাগ করে তওবা করেছে। পাঁচ ছয় বছরের স্বল্পতম সময়ে হিন্দুস্তানের তিরিশ লক্ষ মানুষ হযরতের কাছে বায়আত হয়েছে এবং হজ্জ সফরে প্রায় লক্ষ মানুষ বায়'আত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।"[৩]

হিন্দুস্তানের খ্যাতিমান লেখক ও গ্রন্থকার নওয়াব সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান খান (ভূপালের শাসনকর্তা, মৃ ১৩০৭ হি.) যিনি তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং যারা দেখেছিলেন তাদের একটি বড় দলের যুগকেও পেয়েছিলেন, "তাকসার জুয়ূদু'ল-আহরার" নামক গ্রন্থে লিখছেনঃ

"আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের পথ প্রদর্শন এবং আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্র এক নিদর্শন ছিলেন। এক বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং এক বিশাল জগত তাঁর কলবী ও জিসমানী তথা আত্মিক ও দৈহিক তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ওলীর দর্জায় উপনীত হয়। তাঁর খলীফাদের ওয়াজ-নসীহত ভারতভূমিকে শির্ক ও বিদ'আতের

---

১. লেখক কর্তৃক লিখিত تحقیق و انصاف کی عدالت میں ایك مظلوم مصلح کا مقدمه-পাঠ করা উপকারী হবে।

২. সওয়ানিহ আহমদী;

৩. রিসালা দাওয়াতে মাশমূলা মাজমূ'আয়ে রাসায়েলে তিস'আ, মওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদীকৃত, প ৬ ৫।

জঞ্জাল ও আবর্জনা থেকে মুক্ত করে দেয় এবং কুরআন ও সুন্নাহর রাজপথে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখন পর্যন্ত তাঁদের ওয়াজ-নসীহতের বরকত অব্যাহত রয়েছে।"

সামনে অগ্রসর হয়ে লিখছেন ঃ

"সংক্ষিপ্ত কথা হল এই যে, এই যুগে দুনিয়ার কোন দেশে এমন কামালিয়াতসম্পন্ন বুযুর্গের নাম শোনা যায় নি এবং যেই ফয়েয এই সত্যপথের পথিক দলটি থেকে মানুষ পেয়েছে তার দশ ভাগের এক ভাগও এ যুগের কোন আলিম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ থেকে পায়নি।"

যেমনটি এর আগেই লেখা হয়েছে, সাইয়েদ সাহেবের মাধ্যমেই দেওবন্দের মহান শ্রদ্ধাভাজন সন্তানেরা এবং সাদিকপুরের[১] বুযুর্গ মনীষিগণ মুজাদ্দিদিয়া নক্শবান্দিয়া সিলসিলায় দাখিল, এজাযত ও খেলাফত লাভে ধন্য হয়েছেন। ঐ সব হযরতের দ্বারা এই উপমহাদেশে দীনি ইল্মের প্রচার-প্রসার, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং দাওয়াত ও ইসলাহ্র যেই বিশাল কাজ সম্পাদিত হয়েছে যা কোন ইনসাফ প্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। আর এসবই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র তাজদীদ ও ইসলাহ্ তথা সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মের ফল-ফসল এবং তাঁরই বরকতময় প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনিই হিজরী একাদশ শতাব্দীর কোলাহলপূর্ণ যুগের সূচনায় এর জন্য রাস্তা সমতল করেন, এর জন্য অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করেন, দিলের মধ্যে এর জন্য আবেগদীপ্ত প্রেরণা ও উৎসাহ জাগিয়ে তোলেন এবং এমন একটি দল স্মৃতি-স্মারক হিসেবে রেখে যান যারা নিজেদের অন্তর্জ্বালা ও অভ্যন্তরীণ (বাতেনী) নূরের সাহায্যে ধর্মের এই প্রদীপ শিখাকে আলোকদীপ্ত ও উজ্জ্বল রাখেন। এরপর এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বলতে থাকে এবং এদেশ থেকে কুফর ও অজ্ঞতা এবং শির্ক ও বিদ'আতের অন্ধকার সেভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে নি যেভাবে হিজরী দশম শতাব্দীর শেষভাগে দর্শকের চোখে ভাসছিল। এর সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত কিংবা কোন মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষাকারী জামা'আতের একথা বলার অধিকার জন্মায় যে,

১. সাদিক পুর বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনার এক মশহুর মহল্লা যা সাইয়েদ সাহেবের জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলনের সবচে' বড় কেন্দ্র ছিল এবং যাঁরা এই কাজকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন এবং এক্ষেত্রে সবচে' বেশি কুরবানী দেন তাঁরা হযরত মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা এনায়েত আলী গাযী, জামাআতে মুজাহিদীনের আমীর মাওলানা আবদুল্লাহ (চামারকান্দ) এবং আবদুর রহীম সাদিকপুরী এর বিশিষ্ট সদস্য। "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে; ওদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের অঙ্গীকারে পরিবর্তন করে নাই।" (আল-কুরআন)

اغشه ایم برسرخارے بخون دل

قانون باغبانی صحرا نوشته ایم

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র রচনাবলী

পরিশেষে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র রচনাবলীর তালিকা পেশ করার মাধ্যমে আমরা গ্রন্থের ইতি টানতে চাই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমরা পাঠককে মাওলানা সাইয়েদ যেওয়ার হুসায়ন শাহ লিখিত "হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী" গ্রন্থের "হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর মহান রচনাবলী"[১] শিরোনামযুক্ত অধ্যায়টি পড়বার জন্য পরামর্শ দেব যেখানে বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁর রচনাসমূহের প্রত্যেকটির বিস্তারিত পরিচিতি পেশ করেছেন এবং সে সম্পর্কে মূল্যবান উপকরণ একত্র করে দিয়েছেন।

১. ইছবাতু'ন-নুবূওয়া (আরবী) ঃ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, মুজাদ্দিদী খান্দানের পারিবারিক লাইব্রেরী ও খানকাহগুলোতে সুরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছিল। কুতুবখানা ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী ১৩৮৩ হিজরীতে আসল আরবী মতন (মূলপাঠ) ও উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করে। এরপর ইদারায়ে সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া লাহোর ১৩৮৫ হিজরীতে অন্যান্য পুস্তিকার সঙ্গে আসল মতন ছাড়াই উর্দূ অনুবাদ প্রকাশ করে।

২. রদ্দে রওয়াফিয ঃ পুস্তিকাটি কতক ইরানী শী'আ আলিম লিখিত পুস্তিকার জওয়াবে লিখিত। এটি সম্ভবত ১০০১ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে লিখিত। পুস্তিকার কিছু কিছু নিবন্ধ দফতর আওয়াল, মকতূব নং ১৮০ ও ২০২-এও পাওয়া যায়। পুস্তিকার ফারসী মতন মকতূবাত শরীফ ফারসীর শেষে বহু প্রকাশক প্রকাশ করেছেন। হাশমত আলী খান ১৩৮৪ হিজরীতে রামপুর থেকে এর ফারসী মতন প্রফেসর ড. গোলাম মোস্তফা খানের উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করেন। অতঃপর ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া লাহোর ফারসী মতন পৃথক এবং উর্দূ তরজমা পৃথক প্রকাশ করে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী এই পুস্তিকার শরাহ লিখেছেন যা প্রকাশিত হয় নি।

৩. রিসালায়ে তাহলীলিয়া (আরবী) ঃ পুস্তিকাটি হিজরী ১০১০ সনে সংকলিত হয়। এর কেবল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত। ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী থেকে ১৩৮৪ হিজরীতে আরবী মতন উর্দূ অনুবাদসহ এবং ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া, লাহোর ১৩৮৫ হিজরীতে কেবল আরবী মতন (মূলপাঠ) অপরাপর পুস্তিকাসহ প্রকাশ করে।

৪. শরহে রুবা'ঈয়াত ঃ এতে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র দু'টি রুবা'ঈর হযরত খাজার কলমে ব্যাখ্যা এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কলমে ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা লেখা। ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া লাহোর এবং ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া নাযিমাবাদ করাচীর পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে ১৩৮৫ হি. ও ১৩৮৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। এই শরহে রুবাঈয়াত-এর ব্যাখ্যা লিখেছেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী যা "কাশফু'ল-গায়ন ফী শারহি রুবা'আতায়ন" নামে মাতবা' মুজতাবাঈ দিল্লী থেকে ১৩১০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৫. মা'আরিফে লাদুন্নিয়্যা (ফারসী) ঃ এটি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র বিশেষ মা'আরিফ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসম্বলিত যা স্বয়ং হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবই বিন্যস্ত করেছিলেন হিজরী ১০১৫ কিংবা ১০১৬ সনে। প্রতিটি নিবন্ধেরই নাম দিয়েছিলেন "মা'রিফাত"। এসব মা'আরিফের সংখ্যা সর্বমোট ৪১ টি। পুস্তিকাটির ফারসী মতন সর্বপ্রথম হাফিজ মুহাম্মদ আলী খান শওক মাতবা' আহমদী, রামপুর থেকে ১৮৯৮ সালে প্রকাশ করেন। এরপর মজলিসে ইলমী ডাভেল, হাকীম আবদুল মজীদ সায়ফী, ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া এবং ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া নাযিমাবাদ, করাচী লাহোর বিভিন্ন বছরে প্রকাশ করে।

৬. মাবদা ও মা'আদ (ফারসী) ঃ পুস্তিকাটি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র ইল্‌ম ও মা'রিফাতের পরিচয় সম্বলিত। এর নিবন্ধগুলো বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল যেগুলোকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খলীফা মাওলানা সিদ্দীক কাশ্মী হিজরী ১০১৯ সনে সংকলিত ও বিন্যস্ত করেন এবং এর নিবন্ধগুলোকে "মিনহা" শিরোনামে পৃথক করে দেন। সংকলিত নিবন্ধের সংখ্যা ৬১ টি। প্রকাশিত নুসখাগুলোর মধ্যে সবচে' প্রাচীন ফারসী নুসখা মাতবায়ে আনসারী দিল্লী কর্তৃক ১৩০৭ হিজরীতে প্রকাশিত। এরপর আরও কয়েকবার বিভিন্ন সনে প্রকাশিত হয়। শেষ বার ১৩৮৮ হিজরীতে ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী ফার্সী মতন সাইয়েদ যেওয়ার হুসায়ন শাহর উর্দু তরজমাসহ প্রকাশ করে। এর আরবী তরজমা শায়খ মুরাদ মাক্কীর কলমে মকতূবাত মু'আরবাব মাতবূ'আর হাশিয়ায় বর্তমান।

৭. মুকাশিফাতে আয়নিয়া ঃ এটি হযরত মুজাদ্দিদের এমন পাণ্ডুলিপি সম্বলিত যা কোন কোন খলীফা হেফাজত করেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ওফাতের পর মাওলানা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী হি. ১০৫১ সনে এটি বিন্যস্ত করেন। পুস্তিকাটি ১৩৮৪ হিজরীতে প্রথমবার ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী, ফারসী মতন উর্দূ অনুবাদসহ প্রকাশ করে।

৮. মকতূবাতে ইমাম রব্বানী (ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানীর পত্র সংকলন) ঃ এটি মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সবচে' বড় 'ইলমী, সংস্কার ও

পুনর্জাগরণমূলক স্মারক এবং আল্লাহ্প্রদত্ত কামালিয়াত, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদসুলভ তাহ্কীক ও মা'রিফাতের মকাম, তাঁর দিলের আবেগ ও হৃদয়ানুভূতির দর্পণস্বরূপ যার ওপর ভিত্তি করে তাঁকে "মুজাদ্দিদ আলফেছানী" তথা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁর জ্ঞানগত মকাম সমুদ্ভাসিত করা এবং হিন্দুস্তানের ফারসী সাহিত্যে (যার গুরুত্বকে "সুবুক হিন্দী"-র বিদ্রূপাত্মক নাম দিয়ে কম করা যায় না) তাঁর স্থান নির্ধারণ করা ও ইল্ম ও মা'আরিফ-এর পর্দা উন্মোচন করার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রয়োজন। এই পুস্তকটি ভারতবর্ষের একক রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত যার ওপর বহিঃভারতের উন্নত মানের মনীষী বুযুর্গ ও গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেছেন। আরবী ও তুর্কী ভাষায় এর তরজমা হয়েছে। ইল্মী ও রূহানী মারকাযগুলোয় এটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত। আলিম-উলামা, জ্ঞানী ও তরীকতপন্থী সূফীরা একে প্রাণ রক্ষাকারী কবচ বানিয়েছেন এবং এর সজীবতার মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন পার্থক্য আসে নি।

মকতূবাতের সাকূল্য সংখ্যা ৫৩৬। এটি তিনটি দফতর সম্বলিত। ১ম দফতরে ৩১৩ টি পত্র রয়েছে। এই দফতরকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর ইঙ্গিতে তাঁরই খলীফা হযরত মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ জাদীদ বাদাখশী তালেকানী ১০২৫ হিজরীতে সুবিন্যস্ত করেন। দ্বিতীয় দফতর ৯৯টি পত্র সম্বলিত এবং হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের ইঙ্গিতে এটি মাওলানা আবদুল হাই হিসারী শাদমানী ১০২৮ হিজরীতে বিন্যস্ত করেন। তৃতীয় দফতর ১১৪টি পত্র সম্বলিত। এটি তাঁরই বিখ্যাত খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী হিজরী ১০৩১ সনে বিন্যস্ত করেন। পরে ১০টি পত্র যা পরবর্তীকালে লেখা হয়েছিল এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এই দফতরের সাকুল্য পত্র সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১২৪-এ।

মকতূবাতের অনেকগুলো সংস্করণ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়। ১ম সংস্করণ সম্ভবত লাখনৌর নওল কিশোরের। এরপরে আরও কতকগুলো সংস্করণ ঐ প্রেস থেকেই ছাপা হয়। এরপর মাতবা' আহমদী দিল্লী, মাতবা' মুর্তাযাবী দিল্লী থেকে বারবার প্রকাশিত হয়। ১৩২৯ হিজরীতে মাওলানা নূর আহমদ অমৃতসরী খুবই যত্নসহকারে এর একটি উন্নত সংস্করণ প্রকাশ করেন যা অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের ধারক।

تمت بالخير